ভারত যখন ভাঙলো

নসীম হিজাযী

ভারত যখন ভাঙলো
নসীম হিজাযী

বৃত্তাকারে অর্ধশতাধিক বালতি সেট করা রেহেটের পাশে একটি বড় আকারের পুরাতন আম গাছ। তার নিচে বসে কশে হুকায় টান দিচ্ছিল ইসমাঈল। বাগানের এক প্রান্ত থেকে তার বড় ভাই গোলাম হায়দরকে আসতে দেখা গেলো। হাতের কোদালটি জমিনের ওপর রেখে তার কাছাকাছি বসতে বসতে বললো, ইসমাঈল! বলদগুলোকে আরো একটু জোরে হাঁকাও। কলুর ঘানিতে যেসব বলদ জুড়ে দেয়া হয় সেগুলোর মতো আস্তে চালে চললে তো সারাদিনেও জমিটায় পানিসেচের কাজ শেষ হবে না। দেখছোনা এখনো অর্ধেক জমিতেও পানি পৌঁছেনি। সন্ধ্যার আগে জমিতে পানিসেচের কাজ শেষ করে বাগানেও একটা সেচ দিতে হবে।

ইসমাঈল হুকার নলটি গোলাম হায়দরের দিকে ফিরিয়ে দিল। তারপর সেখান থেকে উঠে শ্লথগামী বলদগুলোর পিঠে দু ঘা বসিয়ে দিল এবং আবার আগের জায়গায় এসে বসে পড়লো।

গোলাম হায়দর হুকায় কয়েকটান দিয়ে বললো একটু পরে কেয়ারীটাও একবার দেখে এসো। তুমি কি কোথাও যাচ্ছো?

আমি একটু মজিদের খবরটা নিয়ে আসি। গতকাল পাটওয়ারীর হাত দিয়ে মাস্টারজী পয়গাম পাঠিয়েছিল বিগত দুদিন থেকে সে গরহাজির। আজ আমি তাকে খুব মেরেছি।

ইসমাঈল মুচকি হেসে বললো, মেরে কোনো লাভ হবে না। আমার মনে হয় তার সাথে তুমিও স্কুলে ভর্তি হয়ে যাও। আজ ভাইজান বাড়িতে আসবেন। আমি তাঁকেও বলবো যদি মজিদকে পড়াতে হয় তাহলে তার দেখাশুনা করার জন্য তার বাপকেও সংগে রাখতে হবে।

ভাইজান আজকে আসবেন, তোমাকে কে বললো?

তার নওকর এইমাত্র এলো। সে বলছে, সন্ধ্যে নাগাদ তিনি পৌঁছে যাবেন। দশ দিনের ছুটি পেয়েছেন।

তাহলে এবার তিনি সেলিমকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে তবে যাবেন। এটা ভালোই হবে। হয়তো তার সাথে পড়ে মজিদেরও মনে লেখাপড়ার শখ জন্মাবে।

কিন্তু সেলিম এখনো অনেক ছোট। আর আমি শুনেছি এ মাস্টারজী নাকি খুব বেশী মারধর করে।

গোলাম হায়দর কিছু বলতে চাচ্ছিল এমন সময় নিকটবর্তী একটি ক্ষেতে যে কৃষকটি হাল চালাচ্ছিল সে চিৎকার করে উঠলো, হায়দর মনে হচ্ছে তোমার পুত্রধন আসছে।

গোলাম হায়দর উঠে দাঁড়ালো। ইসমাঈলও তার অনুসরণ করলো। উভয়ে দেখতে লাগলো শস্যশ্যামল ক্ষেতগুলোর মধ্য দিয়ে অন্য গ্রামগুলোর দিকে চলে যাওয়া পায়ে চলা পথটির দিকে।

পাঁচ ছয়টি ছেলে গাধার পিঠে চড়ে অতি দ্রুত বেগে আসছিল। সওয়ারের দল তাদের হাতের লেখার তখতিগুলোকে ছড়ি হিসাবে ব্যবহার করছিল। সবার আগে ছিল মজিদ। ক্ষেতে কর্মরত কৃষকরা মাথা তুলে তাদেরকে দেখছিল। গাধার মালিক ছুটে আসছিল তাদের পেছনে পেছনে। অস্বাভাবিক ক্রোধে ফেটে পড়ছিল সে। অনবরত খিস্তি আওড়াচ্ছিল তাদের উদ্দেশ্যে। জমিন থেকে ঢিলা উঠাচ্ছিল এবং জোরে জোরে ছুঁড়ে মারছিল তাদের দিকে।

গোলাম হায়দরের চোখে মুখে রাগের লক্ষণ ফুটে উঠলো। কিন্তু ওদিকে ইসমাঈলের উচ্চ হাসি শুনে সেও হেসে উঠলো।

রেহেটের কাছাকাছি এসে মজিদ গাধার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়লো। অন্য ছেলেরাও তার পদাংক অনুসরণ করলো। গাধার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়েই তারা সবাই যার যার বাড়ির দিকে দৌড়ে পালালো। কিন্তু সামনে বাপ ও চাচাকে দেখে মজিদ পালাবার সাহস করলো না।

গাধাগুলোর মালিক কুমোর খয়েরদীনের এ সময় সবচেয়ে বড় খায়েশ ছিল এ দুষ্ট ছেলেদের বাপেরা যেখানেই থাক তারা যেন তার গালিগালাজ শোনে। কিন্তু তার অশেষ দুর্ভাগ্য খিস্তি খেউড়ের তোড়ে তার ঘন ঘন শ্বাস পড়ছিল এবং গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। ফলে তার আওয়াজ বেশী দূর শোনা যাচ্ছিল না। তার পাগড়ী মাথা থেকে নিচের দিকে নেমে এসে গলার মালায় পরিণত হয়েছিল। রেহেটের কিছু দূরে এসে প্রথমে সে জড়িয়ে পড়লো কাঁটার বেড়ায়। তারপর পা পিছলে পড়লো পানির নালায়। মোট কথা সভ্য সমাজে যেসব কারণকে আত্মহত্যার জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়ে থাকে তার সবগুলিই তার ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একটি গাধা আকাশের পানে মুখ তুলে করুণ সুরে তার জাতীয় সংগীত গাইতে লাগলো। কিন্তু খয়েরদীন তার প্রাণ প্রাচুর্যের প্রশংসা না করে বেদম লাঠিপেটা করতে লাগলো তাকে। শেষ পর্যন্ত লাঠি ভেঙে গেলো এবং তার সাথে সাথে খয়েরদীনের অর্ধেক রাগও পড়ে গেলো। ইসমাঈল হাসি চাপতে চাপতে এগিয়ে গিয়ে বললো, খয়রু, আজ আমি এদের সবার পিঠ ভাঙবো, তুমি দেখে নিয়ো, একটাকেও ছাড়বো না। আজকাল তোমাকে খুবই জ্বালাতন করছে এরা।

গোলাম হায়দর ছড়ি হাতে নিয়ে মজিদের দিকে এগুলো। কিন্তু ইসমাঈল দৌড়ে গিয়ে তাকে থামালো এবং মজিদকে শাসিয়ে বললো, মজিদ! কান ধরে ওঠো আর বসো। মজিদ সংগে সংগে হুকুম তামিল করলো।

গোলাম হায়দর ও ইসমাঈলের সামনে দাঁড়িয়ে খয়েরদীনের গোস্বা কমে গিয়েছিল। পাগড়ীটা ঘাড়ের ওপর থেকে উঠিয়ে আবার মাথার চারপাশে পেঁচিয়ে বেঁধে বললো, চৌধুরী জী! ওকে আমি কখনো মানা করিনি। আমার যখন কোনো কাজ থাকে না তখন পরোয়া করি না। কিন্তু আজ পূর্ণমাসীর মেলায় আমাকে হাঁড়ি বাসন নিয়ে যেতে হবে। বিগত দু-তিন সপ্তাহ একের পর এক কাজ থাকার কারণে ওরা আর কোনো জারিজুরি খাটাতে পারেনি। ওদের স্কুলের ছুটির সময়ই আমি গাধাগুলি নিয়ে চরাতে যেতাম। কিন্তু আজ এরা ছুটি হবার আগেই এসে গেছে। আমি ভাটি থেকে হাঁড়ি বের করছিলাম এমন সময় এরা এসে গাধাগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে এলো। প্রথমে এরা গ্রামের চারদিকে এক চক্কর লাগালো। তারপর খালের পাড়ে চলে এলো। ফেরার পথে আমি ভাবলাম এবার এরা আমার ওপর রহম করবে। এদের পথ রোধ করার জন্য আমি দৌড়াতে থাকলাম। আমাকে দৌড়াতে দেখেই এরা আমাকে গচ্ছা দিয়ে এদিকে চলে এসেছে।

ইসমাঈল বললো, ঠিক আছে খয়রু! আগামীতে এরা যদি এমনটি করে তাহলে সোজা আমার কাছে চলে আসবে। এখন তোমার কাঁচি উঠাও এবং গাধাগুলির জন্য এই ক্ষেত থেকে ঘাস কেটে নাও।

এবার খয়েরদীনের চেহারায় রাগের বদলে শোকরের অনুভূতি ফুটে উঠছিল বেশী করে। কাঁচি উঠাবার আগে সে এগিয়ে এসে মজিদকে উঠিয়ে দাঁড় করালো এবং বললো, দেখো বেটা, আজ তুমি আমাকে খুব বেশী পেরেশান করেছো। যখন তোমার সওয়ারী করার ইচ্ছা হবে আমার কাছে চলে আসবে কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে স্কুলের অন্য ছেলেদেরকে সংগে করে আনবে না।

মজিদ ইতস্তত ভাবে একবার বাপের ও একবার চাচার দিকে দেখতে লাগলো। এমন সময় বাগানের অন্য প্রান্ত থেকে কেউ আওয়াজ দিল, মজিদ! ও মজিদ! অনুমতিলাভের দৃষ্টিতে বাপ ও চাচার প্রতি তাকাচ্ছিল সে। ইসমাঈল বললো, যাও--।

দ্রুত তখতি ও ব্যাগ উঠিয়ে নিয়ে মজিদ সবেমাত্র গ্রামের দিকে দৌড় দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিল এমন সময় একটি ছোট ছেলে টাট্টু ঘোড়ার নাংগা পিঠে সওয়ার হয়ে বাগানের পেছন থেকে দৃশ্যমান হলো। মজিদের কাছে এসে সে টাট্টু থামালো।

ইসমাঈল বললো, সেলিম! নিচে নামো। তোমাকে না আমি কতবার মানা করেছি!

সেলিম এ হুকুম তামিল করার পরিবর্তে বরং দ্রুত লাগাম ঘুরিয়ে ঘোড়ার পিঠে গোড়ালী ঠুকে দিল। টাট্টু এক লাফে পানির নালা পার হয়ে তীর বেগে ছুটতে লাগলো।

ইসমাঈল চিৎকার করলো, 'সেলিম! ঘোড়া থামাও। বেওকুফ, পড়ে যাবে।' কিন্তু সেলিম ঘোড়ার গতি আরো দ্রুত করে দিল। টাট্টু যখন লাফ দিয়ে ক্ষেতের বেড়া টপকালো তখন সে পড়ে যেতে যেতে বাঁচলো। ইসমাঈল ও গোলাম হায়দর নিশ্বাস বন্ধ করে তার কাণ্ড কারখানা দেখছিল। প্রায় দু ফার্লং যাবার পর সে ঘোড়ার লাগাম টেনে পেছনে মুড়লো। মজিদ দৌড়াতে দৌড়াতে পাকদণ্ডীর কাছে এসে দাঁড়ালো। ফেরার পথেও টাট্টুর গতি অপরিবর্তিত ছিল।

মজিদকে পথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেলিম টাট্টু থামালো। ক্ষেতের আলের পাশে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে বললো, মজিদ! জলদি আমার পেছনে বসে পড়ো। তোমাকে আজ একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাবো।

মজিদ আলের ওপর পা রেখে তার পেছনে সওয়ার হলো। দূর থেকে গোলাম হায়দর আওয়াজ দিল, সেলিম! এবার আর জোরে ভাগাবার দরকার নেই তাহলে দুজনই পড়ে যাবে।

না চাচা! সে জবাব দিল।

গ্রামের অপর প্রান্তে একটি ঝিলের কিনারে কয়েকটি ঝোপ ঝাড়ের কাছে পৌঁছে সেলিম ও মজিদ টাট্টুর পিঠ থেকে নেমে পড়লো। মজিদ একটি গাছের ডালের সাথে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো, এখানে কি দেখাবে আমাকে?

প্রথমে ওয়াদা করো তুমি তাদেরকে মেরে ফেলবে না।

কাদেরকে?

তা পরে বলবো। প্রথমে ওয়াদা করো।

আচ্ছা বাপু ঠিক আছে, আমি তাদেরকে মেরে ফেলবো না।

আরো ওয়াদা করো, তুমি তাদেরকে এখান থেকে উঠিয়ে ঘরে নিয়ে যাবে না।

না, নিয়ে যাবো না।

সেলিম কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললো, না, তোমাকে দেখাবো না। তুমি অন্য ছেলেদেরকে বলে দেবে।

না, আমি কাউকেও বলে দেবো না।

ঠিক আছে, তাহলে এসো।

মজিদ সেলিমের পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলো। একটি ঝোপের পাশে থেমে গেলো সেলিম। ডালাপালার ভেতরে একটি ছোট পাখির বাসার দিকে আঙুল তুলে দেখালো। বললো, দেখো ওই ঘুঘু বসে আছে।

আরে এটা এমন আর কী অদ্ভুত ব্যাপার হলো! আমাদের বাগানে তো এমন অনেক ঘুঘু আছে।

তুমি এখনো আসলে কিছুই দেখোনি। আরে ওই পাখিটির দুটি ডিম ফুটেছে। একেবারে ছোট ছোট বাচ্চা।

সেলিম এগিয়ে গেলো। পাখিটি ফুড়ুত করে উড়াল দিল।। সেলিম আস্তে করে বাচ্চা দুটি উঠিয়ে হাতের তালুতে রাখলো এবং মজিদকে দেখিয়ে বললো, গত পরশু পর্যন্ত এ দুটি ডিমের মধ্যে ছিল। কয়েক দিনের মধ্যে এদের গায়ে ডানা গজাবে। তারপর মায়ের সাথে এরাও উড়ে বেড়াবে।

ওহ-হো, আমি আগে যেন কখনো ঘুঘুর বাচ্চা দেখিনি। আমি ভেবেছিলাম তুমি কোনো আশ্চর্য জিনিস দেখেছো। চলো ঘরে চলো।

ছেলে দুটির গ্রামে পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। সেলিম বাইরের হাবেলীতে প্রবেশ করে ঘোড়ার লাগাম নওকরের হাতে সোপর্দ করলো। নওকর টাট্টুর পিঠ চাপড়ে বললো, সেলিম! আজ তোমার চাচা আমার ওপর খুব গোস্বা করেছেন। তুমি যদি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যেতে তাহলে আমার কপালে দুর্ভোগ ছিল। আগামীতে তোমার চাচার অনুমতি ছাড়া আমি এই টাট্টুর পিঠে তোমাকে চড়তে দেবো না।

সেলিম কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু আচানক হাবেলীতে একটি সুন্দর ঘোড়া বাঁধা থাকতে দেখলো। খুশিতে লাফিয়ে উঠলো সে। মজিদ, আব্বাজান এসে গেছেন। ওই দেখো, তাঁর ঘোড়া। একথা বলতে বলতে সে ভিতর হাবেলীর দিকে দৌড় দিল। ঘোড়া তাকে দেখতেই কান খাড়া করলো। তার নাসারন্ধ্রের আওয়াজ একথার জানান দিচ্ছিল, আমি তোমাকে চিনি। সেলিম নিকটে গেলে ঘোড়া গর্দান কিছুটা নিচু করলো এবং সে তার কপালে ও গলায় হাত বুলাতে লাগলো। মজিদ কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে রইলো।

মজিদ, তুমি একে ভয় পাও?

এ আমাকে কামড়ায়।

মজিদ ইতপূর্বে ঘুঘুর বাচ্চার ব্যাপারে বেপরোয়া মন্তব্য করে সেলিমের মনে যে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল, অন্য ছোট ছোট ভাই বোনদের সামনে এখন সে তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে, সে ভয় তার দূর হয়ে গিয়েছিল। সে গর্বভরে বললো,গ্রামের সব ছেলেরা একে ভয় করে, আমি করি না।

তোমাকে কামড়ায় না বলেই তুমি একে ভয় করো না, তাই না?

তুমি জানো এ আমাকে কামড়ায় না কেন?

কিছুটা ভেবে নিয়ে মজিদ বললো, আচ্ছা বলো তোমাকে কামাড়ায় না কেন?

আমি একে ছোলা ও গুড় খাওয়াই বলে।

আমিও একে ছোলা ও গুড় খাওয়াবো। সেলিম, তুমি বলেছিলে তোমার আব্বাজান বল আনবেন!

হ্যাঁ, তিনি বল এনে থাকবেন। চলো ঘরে গিয়ে দেখি।

এ হাবেলীতে গবাদি পশুর গোয়াল ও আস্তাবল এবং ভূসি, খড়, ঘাস ফসল ইত্যাদির গুদাম রয়েছে। এছাড়াও কৃষিকাজের যাবতীয় উপকরণ এখানেই রাখা হয়। এক কোণে চালাঘরের মধ্যে ঘাস ও খড় কাটা মেশিনও আছে। আঙিনার মাঝখানে দুটি আম গাছের মাঝামাঝি জায়গায় আমের রস বের করার মেশিন বসানো আছে। উভয় দিকের দেয়ালের সাথে আছে পশুদের বাথান, এক কোণে আছে গুড় জ্বাল দেবার চুলা।

বাইরের ফটক বরাবর দেয়ালের মাঝখানে পাকা ইটের তৈরি দেউড়ি এবং তার সাথে

আছে বৈঠকখানা। বৈঠকখানা ও দেউড়ির ডাইনে বাঁয়ে কাঁচা বারান্দা। দেউড়ি পার হয়ে আছে দ্বিতীয় হাবেলী। সেখানে রয়েছে পাকা ইটের তৈরি ছোট ছোট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাসগৃহ। বৈঠকখানার একটি দরোজা বাড়ির আঙিনার দিকে এবং অন্যটি আছে দেউড়ির দিকে।

মজিদ ও সেলিম যখন দেউড়িতে প্রবেশ করলো তখন বৈঠকখানা থেকে বাড়ির লোকদের আওয়াজ শোনা গেলো, মজিদ থেমে বললো, তুমি যাও, আমি ঘরে যাচ্ছি।

সেলিম দরোজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল। বৈঠকখানায় চেরাগ জ্বলছিল। বিভিন্ন চারপাইয়ের ওপর তার দাদা ছাড়াও আরো আটদশজন বসেছিল। সেলিম প্রথমে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলো যে, তাকে কেউ দেখতে পায়নি তারপর নিচু হয়ে ঝট করে একটি চারপাইয়ের নিচে ঢুকে পড়লো এবং হামাগুড়ি দিতে দিতে তার দাদা ও আব্বা যে চারপাইটির ওপর বসেছিল সেটির নিচে চলে গেলো। সে কোমরে ঠেস দিয়ে চারপাইটি উঁচু করার চেষ্টা করলো এবং তারপর গুটি গুটি মেরে নিচে শুয়ে পড়লো। চারপাই যদিও হেলে পড়েনি কিন্তু সেলিমের উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছিল।

তার দাদা বলছিল, আলী আকবর! চারপাইয়ের নিচে একটু দেখোতো। মনে হয় কোনো কুকুর ভেতরে এসে গেছে।

সেলিম বহু কষ্ট করে নিজের হাসি চেপে রাখছিল। আলী আকবর নিচে উঁকি দিয়ে হাসতে হাসতে বললো, কুকুর নয়, ভল্লুক আব্বাজী!

সেলিম এবার পূর্ণ শক্তিতে চারপাই ওপরে ওঠাবার চেষ্টা করছিল।

দাদা বললো, না এটা ভল্লুক নয়, সিংহ মনে হচ্ছে। আলী আকবর আর একবার দেখোতো।

সেলিম খিলখিল করে হাসতে হাসতে বাইরে বের হয়ে এলো। আলী আকবার তাকে পরে নিজের কোলে বসিয়ে নিল।

আলী আকবর! তোমার বেটাকে এবার তোমার সাথে নিয়ে যাও। এর জ্বালাতনে আর বাঁচি না।

আব্বাজান এখন এর বয়স ছয় বছরে পড়েছে। গতবছর আপনি রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু এবছর ওকে স্কুলে পাঠাতে হবে। নয়তো সে বাউণ্ডুলে হয়ে যাবে। আমি সকালে নিজেই ওকে স্কুলে নিয়ে ভর্তি করে দিয়ে আসবো।

সেলিমের হাসি গলায় আটকে গেলো। তার দাদা বলছিল, গত বছর সে লেখাপড়ার যোগ্য ছিল না কিন্তু এবছর আর আমি তোমাকে মানা করবো না। সেলিম মনে করছিল, এ সিদ্ধান্ত আর নড়চড় হবে না।

স্কুলের ব্যাপারে সেলিম এ পর্যন্ত শুনেছিল যে সেখানে বাচ্চাদের কেবল মারধর করা হয়। তার চাচা হায়দর ও ইসমাঈল ছোটবেলায় লাগাতার চার বছর ধরে কেবল মাষ্টারদের হাতে মারই খেয়েছে। গ্রামের লোকেরা গ্রীষ্মকালে বড় বড় গাছের ছায়ায় এবং শীতকালে অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে বসে যখন পুরাতন দিনের জাবর কাটতে থাকে তখন স্বাভাবিকভাবে চাচা ইসমাঈল ও গোলাম হায়দরের ছাত্র জীবনের কথা এসে যায়। তারা নিজেরাই স্বীকার করতো মাষ্টার তাদের হেঁট হয়ে দুহাত দিয়ে কান ধরিয়ে পিঠে ইট চাপিয়ে দিতো। তারা আখের ক্ষেতে লুকিয়ে থাকতো। কিন্তু পরিবারের বয়স্ক লোকদের মতো সম্ভবত গ্রামের বাকি লোকদেরও তাদের সাথে দুশমনী হয়ে গিয়েছিল এবং তারা তাদেরকে পাকড়াও করে মাষ্টারজীর হাতে সোপর্দ করে দিয়ে আসতো। তার চাচাত ভাই মজিদ এবং গ্রামের অন্য ছেলেরাও একই স্কুলে পড়ে। তারাও স্কুল সম্পর্কে অনেক

কথা বলে। মজিদ দুবছর থেকে প্রথম শ্রেণীতে পড়ছে। সে হচ্ছে সেলিমের বড় চাচা গোলাম হায়দরের বড় ছেলে। সে গাছে চড়া, সাঁতার কাটা ও খেলাধূলায় গ্রামের সব ছেলেদের সেরা। বহুগুণধর সে। কিন্তু সেলিম ভেবে অবাক হয়, এরপরও স্কুল তার প্রতি রহম করে না। সেলিম কয়েকবার নিজ চোখেই দেখেছে তার পিঠে ছড়ির নিশানা। চাচা গোলাম হায়দরের ক্ষমতা থাকলে মজিদকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্কুলে যেতে বাধ্য করতো না। কিন্তু সেলিমের বাপ হচ্ছে ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং পরিবারের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তার কঠোরতার কাছে সবাই নতি স্বীকার করেছে। দাদার পরে সমগ্র পরিবারে তার হুকুম মানা হতো এবং এর কারণ হচ্ছে সে শিক্ষালাভ করার পর নায়েবে তহশীলদার হয়ে গিয়েছিল।

স্কুলে যাওয়া এবং মাস্টারের হাতে মার খাওয়া অন্যথায় বাড়িতে মার খাওয়া বেচারা মজিদের কপালের লিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সেলিমের দুঃখ এজন্য তার বাপ দায়ী।

সেলিম জিন, পরী, ভূত, প্রেতের কাহিনী শুনেছিল।

কিন্তু তার কাছে স্কুল মাস্টার ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ জিনিসের নাম। সে শুনেছিল, বাদশাহ হয় সবচেয়ে বড়। সে যাকে চায় মেরে ফেলতে পারে। সে একজন বাদশাহ হতে চাইছিল।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে এই জল্লাদ মাস্টারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার মতে এই একটাই পথ ছিল। কিন্তু এখন সে নিজেই স্কুলে যাবে। তার আব্বাজান বৈঠকখানায় যাকিছু বলেছিল সবই সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছিল। মা তার জন্য নতুন জুতা ও নতুন পোশাক কিনে রেখেছিল। তার চাচা, ফুফী ও বোনেরা সবাই খুশী ছিল। সমস্ত পরিবারের মধ্যে একমাত্র দাদীই ছিল তার সত্যিকার ব্যথার ব্যথী। একমাত্র সে-ই মাস্টারের ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করেছিল। একমাত্র দাদীই বলেছিল দাদু, তুমি চিন্তা করো না। মাস্টার তোমাকে কিছুই বলবে না।

গ্রামের ছেলেরা বাইরে খেলা করছিল। তারা সেলিমকে ডাকতে এসেছিল। সে যেতে অস্বীকার করেছিল কিন্তু তারা জোর করে টেনে নিয়ে গেলো তাকে। যখন তারা দেউড়ির কাছাকাছি পৌঁছুলো, পেছন থেকে মা আওয়াজ দিয়ে বললো, বেটা! জলদি ফিরে আসবে কিন্তু। কাল সকালেই স্কুলে যেতে হবে। সেলিম কোনো জবাব দিল না।

তার সংগীরা বাইরে বের হয়েই শোরগোল শুরু করে দিল, সেলিম কাল সকালে স্কুলে যাচ্ছে। এখন অন্যান্য ছেলেরাও খেলার চিন্তা বাদ দিয়ে তার চারদিকে জমা হয়ে গেলো। তারা বলতে লাগলো, কেন সেলিম একথা কি সত্যি? সত্যিই কি তুমি স্কুলে যাচ্ছো? তারপর যখন তারা সেলিমের স্কুলে যাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হলো তখন মজিদের প্রস্তাব অনুযায়ী কানামাছি, কাবাডি অথবা চোর কোতোয়াল খেলার পরিবর্তে মাস্টার ও ছাত্রদের খেলা খেলার ফায়সালা করলো। মজিদ মাস্টার হলো। সে ছেলেদের এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সবাইকে কান ধরার হুকুম দিল।

স্কুলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছেলেরা সংগে সংগেই কান ধরলো এবং অন্যদেরকে নিজের চারদিকে সমবেত করে মজিদ তাদেরকে এর প্রাকটিস করালো। সে বলে চলছিল, দেখো, আমার দিকে এভাবে ঝুঁকে পড়ো তারপর গরদান নিচু করে নাও। এরপর হাতগুলোকে এভাবে নিয়ে যাও এবং কান ধরো। আর পিঠগুলো উঁচু রাখো। পিঠ উঁচু রাখা জরুরী অন্যথায় ডাণ্ডা পড়বে পিঠে। কথা বলো না। ও গোপার বেটা! এটা স্কুল, না তোর বাপের বাড়ি? হাসছো কেন? এঁা, দাঁত ভেঙে দেবো। ছেলেরা সবাই ঠিকমতো কান ধরেছিল। কিন্তু সেলিম ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। মজিদ বললো, আরে তুমি কান ধরবে না...?

সেলিম রাগে কাঁদতে কাঁদতে বলল আমি কান ধরবো না। মজিদ কিছু বলার আগেই সে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

ঘরে পৌঁছে কারোর সাথে কথা না বলে সেলিম নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লো। তার সমবয়সী চাচাত বোন আমিনা তার কাছে এসে বসলো। সে বললো, সেলিম, চলো দাদীজানের কাছে গল্প শুনবো।

না। সে বিরক্তি মাখা স্বরে জবাব দিল।

সেলিমের হাত ধরে সে টানতে লাগলো। সেলিম ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো, চলে যাও শয়তানী। নয়তো চুল ছিঁড়ে নেবো।

আমিনা হতাশ হয়ে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরে সেলিমের মা এসে বললো, সেলিম তুমি এখানে! আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বাইরে ছেলেদের সাথে খেলা করছো। তুমি আজ দুধ খাওনি। আমি এখনি আসছি। মা হাতে করে এক গ্লাস দুধ আনলো। কিন্তু সেলিম দুধ খেতে অস্বীকার করলো। মা জোর করতে লাগলো, সেলিম বিছানা থেকে উঠে ছাদে পালিয়ে গেলো এবং কিছুক্ষণ ছাদের কার্নিশের ওপর বসে রইলো। তারপর উঠে দাঁড়ালো এবং ধীরে ধীরে একদিকে হাঁটতে লাগলো।

হাবেলীর সব ঘরের ছাদগুলো একসাথে মিশেছিল। সেখানে হাঁটতে হাঁটতে সে এক কোণে গিয়ে খাড়া হলো। পেছন দিকে ছিল আম ও জামের গাছ। মৃদুমন্দ বাতাসে শাখাগুলোর সিরসির আওয়াজ কানে বাজতে লাগলো। চাঁদের আলোয় ছাদের ওপর তাদের ছায়াগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কোনো কোনো ছাদের ওপর থেকে কুকুরের চিৎকারও শোনা যাচ্ছিল এবং পাশের ক্ষেত থেকে শোনা যাচ্ছিল একটানা শেয়ালের ডাক।

কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর সেলিম কয়েকটি কামরার ছাদের ওপর দিয়ে হেঁটে এককোণে বাসগৃহের ছাদের ওপরে গিয়ে পৌঁছুলো, যেখান থেকে গবাদি পশুর হাবেলীর বারান্দা দেখা যায়। এখান থেকে বিলও দেখা যাচ্ছিল। এই বিলের কিনারা বাইরের হাবেলীর দেয়ালের সাথে এসে মিশেছিল। এই বিলের অন্য কিনারে ঝাঁকড়া ঝাউ গাছের সারি। বিলের পানিতে তার প্রতিবিম্ব সৌন্দর্যের অপরূপ প্রভা সৃষ্টি করে। সেলিম অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আচানক তার কানে এলো তার বাপের ডাক।

সেলিম! সেলিম!

হঠাৎ আঁতকে উঠলো সে। একবার দেখলো এদিক ওদিক। তার বাপকে দেখতে পেলো ছাদের অন্য কিনারে দাঁড়িয়ে থাকতে।

আব্বাজান, বলেই সে দৌড়ে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

সেলিম বেটা, এখানে একা একা কি করছিলে?

কিছু নয় আব্বাজান।

তোমার মা বলছিল তুমি নাকি স্কুল মাষ্টারকে খুব ভয় করো।

সেলিম চুপ করে থাকলো।

আলী আকবর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, বেটা! কেউ তোমাকে ভয় দেখিয়ে থাকবে। মাষ্টারজী ভালো ছেলেদেরকে মারে না। কেবল তাদেরকে মারে যারা লেখাপড়া করে না। আমিও ঐ স্কুলে পড়েছি। কিন্তু আমি একদিনও মার খাইনি। উস্তাদ ভালো ছেলেদেরকে তো আদর করে। এখন তুমি বড় হয়ে গেছো। তোমার কাজ হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করা। সারাজীবন তুমি খেলাধুলা করে কাটাতে পারো না। আমি চাই তুমি অনেক বড় হও। এখন আমি তোমাকে সারাদিন গ্রামের ছেলেদের সাথে টো টো করে ঘুরে বেড়াবার অনুমতি দেবো না। তোমাকে দুনিয়ায় খ্যাতি অর্জন করতে হবে। এই স্কুল থেকে তোমাকে শহরের স্কুলে যেতে হবে। তারপর কলেজে যাবে। তারপর তোমাকে আরো দূরে অনেক দূরে বিলাতে যেতে হবে।

সেলিম নিচে নেমে যখন বিছানায় শুয়ে পড়লো তখন তার মা সমস্ত কাজ কাম সেরে তাকে সান্ত্বনা দিতে এলো। মা বললো, বেটা! মাষ্টার তোমাকে মারবে না। আমি তোমাকে প্রতিদিনের পড়া মুখস্থ করিয়ে দেবো। তোমাকে ঠিক সময়ে স্কুলে পাঠিয়ে দেবো। তোমাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিয়ে দেবো। এরপরও যদি মাষ্টার তোমাকে মারে তাহলে তোমার বাপ গিয়ে তাকে উচিত সাজা দেবে।

নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে সেলিম যথেষ্ট চিন্তামুক্ত হতে পেরেছিল। তবুও অনেকক্ষণ তার ঘুম এলো না। বারবার মনে হচ্ছিল, আমি বড় হয়ে গেছি। এখন আর গ্রামের ছেলেদের সাথে খেলতে পারবো না। আব্বাজান বলেছেন, আমাকে অনেক বড় মানুষ হতে হবে। সে বুঝতে পারছিল না বড় মানুষ আবার কেমন। কি এমন সমস্যা আছে যার ফলে তাকে প্রথমে পাশের গ্রামের স্কুলে, তারপর সেখান থেকে দূরে শহরের স্কুলে এবং তারপরে একেবারে দূরে বহুদূরে যেতে হবে। এতদিন জানতো যা কিছু সে চাইতে পারে সবই তার গ্রামে পাওয়া যায়। গ্রামে বড় বড় সবুজ গাছের সারি। ফলে ও ফুলে সুশোভিত গাছপালা চারদিকে। বাতাস চলে সাঁ সাঁ করে প্রবল বেগে আবার কখনো মৃদুমন্দ গতিতে। বৃষ্টি আসে বর্ষার মওসুমে। সবুজ শ্যামল ক্ষেত ফসলে ভরে ওঠে। গাছে গাছে নানা জাতের পাখি ওড়ে। পাখিরা কিচির মিচির করে। গ্রামে আম, নাসপাতি, পেয়ারা ও বেদানার বাগান আছে। গ্রামের পাশে নদী আছে, ঝিলও আছে। এখান থেকে সে বরফ ঢাকা পর্বত চূড়াও দেখতে পেতো। আকাশে সূর্য কিরণ দিতো। রাতে চাঁদ আলো দিতো এবং অসংখ্য তারা আকাশে ঝিকমিক করতো। কারোর মুখে একথা শোনা সে পছন্দ করতো না যে, তুমি এখন বড় হয়ে গেছো। সারা জীবন সে তার দুনিয়াকে একটি শিশুর চোখ দিয়ে দেখতে চায়। জীবন তার জন্য সে সময় কতই না পরিপূর্ণ ছিল যখন নিজের

ঘরের ছাদে উঠে চারদিকে দৃষ্টি ফেরাবার পর সে একথা অনুভব করতো যে, এই দুনিয়াটা চারদিকে গোল এবং এর কিনারাগুলি দৃষ্টির সীমানা পার হয়ে আসমানের গম্বুজে গিয়ে মিশেছে আর তাদের বাড়িটা এ গোলাকার জায়গার ঠিক মাঝখানে রয়েছে। দুনিয়াটা সে সময় কতটুকুন কিন্তু কত সুন্দর ছিল যখন সে তার ছোট ছোট দুটি হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলতো, সূর্যটা এত বড়, চাঁদ মাত্র এতটুকুন এবং তারাগুলো কত ছোট ছোট। সে যতটুকু জানতো ততটুকুর ওপর কতই নিশ্চিন্ত ছিল। সে তার সমবয়সী খেলার সাথিদেরকে বোঝাতো যে, এই চাঁদ, সুরুজ ও তারারা আমাদের সাথে কানামাছি খেলছে। সন্ধ্যার সূর্য আসমান থেকে নেমে জমিনের কোনো বনের মধ্যে গায়েব হয়ে যায়। চাঁদ ও তারারা সারারাত ধরে তাকে তালাশ করতে থাকে কিন্তু সে গাছের আড়াল নিয়ে জমিনের উল্টোপিঠে পাহাড়ের মধ্যে চলে যায়। অতি প্রত্যুষে কোনো বুদ্ধিমান তারকা তাকে ছুঁয়ে ফেলে। তারপর তারকারা কোথাও পালিয়ে যায় এবং সূর্য তাদেরকে সারাদিন খুঁজে বেড়াতে থাকে।

যখন সে মনে করতো মেঘেরা আসমানের এমন সব ঘোড়া, হাতি ও উট যেগুলোর পিঠে চড়ে বেড়ায় ফেরেশতারা এবং পাহাড় হচ্ছে ঐ সমস্ত অদ্ভূত পশুদের আস্তাবল তখন সে মনে মনে কত উল্লসিত হতো। কিন্তু বড়দের কথাবার্তায় তার সেসব ধারণা বদলে গেছে। ছোট বেলায় মায়ের কোলে বসে আসমানের চাঁদ তারা নিয়ে কতরকম খেলা করতো কিন্তু এখন আর তারা খেলনা নয়।

মেঘেরা এখন আর অদ্ভূত পশু নয়। তাদের পিঠে সওয়ার হবার আকাংখা আর মনে জাগে না। সে ভাবছে, যতই দিন যাবে, সে বড় হবে, ততই বিশ্বজগতের চেহারা থেকে সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর নেকাব খসে পড়তে থাকবে।

মাস্টারজীর ছিল হুকার নেশা। হুকা টানতে টানতে কাশতো আর সাথে সাথে ছাত্রদের পেটাইও করতো। জীবনের সব তিক্ততার জন্য মাস্টারজী প্রস্তুত ছিল কিন্তু ছাত্রদের কথা বলা, হাসা ও এদিক ওদিক দেখা ছিল তার কাছে একেবারেই অসহ্য। শিক্ষা বিভাগের বিশ বছরের চাকরী তাকে এজগতে হাসিমুখ মানুষের প্রতি ঘৃণা করতে শিখিয়েছিল। পনর বিশ টাকা বেতনে তার চাকুরী জীবন শুরু হয়েছিল এবং প্রতি বছর এক টাকা হারে বেতন বৃদ্ধি চলছিল। কিন্তু এই অর্থনৈতিক তরক্কীর মোকাবিলায় তার শারীরিক ও মানসিক অবক্ষয় ছিল অনেক গুণ বেশী দ্রুততর। চাকুরী শুরু করার সময় মাস্টারজী ছিল একা। এরপর তার বিবাহ হয় এবং বর্তমানে সে সাত সন্তানের জনক। এরপরও তার এমন কিছু ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল যার শাস্তি যে কোনো শরীফ ব্যক্তি লাভ করতে বাধ্য। একবার ইন্সপেক্টর সাহেব স্কুল পরিদর্শনে আসে। মাস্টারজী তাকে মুরগী খাওয়াবার পরিবর্তে ডাল খাওয়ায়। এর

ফলে দুবছর তার তরক্কী বন্ধ থাকে। মোটকথা এভাবে বিশ বছরের চাকুরী জীবনে তিন বছর তার তরক্কী বন্ধ থাকে।

মাস্টারজী আর একটি পাপও করেছিল। নিজের স্থায়ী বসবাসের জন্য এ গ্রামে ছোট একটি ঘরও তৈরি করেছিল। যে কোনোভাবেই ইন্সপেক্টর সাহেব একথা জেনেছিল। ফলে তার বদলির অর্ডার এসে গিয়েছিল। এখন গ্রামে গৃহের কোনো খরিদদার ছিল না। মাস্টারজী অনেক কাকুতি মিনতি করলো। কিন্তু ইন্সপেক্টর অটল। কাজেই অশ্রুপাতে কোনো কাজ হলো না দেখে এবার মাস্টারজী মুরগী, ডিম ও ঘি-এর সাহায্য নিতে বাধ্য হলো।

ইন্সপেক্টর বদলি হবার সময় তার স্থলাভিষিক্তকে মাস্টারজীর জীবনের এই দুর্বল দিকটি সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে যায়। কাজেই মাস্টারজীর অনুমান ষাট বছর বয়স পর্যন্ত যদি তার মৃত্যু না হয় তাহলে তাকে গৃহের মূল্য বরাবর মুরগী ও ডিম ভেঁট দিতে হবে ইন্সপেক্টর ও কেরানীদেরকে। তার এই দীর্ঘ চাকুরী জীবনে এমন ইন্সপেক্টর মাত্র তিনজন এসেছিল যারা মাস্টারদের বাড়ি থেকে এক গ্লাস দুধ পান করাও পাপ মনে করতো। কিন্তু মাস্টারজীর অভিযোগ, এমন নেকবখতদের ট্রান্সফার করা হতো অতি দ্রুত।

সেলিমের বাপ তাকে স্কুলে ভর্তি করতে এলো। যাবার সময় মাস্টারজীর হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিল।

মাস্টারজী বললো, না, না, চৌধুরী সাহেব। আপনি অনেক মেহেরবানী করেছেন কিন্তু.......।

আলী আকবর তাকে নিজের বাক্য পুরা করার সুযোগ না দিয়ে বললো, মাস্টারজী! উস্তাদের হক কেউ আদায় করতে পারে না। আপনি দোয়া করবেন। আল্লাহ সেলিমকে যেন আপনার খিদমতের যোগ্য করেন।

প্রাইমারী স্কুলটি যে গ্রামে ছিল সেটি ছিল সেলিমদের গ্রাম থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। আশপাশের পাঁচসাতটি গ্রামের ছেলেরা সেখানে পড়তো। তাদের মোট সংখ্যা ছিল ষাটজনের মতো। মজিদ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র হলেও তিন বছর থেকে এ স্কুলে পড়ছে। বয়সের দিক দিয়ে স্কুলের আর মাত্র ছ সাতটি ছেলে ছিল তার চেয়ে বড়। কিন্তু দাউদ ছাড়া বাকি সবাই তাকে ভয় করতো। দাউদ ছিল অন্য গ্রামের একজন তেলির ছেলে। দশ বছর বয়সে তার বাপ তাকে লেখাপড়া শেখাবার তাগিদ অনুভব করে। এখন সে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। মাস্টারজীর অনুপস্থিতিতে স্কুলের ছাত্রদের ওপর সে থানার দারোগার মতো কর্তৃত্ব করতো। বয়স ছাড়াও দৈহিক কাঠামো, উচ্চতা ও শারীরিক শক্তির দিক দিয়ে তার প্রাধান্য ছিল সবার ওপর। চেহারার তুলনায় তার মাথাটা সামান্য ছোট মনে হতো। সম্ভবত এজন্যই কাঁচির পরিবর্তে নাপিতের ক্ষুর ছিল তার বেশী পছন্দ। নেড়া মাথায় তেল মাখানো পালিশের কাজ করতো। তার ছোট মতো পাগড়ীটি প্রায়ই মাথা থেকে নেমে যেতো। অন্য কোনো ছেলে যদি তার মতো মাথা নেড়া করে আসতো তাহলে তার আর নিস্তার থাকতো

না। কিন্তু দাউদের মাথায় হাত দেবার সাহস কারোর ছিল না। একমাত্র মাস্টারজীর হাত এ উঁচু জায়গায় পৌছুতে পারতো।

দাউদ যেমন বড় ছিল তার বুদ্ধিও ছিল ঠিক তেমনি কম। চতুর্থ শ্রেণীতে সে ফেল করেছে দুবার। কিন্তু মাস্টারজীকে খুশি করার জন্য গ্রাম থেকে তার জন্য ঘুঁটে আনতো। তার বাড়িতে পানি তুলে দিয়ে আসতো। তার হুকায় তামাক সেজে দিতো। আবার কখনো তার গাভীর জন্য ঘাস কেটে আনতো। এ স্কুলটি আশপাশের গ্রামের পোস্টঅফিসের কাজও করতো। প্রত্যেক গ্রামের ডাক সেই গ্রামের ছাত্রদের দিয়ে বিলি করে দেয়া হতো। মাস্টারজী চিঠিপত্রের ওপর সিল মারা এবং ডাকের থলি খোলা ও বন্ধ করার কাজ দাউদের ওপর সোপর্দ করে রেখেছিল। সব ব্যাপারেই সে ছিল স্কুলে মাস্টার সাহেবের সহকারী। কিন্তু স্কুলে কেবল দুটি ছেলে ছিল এমন যাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে সে ইতস্তত করতো। তারা ছিল মজিদ ও মোহন সিং। মজিদ ছিল প্রথম ছেলে যে স্কুলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়েছিল।

একদিন দুপুরে মাস্টারজী বাড়িতে গিয়েছিল। দাউদ ছাত্রদেরকে ধমক দিয়ে ভয় দেখিয়ে শৃংখলা কায়েম করার পর দেয়ালে ঠেস দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তার পাগড়ী মাথা থেকে সরে কোলের ওপর পড়ে গিয়েছিল। ছেলেরা নিজেদের পাগড়ী খুলে ভাঁজ করে কোড়া বানিয়েছিল এবং তা দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করছিল। এ এক ধরনের খেলা ছিল। সেদিন মজিদ টুপি পরে এসেছিল। সে নিরবে দাউদের পাগড়ীটি তুলে নিল এবং তাকে কোড়া বানিয়ে ছেলেদের সাথে খেলায় মেতে উঠলো।

হঠাৎ দাউদের চোখ খুলে গেলো। ছেলেরা সংগে সংগেই যার যার জায়গায় বসে পড়লো। মজিদ তখন স্কুলে দাখিল হয়েছিল মাত্র এক সপ্তাহ হয়েছে। স্কুলে মনিটরের ক্ষমতার ব্যাপারেও সে পুরোপুরি জানতো না। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখার পর সে কোড়া দাউদের দিকে ছুড়ে দিল এবং বললো, এই নাও তোমার পাগড়ী।

'আমার পাগড়ী?' একথা বলেই দাউদ ছড়ি উঠিয়ে মজিদকে মারতে লাগলো। সপাসপ কয়েক ঘা মারার পর মজিদ ছড়ির অপর প্রান্তটা ধরে রাখলো মজবুত করে। দুতিনটা ঝটকা দেবার পর দাউদ প্রতিপক্ষের শক্তি আন্দাজ করতে পেরে এবার পূর্ণ শক্তিতে ছড়ি টানলো। মজিদ আচানক ছড়ি ছেড়ে দিল। দাউদ ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলো না। পেছনে হটতে গিয়ে তার ঠ্যাং ধাক্কা খেলো একটি ছেলের সাথে এবং নিজে চিৎ হয়ে পড়ে গেলো। কিন্তু তারপর অতি দ্রুত রাগে টং হয়ে উঠে দাঁড়ালো। সে যেন এক ক্রুদ্ধ সাপ। ঝটপট উঠেই দিল এক ছোবল মজিদের ওপর। এবার দুজনের কুস্তি ছিল দেখার মতো। মজিদ তার কোমর আঁকড়ে ধরেছিল এবং দাউদ তার পিঠে ঘুঁসি মারছিল। মজিদ হঠাৎ নিজের ঠ্যাং তেরছা করে দাউদের রানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে এক ঝটকানিতে তাকে মেঝেতে ফেলে দিল। এখন দাউদ

ছিল নিচে এবং মজিদ তার ওপরে। মজিদ ধমাধম দাউদের পিঠে কিল ঘুঁশি মেরে চলছিল। কিন্তু এ অবস্থা বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। কিছুক্ষণ পরে আবার দাউদের পাল্লা ভারী হলো। মজিদের জামা ছিড়ে গিয়েছিল। ঘুঁসি ও থাপ্পড়ের চোটে তার দুই গাল লাল হয়ে উঠেছিল। ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছিল সে। এরপরও হার মানতে রাজি ছিল না। সে মার খেয়ে পড়ে গেলো কিন্তু আবার উঠে সোজা হয়ে প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দাউদের রাগ এখন পেরেশানীর রূপ নিয়েছিল। এ সময় তার সামনে নিজের মর্যাদা বাঁচাবার অথবা প্রতিপক্ষের ওপর নিজের শারীরিক শক্তির প্রাধান্য প্রমাণ করার ব্যাপার ছিল না। বরং এখন প্রশ্ন ছিল কিভাবে এ লড়াই খতম করা যায়। এখন সে মজিদকে মারার বা আছাড় দেবার পরিবর্তে নিজের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছিল। 'দেখো, এখন বসে পড়ো নয়তো খুব মারবো। আমি অনেক ছাড় দিয়েছি তোমাকে, আর দেবো না কিন্তু। তুমি আমার পাগড়ীকে কোড়া বানালে কেন? তুমি থামছো না। দেখো, এখনি মাস্টারজী এসে পড়বেন.... ।' দাউদ বারবার একথা আওড়াচ্ছিল। কিন্তু মজিদ তার কোনো কথায় কান দিচ্ছিল না।

শেষে দাউদ তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল এবং কয়েক কদম পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। মজিদের মাথায় ও পিঠে অনেক চোট লেগেছিল। কিন্তু সে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। দাউদ এখন কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে বলছিল, 'এবার আরামে বসে পড়ো। এবার সাবধান কিন্তু আর কোনো ছাড় দিচ্ছি না।'

মজিদ এক মুহূর্ত এদিক ওদিক দেখলো তারপর একটি তখতি উঠিয়ে সামনে পা বাড়িয়ে বললো, 'এবার কোথায় যাবে বাছাধন?'

দাউদ হাতের ওপর তার আঘাত রুখবার চেষ্টা করলো কিন্তু তা লাগলো তার কনুইয়ের ওপর খটাশ করে। পরমুহূর্তে তার দ্বিতীয় আঘাতের হাত থেকে বাঁচার জন্য পেছনে হটলো। কিন্তু মজিদ নিচু হয়ে তার হাঁটু ও টাখনুর ওপর জোরে পরপর দুতিনটে আঘাত করলো। এবার সে তাকে কখনো এ ঠ্যাং আবার কখনো ওঠ্যাং-এর ওপর নাচাচ্ছিল। দাউদ তখতি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলো কিন্তু আবার আঘাত খেয়ে পেছনে হটলো। সে দৌড়ে গিয়ে একটা তখতি উঠিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সবেমাত্র সে ঝুঁকে ছিল এমন সময় মজিদ তার কোমরে এমন জোরে মারলো যে সে আহা উহু করে উঠলো। দাউদ ময়দান ছেড়ে ভাগছিল এবং মজিদ তার পেছনে তাড়া করছিল।

এখন প্রায় সব ছেলেই মজিদের পক্ষে চলে গিয়েছিল। দাউদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছিল এবং সে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়া খেয়ে তার আগে আগে স্কুলের চারদেয়ালের মধ্যে দৌড়াচ্ছিল ।

ওদিকে ছাত্ররা চিৎকারে আকাশ মাথায় তুলে নিয়েছিল। এমন সময় বাইরের দরোজায় দাঁড়িয়ে এক ছেলে আওয়াজ দিল, 'মাস্টারজী এসে গেছেন।' ছেলেরা দৌড়ে যার যার জায়গায় বসে পড়লো। মজিদ মাস্টারজীকে দেখে দাউদের ওপর শেষ আঘাত হানতে হানতে থেমে গেলো।

মাস্টারজী এসেই জোরে চিৎকার করে বললো, আমি ঘর থেকেই তোমাদের শোরগোল শুনছিলাম। দাউদ! তুমি এদেরকে থামাওনি। আমি তোমাকে মনিটর বানিয়েছি কেন?

দাউদের জবাব দেবার আগেই মাস্টারজীর দৃষ্টি মজিদের ওপর পড়লো। ফলে সাথে সাথে তার দ্বিতীয় প্রশ্ন এলো, এর জামা ছিঁড়েছে কে?

এ প্রশ্নের জবাবে মজিদ নিরব রইলো।

মাস্টারজী বিরক্তি মাখা কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, আমি জিজ্ঞেস করছি, এর জামা ছিঁড়েছে কে? আর এর দুই গালও লাল হয়ে গেছে। একে মেরেছে কে? বলছো না কেন?

একটি ছেলে হিম্মত করে বললো, মাস্টারজী! দাউদ ও মজিদ পরস্পর লড়াই করছিল।

মাস্টারজী আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করার আগেই ছড়ি উঠিয়ে দাউদের পিঠে তিন চার ঘা বসিয়ে দিল। 'তেলির বাচ্চা! ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে লড়াই করতে তোর লজ্জা হয় না?'

মাস্টারজীর ভুল বোঝাবুঝির কারণে দাউদ দুনিয়ার সবচেয়ে মজলুম মানুষে পরিণত হয়েছিল। সে কাঁদতে কাঁদতে বললো, মাস্টারজী! এই ছেলেদের জিজ্ঞেস করুন। আমি ওকে অনেক ছাড় দিয়েছি কিন্তু সে আমাকে তখতি দিয়ে মেরেছে।

তোমাকে মজিদ মেরেছে?

দাউদ নিজের ঠোঁট চিপে ধরে হাঁ সূচক মাথা নাড়লো এবং পাজামা উপরে উঠিয়ে হাঁটু ও গোছার ওপর মারের দাগ দেখালো।

মজিদ বললো, মাস্টারজী! আমি ওকে অনেক ছাড় দিয়েছি।

কিন্তু দাউদের জখম মজিদের জামা ছেঁড়ার ক্ষতিপূরণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। মাস্টারজী দুজনকে ধমক দিয়ে ছেড়ে দিল।

তারপর মজিদ ও দাউদ পরস্পরের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল।

স্কুলে দাউদ যে দ্বিতীয় ছেলেটির কাছে পরাস্ত হয়েছিল সে ছিল মোহন সিং। মোহন সিং-এর বাপ কেবল ঐ গ্রামের জমিদারই ছিল না বরং আশপাশের আরো অনেক গ্রামেও তার জমি ছিল। গ্রামে তার কেল্লার ধাঁচে গড়া একটি দালানকোঠা ছিল। মোহন সিং আট নয় বছর বয়সেও নওকরের কাঁধে চড়ে স্কুলে আসতো। ক্লাসের একেকটি ছেলেকে গালি দেয়া তার জন্মগত অধিকার মনে করতো। কাজেই একদিন সে দাউদকেও গালাগালি করলো। দাউদ জবাবে তাকে একটি চড় কশিয়ে দিল। মাস্টার বাইরে কোথাও গিয়েছিল, মোহন সিং কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে গেলো [illegible] বাপের দুজন নওকরকে সংগে করে নিয়ে এলো। তারা দাউদকে ধরে স্কুলের বাইরে নিয়ে গেলো এবং ভীষণভাবে মারধর করলো। দাউদের বাপ সরদারজীর কাছে গিয়ে নালিশ করলো, আপনার নওকররা আমার ছেলেকে মেরেছে। সরদারজী সে সময় শরাবের নেশায় বুঁদ ছিল। তার জন্য কেবল এতটুকু

জানাই যথেষ্ট ছিল যে, এ লোকটি দাউদের বাপ এবং দাউদ তার পুত্রধনকে গালির জবাবে মেরেছে। কাজেই তার নওকরদেরকে হুকুম দিল, একে আচ্ছামত জুতা পেটা করে বিদায় করো। এরপর দাউদ তার জীবনের অক্ষমতা অনুভব করলো। সে বুঝলো ইটের জবাবে পাটকেল মারার অনুমতি সবার নেই।

কিছুদিনের মধ্যে সেলিম স্কুলের পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল। মাষ্টারজী বিনা কারণে কোনো ছেলেকে মারে না এ বিষয়টি তাকে নিশ্চিন্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। সে জেনেছিল মাষ্টারজী শোরগোল করলে, পড়া না বলতে পারলে এবং গরহাজির থাকলেই কেবল শাস্তি দিয়ে থাকে।

স্কুলের বাইরে বহু আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। মাষ্টারজীর মারপিটের ভয় থাকা সত্ত্বেও অনেক ছাত্র এগুলির মধ্যেই ডুবে থাকতো। স্কুলের বাইরে ছিল সবুজ শ্যামল শস্য ক্ষেত। বড় বড় ফলের বাগান। খোলা আকাশে পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াতো। বড় বড় বিল ছিল। তার মধ্যে পদ্ম ফুল ফুটে থাকতো। চারদিকে ছিল প্রচুর নদীনালা। বর্ষার পানি এগুলোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো। স্কুলের বাইরে দেখা যেতো আকাশচুম্বী পাহাড়। আর সবচেয়ে বড় কথা, স্কুলের বাইরে খেলাধূলা করার ও মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়াবার অবাধ স্বাধীনতা ছিল। এর মোকাবিলায় স্কুল ছিল একটি চারদেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ বাড়ি, যার মধ্যে দুটি কামরা ছিল। সামনের দিকে ছিল একটি বারান্দা। আর পাশে ছিল ছোট একটা ডোবা, যার ময়লা পানিতে ছেলেরা তাদের তখতি ধুতো। স্কুলে লেখার জন্য ছিল দোয়াত, কলম ও তখতি এবং পড়ার জন্য ছিল বই। সেলিম ছাদের কড়িকাঠ থেকে শুরু করে দরোজার পেরেকগুলো পর্যন্ত সবই তন্ন তন্ন করে দেখেছে। দেয়ালের গায়ে ছিল কয়েকটা পুরাতন নকশা ও জীর্ণ ছবি। এসব সেলিমের মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। বসার চাটাইয়ের ওপর কালো কালির দাগ ও ছাদের গায়ে মাকড়শার জালগুলি সে গুণে শেষ করেছিল। দুতিন সপ্তাহের মধ্যে স্কুলে আর এমন কোনো জিনিস ছিল না যা তার জানার বাইরে ছিল। এখন আর স্কুল তার জন্য কোন নতুন জগত ছিল না বরং ছিল একটি ছোট্ট কয়েদখানা।

যে কামরায় সে বসতো তার উত্তর দেয়ালে একটি জানালা ছিল। সে বসতো সেই জানালার কাছেই। এখান থেকে সে দেখতে পেতো বাইরের শস্য শ্যামল ক্ষেত এবং দূরে দিগন্ত বিস্তৃত কাংগড়ার বুলন্দ পাহাড়। কাছে গিয়ে এ পাহাড় দেখার আকাংখা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন। স্কুল ঘরের এই ছোট্ট জানালাটি ছিল এমন একটি গলিপথ যে পথ অতিক্রম করে সে এই ক্ষুদ্র সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে পালিয়ে স্বপ্নের সুন্দর জগতে পৌঁছে যেতো, পাহাড়ের কোলে শায়িত মেঘদেরকে ঘুম থেকে জাগাতো এবং তাদের পিঠে সওয়ার হয়ে নীল আকাশের মহাশূন্যে উড়ে বেড়াতো। আচানক মাষ্টারজীর আওয়াজ শোনা যেতো, 'সেলিম! তুমি কি দেখছো?' সাথে সাথেই তার স্বপ্নের দুনিয়া চাকনাচুর হয়ে যেতো। সে চমকে উঠে বলতো, জী, কিছু নয়।

পড়া তৈরি করেছো?

জ্বী হাঁ।

আচ্ছা, এখন তখতি লেখো।

পড়া তৈরি করা এবং তখতি লেখা তার জন্য ছিল অতি সহজ কাজ কিন্তু দিনের সাত ঘন্টা এই সংকীর্ণ পরিসরে বন্দী থাকা ছিল অনেক বড় শাস্তি।

পড়া তৈরি করেছো?
জী হাঁ।
আচ্ছা, এখন তখতি লেখো।
পড়া তৈরি করা এবং তখতি লেখা তার জন্য ছিল অতি সহজ কাজ কিন্তু দিনের সাত ঘন্টা এই সংকীর্ণ পরিসরে বন্দী থাকা ছিল অনেক বড় শাস্তি।

সেলিম ছিল সাধারণ ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশী মেধাবী। ছয় মাসে সে প্রথম শ্রেণীর পড়া শেষ করে ফেললো। মাস্টারজী তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলেদের সাথে বসিয়ে দিল। প্রথম দিকে মজিদের প্ররোচনায় সে কয়েকদিন গরহাজির থাকার চেষ্টা করলো। কিন্তু মাস্টারজী উঁচু ক্লাসের ছেলেদেরকে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতো এবং বাড়ির লোকেরা তাদেরকে কোনো ক্ষেত বা বাগান থেকে ধরে নিয়ে স্কুলে বসিয়ে দিয়ে আসতো। ফিরে আসার পর সেলিমকে ছোট মনে করে ধমক দিয়ে মাফ করে দেয়া হতো কিন্তু মজিদকে ভালো রকম পিটনি দেয়া হতো। মজিদের বাপ তাদেরকে মাস্টারজীর হাতে সোপর্দ করে দিয়ে বলতো, মাস্টারজী! সেলিম এখনো ছোট বাচ্চা, সব দোষ মজিদের। গরহাজির থাকার কয়েকটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর সেলিম মজিদের পরামর্শ মতো কাজ করা বন্ধ করে দিল। যেদিন মজিদের নিয়ত বদলে যেতো, সে গ্রামের অন্য ছেলেদের সাথে বেরিয়ে পড়তো। সেলিমের ভর্তি হবার পূর্বে গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের ওপর ছিল মজিদের কর্তৃত্ব। তার মাথায় যেদিন দুষ্টুমী ভর করতো সেদিন গ্রামের সব ছেলেদেরকে আটকে রাখতো, স্কুলে যেতে দিতো না। অতি সহজেই সে তাদের মনে ঝরণা বা বিলে গোসল করার শখ পয়দা করতে পারতো এবং কখনো তারা এ ব্যাপারে তার সাথে সহযোগিতা করতে ইতস্তত করলে সে মারপিট করে তাদের ওপর নিজের কর্তৃত্ব জমাতো। কিন্তু সেলিম যখন স্থির সিদ্ধান্ত করলো সে স্কুলে গরহাজির থাকবে না তখন মজিদ অনুভব করলো, সে এক নতুন পারিস্থিতির সম্মুখীন হতে চলেছে। সেলিমকে প্ররোচিত করার জন্য তার কোনো কৌশলই কাজে লাগলো না। প্রথম দিন সেলিম তাকে বললো, ঠিক আছে তুমি যদি না যাও আমি তো অবশ্যই যাবো। মজিদ তাকে পথে ধোপার কুকুরের ভয় দেখালো। সেলিম তাতেও পিছিয়ে এলো না। এবার মজিদ তাকে ময়ূরের ডিম দেখাবার লোভ দেখালো। কিন্তু সেলিম প্রলোভনের ফাঁদেও পা দিল না। মজিদ দেখলো কোনোক্রমেই সে নিজের ইরাদা বদলাচ্ছে না, সে অন্য ছেলেদের রুখবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে অনুভব করলো, তারা সেলিমকে নিজেদের নেতা বানিয়ে নিয়েছে। রাগে ক্ষোভে সে একটি ছেলেকে মারবার জন্য হাত তুলতেই সেলিম এসে সামনে দাঁড়ালো।

দেখো মজিদ! তুমি যদি কাউকে মারো, তাহলে আমি তোমার সাথে লড়বো। তুমি দাদাজানের কাছে ওয়াদা করেছিলে আর কোনোদিন স্কুলে গরহাজির থাকবে না।

তুমি আমার সাথে লড়বে? একথা বলেই মজিদ তার গালে একটা হালকা চড় মারলো।

সেলিম কয়েক মুহূর্ত নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলো। মজিদের হাতে তার গালে মারা এটা ছিল প্রথম চড়। কিন্তু তার কাছে এর কোনো জবাব ছিল না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মজিদের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে। সেলিম আচানক পেছন ফিরলো এবং কাউকে কিছু না বলে স্কুলের দিকে চলতে লাগলো। গ্রামের অন্যান্য ছেলেরা জামাল, বশীর, রামলাল ও গোলাপ সিংও তার পেছনে পেছনে চললো।

মজিদ কিছুক্ষণ নিসাড় নিস্তেজ দাঁড়িয়ে থাকলো। তার রাগ লজ্জায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। এটি ছিল তার ও সেলিমের প্রথম বিরোধ এবং প্রথম লড়াই। সে দেখেছিল সেলিমকে গ্রামের ছেলেদের সাথে লড়তে। সে জানতো সেলিম হার মানবার ছেলে নয়। জালাল একবার তাকে গালি দিয়েছিল। ফলে সে নিজের তখতি দিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তার আজকের এ কার্যক্রম মজিদকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল। তার চড়ের মোকাবিলায় যে হাত তার জামা ছিঁড়বার জন্য এগিয়ে আসেনি তার বিরুদ্ধে সে ছিল অভিযোগ মুখর। যে চোখে ক্রোধ ও ঘৃণার পরিবর্তে পৌরুষ ও করুণার দীপ্তি ফুটে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ ছিল।

সেলিম ও তার সাথিরা তিন চারটি ক্ষেত পার হয়ে গিয়েছিল। 'সেলিম', 'সেলিম', বলতে বলতে মজিদ তাদের পেছনে দৌড়াতে লাগলো। সেলিমের সাথিরা পেছন ফিরে তাকে দেখছিল। কিন্তু সেলিম তার দিকে মুখ ফিরায়নি। মজিদ ভেবেছিল, সে তার আওয়াজ শুনতেই দৌড়াতে থাকবে এবং স্কুলে পৌঁছুবার আগেই সে তাকে ধরে ফেলবে তারপর দুজনই খিলখিল করে হেসে উঠবে। কিন্তু সেলিম তার স্বাভাবিক চালে চলতে থাকলো।

মজিদ কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে আবার আওয়াজ দিল, সেলিম! দাঁড়াও, আমি তোমাদের সাথে যাবো। সেলিম তার দিকে ফিরে দেখে বললো, তুমি আমার ভয়ে স্কুলে যেয়ো না। আমি দাদাজান ও চাচাজানের কাছে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করবো না।

সেলিম সামনের দিকে এগিয়ে চললো। মজিদ হতাশা ও পেরেশানির মধ্যে তার পেছনে পেছনে মাথা হেঁট করে আসতে লাগলো। সারা পথ সেলিমকে খুশি করার জন্য সে মনে মনে বিভিন্ন চিন্তা ও কৌশল রচনা করতে থাকলো। স্কুলের কাছাকাছি পৌঁছে সে সেলিমকে বললো, সেলিম! আমার সাথে সন্ধি করবে না?

সেলিম কোনো জবাব দেবার পরিবর্তে তার গতি আরো বাড়িয়ে দিল। মজিদ বললো, আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে ছুটির দিন আমি তোমার সাথে খালপাড়ে যাবো না।

সেলিম একবারও কোনো জবাব দিল না। মজিদ আবার বললো, আমি ছুটির পরে ফিরে গিয়ে ময়ূরের সব ডিম ভেঙে দেবো। আমি তোমার বকের বাচ্চাগুলোর গলাটিপে মেরে ফেলবো। তাদের গলায় দড়ি বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেবো।

সেলিমের গতি কমে গেলো। সে মাথা ঘুরিয়ে মজিদের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। তার চোখ বলছিল সে মজিদের কথাকে ঠাট্টা ভাবছে না। মজিদ বলে চলছিল, আর আমি তোমার বেড়ালের বাচ্চাগুলিকে উঠিয়ে নিয়ে গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে রেখে আসবো। কূয়ার পাড়ের সবচেয়ে উঁচু জামগাছটার ডালে। সেখান থেকে তুমি আর তাদেরকে নামিয়ে আনতে পারবে না।

সেলিমের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। আচানক নিজের ব্যাগ ও তখতি একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে জমিনের ওপর বসে পড়লো সে।

মজিদ ও অন্য ছেলেরা তার চারদিকে জমা হয়ে গেলো। জালাল বললো, চলো সেলিম! এবার কিন্তু দেরী হয়ে যাচ্ছে।

সেলিম জমি থেকে ঘাসের পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললো, আমি যাবো না।

মজিদ হাসতে হাসতে তার সামনে বসে পড়লো এবং মুখ ভেংচাতে লাগলো। সেলিম আচানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং মজিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ সেলিমকে কিল ঘুসি মারার এবং আঁচড়াবার খামাচাবার ও চুল ছিঁড়বার সুযোগ দেবার পর মজিদ উঠে দাঁড়ালো। তার দুটি শক্তিশালী হাত দিয়ে সেলিমের দুটি হাত ধরলো। সেলিমের চেহারা রাগে লাল হয়ে যাচ্ছিল। সে মজিদকে ল্যাং মারছিল এবং মজিদ হাসছিল।

জালাল সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু মজিদ তাকে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললো, তুমি সরে যাও। সেলিমকে তার ঝাল ঝেড়ে নিতে দাও। সেলিম সুযোগ পেতেই ক্ষেত থেকে মাটির ঢেলা উঠিয়ে তার গায়ে ছুঁড়ে মারতে লাগলো। মজিদ এদিকে ওদিকে দৌড়াদৌড়ি করে আত্মরক্ষা করতে লাগলো। একটি ঢেলা মজিদের মাথায় লাগলো এবং সে দুহাত দিয়ে নিজের মাথা ধরে দাঁড়িয়ে পড়লো। সেলিম আর একটি ঢেলা উঠিয়ে কিছুটা ইতস্ততভাবে তার দিকে দেখছিল। মজিদ ধীরে ধীরে কদম উঠিয়ে সামনের দিকে আসলো। সেলিম নিজের হাত উঁচু করলো। কিন্তু মজিদ এদিক ওদিক দৌড়াবার পরিবর্তে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'মারছো না কেন?' সে বললো। সেলিম ঢিলা মাটির ওপর ফেলে দিল।

মজিদ জমিন থেকে সেলিমের টুপিটা তুলে নিয়ে তার মাথায় বসিয়ে দিল। তারপর উভয়ই যার যার ব্যাগ তুলে নিয়ে নিরবে পরস্পরকে দেখতে লাগলো। মজিদ হাসছিল এবং সেলিম তার হাসি লুকাবার চেষ্টা করছিল। মজিদ বললো, "দাও

তোমার কাপড় আমি ঝেড়ে দিচ্ছি। এতে সেলিম খিলখিল করে হেসে উঠলো। ওরা সবাই হাসছিল।

জালাল বললো, সেলিম! মজিদ বক ও বিড়ালের বাচ্চাগুলিকে মারবে না। সে তোমাকে এমনিই ভয় দেখাচ্ছিল।

আমি জানি, সেলিম বেপরোয়াভাবে জবাব দিল।

কিন্তু জালালের বাচ্চা! তোমার মুরগীর বাচ্চা বের হয়েছে। সেগুলিকে আমি ছাড়বো না। সেলিমের বেড়ালের মুখে সেগুলিকে ফেলে দেবো। তারা মুরগীর বাচ্চা খায়।

জালালের মনে এখন স্কুলের পরিবর্তে তার মুরগীর বাচ্চাগুলির চিন্তা জাগছিল। সে ভাবছিল, আমি তাদের কথায় দখল না দিলেই ভাল ছিল।

সেলিম জালালকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে তার কানে কানে বললো, চিন্তা করো না, মজিদ তোমাকে এমনিই ভয় দেখাচ্ছে।

এই ছেলেরা যখন স্কুলে প্রবেশ করলো তখন দাউদ ঘন্টা বাজাচ্ছিল। মজিদকে দেখে সে বললো, মজিদ! আজ একটি গাছে তোতা পাখির বাচ্চা দেখে এসেছি। ছুটির পর ওখানে যাবো।

সেলিম বললো, আমিও তোমাদের সাথে যাবো।

দাউদ বললো, সেখানে অনেক বাচ্চা আছে। তোমাকেও একটি দেবো।

জালাল বললো, আর আমাকে?

দাউদ বললো, আমি তোমাদের সবাইকে একটা একটা করে বাচ্চা পেড়ে দেবো। কিন্তু বাকশক্তি সম্পন্ন তোতাটি হবে আমার।

সেলিম বললো, বাকশক্তি সম্পন্ন আবার কেমন?

তার গলায় ডোরা কাটা দাগ আছে।

বিকেলে স্কুল ছুটি হলো। দাউদের নেতৃত্বে ছেলেরা তোতা পাখির বাচ্চার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। সেলিম তাকে এক আনা দিল। জালাল এক পয়সার চিনাবাদাম কিনে দিয়েছিল। গোলাপ সিং ও বশীর ওয়াদা করেছিল আগামীকাল তারা বাড়ি থেকে তার জন্য গুড় এনে দেবে। এর বদলে দাউদ তাদেরকে তোতার একটি করে বাচ্চা দেবে। মজিদের কাছে সে কোনো মূল্য চায়নি। তবুও মজিদ তাকে ময়ূরের একটি ডিম দেবার লোভ দেখিয়েছে এবং এর বিনিময়ে দাউদের পরে সবচেয়ে সুন্দর বাচ্চাই সে পাবে। দাউদের নিজের গ্রামের ছেলে ছিল দুজন। তাদের সাথে শর্ত সে আগেই করে নিয়েছিল।

পথে মজিদ দাউদকে জিজ্ঞেস করলো, বাচ্চার সংখ্যা যদি কম হয় তাহলে?
না, এমন নয়। ঐ গাছে অনেকগুলি বাসা আছে, কেবল গাছে চড়াই কঠিন।
তুমি বলেছিলে বাকশক্তি সম্পন্ন তোতাটি কাউকে দেবে না?
যদি দুটো পাওয়া যায়, তাহলে একটা তোমাকে দেবো।
সেলিম বললো, আর আমাকে দেবে না?
আরো বেশী হলে তোমাকেও দেবো।
সেলিম বললো, দাউদ! গাছে উঠে সমস্ত বাসা ভালো করে দেখবে।
দেখবো, কিন্তু যে তোতার গলায় ডোরা কাটা তা বেশী হয় না।
দেখো দাউদ! আমার কিন্তু একটা গলায় ডোরা কাটা চাই। আমি তোমাকে কালকে আরো এক আনা দেবো এবং গুড়ও এনে দেবো।
মজিদের উপস্থিতিতে সেলিম অন্য কাউকে খোশামোদ করবে এবং তোয়াজও করবে এটা তার কাছে মোটেই ভালো লাগছিল না। সে বললো, সেলিম! সে যদি তোমাকে গলায় ডোরা কাটা তোতা না দেয় তাহলে আমি নিজে গাছে চড়ে তোমাকে তা এনে দেবো।
দাউদ বললো, আমি শর্ত লাগাচ্ছি, তুমি ঐ গাছে চড়তে পারবে না। তার কাণ্ড অনেক মোটা। কেবলমাত্র একটা ডাল আছে, যার গা বেয়ে ওপরে ওঠা যায়। কিন্তু তোমাদের কারোর হাত সেখান পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না। সেই শাখায় ওঠার জন্য আমারও তোমাদের সহযোগিতার দরকার হবে।
মজিদ সেলিমকে বললো, সেলিম! যদি তুমি ডোরা কাটা তোতা না পাও তাহলে আমি তোমাকে আমারটা দেবো। আমি অন্য একটা নেবো। অশ্বত্থ গাছের নিচে পৌঁছে ছেলেরা যার যার ব্যাগ জমিনের ওপর রেখে দিল। মজিদ ও জালাল দাউদকে সহায়তা দেবার জন্য পরস্পরের বাহু হাত দিয়ে চেপে ধরলো। একটি ছেলে তাদের পাশে জমিতে হাত ঠেকিয়ে বসে পড়লো। দাউদ তার পিঠে একটি পা রেখে অন্য পা মজিদও জালালের হাতের ওপর রাখলো। তারপর দুটি পা-ই সে তাদের হাতের ওপর রেখে দিল। বোঝার ভারে জালালের কোমর বেঁকে যাচ্ছিল। কিন্তু মজিদ তার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিল।
জালাল বলছিল, দাউদ জলদি করো।
মজিদও জালালের মাথায় হাত রেখে দাউদ দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সবেমাত্র সে গাছের শাখার গায় হাত লাগাতে যাচ্ছিল এমন সময় জালালের পা পিছলে গেলো। সে নিজের জায়গা থেকে সরে গেলো।
'জালালের বাচ্চা! তুমি....' দাউদ নিজের বাক্য পূর্ণ করার আগেই চিৎপটাং হলো। কিন্তু পড়ে গিয়েই উঠে বসলো। ছেলেরা বহুকষ্টে নিজেদের হাসি চেপে রাখছিল। দাউদের পাগড়ী ঢিলা হয়ে গিয়েছিল। এবার সেটাকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এবং দৌড়ে গিয়ে দুহাতে জালালের কান টেনে ধরলো।

মজিদ জলদি এগিয়ে গিয়ে জালালকে দাউদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বললো, দাউদ! এটা তোমার ভুল। তোমার এত দেরী করা উচিত হয়নি। এখন আমরা আবার তোমাকে সহায়তা দিচ্ছি এবং তুমি বেশি ভার আমার ওপর দেবে।

দাউদ দ্বিতীয় বার হিম্মত করে এগিয়ে এলো। তবুও সে বললো জালালের বাচ্চা! এবার যদি তুমি আমাকে ফেলে দাও, তাহলে তোমাকে টিয়া দেবো না।

এবার অবশ্য জালালের মধ্যে দায়িত্বানুভূতি আগের বারের তুলনায় বেশী দেখা গেল। আর কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই দাউদ গাছে উঠে গেলো।

গাছের মাঝখানের শাখাটি তুলনামূলকভাবে বেশী মোটা ছিল। কিন্তু দাউদের আন্দাজ অনুযায়ী তাতেই এখানে ওখানে ছিল বহু বাসা। কিন্তু তার প্রশাখা চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। দাউদ ঐ প্রশাখাগুলিকে সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করে মূল শাখার চারপাশে চক্কর কেটে উপরের দিকে চড়তে লাগলো।

একটি বাসা থেকে দুটি তোতা উড়ে গেলো। দাউদ খুশি হয়ে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। কিছুক্ষণ তালাশ করার পর বললো এর ভেতর কিছুই নেই। মনে হয় বাচ্চা বড় হয়ে উড়ে গেছে।

নিচের ছেলেরা হতাশ হলো। সেলিম বললো, দাউদ! উপরে অনেকগুলি গর্ত আছে। ওগুলিতে নিশ্চয়ই বাচ্চা থাকবে। ভালো করে দেখো।

মজিদ জবাব দিল, তুমি চিন্তা করো না।

আর একটি গর্ত থেকে তোতা উড়ে গেলো এবং দাউদ ভেতরে হাত ঢুকিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'পেয়েছি!' 'পেয়েছি!' দুটো নয়, তিনটে। একের পর এক তিনটি বাচ্চা বের করে সে ডালের ওপর রেখে দিল। এবং গভীরভাবে তাদেরকে দেখে বললো, এদের মধ্যে কারোর গলায়ও ডোরা কাটা নেই। তাছাড়া এরা এখনো অনেক ছোট। এদের ডানা এখনো ভালোভাবে গজায়নি।

কয়েকটি ছেলে এগুলি নিয়েই ক্ষান্ত হতে চাচ্ছিল। কিন্তু সেলিম নিচে থেকে বললো, দেখো দাউদ! ওগুলিকে ওখানেই রেখে দাও। ওরা এখনো অনেক ছোট। ওরা তো মরে যাবে।

দাউদ তিনটি বাচ্চা আবার বাসার মধ্যে রেখে দিল এবং বললো, আমি আরো ওপরের দিকে দেখছি।

আরো একটি বাসা থেকে দাউদ আরো দুটি বাচ্চা পেলো। কিন্তু এদের কারোর গলায়ও ডোরা কাটা নেই। তবুও এরা অনেক বড় ছিল। নীচে ছেলেরা চাদর টানিয়ে ধরেছিল। কিন্তু দাউদ বললো, আমি ফেরার সময় এদেরকে আমার ঝুলির ভেতরে রেখে নিয়ে যাবো। উপরে আরো বাসা আছে। ওগুলো দেখবো।

গাছের সর্বোচ্চ শাখার কাছাকাছি পৌঁছে দাউদ আরো একটা বাসা দেখতে পেলো। সে চিৎকার করলো, মজিদ! উপরে তাকিয়ে দেখো, সর্বোচ্চ শিখরে কোনো বড় পাখির বাসা বলে মনে হচ্ছে।

মজিদ কিছুক্ষণ মনোযোগ সহকারে দেখার পর বললো, আরে দোস্ত! এতো অনেক বড় বাসা। চিলের বাসা নয় তো?

জালাল বললো, দাউদ! আমার মা বলতেন, চিলের বাসায় সোনা থাকে।

মজিদ বললো, আরে বাজে কথা, চিল সোনা পাবে কোথায়?

সত্যি বলছি মজিদ! আম্মা বলতেন, চিলের বাসায় সোনা থাকে।

যদি না থাকে তাহলে?

জালালের কাছে এ প্রশ্নের কোনো জবাব ছিল না। কিন্তু সেলিম বললো, হ্যাঁ মজিদ! জালাল মিথ্যা বলছে না। চিলের বাসায় সোনা থাকে। তুমি কি এ গল্প শোননি, এক রানী ছাদের ওপর গলার হার খুলে রেখে গোসল করছিল এবং একটি চিল তা ছোঁ মেরে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল? একজন লোক বনে কাঠ কাটতে গিয়ে চিলের বাসা থেকে সোনার হার পেয়েছিল। সে হার নিয়ে রাজার কাছে যেতেই রাজা তাকে অনেক ইনাম দিয়েছিল।

জালাল বললো, দেখলে তো আমি মিথ্যা বলিনি। সত্যি চিলের বাসায় সোনার হার পাওয়া যায়।

মজিদ দাউদকে আওয়াজ দিয়ে বললো, দেখো দাউদ! একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে নাও। তুমিও হয়তো হার পেয়ে যেতে পারো।

কিন্তু দাউদ সেলিমের কাহিনী শুনেছিল। তার আর কোনো পরামর্শের প্রয়োজন ছিল না। সে দ্রুত গাছের ওপরের দিকে উঠছিল। এখন তার কাছে গলায় ডোরা কাটা তোতার কোনো গুরুত্ব ছিল না। সোনার হারের জন্য দাউদ যে কোনো বিপদের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু যখনই সে বাসার কাছে পৌঁছে হাত উঁচু করলো অমনি বাসার মধ্যে ফড়ফড় আওয়াজ হলো এবং মুহূর্তেই একটি চিল তার মাথায় ঠোকর দিয়ে একদিকে উড়ে গেলো। দাউদ জীবনে প্রথমবার মাথায় চুলের প্রয়োজন অনুভব করলো। সে সবেমাত্র নিজের মাথায় হাত বুলাচ্ছিল এমন সময় চিল দ্বিতীয়বার শূন্যে চক্কর মেরে উড়ে এসে তার মাথায় বসে পাঞ্জা গেড়ে দিল। দাউদ খুব জোরে হাত মেরে তাকে ভাগালো এবং দ্রুত নিচে নামতে লাগলো। কিন্তু চিল তাকে বারবার এসে খুঁপিয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে দাউদ মগডালের সরুসরু ও বিপদজনক শাখা প্রশাখা থেকে নেমে কিছুটা মজবুত ডালে পা রেখেছিল। কিন্তু এতক্ষণে মেয়ে চিলটির আওয়াজ শুনে পুরুষ চিলটিও কোথায় ছিল তাকে সাহায্য করার জন্য ছুটে এলো। এখন দুজন একের পর এক দাউদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। তাদের চঞ্চু ও পাঞ্জার লক্ষ্য ছিল দাউদের ক্ষুর দিয়ে নেড়া করা চকচকে মাথা। নিচে তার সাথিরা হেসে লুটিয়ে পড়ছিল এবং ওপর থেকে সে গোস্বায় চিৎকার করছিল–'ও জালালের বাচ্চা! তোর মা চিলের বাসায় সোনা......' সে তার বাক্য পূর্ণ করতে পারলো না, চিল তার মাথায় একটা জবরদস্ত আঘাত করলো।

মজিদ বারবার চিল্লাচ্ছিল, এলো, এলো, ওই চিল এলো।

ওদিকে দাউদ এক হাত দিয়ে ডাল ধরেছিল এবং অন্য হাত ও বাহু দিয়ে নিজের মাথা ও চোখের ওপর ঢাল বানিয়ে নিচ্ছিল। তারপর দ্রুত কয়েক কদম নিচে নেমে আসছিল। মজিদ আবার চিল্লাচ্ছিল, ওই এলো চিল, আবার ছোবল মারলো।

দাউদ চিৎকার করতে করতে, দোহাই দিতে দিতে, আঁচড়ে কামড়ে যেকোনোভাবে গাছের নিচের ডালে এসে ঝুপ করে জমিনের ওপর একটা লাফ দিল। তার মাথায় চিলের ঠোঁটের কামড় ও পাঞ্জার নখের দগদগে ঘা দেখা যাচ্ছিল তার কোথাও কোথাও থেকে রক্ত ঝরছিল। ছেলেদের হাসি এবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দাউদ কিছুক্ষণ নিসাড় নিস্তব্ধ হয়ে জমিনে বসে নিজের সাথিদেরকে দেখতে থাকলো। তারপর সে বললো, জালালের বাচ্চা! তুমিও হাসছিলে?

জবাব না পেয়ে সে চার দিকে ফিরে একবার দেখে নিল। জালাল সেখানে ছিল না। রামলাল একদিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললো, আরে ওই যে জালাল চলে যাচ্ছে।

কোথায়? দাউদ দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো।

ওই দেখো!

দাউদ চিৎকার করলো, দাঁড়াও জালালের বাচ্চা!

কিন্তু জালাল ব্যাগটা বগলে সাপটে ধরে দৌড়ে চলছিল, পেছনে আওয়াজ শুনে তার গতি আরো তেজ আরো দ্রুত হলো। তার গতি থেকে বোঝা যাচ্ছিল নিজের গ্রামে পৌঁছার আগে আর সে পেছন ফিরে দেখবে না।

বর্ষাকাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। ছেলেরা স্কুলের আঙিনায় দাঁড়িয়ে আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখছিল। পশ্চিম থেকে ধেয়ে আসা মেঘগুলির গতি যথেষ্ট দ্রুত ছিল। তবুও ছেলেরা আশংকা করছিল মাস্টারজীর স্কুল ঘরে এসে পৌঁছার আগেই যদি বৃষ্টি শুরু না হয়ে যায় তাহলে তারা ছুটি পাবে না। কালো কালো মেঘগুলো এখনো সূর্য থেকে কিছু দূরে ছিল। বিগত রাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। ফলে আজ সকাল থেকে আবার বৃষ্টির লক্ষণ দেখে অন্য গ্রামগুলি থেকে যেসব ছাত্র নিয়মিত আসতো তাদের অনেকে আসেনি।

সেলিম, মজিদ ও তাদের গ্রামের অন্য ছেলেরা এখন খুব কমই গরহাজির থাকতো। কিন্তু এমন দিনগুলোয় আম, জাম ইত্যাদি গাছের তলায় অথবা বিল ও বর্ষা মওসুমের নদীগুলোর কিনারায় তাদের জন্য অনেক আকর্ষণীয় বিষয় ছিল। রাতে যখন জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল, তাদের পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছিল সকালে তাদের স্কুলে যেতে হবে না। তাই তারা সারা দিনের খেলাধুলা, সাঁতার ও গোসলের প্রোগ্রাম তৈরি করে নিয়েছিল। কিন্তু খুব সকালেই বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল এবং পুব আকাশের কোণায় মেঘগুলো এদিক ওদিক সরে গিয়ে সূর্যের জন্য জায়গা খালি করে দিল।

তারা হতাশ হয়েছিল। তবুও যখন তারা গ্রাম থেকে রওনা হয়েছিল, দক্ষিণ পশ্চিম কোণ থেকে কাল মেঘের দল ধেয়ে আসতে শুরু করেছিল। তারা এই আশায় চলা শুরু করেছিল যে, তাদের স্কুলে পৌঁছে যাবার আগেই এ মেঘগুলি বারিবর্ষণ শুরু করে দেবে এবং তারা লম্ফ ঝম্ফ ও হাসি উল্লাস করতে করতে ঘরে ফিরে আসবে। অত্যন্ত ধীর গতিতে তারা স্কুলের পথে এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু বৃষ্টি হয়নি। স্কুল ঘরের কাছে পৌঁছে মজিদ বললো, আজ নিশ্চয়ই অনেক কম ছেলে এসে থাকবে। এখনো ঘন্টা বাজেনি। যদি অর্ধেক ছাত্র গরহাজির থাকে তাহলে মাষ্টারজী ছুটি দিয়ে দেবেন। যদি আরো কিছুক্ষণ ঘন্টা না বাজে তাহলে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে এবং তারপরও মাষ্টারজী ছুটি দিয়ে দেবেন।

স্কুলে পৌঁছে অন্য ছেলেদের মতো অস্থিরভাবে তারা আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। মেঘ এখন আকাশের পূব কোণেও পৌঁছে গিয়েছিল এবং সূর্য ঢেকে গিয়েছিল। ধূসর ও কালো মেঘেরা একসাথে মিশে যাওয়ার ফলে আকাশে এখন ধোঁয়াটে পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। স্কুলের একদিকের বিলে ব্যাঙেরা একটানা গাঁঙর গোঁ আওয়াজে আকাশ মাথায় তুলে নিয়েছিল। অন্যদিকে আমগাছে পাপিয়ার সুর বেজে চলছিল।

দাউদ মাষ্টারজীর হুক্কা হাতে স্কুলে প্রবেশ করলো। ছেলেদের চেহারায় হতাশা ছেয়ে গেলো।

দাউদ ভেতরে গিয়ে হুক্কাটা রাখলো মাষ্টারজীর আসনের পাশে এবং বাইরে বের হয়ে এসে ঘন্টা বাজিয়ে দিল। ছেলেরা কাতারবন্ধ হয়ে আঙিনায় দাঁড়িয়ে গেলো এবং দাউদের হুকুমে উদ্বোধনী সংগীত শুরু হয়ে গেলোঃ

'দোয়ার আকারে কণ্ঠে জাগে আকাংখা আমার।
জীবন আমার 'শামা' সম হোক হে খোদা আমার!'

কিন্তু ছোট বাচ্চাদের জানা ছিল না 'শামা' তথা প্রদীপের জীবন কেমন হয়? তারা কেবল আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। তাদের কেবল একটাই আকাংখা ছিল অর্থাৎ বৃষ্টি হোক এবং হুকার পেছনে পেছনে মাষ্টারজী যেন না আসতে পারে। কিন্তু মাষ্টারজী এসে গেলো এবং পাটওয়ারীর সাথে কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। গেটের সামনে এসে তারা উভয়ে থেমে গেলো। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ করছিল তারা। সাধারণ অবস্থায় তাদের এ ধরনের আলাপ অনেক লম্বা হতো।

কথা বলতে বলতে পাটওয়ারী আকাশের দিকে মুখ তুলে বললো, মাষ্টারজী! এ মেঘটাতে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হবে। রাতেও জোর বৃষ্টি হয়েছে।

মাষ্টারজীও আকাশের পানে তাকালো তারপর ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, আজ অনেক ছেলে গরহাজির।

দোয়া শেষ হলো। মাষ্টারজীর হুকুমে দাউদ ভেতর থেকে হাজিরা বইটি বের করে আনলো। সাধারণ অবস্থায় মাষ্টারজী নিজের আসনে বসে হুকায় দু'চারটা টান

দেবার পর হাজিরা নেয়া শুরু করতো। কিন্তু আজ আঙিনায় দাঁড়িয়ে হাজিরা নেয়ার কাজ চলতে লাগলো। পাটওয়ারী তার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলো। মাস্টারজী হাজিরা নিতে নিতে আকাশের দিকে দেখলো। দু এক ফোঁটা তার খাতার ওপর পড়লো। তাড়াতাড়ি হাজিরা শেষ করে খাতা দাউদের হাতে সোপর্দ করলো।

পাটওয়ারী বললো, মাস্টারজী! আজ ছুটি দিয়ে দিন।

মাস্টারজী জবাব না দিয়ে আকাশের দিকে দেখলো।

মজিদ সেলিমের বাহুতে চিমটি কাটলো এবং সে একটি ছেলের পেছনে মুখ লুকিয়ে বুলন্দ আওয়াজে বলে উঠলো, 'ছুটি!' 'ছুটি!'

অন্য প্রান্ত থেকে একটি ছেলে তার অনুকরণ করলো এবং এরপর সব ছেলেরা মিলে সমস্বরে গেয়ে উঠলো, 'ছুটি ছুটি ছুটি, আজ আমাদের ছুটি!'

যদি মাস্টারজীর মন বর্ষার মনোরম আবহাওয়ায় প্রভাবিত না হতো তাহলে হয়তো এতক্ষণ ছড়ি হাতে তুলে নিতো অথবা ছাত্রদের কান ধরার হুকুম দিয়ে দিতো। কিন্তু তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো এবং এই সাথে ছেলেদের আওয়াজ আরো জোরে বুলন্দ হলো। মাস্টারজী পাটওয়ারীর দিকে তাকালো।

পাটওয়ারী বললো, মাস্টারজী! আজ আম খাবার দিন।

মাস্টারজী আবার ছাত্রদের দিকে তাকালো এবং হাসতে হাসতে বললো, বড়ই নালায়েক হয়ে গেছো, না! আচ্ছা যাও! কিন্তু আগামীকাল কেউ গরহাজির থাকতে পারবে না।

ছেলেরা স্কুল থেকে বের হয়ে গ্রামের বাইরে একটি বিলের কিনারে একত্র হলো। ময়লা পানির এ বিলটি বর্ষার ঝকঝকে পরিষ্কার পানির স্রোতে ভরে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পানিতে সাঁতার কাঁটার ও ঝাঁপা ঝাঁপি করার পর ছেলেরা উপরে উঠে কাবাডি খেলা শুরু করলো। স্কুলের গ্রামের ছেলেরা ছিল সংখ্যায় বেশী এবং বাইরের গ্রামগুলি থেকে আগত ছেলে ছিল অনেক কম। তাই উভয় দলের সংখ্যা সমান সমান করার জন্য স্কুলের গ্রামের কিছু ছেলে বাইরের গ্রামের ছেলেদের দলে যোগ দিল। দাউদ ও মজিদকে খেলায় নিতে সব ছেলেই ভয় করছিল। কাজেই ফায়সালা করা হলো, মজিদ এক দলে এবং দাউদ অন্য দলে থাকবে এবং তারা ছোট ছেলেদের গায়ে হাত দেবে না। একদিক থেকে যদি মজিদ ডাক দিতে যায় তাহলে অন্য দিক থেকে দাউদ ডাক দিতে যাবে। এভাবে দাউদের মোকাবিলা কেবল মজিদই করবে। ক্ষেতের মাঝখানে দুটি ব্যাগ রেখে দিয়ে মধ্য রেখা টেনে দেয়া হলো। কিন্তু খেলা শুরু হতে যাচ্ছিল এমন সময় মজিদ বিলের কিনারে দেখতে পেলো খয়েরদীনের গাধা চরে বেড়াচ্ছে। সে আর কোন কথা না বলে দাউদকে নিয়ে সেদিকে দিল ছুট।

সেলিম জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছো মজিদ?

তোমরা খেলো সেলিম। আমরা এখনি আসছি।

জলিলের অনুপস্থিতিতে সেলিম ছিল তাদের খেলোয়াড়দের দলনেতা। অন্যদিকে তার প্রতিপক্ষে মোহন সিং ছিল দলনেতা। কবাডির সূচনা করলো মোহন সিং। সে ডাক নিয়ে এসে পরম নিশ্চিন্তে বিপক্ষ দলের একজন খেলোয়াড়ের গা ছুয়ে দিয়ে চলে গেলো। তার জবাবে সেলিমদের দল থেকে গোলাপ সিং ডাক দেবার জন্য তৈরি হলো। সে বিপক্ষের একটি ছেলেকে ছুঁয়ে দিয়ে চলে এলো। মোহন সিং দ্বিতীয় বার একটি ছেলেকে ছুঁয়ে দিয়ে চলে গেলো। এবার সেলিমের পালা এলো। সে নিজের প্রতিপক্ষকে পাছাড় দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেলিম অনুভব করলো, যখন মোহন সিং ডাক নিয়ে আসে তখন তার নিজের দলের কোনো ছেলে তাকে ধরার সাহস করে না। সেলিমের কানে কানে বললো গোলাপ সিং, সেলিম! ছেলেরা মোহন সিংকে ভয় করে। তারা জানে, তার মোকাবিলা করলে তার বাপের নওকর তাদেরকে তাদের বাড়িতে গিয়ে মারধর করে আসবে। সে আমাদের অর্ধেক সাথিকে বসিয়ে দিয়েছে। এই জালাল, রামলাল ও বশীরও তাকে ভয় করে।

সেলিম বললো, এই জালাল! তুমি মোহন সিংকে ভয় করো?

আমি ডাক নিয়ে গেলে সে আমাকে গালি দেয়।

আচ্ছা, এবার তাকে সাইজ করা হবে।

সেলিম এমনিতেও তাকে ঘৃণা করতো। যখনই সে শুনেছিল, মোহন সিং তার বাপের নওকরদের দিয়ে দাউদকে পিটিয়েছিল এবং তার বাপকে দিয়ে দাউদের বাপকে বেইজ্জত করিয়েছিল তখন থেকেই সে মোহন সিংকে তাচ্ছিল্য করতো।

মোহন ডাক নিয়ে এলো। সেলিম এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ালো। মোহন সিং পূর্ণ শক্তিতে তার বুকে থাপ্পড় কশে দিল। এর জবাবে সেলিমের হাত তার ঘাড়ে গিয়ে পড়লো সজোরে। সে পেছন দিকে হটে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সেলিম সামনে একপা এগিয়ে গিয়ে তার বুকে মারলো কশে দুটো ঘুঁসি। সে চিৎ হয়ে পড়ে গেলো। মোহন সিং পড়ে যেতে যেতে 'কবাডি', 'কবাডি'-এর পরিবর্তে গালাগালি দিতে শুরু করলো। দুজনের জন্য এটা ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। খেলাধূলায় আজ পর্যন্ত মোহন সিংয়ের বিরুদ্ধে কেউ দৈহিক শক্তি প্রদর্শনের সাহস করেনি আর সেলিমকেও কেউ গালি দেয়নি। উভয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়েছিল। মোহন সিং নিজে পড়ে গিয়েও গালি দিয়ে চলছিল। আর সেলিম প্রত্যেক গালির জবাবে একটি করে ঘুঁসি মারছিল। এ অবস্থায় জমিদার পুত্রকে সাহায্য করা তার গ্রামের গরীব ছেলেদের দায়িত্ব হয়ে পড়েছিল। পাঁচ ছয়টি ছেলে সেলিমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু গোলাপ সিং ও বশির দৌড়ে গিয়ে তাদের তখতি উঠিয়ে নিল। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ। বাইরের গ্রামের আরো তিনটি ছেলে সেলিম, গোলাপ সিং ও বশিরের সহযোগী হলো। বাকি অন্যান্য ছেলেরা নিরপেক্ষ রইলো। জালাল তার অভ্যাস মতো নিজের ব্যাগ ও তখতি সামলে নিয়ে পূর্ণ গতিতে তার গ্রামের দিকে ভেগে চলছিল।

সেলিম ক্ষেতের এক মুঠো মাটি তুলে মোহন সিং-এর মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলো। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের সাথিদের মধ্যে এসে দাঁড়ালো।

সেলিমের হাত থেকে ছাড়া পেয়েই মোহন সিং তার সাথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, এখন যেন এরা পালিয়ে না যায়। এদেরকে ঘিরে ফেলো।

সে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। এতক্ষণে রামলাল বিলের অন্য কিনারে পৌঁছে চিৎকার করে বলছিল, দাউদ! মজিদ! লড়াই শুরু হয়ে গেছে, দৌড়ে চলো, দৌড়ে চলো! তারা গাধার পিঠে ছড়ি মারছিল এবং যথারীতি খয়েরদীন তাদের পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছিল।

মোহন সিং-এর সাথিরা তার হুকুম অনুযায়ী ক্ষেতের চারদিক ঘেরাও করে নিয়েছিল।

সেলিমও তার সাথিরা পরামর্শ করার পর আচানক মোহন সিং যেদিকে দাঁড়িয়েছিল সেদিকে আক্রমণ করলো। গোলাপ সিংয়ের তখতি একটি ছেলের বাহুতে আঘাত করলো। সে বাবাগো মাগো বলে পিছনে হটে নিজের বাড়ির দিকে দৌড় দিল। বশির আর একটি ছেলের হাঁটুতে ঘা দিল। সে 'আমার পা গেলো' 'পা গেলো' বলে চিৎকার করে আকাশ মাথায় তুলে নিল। অন্যান্য ছেলেরা এদিক ওদিক সরে গেলো। সেলিমের লক্ষ্য ছিল মোহন সিং। মোহন সিং নিজের সাথিদের থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিল। সে দৌড়ে তাদের সাথে মিশতে চাইছিল। কিন্তু সেলিম তার পথরোধ করলো। বাধ্য হয়ে সে নিজের বাড়ির পথ ধরলো। সেলিম তার পিঠে তখতির এক ঘা বসিয়ে দিল। ফলে তার গতি আরো দ্রুত হলো। ধোপাদের বাড়ি পর্যন্ত সেলিম তার পিছু নিল। কিন্তু ধোপাদের কুত্তা যখন ঘেউ ঘেউ করতে করতে বাড়ির বাইরে বের হয়ে এসে মোহন সিংকে ধাওয়া করলো তখন সেলিম হাসতে হাসতে ফিরে এলো।

এতক্ষণে মজিদ ও দাউদ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল। তারা মোহন সিং-এর সাথিদেরকে কান ধরার হুকুম দিয়েছিল। সেলিম বললো, দাউদ! এদের কোনো দোষ নেই। এরা আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি। এরা মোহন সিং-এর ভয়ে আমাদের সাথে লড়াই করতে বাধ্য হয়েছিল। এরা ভয় করছিল মোহন সিং তার নওকরদের দিয়ে এদেরকে মারধর করবে।

দাউদ বললো, ঠিক আছে, তাহলে কান ছেড়ে দাও।

একটি ছেলে বললো, সেলিম! এখন তোমরা পালাও। মোহন সিং তোমাদের হাতে মার খেয়ে গেছে। সে এখন তার পিতাজী ও নওকরদেরকে সাথে করে নিয়ে আসবে।

'পলাতক হয় ভীরু কাপুরুষ', সেলিম রাগে ফেটে পড়লো।

মজিদ এগিয়ে এসে তার পিঠ চাপড়ে বললো, দেখলে দাউদ! আমার ভাই তো!

দাউদ বললো, দেখো মজিদ! তার বাপ বা নওকররা তোমাদের গায়ে হাত দিলে আমাকে তোমাদের পক্ষ নিতে হবে। আর তুমি জানো তারা একবার আমাকে মেরেছিল এবং আমার বাপের বেইজ্জতি করেছিল।

মজিদ ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, আজ যদি তারা আসে তাহলে আমরা বদলা নেবো। কিন্তু তারা আমাকে এর শাস্তি অবশ্যই দেবে। কারণ তারা বলবে, এ সবকিছু আমার চালাকি।

সেলিম বললো, দাউদ! তুমি চলে যাও, আমরা যাবো না।

দাউদ রাগ করে বললো, চলে যাবো? তোমাকে আর মজিদকে ত্যাগ করে? না, আমি তোমাদের সাথে আছি। তারা বড় জোর আমার বাপের বেইজ্জতি করবে। কিন্তু তার বদলে আমি মোহন সিংয়ের মাথার একটি চুলও আস্ত রাখবো না।

স্কুলের গ্রামের ছেলেরা একদিকে একথা ভাবছিল যে, মোহন সিং নিশ্চয়ই তার বাপ ও নওকরদেরকে সংগে করে নিয়ে আসবে এবং অন্যদিকে একথাও বুঝতে পারছিল যে, মজিদ, সেলিম ও তার সাথিরা পালিয়ে যাবার পরিবর্তে তাদের মোকাবিলা করার ইরাদা করে নিয়েছে, তাই তারা যার যার বাড়ির পথ ধরলো। তাদের কয়েকজন দূর থেকে তামাশা দেখার জন্য কাছাকাছি একটি বড় গাছে চড়ে বসলো। দাউদ ও মজিদদের এসে যাবার পর এখন বাইরের গ্রামের যেসব ছেলেরা নিরপেক্ষ ছিল তারাও তাদের সাথে যোগ দিল।

মজিদের পরামর্শ অনুযায়ী ছেলেরা নিজেদের ব্যাগগুলো একত্র করে একটি আখের ক্ষেতে লুকিয়ে রাখলো এবং সবাই বিলের কিনারায় বসে পড়লো। মজিদ বললো, দেখো, আমি না বলা পর্যন্ত তোমাদের কেউ নিজের জায়গা থেকে উঠবে না। কেউ এলে আমি নিজে তার সাথে কথা বলবো।

মজিদ তার পাগড়ি নামিয়ে দুভাঁজ করলো এবং তারপর প্রায় দুসেরের মতো কাদা মাটি তুলে নিয়ে তাকে গোলায় পরিণত করে পাগড়ির ভাঁজ করা চাদরের এক কোণায় বাঁধলো। তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে দাউদকে বললো, জানো এটা কি হলো?

দাউদকে খামুশ থাকতে দেখে সে নিজেই জবাব দিল, এটা একটা হাতিয়ার। চাচা আফজালের কাছ থেকে আমি এটা শিখেছি। চাচা আফজাল একবার এ অস্ত্রের সাহায্যে এক ভয়ংকর ডাকাতকে তার ঘোড়া সমেত পাকড়াও করেছিল।

কেমন করে? দাউদ এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলো।

মজিদ পাগড়ির এক প্রান্ত দুহাত দিয়ে ধরলো এবং নিজের মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে বললো, দেখো এটা লাঠির চেয়ে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। কেউ এর আওতায় এসে পড়লে সেখানেই পড়ে যাবে। মজিদ এর বাস্তব প্রমাণ পেশ করার জন্য পাগড়ি দ্রুত ঘুরিয়ে মাটির গোলার প্রান্তটি জমিনের ওপর মারলো। এ আঘাতে ভিজে ও নরোম জমিনে বেশ বড় সড় একটি গর্ত হয়ে গেলো। মজিদ ছেলেদের কাছে এসে বসলো এবং বাহবা নেবার দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

দাউদ জলদি তার পাগড়ি খুলে ফেললো এবং দুহাত দিয়ে মটির গোলা তৈরি করতে করতে বললো, আরে, এতো বেশ চমৎকার অস্ত্র! কিন্তু এ মাটি নরোম। এর পরিবর্তে যদি......! সে তার বাক্য পূর্ণ করার পরিবর্তে দৌড়ে গেলো একটি কূয়ার দিকে এবং তার ভাঙা আল থেকে দুটো ইট খসিয়ে নিয়ে তার একটি নিজের পাগড়িতে বেঁধে এবং অন্যটি মজিদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, কাদামাটির গোলার পরিবর্তে এ ইট অনেক জোরদার হবে মজিদ!

অন্য ছেলেরাও নিজেদের জন্য ইট উঠিয়ে আনলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সবাই এ নব অস্ত্রে সজ্জিত হলো। কিন্তু সেলিমের আফসোস ছিল সে পাগড়ির মতো কার্যকর জিনিসের পরিবর্তে টুপি পরে এসেছে।

আচানক বিলের অপর কিনারে তার দৃষ্টি পড়লো। খয়েরদীন গাধাদের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে নাকাল হয়ে পড়েছিল। বিলের পারে এসে তাজাদম হবার জন্য সে বিলের পানিতে গোসল করছিল। বিলের পাড়ে তার কাপড় চোপড় রাখা ছিল। সাধারণ অবস্থায় সেলিম হয়তো এমন কাজ করতো না কিন্তু পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। এক দৌড়ে অন্য কিনারে পৌছে সে খয়েরদীনের পাগড়িটা তুলে নিল। খয়েরদীন অন্য দিকে মুখ করে ডুব দিচ্ছল। কাজেই তার দৃষ্টি সেলিমের ওপর পড়লো না।

সেলিম যখন তার সাথিদের কাছে পৌছুলো তখন মোহন সিং ও তাদের তিনজন নওকর গ্রাম থেকে বের হয়ে বিলের দিকে আসছিল। এখন আর পাগড়িতে ইট বাঁধার সময় ছিল না। ফলে মাটির গোলার ওপরই তাকে নির্ভর করতে হলো।

মোহন সিং-এর হাতে ছিল হকিস্টিক এবং তার নওকরদের হাতে ছিল লাঠি। দাউদ বললো, মজিদ! ওই কালো পাগড়িওয়ালা আমার বাপকে জুতো মেরেছিল। তাকে শাস্তি দেবো আমি।

মজিদ বললো, কিন্তু যতক্ষণ আমি না হুকুম দেবো তোমাদের কেউ অগ্রসর হবে না।

তারা কাছে এসে গেলে মজিদ উঠে দাঁড়ালো। নওকররা যখন দেখলো এই বাচ্চাদের কাছে তাদের লাঠির কোনো জওয়াব নেই তখন নিশ্চিন্তে তাদের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো।

তাদের একজন বললো, মোহন সিংকে মেরেছে কে?

মোহন সিং সেলিমের দিকে ইশারা করে চিৎকার দিয়ে উঠলো, আমাকে এ ছেলেটি মেরেছে।

মজিদ বললো, তুমি ওদেরকে এনেছো কেন? তোমার পিতাজীকে সংগে করে আসতে পারতে।

মোহন সিং নওকরদের দিকে তাকিয়ে আবার চিৎকার দিল, এ হচ্ছে সেলিমের ভাই আর এসব ছেলেরা তার সহযোগী। এদের সবাইকে পাকড়াও করো।

নওকর বললো, তোমরা সবাই আমাদের সাথে সরদারজীর কাছে চলো।

মজিদ বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে বললো, আরে দেখেছি তোমাদের সরদারজীকে। তার কাছে আমরা যাবো না।

এই অপ্রত্যাশিত জবাবে নওকর এক মুহূর্তের জন্য পেরেশান হয়ে গেলো। সে ঘাড় ফিরিয়ে তার সাথিদের দিকে দেখতে লাগলো। কালো পাগড়িধারী বেঁটেখাটো নওকরটি কিছুক্ষণ দাউদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর চিৎকার করে উঠলো, আরে এ সেই নূরদীন তেলির ছেলে। ওরে তেলির ব্যাটা! তুই সেই মার ভুলে গেছিস?

সেলিম উঠে দাঁড়িয়ে বললো, দাউদের ওপর তোমাদের গোস্বার কারণ তার বাপ গরীব। মোহন সিংকে আমি মেরেছি এবং যখনই সে গালি দেবে, তাকে মারবো।

নওকর সেলিমকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে লাঠি উঠালো। কিন্তু তার আগেই মজিদের হাত চলা শুরু করেছিল। পাগড়ির সাথে দ্রুতগতিতে ঘূর্ণায়মান ইট নওকরটির পাঁজোরে সজোরে আঘাত করলো। বাবাগো বলে কোমর বেঁকিয়ে সে দু'কদম পেছনে হটে জমিনের ওপর বসে পড়লো এবং পাঁজরের ওপর দুহাত রেখে আর্তচিৎকার করতে লাগলো। তার সাথিরা অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। মজিদ অচানক তার লাঠি উঠিয়ে নিল। একজন মজিদকে লাঠির আঘাত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে লাফিয়ে অন্যদিকে সরে গেলো। এতক্ষণে মজিদের অন্য সাথিরাও ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মজিদের প্রতিপক্ষ ততক্ষণ তার ওপর দ্বিতীয় আঘাত হানার জন্য লাঠি উঠালো। কিন্তু পেছন থেকে গোলাপ সিংয়ের পাগড়ির সাথে ঘূর্ণায়মান ইট তার গর্দানে আঘাত করলো আর এই সংগে মজিদ সজোরে লাঠি চালালো তার ঠ্যাংয়ে। মজিদ দ্বিতীয়বার লাঠি তুলতেই সে ময়দান ছেড়ে দিল এক দৌড়।

যে নওকরটি মজিদের ওপর প্রথম আঘাত হেনেছিল এবার সে উঠার চেষ্টা করলো কিন্তু চারটি ছেলে তার চারদিকে এসে দাঁড়ালো। একটি ইট তার মাথায় লাগলো এবং সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো মাটিতে।

মোহন সিং পরাজয়ের লক্ষণ দেখে কয়েক কদম দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেলিম সবার চোখ বাঁচিয়ে একটি লম্বা চক্কর কেটে তার কাছে গিয়ে পৌঁছুলো। মোহন সিং তখনই জানতে পারলো যখন সে সেলিমের হাতের আওতার মধ্যে এসে গিয়েছিল। পালিয়ে ওঠার আগেই তার পা দুটিতে সেলিমের পাগড়ির আঘাত পড়লো এবং ধপাস করে উপুড় হয়ে পড়ে গেলো সে। সেলিমের দুচারটি ঘুঁসি খাবার পর সে উঠলো এবং নিজের পাগড়ি ও অর্ধেক জামা সেলিমের হাতে ছেড়ে দিয়ে পড়ি কি মরি করে দে ছুট।

সেলিম দৌড়ে তার সাথিদের কাছে পৌঁছে গেলো। তখন লড়াইয়ের শেষ পর্বের সবচাইতে মজার দৃশ্যের অবতারণা চলছিল। বেঁটে কালো পাগড়িধারীর ওপর দাউদ তার কারুকা পরীক্ষা করছিল। সে ইটের আঘাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল কিন্তু দাউদ তার পাগড়িটি তার গরদানে জড়িয়ে দিয়েছিল। দাউদ তাতে জোরে টান দিল এবং সে

জমিনে আছড়ে পড়লো। দাউদ তাকে টেনে নিয়ে চলছিল এবং সে কণ্ঠরোধ হবার ভয়ে দুহাত দিয়ে পাগড়ি ধরে রেখে দিয়েছিল।

দাউদের এ খেলাটি কৌতুহলোদ্দীপক মনে করে ছেলেরা সবাই তার চারদিকে জামায়েত্‌ হয়েছিল।

মোহন সিংয়ের দ্বিতীয় নওকরটি জমিনের ওপর পড়েছিল। নিজের চারদিকে ঘূর্ণায়মান পাগড়িগুলিকে সে লাঠির চাইতে ভয়ংকর দেখছিল। তাকে যারা পাহারা দিয়ে রেখেছিল তাদের দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট দেখে এক ফাঁকে সে উঠে দিলো দৌড়। কোথাও থামলো না। পালাবার সময় মজিদ তার পিঠে লাঠির এক ঘা বসিয়ে দিল।

লড়াই শেষ হয়েছিল। দুশমন ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। বিজয়ীরা গনীমাতের মাল হিসাবে পেয়েছিল দুটি লাঠি, দুটি জুতা, একটি পাগড়ি ও একটি জামার অর্ধাংশ। এছাড়া একজন কয়েদীও ছিল। দাউদ তাকে জীবিত গ্রেফতার করেছিল। কালো পাগড়িধারী বেঁটে মানুষটি তার জীবনে প্রথমবার এই অনুভূতির শিকার হয়েছে যে, পাগড়ির মতো একটি অক্ষতিকর জিনিসকে যদি ভুল পথে ব্যবহার করা যায় তাহলে তা পরিণত হতে পারে একটি ভয়ংকর অস্ত্রে। তাছাড়া সে এ ব্যাপারেও বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছে যে, ছেলেরা বিশেষ করে স্কুলের ছেলেরা রাগের তুলনায় খুশির অবস্থায় বেশী ভয়ংকর হয়। সে তাদের হাত থেকে নিস্তার লাভ করার জন্য জমিনে নাক দিয়ে দাগও কেটেছে। কিন্তু এরপর কে একজন বলে দিল এর পাগড়ি তো কালো তাই এর মুখও কালো করে দাও। কাজেই আটদশটি দোয়াতের কালি তার মুখে মাখিয়ে দেয়া হলো। তারপর কে একজন খিলখিল করে হাসতে লাগলো। তখন সে অনুভব করলো, আবার নুতন কোনো মুসিবতের আগমনী হচ্ছে। কাজেই যে ছেলেটি হেসে উঠেছিল সে নিজেই এ প্রস্তাব দিয়ে তার আশংকাকে সত্যে পরিণত করলো যে, এবার একে জুতা পেটা করা হোক। ফলে তার মাথায় জুতা বৃষ্টি হতে লাগলো।

তারপর কে একজন বললো, চলো একে আমাদের গ্রামে নিয়ে যাই। বাচ্চারা একে দেখে খুশি হবে। একথা শুনে তার ভীষণ মনোকষ্ট হলো। কিল, ঘুঁসি, লাথি, জুতা খাবার পর তার মধ্যে আর বাচ্চাদের কোনো গ্রুপের জন্য কোনো আকর্ষণের বিষয় সরবরাহ করার ক্ষমতা নেই।

দাউদ এসে বললো, ঠিক আছে, এখন তুমি কসম খাও, এরপর আর তুমি কখনো স্কুলের কোন ছেলের সাথে লড়বে না।

আমি কসম খাচ্ছি।

বলো, আমি একটি বাঁদর।

আমি একটি বাঁদর।

আমি বাঁদরের মতো নাচতে পারি।

আমি বাঁদরের মতো নাচতে পারি।

মজিদ তার পাগড়ি খুলে তার গলায় বেঁধে দিল এবং বললো, সাবাশ! আমার বীরত্ব। এবার নেচে দেখাও! সে অসহায় অবস্থায় উঠে দাঁড়ালো। ছেলেরা শোরগোল করতে লাগলো।

সে নাচতে জানে না। সে মিথ্যা বলেছে। মাষ্টারজী মিথ্যাবাদীদের কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি দিয়ে থাকেন।

দাউদ বললো, ঠিক আছে, তাহলে তোমার কান ধরো।

সে দুই হাত উঠিয়ে কান ধরলো। ছেলেরা এখন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল।

মজিদ বললো, আরে বাঁদর! এভাবে নয়। গোলাপ সিং তুমি ওর কান ধরা দেখিয়ে দাও।

গোলাপ তার সামনে নমুনা পেশ করে এই বিষয়টির মধ্যে যে প্যাঁচ আছে তা বুঝিয়ে দিল।

সে কান ধরে ভাবছিল, নিশ্চয়ই এতক্ষণ তার সাথিরা সরদারজীর কাছে পৌছে গেছে। তারা শিগগির নতুন লোকদের দলবল নিয়ে এখানে পৌছে যাবে। যখন তার খুব বেশী কষ্ট হচ্ছিল তখন ভাবছিল, এই এখনি মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে এবং ছেলেরা পালিয়ে যাবে। যখন কষ্ট সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছিল তখন সে চিৎকার করে উঠলো, আমাকে ছেড়ে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যে সরদারজী গ্রামের সমস্ত লোকদেরকে নিয়ে এসে যাবে। তোমরা পালিয়ে যাও। ছেলেরা হঠাৎ চিন্তান্বিত হয়ে পড়লো।

দাউদ বললো, চলো মজিদ! গ্রামের লোকদের সাথে আমরা লড়তে পারবো না। যদি তুমি লড়াই করতে চাও। তাহলে একটি ছেলেকে তোমাদের গ্রামে পাঠিয়ে দাও।

পেছন থেকে কে একজন গুরুগম্ভীর স্বরে বললো, এখানে কি হচ্ছে?

ছেলেরা এদিক ওদিক সরে গেলো। আর কান ধরার শাস্তি ভোগকারী এই আওয়াজকে গায়বী মদদ মনে করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো

এ ছিল সেলিমের চাচা আফজাল এবং তার সাথে ছিল গোলাপ সিংয়ের বাপ শেরসিং। তাদের হাতে ছিল লাঠি এবং ছেলেদের জন্য অনুমান করা কঠিন ছিল না যে, জালালই এদেরকে খবর দিয়েছে।

আফজাল ও শের সিং যুদ্ধবন্দীর কালি লেপটানো চেহারা দেখে একচোট হাসলো তারপর ছেলেদের জিজ্ঞেস করলো, কে এই লোক?

এর জওয়াবে সেলিম সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিল।

আফজাল ও শের সিং পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। শের সিং বললো, মঙ্গল সিং বড়ই কমিনা। সে অন্যের ছেলেদেরকে কি মনে করে? চলো তার কাছে যাই?

আফজাল বললো, এখানেই অপেক্ষা করো। এখন সে আরো বেশী লোক জন নিয়ে আসবে।

সেলিম বললো, চাচাজী! এর আগে সে দাউদ ও তার বাপকে নওকরের হাতে মার খাইয়েছিল। আজ দাউদ আমাদের সাথে সহযোগিতা করেছে। এখনি যদি তার বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ান তাহলে আবার সে দাউদের বাপকে বেইজ্জতী করবে।

আমরা তাকে সোজা করে দেবো, একথা বলে আফজাল সরদারের নওকরের দিকে মুখ ফেরালো।

কেনরে বদমাশ! ছোট ছোট ছেলেদের বিরুদ্ধে লাঠি হাতে করে নিয়ে আসতে লজ্জা করে না?

শংকিত কণ্ঠে জবাব দিল সে, চৌধুরী জী! আমরা জানতাম না এরা আপনাদের ছেলে।

দেখো বদমাশ! ছেলে সবার একই রকম হয়। আগামীতে তুমি যদি কোনো ছেলের গায়ে হাত উঠিয়েছো তাহলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে জেনে রাখবে।

না চৌধুরী সাহেব, না।

আচ্ছা যাও, তোমার চেহারা ঠিক করো।

নওকর দৌড়ে কয়েক কদম দূরে গিয়ে বিলের কিনারে বসে পড়লো।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। গ্রাম থেকে লোকদের শোরগোল শুনে আফজাল ও শের সিং কয়েক কদম দূরে একটি ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে বসে রইলো। আফজাল ও শের সিংয়ের উপস্থিতিতে ছেলেদের কোনো পেরেশানী ছিল না। তারা নিশ্চিন্তে কবাডি খেলছিল। মোহন সিংয়ের বাপ চরণ সিংকে প্রায় দশজন লোককে সাথে নিয়ে আসতে দেখা গেলো। চরণ সিং চিৎকার করতে করতে, হুংকার দিতে দিতে এবং অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে করতে এগিয়ে আসছিল। চরণ সিং বলছিল, দেখো, এরা পালিয়ে না যায়। এদের সবাইকে ধরে ফেলো। আর তার সাথিরা ছেলেদের ধরার বা মারার পরিবর্তে ভাগিয়ে দিতে চাচ্ছিল বলেই যেন মনে হচ্ছিল। গ্রাম থেকে বের হবার সময় তারা বেশ জোরে শোরে চিৎকার হই চই করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, ছেলেরা যদি আগেই পালিয়ে না গিয়ে থাকে তাহলে এখন তাদের হইহল্লা শুনে পালিয়ে যাবে। কিন্তু ছেলেরা পরম নিশ্চিন্তে কবাডি খেলছিল। এ দৃশ্য দেখে গ্রামের লোকদের আগ্রহ ও উৎসাহে ভাটা পড়লো এবং তারা পেরেশান হয়ে গেলো।

চরণ সিং অনুভব করছিল, এই বেআদব ছেলেগুলি তার ক্ষতস্থানে লবণ ছিটিয়ে দিচ্ছে। এরা তার ছেলের গায়ে হাত তুলেছে। তার নওকরদের হাতে মার খাওয়ার পরিবর্তে এদের হাতে তারা মার খেয়েছে। সে হচ্ছে এক হাজার একর জমির মালিক। তার সাথে ছিল দশজন লড়াকু জওয়ান। তারা চিৎকার করে নিজেদের

জনাবহ সংকল্পের কথা প্রকাশ করে যাচ্ছিল। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও ছেলেরা কবাডি খেলে চলছিল, কেবল তার গ্রামের সীমানার মধ্যেই নয় বরং তার নিজের ক্ষেতের মধ্যে দাঁড়িয়ে। তাদের বেপরোয়াভাব যেন একথা প্রকাশ করছিল যে, তারাই এ গ্রামের মালিক এবং এ জমি তাদের। আর তাদেরকে যারা গালি ও ধমক দিচ্ছে তারা যেন অন্য দেশের লোক। চরণ সিংয়ের নওকর যারা ইতিপূর্বে ছেলেদের হাতে মার খেয়ে ভেগেছিল তাদের কথায় সে জেনেছিল যে, এই ছেলেদের পাগড়িগুলি লাঠির চাইতেও ভয়াবহ। কিন্তু এখন তারা খালি হাতে খেলা করছিল। হামলাকারীরা যতই যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছিল ততই তাদের গতি ও কথাবার্তার মধ্যে ধীরতা ও স্থিরতার সঞ্চার হচ্ছিল।

যখন তাদের দূরত্ব কমে পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে গিয়েছিল তখন ঝোপের আড়াল থেকে আফজাল ও শের সিং বের হয়ে এলো এবং কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ালো।

আক্রমণকারীদের ওপর আচানক যেন বজ্রপাত হলো। এবার তাদের পরিবর্তে ছেলেরা চিৎকার করছিল।

আফজাল ধমক দিয়ে ছেলেদেরকে খামুশ করে দিল। চরণ সিং এটাকে ভালো লক্ষণ মনে করে কয়েক কদম এগিয়ে গেলো। সে বললো, চৌধুরী আফজাল! এই ছেলেগুলি আমার ছেলে ও নওকরদের মেরেছে।

আফজাল জবাব দিল, যদি তোমার ছেলে ও নওকররা এই ছেলেদেরকে ঠিক ঐ ধরনের গালি দিয়ে থাকে যে ধরনের গালি তুমি এই এখনি এদেরকে দিচ্ছিলে তাহলে এরা খুব ভালো কাজই করেছে।

শের সিং বললো, চরণ সিং! আমরা মনে করেছিলাম তুমি তোমাদের গ্রামের সমস্ত লোককে সাথে করে নিয়ে আসবে। তোমার চুল সাদা হলে কি হবে বুদ্ধি এখনো হয়নি। যদি তুমি মনে করে থাকো তোমার বেটা ছাড়া বাকি সব ছেলেই লাওয়ারিশ তাহলে এদের মধ্য থেকে কারোর গায়ে হাত লাগিয়ে দেখ!

চরণ সিং অনুগৃহিতের স্বরে বললো, শের সিং! তোমার সাথে আমার কোনো লড়াই নেই কিন্তু এই ছেলেরা আমার ছেলেকে খুব মেরেছে।

শের সিং বললো, তোমার ছেলেকে মেরেছে মাত্র দুজন ছেলে। তাদের একজন হচ্ছে আমার ছেলে এবং অন্যজন আফজালের ভাইয়ের ছেলে। আমরা আমাদের ছেলেদের গালি দেয়া শেখাইনি কিন্তু গালির জবাব দেয়া অবশ্যই শিখিয়েছি। তোমার ছেলে তাদেরকে গালি দিয়েছে। কাজেই তাকে তার গালির জবাব দেয়া হয়েছে বলে এখন তোমার দুঃখ করা উচিত হবে না। যদি এতে তোমার সান্ত্বনা না হয়ে থাকে তাহলে হিম্মত করো, এগিয়ে এসো। আমরা তো মাত্র দুজন আর তোমার সাথে আছে দশজন। যদি তুমি বলো তাহলে আমাদের লাঠিও ফেলে দিতে পারি। কিন্তু তুমি এই যে ফৌজ সংগে করে নিয়ে এসেছো এদেরকে তো লড়নেওয়ালা মনে হচ্ছে না।

আফজাল বললো, চরণ সিংয়ের গোস্বা হয় কেবল বাচ্চাদের ওপর। সেলিম, গোলাপ, মজিদ! একটু সামনে এসে যাও। সরদারজী তার গোস্বা ঠাণ্ডা করে নিক।

এরা তিনজন সামনে এগিয়ে এসে চরণ সিংয়ের কাছাকাছি দাঁড়ালো। চরণ সিং এখন কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। তার সামনে অন্য কেউ থাকলে সে এতক্ষণে আক্রোশে ফেটে পড়তো। কিন্তু আফজাল ও শের সিংয়ের ব্যাপার ছিল আলাদা। শেষে শক্তি যেখানে বিকল হলো সেখানে বুদ্ধি কাজে লাগলো। চরণ সিং বললো, আমি যদি জানতাম মোহন সিং তোমাদের ছেলেদের গালি দিয়েছে তাহলে আমি নিজেই তাকে মারতাম।

আফজাল হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললো, শিশুরা তাদের বাপ-চাচা ও নওকরদের কাছ থেকে গালি দেয়া শেখে। এখন তাহলে যাও সরদারজী! আমরা তোমার সাথে লড়তে আসিনি। এটা বাচ্চাদের ব্যাপার ছিল। আজ তাদের ঝগড়া হয়েছে আবার কাল আপোশ হয়ে যাবে। আসলে তাদের ব্যাপারে বড়দের নাক না গলানোই উচিত। ছেলের কথায় যদি তুমি মানুষের সাথে লড়াই করতে থাকো। তাহলে নিজের মর্যাদা হারাতে বসবে।

এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে কিছুক্ষণ আপোশমূলক কথাবার্তা চলতে থাকলো সরদার চরণ সিং আফজাল ও শের সিংকে তার ঘরের পানি পান করাবার ও বাগানের মিষ্টি আম খাওয়াবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো এবং তারা ব্যস্ততার অজুহাত পেশ করতে থাকলো।

মিন মিন করে বৃষ্টি হচ্ছিল। ওরা নিজেদের গ্রামের পথে পাড়ি দিয়েছিল। ওদিকে ঝিলের অন্যপ্রান্ত থেকে কারোর শোরগোল ও হাঁক ডাকে তাদের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হলো। পণ্ডিত রামপ্রসাদ চিৎকার করছিল, ওরে খয়রুর বাচ্চা! ও তো অবলা প্রাণী। আরে পাপী! ওকে মেরো না। কিন্তু খয়রু গাভীর পিঠে ডাণ্ডা মেরেই চলছিল বেপরোয়াভাবে। আর গাভীটি দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ভাগছিল।

লোকেরা ইতিপূর্বে বারবার গাধার প্রতি খয়রুর আক্রোশ দেখেছিল কিন্তু আজ অন্যের গাভীর প্রতি তার এ ব্যবহার দেখে সবাই অবাক হচ্ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে তারা সবাই ঝিলের অপর পারে পৌঁছে খয়রুকে বকাবকি করছিল। জবাবে খয়রু বলছিল, সরদারজী! চৌধুরীজী! আমার কথাও শোনো। এ গাভী আমার পাগড়িটি গিলে ফেলেছে। আল্লাহর গযব হোক এর ওপর। সাত গজ লম্বা পাগড়ি, একেবারে নতুন। বিহারীলালকে জিজ্ঞেস করো। গত মাসে তার কাছ থেকে আমি কিনেছিলাম। আমার পাগড়ির জন্য তেমন দুঃখ নেই। কিন্তু তার মুড়োয় একটা তাবীজ বাঁধা ছিল এবং এর জন্য আমি পীর বেলায়েত শাহকে নগদ পাঁচটি টাকা দিয়েছিলাম।

আফজাল বললো, আরে তুমি পাগল হয়ে যাওনি তো! গাভী তোমার পাগড়ি গিলে ফেলবে কেমন করে?

আল্লাহর কসম চৌধুরীজী! আমার পাগড়ি এ গাভী খেয়ে ফেলেছে। আমি কাপড় খুলে রেখে গোসল করছিলাম। আর এই গাভীটি ছাড়া আর কেউ এখানে ছিল না।

চরণ সিং বললো, আরে পানিতে পড়ে গিয়েছে হয়তো।

সরদারজী। আমি ঝিলের কিনারের কাছাকাছি পানিতেও তালাশ করে দেখেছি।

আফজাল বললো, তাহলে অন্য কোথাও রয়ে গিয়েছে। যাও, ঘরে গিয়ে ভালো করে তালাশ করে দেখো।

জী, আমি ঘরেও তালাশ করে এসেছি। আশেপাশে ক্ষেতেও দেখে এসেছি। তারপর আমার মনে হলো হয়তো আমার পাগড়িটি পানিতে পড়ে গেছে। আমি দ্বিতীয়বার পানিতে নেমে তালাশ করছিলাম এমন সময় দেখি এ গাভীটি এসে আমার চাদরের এক প্রান্ত ধরে চিবাতে শুরু করে দিয়েছে। দেখো, বলে সে ঝিলের পাড়ে পড়ে থাকা চাদরের এক অংশ তুলে দোখালো এবং বললো, আমি সংগে সংগে ছাড়িয়ে না নিলে পুরোটাই গিলে ফেলতো।

সেলিম খয়রুর পাগড়ি বগলে দাবিয়ে একদিকে দাঁড়িয়েছিল। সে মজিদের কানে কিছু বললো আর মজিদ দাউদের সাথে কানাকানি করলো। সে সেলিমের কাছ থেকে পাগড়ি নিয়ে জামার মধ্যে লুকিয়ে ফেললো এবং এদিক ওদিক দেখে নিয়ে চুপিচুপি ঝিলের কিনারে রেখে দিয়ে এলো।

স্কুলের ছেলেরা পরস্পর কানাকানি করার পর হাসতে শুরু করে দিল। আচানক খয়রুর গ্রামের একজন লোক বললো, আরে ওখানে কি?

ওরে খয়রুর বাচ্চা! তুমি অন্ধ হয়ে গেছো নাকি! দ্বিতীয় জন এগিয়ে গিয়ে খয়রুর পাগড়ি উঠিয়ে আনলো।

কাদামাটিতে লেপটে খয়রুর পাগড়ির চেহারা অনেকটা বদলে গিয়েছিল। কিন্তু তার সাথে বাঁধা তাবীজ দেখে তাকে একথা মেনে নিতে হলো যে, এটা তার পাগড়ি। তবুও সে কসম খেয়ে বলছিল, এর আগে পাগড়ি এখানে ছিল না। পণ্ডিত রামপ্রসাদ এতক্ষণ চরম ধৈর্য সহকারে সমস্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আসছিল এবার ক্রোধে ফেটে পড়লো।

বৃষ্টির গতি ধীরে ধীরে বেড়ে চলছিল। ফলে লোকেরা আর বেশীক্ষণ তামাশা দেখার সুযোগ পেলো না। সবাই যখন রুখসাত হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন সেলিম এগিয়ে গিয়ে আফজালের কানে কানে বললো, চাচাজান! ওরা তো এবার দাউদের ওপর ওদের ঝাল মিটিয়ে নেবে।

বেটা! তোমরা চিন্তা করো না। একথা বলেই আফজাল সামনে এগিয়ে গেলো এবং চরণ সিংয়ের বাহু ধরে একদিকে নিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো।

আফজাল ও শের সিং যখন ছেলেদেরকে নিয়ে গ্রামের পথে পাড়ি জমালো তখন দাউদও তাদের সাথে চললো। কিছুদূর গিয়ে আফজাল বললো, দাউদ! এবার তুমি

নিশ্চিন্তে তোমার বাড়িতে চলে যাও। আমি তোমার ব্যাপারে তাকে সতর্ক করে দিয়েছি। এরপরও যদি সে তোমাকে কিছু বলে তাহলে সোজা আমার কাছে চলে আসবে।

পরদিন স্কুলে ছেলেরা মোহন সিংয়ের কার্যক্রমে একটি অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন লক্ষ্য করলো। ছেলেরা তাকে গতকালের ঘটনাবলী শুনিয়ে রাগাতে চাচ্ছিল কিন্তু সে মাথা ঝুঁকিয়ে নিরবে বসেছিল। তার প্রতিবেশী ছেলেরা বললো, গতকাল ঘরে পৌছে তার বাপ তাকে খুব মারধর করেছে।

আফজাল ও শের সিংয়ের সামনে চরণ সিংয়ের ভিজে বিড়ালের মতো গুটিয়ে যাওয়াটা অকারণে ছিল না। সারা এলাকায় তাদের দুজনের সামনে বাহাদুরী করার সাহস কারোর ছিল না। তাদের বন্ধুত্ব ও বাহাদুরীর কাহিনী বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা দুজনই ছয় ফুট দৈর্ঘের অধিকারী এবং সুঠামদেহী সুপুরুষ ছিল। কুশ্‌তি ও ঘোড় সওয়ারীতে দুজনই ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আফজাল ছিল তার ভাইদের মধ্যে সবার ছোট। তার বড় ভাই আলী আকবর যখন থেকে তহশীলদারের চাকুরী পেয়েছিল তখন থেকেই নিজের খরচে আফজালকে চাষবাসের কাজে সাহায্য করার জন্য দুজন নওকর রেখেছিল। এর ফলে বলতে গেলে চাষাবাদের কাজ থেকে আফজাল প্রায় ছুটি পেয়ে গিয়েছিল।

শের সিং ছিল তার ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। তার ছোট ভাই তাকে কাজে হাত লাগাতে দিত না।

আফজাল প্রাইমারী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিল। সে 'হীর ওয়ারিস শাহ' পুঁথি পড়তে পারতো। শের সিং দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তে পড়তে স্কুল ত্যাগ করেছিল এবং সে আলিফ-এ আম, বা-এর বকরী এবং তা-এ তখতি ছাড়া প্রায় সবই ভুলে গিয়েছিল।

তবুও আফজালের মুখে বারবার শোনার ফলে তার হীর ওয়ারিস শাহের কাহিনীর বেশ কিছু মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। লোকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য সে প্রায়ই কোনো না কোন বই খুলে নিজের সামনে রাখতো এবং আফজালের কাছ থেকে শেখা ওয়ারিস শাহের কবিতা শুনাতে থাকতো। তার কাছে প্রত্যেকটি বই ছিল ওয়ারিস শাহের হীর। একবার সেলিম তার হাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি বই দিয়ে বললো, চাচা পড়ে শোনাও। শের সিং সংগে সংগেই বইটি মেলে ধরে হীর-এর পনেরটি কবিতা শুনিয়ে দিল।

এলাকার দেহাতী মেলা আফজাল ও শের সিং ছাড়া অনুজ্জ্বল হয়ে যেতো। তারা কুশ্‌তি লড়তো, কবাডি খেলতো এবং কখনো বেকায়দায় পড়লে বাধ্য হয়ে লুটতরাজও করতো। দেহাতী মেলা আবার কখনো সংঘর্ষ, বিরোধ ও লড়াইয়ের

অবস্থায় পরিণত হতো। পরিচিত কুখ্যাত ডাকাত নিজের প্রতিপক্ষের সাথে শক্তি পরীক্ষার জন্য দল বল নিয়ে মেলায় আসতো। একজন শরাবের নেশায় মত্ত হয়ে লাঠি বুলন্দ করে চিৎকার দিতো, ওমুক কোথায়? অন্যদিক থেকে এ চ্যালেঞ্জের জবাব আসতো। তারপর উভয় দল পরস্পর লাঠালাঠি করার জন্য এগিয়ে আসতো। মাথা ফাটতো, দোকানদারদের মালপত্রের বস্তা ও টুকরী উল্টে যেতো এবং জিনিসপত্র চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো। দুর্বল লোকেরা পায়ের তলায় পড়ে আর্তনাদ করে উঠতো। একটি দল নিজেদের নেতাকে নিয়ে পলায়ন করতো। অন্য দলটি তাদের পিছু নিতো। তারপর পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেলে পুলিশ আসতো এবং কয়েকজনের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে থানায় চালান দিতো।

কিন্তু যখন থেকে আফজাল ও শের সিং মেলায় আসা শুরু করেছে তখন থেকে এই ধরনের ঘটনা অনেক কমে গেছে। তারা সংঘর্ষকারীদের মাঝখানে লাফিয়ে পড়তো। কিন্তু যখন সমঝোতা করাবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেতো তখন তারা লাঠি হাতে তুলে নিতো। এ সময় কুশ্‌তিগীর ও কবাডি খেলারত নওজোয়ানরা তাদের সাথে সহযোগিতা করতো।

আফজাল ও শের সিংয়ের পরিবারের মধ্যে তিন পুরুষ থেকে বিরোধ ও রেষারেষি চলে আসছিল। কিন্তু এ দুই যুবকের বন্ধুত্ব তাদের পুরাতন পারিবারিক শত্রুতার অবসান ঘটিয়েছে। তাদের বন্ধুত্বের সূচনাও ছিল বড়ই অদ্ভুত।

আশপাশের সমস্ত গ্রামে মশহুর ছিল, এলাকার মধ্যে আফজালের ঘোড়া সবচেয়ে দ্রুতগামী। শের সিংয়ের ছিল একটি সাধারণ ঘোড়া। একদিন শের সিং তার বাপ ও ভাইয়ের সাথে ক্ষেতের ফসল কাটছিল এমন সময় আফজাল তার ঘোড়া ছুটিয়ে কাছ দিয়ে চলে গেলো। শের সিং কাজ ফেলে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবং বেশ কিছুক্ষণ ঘোড়ার দিকে চেয়ে থাকলো। তার ভাইও কাজ বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

শের সিংয়ের বাপ ইন্দার সিং বললো, কি দেখছো শের সিং! তুমি কখনো ঘোড়া দেখোনি?

বাবা! এ ঘোড়াটি বড়ই চমৎকার।

আফজাল এ ঘোড়াটি নিয়ে খুবই গর্ব করে। তোমাকে দেখাবার জন্য সে ঘোড়াটির গতি দ্রুততর করেছে।

বাবা, একদিন আমি নিজের ঘোড়ায় চড়ে শহরে যাচ্ছিলাম। আফজাল ঝড়ের বেগে ঘোড়া দৌড়িয়ে আমার পাশ দিয়ে চলে গেলো। সে আমার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল আর হাসছিল।

ইন্দার সিং কাঁচি জমিনে ছুঁড়ে দিয়ে, সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবং নিজের চাদরটি তুলে নিয়ে কাঁধের ওপর রাখতে রাখতে বললো, শের সিং! আফজালের ভাই তহশীলদার হয়ে গেছে তো কি হয়েছে? আমি তোমাকে এমন দশটি ঘোড়া কিনে দিতে পারি। আজই আমি টাকার ব্যবস্থা করছি।

চতুর্থ দিন ইন্দার সিং তার ছেলের জন্য একটি নতুন ঘোড়া কিনে আনলো।

গ্রামে প্রথমেই রটনা হয়ে গিয়েছিল যে, ইন্দার সিং নতুন ঘোড়া কেনার জন্য শহরে গিয়েছে এবং তার বেটা আফজালের সাথে পাল্লা দিয়ে এটাকে দৌড়াবে। কাজেই গ্রামের বাইরে ক্ষেতে দুটো ঘোড়ার মোকাবিলা হলো। শের সিংয়ের বাপ ও ভাই বুকভরা আশা নিয়ে মোকাবিলা দেখতে এসেছিল। গ্রামের বয়স্ক অভিজ্ঞ লোকেরা বিশেষ করে চৌধুরী রমজান শের সিংকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল এই বলে যে, তোমার ঘোড়া আরবীয় বংশোদ্ভূত কাজেই মোকাবিলায় আফজালের ঘোড়াকে পেছনে রেখে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। যখন দৌড় শুরু হলো, শের সিংয়ের ঘোড়া লোকদের চিৎকার ও হইহল্লা শুনে সামনে যাবার পরিবর্তে পেছন দিকে হটে আসতে লাগলো। শের সিং তার গায়ে ছড়ি মারতেই সে ক্ষেপে উঠলো। লোকেরা অট্টহাসি দিচ্ছিল। শের সিং আরো দুতিন ঘা বসিয়ে দিল। ঘোড়া পেছনের ঠ্যাং দুটো আকাশের দিকে উঠিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে মারতে লাগলো।

ততক্ষণে আফজাল প্রায় আধামাইলের মতো চক্কর লাগিয়ে ফিরে এসেছিল। সে বললো, ব্যাপার আর কিছুই নয়, আসলে লোকদের হইহল্লা শুনে শের সিংয়ের ঘোড়া ঘাবড়ে গিয়েছে।

চৌধুরী রমজান নিজের হুকাটি হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে এসে বললো, আফজাল ঠিকই বলেছে। তোমরা শোরগোল করছো, নয়তো এটি একটি আরবীয় বংশোদ্ভূত ঘোড়া, মোকাবিলা ভালই জমতো। শের সিং ঘোড়ার পিঠে হাত চাপড়ে একে শান্ত করো। আফজাল তুমিও তোমার ঘোড়াকে একটু বিশ্রাম দাও। আবার মোকাবিলা হবে।

আফজাল ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তার গায়ে হাত বুলাচ্ছিল আর চৌধুরী রমজান হুকা হাতে নিয়ে শের সিংকে পরামর্শ দিয়ে বলছিল, দেখো শের সিং! ঘোড়া ছুটাবার সময় তার লাগাম ঢিলা ছেড়ে দেবে। সে দৌড়ানো শুরু না করার আগে ছড়ি মারবে না। এখন গর্দানে হাত বুলিয়ে একে আদর করো। আরবীয় বংশোদ্ভূত ঘোড়ার মধ্যে ক্রোধ বেশী থাকে।

চৌধুরী রমজান এগিয়ে গিয়ে শের সিংয়ের ঘোড়াকে আদর করার জন্য তার পাছায় হাত বুলাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তার হুকার কলকের ঢাকনা এবং লোহার সরু শিকল দিয়ে কলকের সাথে বাঁধা একটি ছোট চিমটার পরস্পর ঠোকাঠুকির ফলে যে আওয়াজটি হচ্ছিল সেটি সম্ভবত এই অনভিজ্ঞ পশুর কানে বেসুরো বাজছিল। তাই চৌধুরী রমজান যখনই ঘোড়ার পাছার দিকে হাত বাড়ালো তখনই সে পেছনের দুইপা উঠিয়ে কলকে ও চিমটার আওয়াজকে স্বাগত জানালো। চৌধুরী

রমজান এক চুলের জন্য বেঁচে গেলো কিন্তু তার হাত থেকে হুকা ছিটকে দশ কদম দূরে গিয়ে পড়লো। চৌধুরী রমজান চরম ভীত ও আতংকগ্রস্ত হয়ে জনতার অট্টহাস্য শুনছিল।

আফজালের বড় ভাই ইসমাঈল হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললো, কেমন চৌধুরী রমজান! ঘোড়া আরবীয় বংশোদ্ভূত, তাই না?

শের সিংয়ের বাপের সহ্যক্ষমতা সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। ক্রোধে দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে সে পরপর লাঠির কয়েক ঘা বসিয়ে দিলো ঘোড়ার গায়ে। ঘোড়া বেদম লাফাতে লাফাতে এবং চিঁহি চিঁহি করতে করতে একদিকে দৌড় দিল। আফজাল দ্রুত নিজের ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তার পিছনে ছুটলো, কিন্তু তিন'শ গজের মতো পথ অতিক্রম করার পর শের সিংয়ের ঘোড়া আচানক থেমে গেলো। আফজালের ঘোড়া যখন তার কাছাকাছি পৌঁছে গেলো তখন সে সামনের দুপা উঠিয়ে তার দিকে এগিয়ে এলো। আফজাল তার ঘোড়া একদিকে সরিয়ে নিল। কিন্তু শের সিংয়ের ঘোড়া শূন্যে পা ছুঁড়েই চলছিল বেপরোয়াভাবে।

ইন্দার সিং আবার ক্রুদ্ধ ভংগিতে এগিয়ে গেলো। কিন্তু ইসমাঈল দৌড়ে গিয়ে তার হাত টেনে ধরলো। ইন্দার সিং হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, আফজাল যদি ঘোড় সওয়ারী জানে তাহলে আমার বেটা গাধার সওয়ারী করেনি। আমি তাকে নতুন আর একটি ঘোড়া এনে দেবো। তারপর দেখি শের সিংকে হারায় কে?

তবে হ্যাঁ, আবার আরবীয় ঘোড়া আনবেন না যেন চাচাজী!

পরদিন ইন্দার সিং তার একটি ফসলী জমি বন্ধক রাখলো এবং ঘোড়াটি নিয়ে শহরে গেলো নতুন ঘোড়া কেনার জন্য। পনর দিন পরে ইন্দার সিং গ্রামে ফিরলো। তার পিছনে ছিল একটি বাদামী রংয়ের সুন্দর ঘোড়া। আগের ঘোড়াটি এবং সেইসাথে নগদ তিন'শ টাকা দিয়ে সে এই ঘোড়াটি এনেছে। গ্রামে পৌঁছেই সে চৌধুরী রমজানকে চৌধুরী রহমত আলীর কাছে এ পয়গাম দিয়ে পাঠালো যে, চারদিন পর ঘোড়দৌড় হবে, হিম্মত থাকলে তোমাদের ঘোড়া নিয়ে এতে অংশ নাও।

চতুর্থ দিন আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। ঘোড়দৌড় দেখার জন্য এই গ্রাম ছাড়াও বাইরের বেশ কয়েক গ্রামের লোকজনও জমা হয়েছিল। দৌড় শুরু হবার আগে ইন্দার সিং বললো, চৌধুরী রহমত আলী! সাদামাটা দৌড়ে কি লাভ, কিছু শর্ত লাগাও।

এখন আমদের দুজনের চুল সাদা হয়ে গেছে ইন্দার সিং! শর্ত লাগানো কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ব্যস, চৌধুরীজী! ভয় পেয়ে গেলে?

ইসমাঈল বললো, যদি শর্ত লাগাবার শখ থাকে তাহলে শের সিংকে বলুন আফজালের সাথে শর্ত লাগাক।

ইন্দার সিং বললেন, শের সিং! লাগাও আফজালের সাথে পাগড়ির শর্ত।

আফজাল বললো, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি শের সিংয়ের পাগড়ির বিনিময়ে নিজের ঘোড়ার শর্ত রাখছি।

ইন্দার সিং বললো, যদি হেরে যাও, তাহলে কি হবে?

হেরে গেলে আমার ঘোড়ার মালিক হবে তোমরা।

তোমার বাপকে জিজ্ঞেস করে নাও।

আমাকে জিজ্ঞেস করার দরকার কি? আফজালের ঘোড়া, তার ভাই তাকে দিয়েছে। হেরে গেলে আবার দেবে।

ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে গেলো। সওয়ারদের একমাইল দূরের বিশাল অশ্বত্থ গাছটিকে চক্কর দিয়ে ফিরে আসতে হবে। সেদিকে গ্রামের কয়েকজন মুরব্বী আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। গাছটির কাছে পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত শের সিংয়ের ঘোড়া অগ্রবর্তী রইলো। কিন্তু ফেরার পথে আফজাল এসে তার সাথে মিললো। চৌধুরী রমজান আগের মতো এবারও পূর্বাহ্নে বলেই দিয়েছিল, শের সিংয়ের ঘোড়া জিতবে। হরি সিং কর্মকার ও কাকু ঈসায়ীও পরস্পরের পাগড়ি বাজী রেখেছিল। কাকু ঈসায়ী দাবী করেছিল আফজালের ঘোড়া জিতবে।

অশ্বত্থ গাছের দিকে যাবার সময় শের সিংয়ের ঘোড়া যখন এগিয়ে গেলো, হরি সিং চিৎকার দিয়ে উঠলো, ওরে কাকুর বাচ্চা! পাগড়ি উতারো। কাকু চুপি চুপি নিজের পাগড়ি নামিয়ে তার হাতে রেখে দিল। কিন্তু ফেরার পথে উভয় যখন সমান হয়ে গেলো এবং তারপর কিছুক্ষণ পরে আফজালের ঘোড়া শের সিংয়ের ঘোড়াকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যেতে থাকলো তখন কাকু বললো, ওরে হরিসিং! জলদি পাগড়ি উতারো।

আরে এখনো তো পাঁচ সাতটা ক্ষেত বাকি আছে, ইতিমধ্যে শের সিংয়ের ঘোড়া নিশ্চয়ই ওকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলে যাবে।

তুই দৌড় খতম হবার অপেক্ষা করিসনি, তার আগেই আমার পাগড়ি নামিয়েছিস। এখন তোর পাগড়ি নামা, নয়তো আমি নিজেই নামিয়ে নেবো। কাকু জবাবের অপেক্ষা না করে এক হাতে নিজের পাগড়ি ছিনিয়ে নিল এবং অন্য হাত দিয়ে মাথা থেকে পাগড়ি নামিয়ে নিল। এ ধরনের বিষয়ে হরি সিংকে কাকুর শারীরিক শক্তির কথাও মনে রাখতে হয়।

দৌড় শেষ করার আগে আফজাল শের সিং থেকে একটি ক্ষেত এগিয়ে গিয়েছিল। ইন্দার সিং রাগে-দুঃখে-লজ্জায় উঠে ঘরের দিকে চলতে শুরু করেছিল। শের সিংয়ের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে আফজালের কাছে গিয়ে ঘোড়া থামালো এবং মাথা থেকে পাগড়ি নামাবার জন্য হাত বাড়ালো কিন্তু আফজাল বললো, শের সিং! পাগড়ি নামাবে না, নিজের মাথায় রাখো। কারোর পাগড়ি নামানো বাহাদুরের কাজ নয়।

চৌধুরী রহমত আলী এগিয়ে এসে বললেন, ঠিক আছে বেটা! নিজের পাগড়ি নামাবে না এটা তো ছিল তোমার পীড়াপীড়ি। নয়তো শর্ত ও বাজী লাগানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

কিন্তু শের সিং তার পাগড়ি নামিয়ে আফজালের দিকে ছুঁড়ে দিল এবং ঘোড়ার পিঠে সোয়ারী হলো।

ইসমাঈল এগিয়ে গিয়ে চৌধুরী রমজানের হুকা থেকে কলকে নামিয়ে দিল এবং হুকা সেটি জমিনের ওপর রেখে লাঠি উঠাতে উঠাতে বললো, চৌধুরী আমি মনে মনে একটি শর্ত লাগিয়েছিলাম। সেটি ছিল এই যে, যদি শের সিংয়ের ঘোড়া এগিয়ে যায় তাহলে আমি তোমার হুক্কা ভেঙে ফেলবো আর যদি আমাদের ঘোড়া এগিয়ে যায় তাহলে শুধু তোমার কলকেটা ভাঙবো। আল্লাহর শোকর, তুমি বড় কঠিন হাত থেকে বেঁচে গেছো।

রমজান চিল্লে উঠলো, আরে, এমনটি করো না! সবেমাত্র কালই আমি ওটি এনেছিলাম।

এগিয়ে এসে সে কলকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলো কিন্তু ইসমাঈলের লাঠি ততক্ষণে তার দফারফা করে দিয়েছিল। এই ঘোড় দৌড়ের ফলাফল হরি সিং কর্মকারের জন্য কম পেরেশানীর কারণ ছিল না।

কাকু মিরাসী তার পাগড়িটি নিজের মাথায় বেঁধে লোকদের দেখিয়ে ফিরছিল। পুরুষদের ব্যাপারতো স্বতন্ত্র ছিলই, ওদিকে কিছুক্ষণের মধ্যে খবরটি মেয়ে মহলেও পৌছে গেলো। এ ব্যাপারে একটুও সন্দেহ ছিল না যে, কাকু এবার ছেলেদের মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে সারা গ্রাম ঘুরে বেড়াবে। যেদিন সে কাকুর সাথে ঠাট্টা মস্কারা করা শুরু করেছিল সেদিনটিকে সে জীবনের সবচেয়ে অপয়া দিন বলে মনে করতো। কাকু তাকে বারবার অপমান করেছিল। একবার বিরক্ত হয়ে সে নিজের কুকুরের নাম রেখেছিল কাকু। যখন কাকু তার কামারশালার পাশ দিয়ে যেতো, সে নিজের কুরকে ডাক দিতো কাকু, কাকু, কাকু–আ-তু আ-তু তু - তু -তু...... ।

হরি সিং-এর বাপের নাম ছিল সন্তু। কাকুর একটি মহিষ ছিল। কয়েকদিন চিন্তা-ভাবনা করার পর সে মহিষটির নাম রাখলো সন্তু। কখনো হরি সিং তার বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে থাকলে সে সংগে সংগেই ডাণ্ডা হাতে নিয়ে মহিষকে পেটাতো আর বলতো, ওরে সন্তু! মর তুই মর, তোর জ্বালায় আর পারিনারে সন্তু, তুই ধ্বংস হয়ে যা.... । এরপর সে সন্তুকে এমন ভাষায় গালি দিতো যা শুনে বরদাশত করা হরি সিং এর পক্ষে কঠিন হতো। ফলে হরি সিং তার বাড়ির কাছ দিয়ে যাওয়া বন্ধ করলো। কিন্তু কাকু তার পিছু ছাড়ল না। সে দিনের মধ্যে কোনো না কোনো এক সময় তার মহিষের গলার দড়ি ধরে হরি সিং-এর কামার শালার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতো এবং তাকে সন্তু সন্তু বলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতো।

গ্রামের ছেলেরা দল বেঁধে তার সাথে ঘুরতো আর বলতো কাকু, সন্তুকে আজ কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

সে জবাব দিতো, কসাইখানায় নিয়ে যাচ্ছি। আর অমনি হরি সিং রাগে চোখ লাল করে তাকাতো কিন্তু কিছুই বলতে পারতো না।

শেষ পর্যন্ত হরি সিং কুকুরটাকে ঘর থেকে বের করে দিল, ফলে কাকুও তার মহিষের নাম বদলে ফেললো।

ঘোড়দৌড়ের কয়েকদিন পরে একদিন হরি সিং লাংগলের ফাল তৈরি করছিল। শের সিং বসেছিল তার সামনে। আফজাল এসে বললো, হরি সিং! কাল আমি ঘোড়ার জিঞ্জিরের গায়ে চাবিটা রেখে দিয়েছিলাম, এখন আর পাচ্ছি না। মনে হয় ছেলেরা কেউ কোথাও ফেলে দিয়েছে। আমি জিঞ্জিরটা দিয়ে যাচ্ছি, এর একটা চাবি বানিয়ে দাও।

ঠিক আছে বানিয়ে দেবো। কিন্তু এর পর থেকে সাবধান হও যাতে চাবি হারিয়ে না যায়। কোনো দুষ্ট লোকের হাতে চাবি পড়লে তো ঘোড়া চুরি হয়ে যেতে পারে। পরশু সরদার অর্জুন সিংয়ের ঘোড়া চুরি হয়ে গেছে। তার পায়ে জিঞ্জির বাঁধা ছিল। চোর চাবি দিয়ে খুলে ঘোড়া নিয়ে চলে গেছে।

আফজাল বললো, এ জিঞ্জিরের তালাটাও তেমন ভালো নয়। এবার শহরে গেলে কোনো মজবুত জিঞ্জির নিয়ে আসবো। কিন্তু আপাতত তুমি এর চাবি বানিয়ে দাও।

আফজাল চলে যাবার কিছুক্ষণ পর কাকু সেখানে দিয়ে হেঁটে গেলো। তার মাথায় ছিল পাগড়ি, যা সে তার থেকে জিতে নিয়েছিল।

হরি সিং শের সিংকে বললো, আমি শুনেছি আফজাল তোমার পাগড়ি তোমাদের বাড়িতে ফেরত পাঠিয়েছে। কিন্তু এই কাকু বড়ই বদমাশ। সে প্রতিদিন আমার পাগড়ি দেখাবার জন্য আমার এখান দিয়ে অন্তত একবার হেঁটে যাবেই।

শের সিং কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললো, হরি সিং! যদি তুমি বিশ টাকা কামাতে চাও তাহলে আমার সাথে একটা সওদা করে নাও।

বিশ টাকার কথা শুনে হাতুড়ি থেমে গেলো। সে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, যদি তুমি আমার গাভীটি কিনতে চাও তাহলে তিরিশ টাকার এক টাকা কমেও দেবো না।

না, তোমাকে এমন জিনিসের দাম বিশ টাকা দেবো যার দাম আসলে দু পয়সার বেশী নয়।

তুমি ঠাট্টা করছো।

না, ঠাট্টা করছি না।

তাহলে বলো সেটা কি?

প্রথমে কসম খাও, কাউকে সেকথা বলবে না।

আমি বাপুর কসম খাচ্ছি।

না কক্ত অস্ত্রের কসম খাও।

হরি সিং দু'পয়সার জিনিস বিশ টাকায় বিক্রি করার লোভে কসম খেলো।

একদম শের সিং বললো, আফজালের ঘোড়ার জিঞ্জিরের একটা চাবি আমাকে বানিয়ে দাও।

হরি সিং কতক্ষণ বিস্ময়ে থ হয়ে রইলো তারপর বললো, তুমি.........?

হাঁ, আমি এ ঘোড়াটাকে দরিয়ার ওপারে পাঠিয়ে দিতে চাই।

হরি সিং কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললো, কিন্তু তুমি যদি ধরা পড়ো তাহলে তোমার সাথে আমিও ফেঁসে যাবো।

আমি কসম খাচ্ছি তোমার নাম কাউকে বলবো না।

কিন্তু চুরি তো পাপ।

তোমার তাতে কি? তুমি আমাকে চাবি বানিয়ে দাও।

হরি সিং যেকোনো ভাবেই হোক নিজের বিবেকের সায় নিয়ে নিল। তবুও সে বললো, যখন তুমি ঘোড়া নিয়ে কোথাও যাবে, তোমাকে গ্রামে না পেয়ে তোমার উপর সন্দেহ করবে।

তুমি চিন্তা করো না। আমার কাজ হবে শুধু ঘোড়াটা তাদের হাবেলী থেকে বের করে নিয়ে আসা। আর তাকে যে নিয়ে যাবে সে এখানে হাজির থাকবে।

ঠিক আছে! তুমি যাও। তোমাকে আমার কাছে বসে থাকতে দেখে কেউ সন্দেহ করবে। আমি লাংগলের ফালের সাথে সাথে চাবিও তোমার কাছে পৌঁছিয়ে দেবো।

কিন্তু চাবি কেবল আমাকেই দেবে, আমার বাপুকেও না।

আর পয়সা পাবো কবে?

পয়সা পাবে যেদিন ঘোড়া বের হয়ে যাবে সেদিন।

রাত দুটোয় মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। বাইরের দেয়াল টপকে শের সিং হাবেলীতে প্রবেশ করলো। পা টিপে টিপে ফটকের দিকে যেতে যেতে পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করলো এবং তালা হাতড়াতে লাগলো। এতক্ষণ সে অন্ধকারে হাত চালাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ বিজলী চমকালো এবং সে অবাক হয়ে দেখলো গেটে তালা নেই।

দুদিন আগেও সে একবার ভাগ্য পরীক্ষা করেছিল কিন্তু গেটের ভেতরের দিকে তালা লাগানো ছিল। ফলে তাকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল। আজ হরি সিং কর্মকার ও ডাকাত অমর সিং তাকে পনের বিশটা চাবি দিয়েছে। কিন্তু গেটে তালা ছিল না। সে ভাবলো ঘরের লোকেরা হয়তো তালা লাগাতে ভুলে গেছে। একবার

এদিক ওদিক দেখে নিয়ে আস্তে করে গেট খুলে ফেললো। ভেতরে ঢুকে আবার গেট ভেজিয়ে দিল। তারপর পা টিপে টিপে পশুশালায় প্রবেশ করলো। বিদ্যুৎ চমকে হাবেলীর অন্য প্রান্তে বারান্দায় চারপাইয়ে শায়িত লোকদেরকে দেখলো। কিন্তু ভীষণ জোরে বৃষ্টিপাতের আওয়াজে সেখানে কোনো ব্যক্তি জেগে থাকলেও আঙিনার অন্য প্রান্তে তার চলাফেরার সামান্য শব্দও যে শোনা যাবে না, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত ছিল। তবুও তার দিল কাঁপছিল।

ইতস্ততভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সে পশুশালার দরোজার আড়ালে। নিজের হাতের লাঠিটা রেখে দিল দরোজার গায়ে ঠেস দিয়ে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করলো ঘোড়ার পায়ের জিঞ্জির খোলার চাবি এবং চাবির গোছাটি ওখানেই রেখে দিল।

আর একবার বিজলী চমকাবার পর সে তার চারপাশের অবস্থা ভালো করে দেখে নিয়ে নিজের কাজ শুরু করলো। খোঁটা থেকে ঘোড়ার গলার দড়ি খোলার পর বসে বসে ঘোড়ার পায়ের জিঞ্জির খুলতে লাগলো। অন্ধকারে আঙুল দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে তালার গর্ত তালাশ করলো। তার হৃদস্পন্দন ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছিল এবং হাত কাঁপছিল। বৃষ্টির কারণে মওসুমে যথেষ্ট ভারসাম্য এসে গিয়েছিল তবুও তার গা ঘামছিল। কম্পিত হাতে সে একপায়ের তালা খুলে ফেললো। ঘোড়ার অন্য পাগুলির দিকে হাত নিয়ে যাবার জন্য জমিনে দুই হাঁটু টেক দিয়ে এগিয়ে গেলো। দ্বিতীয় তালাটির গর্ত হাতড়াচ্ছিল এমন সময় ঘোড়া আচানক ঘাড় দোলালো এবং জমিনে জোরে শ্বাস ছুঁড়ে মেরে নাসারন্ধ্র দিয়ে 'খুরর' 'খুরর' ধ্বনি বের করতে লাগলো।

শের সিং ঘোড়ার বগলের রশি নিজের বগলে দাবিয়ে রেখে তার পিঠে ও গর্দানে হাত বুলাতে বুলাতে আবার আগের মতো বসে তালা খোলায় ব্যাপৃত হলো। তালার গর্তে চাবি লাগিয়ে সে ঘোরাচ্ছিল এমন সময় কাছেই সামান্য আওয়াজ অনুভব করলো। সে দ্রুত উঠবার চেষ্টা করলো কিন্তু তার চাদরের একটি প্রান্ত ঘোড়ার পায়ের নিচে দেবে গিয়েছিল। সে ঘোড়াকে পেছনে হটিয়ে তার পায়ের খুরের তলা থেকে নিজের চাদর বের করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কারোর একটি হাত তার গর্দানে এবং অন্য হাতটি বাহু আঁকড়ে ধরেছিল। শের সিংয়ের শরীরের প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু জমাটবদ্ধ হয়ে গেলো। একটি মুহূর্ত এবং তারপর শরীরের সমস্ত চেতনা একত্র করে সে উঠার চেষ্টা করলো। কিন্তু শীঘ্রই অনুভব করলো, এই লৌহ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথম চিন্তা যা তার মাথায় এলো তা ছিল এই যে, আক্রমণকারী আফজাল ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। আক্রমণকারী হঠাৎ তার গর্দান ছেড়ে দিয়ে দুহাত দিয়ে তার দুহাতের কব্জি শক্ত করে ধরে মোচড়াতে মোচড়াতে পিঠের সাথে সেঁটে দিল। শের সিং অনুভব করলো সে আর একটু জোর দিলে তার বাহু দুটি ভেঙে কাঁধ থেকে আলাদা হয়ে যাবে। আক্রমণকারী তার শারীরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের একটি প্রমাণ দেবার জন্য তার কব্জি ছেড়ে দিল এবং

আচমকা তার কোমরে হাত দিয়ে তাকে উপরে উঠালো এবং শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে মাটিতে নিক্ষেপ করলো। সে জমিন থেকে উঠে বসার আগেই আক্রমণকারী তার বুকের উপর চড়ে বসেছিল।

দুরাত ধরেই আমি অপেক্ষা করছিলাম। এখন আর তুমি যেতে পারো না নওজোয়ান। এটা ছিল আফজালের কণ্ঠস্বর। তার মধ্যে ক্রোধ ও অস্থিরতার পরিবর্তে আত্মবিশ্বাসের রেশ ছিল অনেক বেশী। এমন ধরনের আত্মবিশ্বাস যার বদৌলতে একজন পুরুষ বাঘের গলায় দড়ি বাঁধতে পারে।

শের সিং প্রথমবার মুরব্বীদের এই কথার সত্যতা স্বীকার করলো যে, চোরের দিলে কোনো দিল থাকে না। সে অনুভব করছিল যদি আফজালের সামনে সে চোর হিসেবে প্রতিপন্ন না হতো তাহলে তাকে এমন ভিজে বিড়াল হয়ে থাকতো হতো না। নিজের প্রতিরক্ষা শক্তিকে সে এই হাবেলীর চার দেয়ালের বাইরে রেখে এসেছিল। সে এও অনুভব করলো, আফজাল যদি দুরাত থেকে তার আসার প্রতীক্ষায় ওঁৎ পেতে বসে থেকে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তার সমস্ত ব্যবস্থাও সম্পন্ন করে ফেলেছে। কাজেই যে কোনো প্রতিরোধ নিস্ফল হতে বাধ্য। ওদিকে আফজাল যেন তার মনের কথা শুনছিল। সে বললো, যদি পালাবার চেষ্টা করো তাহলে দেখবে আমার হাত খুবই বেরহম। কিন্তু তোমাকে বেশ বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। বলো তো তুমি কে?

শের সিং চুপ মেরে গেলো। আফজাল তার পাগড়ি খুলে নিয়ে দুই পা বেঁধে দিল। তারপর তাকে চিৎ করে দুটি হাত পেছন দিকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো। এ কাজ শেষ করে সে ঘোড়ার দিকে মনোনিবেশ করলো। সে নিচু হয়ে ঘোড়ার পায়ের জিঞ্জীর হাতড়াতে লাগলো তারপর বললো, ওহ্ হো, তুমি তো কম কাবার করে ফেলেছিলে। ভালো, এখন এ জিঞ্জীর তোমার কাজে লাগবে।

আফজাল জিঞ্জীর তুলে নিয়ে তার পায়ে লাগিয়ে দিল এবং তাকে সোজা করে মাটিতে শায়িত করে বললো, দেখো আমি শোরগোল করে ঘরের লোকদেরকে পেরেশান করতে চাই না। সোজাসুজি আমার কথার জবাব দাও। তুমি কোন্ গ্রাম থেকে এসেছো এবং তোমার সাথে কে কে আছে?

শের সিং কোনো জবাব দিল না।

আমি জানি তুমি একা এ পর্যন্ত আসোনি। নিশ্চয়ই আমাদের গ্রামের কেউ তোমাকে পথ দেখিয়েছে। আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু নিজের গ্রামের নমকহারামটাকে কখনোই ছাড়তে পারি না। বলো সে বাইরে কোথায় তোমার অপেক্ষা করছে?

শের সিং তখনও কোনো জবাব দিল না।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকালো। দরোজার পথে প্রবেশ করা বিদ্যুৎ ঝলকে আফজাল দেখতে পেলো শের সিংয়ের চেহারার আবছা প্রতিচ্ছায়া। সে চিৎকার করে উঠলো, শের সিং!

চোর একথায়ও খামুশ রইলো। আফজাল দৌড়ে বাইরে বের হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে সে লণ্ঠন হাতে ফিরে এলো। কয়েক মুহূর্ত নিরবে তাকিয়ে রইলো শের সিংয়ের দিকে। তারপর দেয়ালের গায়ে লণ্ঠনটা ঝুলিয়ে দিয়ে বাথানে একপা রেখে তাকে দেখতে লাগলো গভীরভাবে। শের সিং তৈরি হয়ে গিয়েছিল নিকৃষ্টতম শাস্তির জন্য। কিন্তু আফজালের নিরবতা তার জন্য ছিল সহ্যের অতীত। শেষে আফজাল বললো, হুঁ! তাহলে পরশু তুমিই আমদের দেয়াল টপকেছিলে? যদি আমি দেয়ালের গায়ে লেগে থাকা মাটি এবং নিচে দুদিকে পায়ের দাগ না দেখতাম তাহলে তুমি নিজের উদ্দেশ্যে সফলকাম হয়ে যেতে। সেদিন সম্ভবত গেটে তালা দেখে তুমি বিফল মনোরথ হয়ে চলে গিয়েছিলে। কাল রাতে আমি তালা খুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু কাল তুমি আসোনি। আমি বুঝেছিলাম, চোর এক রাত জাগে এবং এক রাত আরাম করে। আমার বিশ্বাস ছিল, আজ তুমি নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু তোমার প্রতি করুণা হচ্ছে। ঘোড়দৌড়ে হেরে যাওয়া এমন কোনো লজ্জার ব্যাপার ছিল না যে, এজন্য তুমি ঘোড়া চুরি করার কাজে লিপ্ত হবে। তোমার চেহারা চোরদের মতো নয়। আজ যদি তুমি চুরিতে সফল হতে তাহলে আগামীকাল কারোর ঘরে ডাকাতি করতে। এরপর কাউকে হত্যা করতে। তারপর একদিন লোকেরা তোমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে থাকতে দেখতো। শের সিং! তোমার বাপ আমাদের দুশমন কিন্তু তিনি বাহাদুর। আর কোনো বাহাদুর বাপ একথা শোনা পছন্দ করবে না যে তার বেটা চোর।

শব্দের এই মিছরির ছুরি শের সিংয়ের জন্য ছিল অসহনীয়। সে বললো, আফজাল! এখন কথার ছুরি দিয়ে আমার দিল টৌচির করার দরকার নেই। দরোজার পাশে আমার লাঠিটা দাঁড় কারানো আছে, সেটা উঠিয়ে নাও তারপর আমাকে মেরে শেষ করে ফেলে দিলেও পুলিশ তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। আমি তোমার দৃষ্টিতে চোর। তোমার যদি লাঠি উঠাবার হিম্মত না থাকে তাহলে তোমার লোকদের ডাকো। তোমার আওয়াজ শুনে সারা গ্রামের লোক জমা হয়ে যাবে। আমার বাপ এসে যদি আমাকে এ অবস্থায় দেখেন তাহলে তিনিও বলবেন, এ ছেলে আমার মুখে কালি লেপটে দিয়েছে, একে মেরে ফেলো।

আফজাল বললো, আস্তে কথা বলো। বারান্দায় আমার ভাই ও নওকর শুয়ে আছে।

তাহলে তুমি আমাকে তড়পিয়ে তড়পিয়ে মারতে চাও। যদি তুমি তাদেরকে না ডাকো তাহলে আমি ডাকছি।

শের সিং! আমার হাত দেখেছো। আমি সহজে গলা টিপে তোমাকে শেষ করে ফেলতে পারি। আমার মর্জি ছাড়া তোমার আওয়াজ তোমার কণ্ঠ ভেদ করতে পারবে না।

আফজাল এমন গাম্ভীর্য ও আত্মবিশ্বাস সহকারে একথা কটি বললো যে, শের সিং তার সারা শরীরে একটি কম্পন অনুভব করলো।

[illegible] কিছুক্ষণ নিরবে উভয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। আফজাল দ্রুতপদে বাইরে বের হয়ে গেলো। সে ফিরে এলো ঘোড়ার জিন ও লাগাম হাতে করে নিয়ে। ঘোড়ার পিঠে জিনটি বসিয়ে দিল সে নিশ্চিন্তে তারপর মুখে লাগাম পরিয়ে দিয়ে জিনটি কশে বাঁধতে বাঁধতে বললো, শের সিং! তুমি কখনো কাউকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখোনি? আমিও দেখিনি। তবে ভাই সাহেবের সাথে গিয়ে দিলাওয়ার খানের লাশ দেখেছিলাম। ফাঁসির পর তার মুখ থেকে জিব বের হয়ে ঝুলছিল প্রায় এক বিঘত পরিমাণ। তার চোখগুলিও বাইরে বের হয়ে পড়েছিল। সে কি এক বীভৎস দৃশ্য! তওবা, তওবা! জীবনে কখনো আমি ভয় পাইনি। কিন্তু সেদিনকার সে দৃশ্যে আমার শরীরের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল। শুনেছিলাম প্রথমে চুরির অপরাধে সে এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করেছিল। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর সে পুরোদস্তুর ডাকাত হয়ে গিয়েছিল। তারপর একবার সে সাত বছরের শাস্তি ভোগ করেছিল। দ্বিতীয়বার মুক্তি লাভের পর তার সাহস অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এবার সে তিন জনকে হত্যা করেছিল। ফলে তার ফাঁসি হয়েছিল। আফজাল জিন কশে বাঁধার পর ঘোড়ার রশি খুলে তার গলায় জড়িয়ে দিচ্ছিল।

তুমি কি থানায় যাচ্ছো?

না, না, আমি চাই না দিলাওয়ার খানের মতো তোমার গলায়ও একদিন ফাঁসির দড়ি ঝুলুক। আমি তার মা ও বিবিকে কাঁদতে দেখেছি। তোমার মা বাপকেও কাঁদতে দেখতে চাই না। আমার জন্য বেশী সহজ তোমার দুহাত ভেঙে দেয়া, যাতে তুমি আর অন্যের দেয়াল টপকাতে না পারো। কিন্তু আমি শুনেছি, আগামী মাসে তোমার বিয়ে। শের সিং! আমি যদি আজ তোমাকে ছেড়ে দিই তাহলে আবার তুমি চুরি করবে?

শের সিংয়ের নিরবতায় আফজাল মুচকি হেসে তার দিকে তাকিয়ে বললো, আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না? থামো, বলেই আফজাল জিঞ্জির ও পাগড়ির বাঁধন থেকে তার হাত পা মুক্ত করে দিল। শের সিং অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। আফজাল বললো ওঠো!

সে অনিচ্ছাকৃতভাবে উঠে বসলো।

আফজাল আবার বললো, তুমি এই ঘোড়াটির জন্য এসেছিলে? নাও, এটি এখন তোমার। এখন তুমি এর পিঠে সওয়ার হয়ে যাবে। কিন্তু এই শর্তে যে, এটাকে তুমি নিজের কাছে রাখবে কোনো ডাকাতের হাতে দেবে না।

শের সিং নিশ্চিতভাবে ভেবে নিয়েছিল, এবার আফজাল আচানক একটা [illegible] দেবে এবং তার বুকের ওপর চড়ে বসবে।

কিন্তু আফজাল বললো, তুমি হয়তো ভাবছো বাইরে পা দিলেই আমার লোকেরা তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তুমি হয়তো একথাও ভাবছো, আব্বার অনুমতি ছাড়া এঘোড়া আমি তোমাকে দিতে পারি না। তুমি বড়ই বেকুব শের সিং! এ ঘোড়া আমার। আর আমি তোমাদের মতো নওজোয়ানদের ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাবার

জন্য এ ঘোড়া দিতে পারি। আমি বলবো, তোমার কাছে এটা বেচে দিয়েছি। নিজের পাগড়ি মাথায় বেঁধে নিয়ে আমার সাথে সাথে এসো। ভোর হতে আর দেরি নেই। জলদি করো।

শের সিং দ্রুত মাথায় পাগড়ি জড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। আফজাল এক হাতে শের সিংয়ের হাত ধরে এবং অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে বাইরে বের হয়ে এলো। বৃষ্টি আগের মতই মুষলধারে বর্ষিত হচ্ছিল। সমস্ত অংগন পানিতে প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। গেটের কাছে গিয়ে আফজাল তার হাত ছেড়ে দিয়ে বললো, দরোজা খোলো।

একটু ইতস্তত করার পর শের সিং দরোজা খুললো।

গেটের বাইরে এসে আফজাল ঘোড়ার লাগাম শের সিংয়ের হাতে দিয়ে বললো, এবার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে যাও।

বিজলী চমকালো। সেই আলোয় শের সিং আফজালের চেহারা দেখলো। হাসিমাখা মুখ। সেখানে কোনো ছলনার আভাস ছিল না। শের সিংয়ের সন্দেহ দূরীভূত হয়েছিল। সে বললো, আফজাল! সত্যিই কি?

শের সিংয়ের আওয়াজ তার কণ্ঠতালুতেই শুকিয়ে গেলো। সে আফজালের পায়ের ওপর ঝুঁকে পড়লো। সে কাঁদছিল। শিশুর মতো কাঁদছিল। আফজাল! আফজাল! আমাকে মাফ করে দাও। না, না, আমাকে মেরে ফেলো, আমাকে মেরে ফেলো।

আফজাল তার হাত ধরে উঠালো এবং বললো, আমি তোমাকে আগেই মাফ করে দিয়েছি শের সিং এবং এর প্রমাণ স্বরূপ এ ঘোড়া তোমাকে দিচ্ছি।

ভগবানের দোহাই, এ ঘোড়ার নাম নিয়ো না। ইতিপূর্বে আমি মানুষ ছিলাম না। বরং পশুও নই আমি। আমাকে সেই বদমাশটা উস্কানি দিয়েছিল। সে প্রতিদিন আসতো আমার কাছে।

কে সে?

ডাকাত অমর সিং।

কোথায় সে?

আমাদের হাবেলীর দরোজায় দাঁড়িয়ে সে আমার ইন্তিজার করছে।

চলো, আমি তোমার সাথে যাচ্ছি।

না, এটা আমার ও তার ব্যাপার। একথা বলেই শের সিং আফজালের জবাবের অপেক্ষা না করেই দৌড় দিল।

আফজাল ঘোড়া আবার আস্তাবলে বেঁধে দিল এবং বৃষ্টি ভেজা কাপড় চোপড় বদল করে চারপাইয়ের ওপর শুয়ে পড়লো। প্রভাতের প্রথম আলো ফুটছিল। তার

ভয়া মতো লেগেছিল। এমন সময় গ্রামের অন্য প্রান্তে লোকদের শোরগোল শুনতে পেলো। সে দ্রুত উঠলো এবং হাবেলীর বাইরে বের হয়ে এলো। এখন অনেক লোকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। যখন শের সিংয়ের হাবেলীর কাছে পৌঁছলো, সে দেখতে পেলো চৌধুরী রমজান ফিরে আসছে।

আফজাল জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে চৌধুরী?

রফা রফা হয়ে গেছে।

কার দফারফা হয়ে গেছে? ব্যাপার কি? শুনি না।

আফজাল! কি আর বলবো, ইন্দার সিংয়ের ছেলে শের সিং কি দুঃসাহসিক কাজটাই করেছে!

আরে চাচা! খুলে বলো না ঘটনাটা কি?

তুমি নদীর ওপারের অমর সিং ডাকুর নাম শুনে থাকবে।

হ্যাঁ, বলো না কি হয়েছে?

শের সিং তার দুটি বাহু ভেঙে দিয়েছে।

সত্যি!

আল্লাহর কসম! শের সিং একজন বীর পুরুষ। সে অমর সিংয়ের বাহু কিভাবে ভেঙেছে জানো?

কিভাবে ভেঙেছে?

মুচড়ে মুচড়ে। লোকেরা বহু চেষ্টা করে তাকে থামিয়েছে নয়তো তাকে জানে মেরেই ফেলছিল। কিছুদিন থেকে সে ইন্দার সিংয়ের বাড়ির আশপাশে ঘুর ঘুর করছিল। আমার ভয় হচ্ছিল, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু এখন আর সে এ গ্রামমুখো হবে না।

রমজান ও আফজাল কথা বলছিল এমন সময় শের সিংয়ের হাবেলী থেকে আবার শোরগোলের আওয়াজ শোনা গেলো।

আফজাল বললো, আবার কি হচ্ছে?

এখন লোকেরা এমনিই শোরগোল করছে।

না, সম্ভবত কাউকে মারধর করা হচ্ছে।

না, দেখছো না সেখানে হাসাহাসি হচ্ছে। চলো, বৃষ্টিতে আমার সর্দি লেগে যাচ্ছে।

আফজাল ও রমজান সেখান থেকে চলে আসছিল এমন সময় কাকু ঈসায়ীকে আসতে দেখা গেলো। সে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল।

কি ব্যাপার কাকু? আফজাল জিজ্ঞেস করলো।

চৌধুরী জী! আজ বড়ই মজার ব্যাপার ঘটেছে। শালা হরি সিংও মনে রাখবে অনেক দিন।

আরে ঘটনাটা কি, বলেই ফেলো না?

শের সিং মাথায় গুণে গুণে বিশ জুতা মেরেছে।

আরে এ আবার কেন?

জানি না, তার কিসমতটাই এমনি। লোকেরা ইন্দার সিংয়ের হাবেলীতে জমায়েত হচ্ছিল। সেও সেখানে হাজির হয়ে গিয়েছিল। তার চেহারা দেখতেই শের সিংয়ের চোখ দুটি ক্রোধে লাল হয়ে উঠলো। সে বললো, হরিয়া এসো তোমাকে বিশ রুপেয়া দিচ্ছি। একথা বলেই পায়ের জুতো খুলে নিল এবং চুলের মুঠি ধরে কাদার মধ্যে বসিয়ে দিল। সে অনেক চিল্লা চিল্লী করলো। লোকেরাও ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু শের সিং কোনো কথাই শুনলো না। বিশ জুতা লাগিয়ে তবেই দম নিল। আর খোদার কসম! বৃষ্টি ও কাদার কারণে তার জুতার ওজন দুসেরের কম ছিল না।

আফজালদের হাবেলীতে যা কিছু ঘটেছিল কেবল দুজন ছাড়া আর কেউ তা জানতো না। কিন্তু শের সিংয়ের হাতে দুর্ধর্ষ ডাকাতের মার খাওয়া এবং হরি সিংয়ের মাথায় জুতার বাড়ি গ্রামবাসীদের জন্য কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না। এ ঘটনার পর ভগতরামের দোকানে বা চৌধুরী রহমত আলীর হাবেলীর সামনে বট গাছটির নিচে লোকদের আড্ডা জমে উঠতো এবং সেখানে এ ঘটনাগুলি নিয়ে রসালো মন্তব্য ও আলোচনা চলতো। কেউ মুক্ত অংগনে চাদর বিছিয়ে বসে পড়তো, আবার কেউ নিজের চারপাইটি উঠিয়ে আনতো। শীতকালে এ ধরনের মজলিস জমে উঠতো সাঁই আল্লা রাখ্খার দহলিজে। গ্রামের যে কোনো মজলিস ইসমাঈল ছাড়া ফিকে হয়ে যেতো। সে চুপ মেরে গেলে লোকেরা ভাবতো এবার নিশ্চয়ই তার মাথায় নতুন কোনো ফিকির আসছে এবং তারপর যখন সে কারোর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে মুচকি হাসতো তখন মনে করা হতো এবার কারোর ভরাডুবি হবে। এদিকে তার ঠোঁট নড়ে উঠতো এবং ওদিকে লোকদের অট্টহাসি শুরু হয়ে যেতো। লছমন সিং কানে কিছুটা কম শুনতো। সাধারণত সে ইসমাঈলের কাছে বসতো। এরপরও যখন ইসমাঈলের আওয়াজ তার কানে পৌঁছুতো না তখনো অট্টহাসি লাগাবার ক্ষেত্রে সে কিন্তু পিছিয়ে থাকতো না লোকেরা খামুশ হয়ে গেলে কারোর কানে কানে বলতো সে, কি বললো ইসমাঈল? লোকেরা উচ্চস্বরে তাকে বুঝাতো এবং তখন সে দ্বিতীয়বার অট্টহাসি দিতো।

ইসমাঈল ছিল সারা গ্রামের জন্য আনন্দ হাসি উল্লাসের একটি সতত প্রবহমান ঝরণা ধারা। কিন্তু চৌধুরী রমজানের তার বিরুদ্ধে ছিল অনেক অভিযোগ। ইসমাঈল যখন ব্যাংগ বিদ্রুপের আর কোনো সূত্র পেতো না তখন রমজান চৌধুরীকে নিয়ে পড়তো। এহেন অবস্থায় রমজান চৌধুরী খুবই হুশিয়ারীর সাথে বিজ্ঞতা প্রসূত কথা বলতো। কিন্তু তার মুখ থেকে যে কোনো কথাই বের হোক না কেন ইসমাঈল তাকে ঘুরিয়ে লোকদের অট্টহাসির বিষয়ে পরিণত করতো। চৌধুরী

রমজান অর্টহাসিন মনে মনে স্থির করেছিল সে ইসমাঈলের ধারে কাছে বসবে না। কিন্তু লোকদের অট্টহাসি তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিতো এবং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘর থেকে বের হয়ে সে মহফিলে শামিল হতো। কখনো ঘরের দাওয়ায় বসে হুকায় টান দিয়ে সে মনের রাজ্যে বিপুল প্রশান্তি অনুভব করতে চাইতো কিন্তু লোকেরা রাতের মহফিলে তার অভাব অনুভব করতো এবং কেউ না কেউ তাকে ডাকতে আসতো।

আজ যদি মুষলধারে বৃষ্টি না হতো তাহলে নিশ্চিতভাবেই গ্রামের বয়োবৃদ্ধরা প্রাচীন বটগাছটির নিচে আড্ডা জমিয়ে বসতো এবং ইসমাঈল নিজের বিশেষ ভঙ্গিতে মাথায় শের সিংয়ের বিশ ঘা জুতা মারার কারণ নির্ণয় করে ফেলতো। রমজান ও কাকু কোনো না কোনো বাহানায় হরিসিংকে উঠিয়ে মহফিলে নিয়ে আসতো। কিন্তু বৃষ্টির কারণে তা সম্ভব হলো না। সকালের দিকে এর প্রকোপ কিছুটা কম ছিল কিন্তু বিকালে আবার বেড়ে গেছে। গ্রামের একটি বিলের পানি বট গাছের নিচে মাটির বেদীমূলে পৌঁছে গেছে এবং অন্য ঝিলটির পানি ঈসায়ী পাড়ার বাড়িঘর ছুঁই ছুঁই করছে। চৌধুরী রমজানের গৃহের আঙিনায় বর্ষার পানি থই থই করছে। তার হাবেলীর একটি দেয়াল পড়ে গেছে এবং তার নিচে চাপা পড়েছে তার একটি মোষ। সে চিৎকার করে বলছিল, লছমন সিং ও তার সাথি পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে দেয়াল ফেলে দিয়ে গেছে।

লোকেরা যার যার ঘর-ক্ষেতের চিন্তায় পেরেশান ছিল। তাই তারা সবাই এক জায়গায় জমা হয়ে তরতাজা ঘটনাবলীর ওপর ইসমাঈলের সরস মন্তব্য শুনতে পারলো না।

মাত্র আট দশ জন সমবেত হয়েছিল ইসমাঈলের চারপাশে পশু হাবেলীর বারান্দায়। সেখানেই তারা আড্ডা জমিয়ে তুলেছিল। বৃষ্টির গতির সাথে সাথে সয়লাবের আশংকা বেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ইসমাঈল তার পূর্ব অভ্যাস অনুযায়ী অট্টহাস্য করছিল। আজ তার সাথে সাথে আফজালও হাসছিল। কিন্তু তার হাসির কারণ ছিল ভিন্ন।

চৌধুরী রহমত আলী ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ির দেউড়ি থেকে বের হয়ে বারান্দায় এলেন এবং বললেন, তোমরা এখানে কি করছো? সয়লাবের পানি যদি ফসলের ক্ষেতে প্রবেশ করে তাহলে ভূট্টা ও মাস কলাইয়ের ফসল বরবাদ হয়ে যাবে। যাও কেউ নালার বাঁধটি ভেঙে দিয়েছে কি না গিয়ে দেখো।

গোলাম হায়দর বললো, আমি এখনি চক্কর দিয়ে এসেছি।

চৌধুরী রমজান শোরগোল করতে করতে হাবেলীতে প্রবেশ করলো। আঙিনায় পা পিছলে সে পড়লো কাদার মধ্যে। তার জামা কাপড়ে শরীরে কাদা লেপটে গেলো। ইসমাঈল অট্টহাসি দিল এবং বাকি সবাই তার অনুসরণ করলো।

চৌধুরী রহমত আলী তাদেরকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা বড়ই নির্লজ্জ বেশরম হয়ে গেছো। বড়দের প্রতি সামান্য সম্মান দেখাতেও ভুলে গেছো।

চৌধুরী রমজান উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো, চৌধুরীজী! এরা এখানে বসে বসে দাঁত বের করছে আর ওদিকে ইন্দার সিং তার গ্রামের সমস্ত লোককে সাথে নিয়ে নালার বাঁধ ভাঙতে যাচ্ছে। আমি তাদের কথাবার্তা শুনেছি। তারা লড়াই করার প্রস্তুতি নিয়ে গেছে। তাদের সাথে অন্য গ্রামের ছসাত জন বদমাশও আছে চৌধুরীজী! তাদেরকে যদি আজ বাধা না দেয়া হয় তাহলে আপনার আমার ফসলও নষ্ট হয়ে যাবে।

রহমত আলী বললেন, আচ্ছা তাহলে ইন্দার সিং তার শয়তানী খাসলত ত্যাগ করবে না। গত বছর সে তার জমি রক্ষার জন্য বাঁধ দেয়নি। এখন বন্যার পানি এসে গেছে, তাই সে নিজের ফসলের সাথে সাথে আমাদের ফসলও বরবাদ করতে চায়।

সে মনে করে, আপনাদের বাঁধ ভেঙে দেয়া হলে তাদের ক্ষেতের দিকে নালার পানির স্রোত কমে যাবে। আজ গ্রামের সমস্ত শিখ তার পক্ষে চলে গেছে এবং তারা সবাই শরাব পান করে মাতাল হয়ে পথে নেমেছে। তাদের সাথে আছে লাঠি, বর্শা এবং সম্ভবত পিস্তলও।

আমরা কয়েকবার তাদের বাহাদুরী দেখেছি। গোলাম হায়দর! যাও, নূর মোহাম্মদ ও আলী মোহাম্মদকে খবর দাও।......... আর ইসমাইল! তুমি যাও, বাকি সবাইকে ডেকে আনো। নূর মোহাম্মদ ও আলী মোহাম্মদ ছিল চৌধুরী রহমত আলীর ছোট ভাই। তাদের হাবেলী ও বাসগৃহ ছিল গ্রামের বাইরে। নূর মোহাম্মদের পাঁচ ও আলী মোহাম্মদের তিন ছেলে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চৌধুরী রহমতের হাবেলীতে পঁচিশ জন লোক সমবেত হলো।

এ ধরনের ব্যাপারে চৌধুরী রমজান আবার বেশী বাড়িয়ে বলে থাকে কিন্তু ইন্দার সিংয়ের গ্রাম থেকে আগত কয়েকজনের কাছ থেকে খবর নিয়ে তার কথার সত্যতাই প্রমাণিত হলো। ইন্দার সিংয়ের নিয়ত যে আজ ভালো নয় সে কথা তারাও বললো।

গ্রামের বাইরে বর্ষার পানি নিষ্কাষণ পথের কিনারে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল উভয় দল। তাদের হাতে ছিল কোদাল, লাঠি ও সড়কি বল্লম। আপোশের কথাবার্তা খতম হয়ে গিয়েছিল। ইন্দার সিং বাঁধ ভাঙার জন্য জিদ ধরেছিল।

গ্রামের মাত্র পাঁচ ছয়জন শিখ চৌধুরী রহমত আলীর পক্ষ অবলম্বন করার কথা ঘোষণা করেছিল, বাকি সবাই ইন্দার সিংয়ের সাথে যোগ দিয়েছিল। পাশের গ্রামের ছ'জন যুবকও তার সাথে ছিল। কিন্তু ইন্দার সিংয়ের বেটা শের সিং, যাকে সে দীর্ঘকাল থেকে এ দিনটির জন্য তৈরি করে আসছিল, কোথাও অদৃশ্য হয়ে

দিয়েছিল। তার সাথিরা অন্যদিকে আফজালকে দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছিল এবং ইন্দার সিং বাহিনীকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিল যে, আফজালের জন্য শের সিং যথেষ্ট, আর শের সিং এই এখনি এসে পড়বে।

লাঠিযুদ্ধে চৌধুরী রমজান সবচেয়ে অগ্রবর্তী হয়ে অংশ নিয়েছে কিন্তু উভয় পক্ষ যখন নিজ নিজ শক্তির প্রদর্শনীতে নেমে আসার জন্য অস্থির হতে থাকলো তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে সে নালার কিনারে এবং ক্ষেত ও ঝোপঝাড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিল।

উভয় পক্ষের মধ্যে দুরত্ব কমে আসছিল। পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি চলছিল। আচানক ঝোপের অন্তরাল থেকে শের সিংয়ের অভ্যুদয় হলো। উভয় দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে হুংকার দিল ঃ 'থামো! এ লড়াই হবে না।'

এক মুহূর্তের জন্য সবাই থ বনে গেলো।

শের সিং নিজের বাপের দিকে তাকিয়ে বললো, বাবা! আমি ঘরেই আপনাকে মানা করেছিলাম। আপনি যখন আমার কথা শুনলেন না তখন লোকদের আসার আগেই বাঁধের হেফাজতের জন্য আমি নিজেই এখানে এসে গেছি।

ইন্দার সিংয়ের দ্বিতীয় ছেলে চিৎকার করে উঠলো, বাবা! শের সিংয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

গতকাল পর্যন্ত আমার মাথা খারাপই ছিল, কিন্তু আজ নয়। তুমি আমার দুধভাই কিন্তু আফজাল আমার ধর্মের ভাই। আফজালকে তাক করে যে লাঠি ওঠানো হবে তা আমি নিজের মাথার ওপর রুখে দেবো।

বছরের পর বছর গ্রামে কেউ শের সিং ও আফজালকে পরস্পর খোলামেলা কথা বলতে দেখেনি। তাই সবাই অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

ইন্দার সিং রাগে কাঁপতে কাঁপতে এবং গালাগালি দিতে দিতে এগিয়ে এলো। দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে শের সিংয়ের ওপর লাঠি চালিয়ে দিল। লাঠি পড়লো তার মাথার ওপর। কিন্তু সে পাহাড়ের মতো অটল। ইন্দার সিং দ্বিতীয় বার লাঠি উঠালো কিন্তু ততক্ষণ আফজাল দৌড়ে এসে তার হাত ধরে ফেলালো। তার লৌহ কঠিন হাতের মধ্যে ইন্দার সিং অসহায় হয়ে গেলো।

শের সিং বললো, আফজাল! ইনি আমার বাবা, তুমি তার হাত ধরো না। তাকে তার ঝাল মিটিয়ে নিতে দাও। ছেড়ে দাও আফজাল! বাপের লাঠির আঘাতে ছেলে মরে না।

কিছুটা ইতস্তত করার পর আফজাল ইন্দার সিংয়ের হাত ছেড়ে দিল। ইন্দার সিং দ্বিতীয় বার লাঠি উঠালো। কিন্তু তার সারা শরীর কাঁপছিল। শের সিং পাগড়ি নামিয়ে তার সামনে মাথা পেতে দিল। বাপের হাত থেকে লাঠি পড়ে গেলো। এক মুহূর্ত এদিক ওদিক তাকাবার পর ইন্দার সিং নিজের গ্রামের দিকে চলতে লাগলো হন হন করে। প্রতি পদক্ষেপে তার গতি বেড়ে যাচ্ছিল। শেষে সে দৌড়াতে লাগলো। ইন্দার সিংয়ের দুই ছোট ছেলে চোখ মুছতে মুছতে বাপের পেছনে দৌড়াতে লাগলো।

আফজাল বললো, শের সিং! যাও তোমার বাপকে গিয়ে সান্ত্বনা দাও।

শের সিং পাগড়িটা মাথার ওপর পরে নিয়ে নিরবে গ্রামের পথে হাঁটা দিল। ইন্দার সিংয়ের সমর্থনে যারা লড়তে এসেছিল তারা বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলো।

চৌধুরী রহমত আলী সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, দেখো ভাই! আল্লাহর ইচ্ছা নয় আমরা পরস্পর লড়াই করি। এর মধ্যেই রয়েছে সবার কল্যাণ। গত বছর আমরা বাঁধ বেঁধেছিলাম। তোমরা আরামে ঘরে বসেছিলে। এখন যদি তোমাদের ক্ষেতে পানি ঢুকে থাকে তাহলে এজন্য আমরা দায়ী নই। এখন বাঁধ ভেঙে দিলে অবশ্যই আমাদের ক্ষতি হবে। আমরা চাই আমাদের ক্ষতি না হোক এবং তোমরাও বেঁচে যাও। বর্তমানে এখানে আমরা ষাট জনেরও বেশী লোক উপস্থিত আছি। তোমরা সবাই মিলে যদি হিম্মত করো তাহলে তোমাদের ক্ষেতের ফসল বাঁচানো কঠিন হবে না। আমরা সবাই তোমাদের সাহায্য করবো। এখনি বাঁধ বেঁধে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ক্ষেতের পানি নেমে যাবে এবং ফসল রক্ষা পাবে। তোমরা কাজ করো, আমি গ্রামে গিয়ে বাকি লোকদেরকেও ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসছি।

লোকেরা অবাক হয়ে ভাবছিল একথা আগেই তাদেরকে বলা হলো না কেন? কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেলো তারা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে বাঁধ তৈরি করে চলেছে। পাশের গ্রামের যে ছজন লোক লড়াই করার জন্য ইন্দার সিংয়ের পক্ষে যোগ দিয়েছিল তারাও দৌড়ে নিজেদের গ্রামে গিয়ে তিরিশ চল্লিশ জন লোককে সাথে করে আনলো। সন্ধ্যার কিছু আগে বাঁধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টিও থেমে গিয়েছিল। কিন্তু এ অন্তরবর্তীকালে চৌধুরী রমজানের কোনো খোঁজখবর ছিল না। বাঁধ নির্মাণ শেষ হবার পর লোকেরা আর একটা কাজ পেয়ে গেলো। একজন পানি ভরা ক্ষেতের মধ্যে একটি মাছ ভাসতে দেখলো। সে হই চই শুরু করে দিল। লোকেরা লাঠি নিয়ে মাছের পিছনে ধাওয়া করলো। মাছটা ছিল বেশ বড়সড়। পানির গভীরতাও ছিল অনেক কম। লোকেরা চিৎকার করতে থাকলো, ধরো, ধরো, ঘিরে ফেলো, গভীর পানিতে যেতে দিয়ো না, মেরে ফেলো। শেষ পর্যন্ত লাঠির ঘায়ে নিস্তেজ করে দিয়ে লোকেরা মাছটাকে ধরে ফেললো।

এখন মাছটা কে নেবে এ সিদ্ধান্ত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর সবাই ফায়সালা করার ভার দিল ইসমাঈলকে।

ইসমাঈল বললো, দেখো ভাই! তোমাদের কেউ যদি বলতে পারে চৌধুরী রমজান এখন কোথায় আছে তাহলে এ মাছটি হবে তার প্রাপ্য।

আসলে কেউ জানতো না চৌধুরী রমজান এখন কোথায়। লোকেরা তার ব্যাপারে আন্দাজে অনেক কথা বললো। কিন্তু ইসমাঈল সবার দাবী নাকচ করে দিল।

শেষে লছমন সিং বললো, দেখো ইসমাঈল! আমরা জানি তুমি এ মাছ ছাড়বে না, আচ্ছা তুমিই বলো চৌধুরী রমজান এখন কোথায়?

ইসমাঈল হাসতে হাসতে বললো, আমরা যখন লড়াই করার জন্য তৈরি হয়ে নিয়েছিলাম তখন সে এখান থেকে সটকে ঝিলের উঁচু পাড়ের পেছনে গিয়ে লুকিয়েছিল। যখন ইন্দার সিং শের সিংয়ের ওপর লাঠি চালালো তখন সে মনে করেছিল লড়াই এবার শুরু হয়ে গেছে। ফলে ঝোপ ঝাড়ের আড়াল নিয়ে আখের ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল সে। তারপর সেখান থেকে এগিয়ে আমাদের ভুট্টা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে লাল সিংজীর আখের ক্ষেত অতিক্রম করে নিজের বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু ততক্ষণ আব্বাজী বাঁধ বাঁধার জন্য গ্রামে ঢুকে বাকি লোকদেরকেও সংগে করে নিয়ে আসছিলেন। তাদের শোরগোল শুনে সে মনে করলো তারা তাকে পাকড়াও করতে আসছে, সে দ্রুত পেছন দিকে সরে গিয়ে আখের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে গুটি সুঁটি মেরে আবার এগুতে আলী মুহাম্মদ চাচার জোয়ারের ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। ততক্ষণে গ্রামের অন্য লোকেরাও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছিল। চৌধুরী রহমান জোয়ারের ক্ষেতকেও নিজের জন্য সংরক্ষিত মনে না করে, সেখান থেকে পালিয়ে আখের ক্ষেতে ঢুকে পড়েছিল। এখন সে জানতো না সে কোন দিকে যাচ্ছে। পানির নালা পার হয়ে আবার সে এদিকে চলে এলো। তোমরা বাঁধ বাঁধছিলে কিন্তু সে মনে করলো তোমরা লড়াইয়ে নিহতদের লাশ দাফন করছো। সে পেছন ফিরে চললো এবং এখন সে আমাদের আখের ক্ষেতের মধ্যে বসে আছে।

লছমন সিং বললো, কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে, সে তোমাদের আখের ক্ষেতে লুকিয়ে আছে?

ইসমাঈল বললো, আরে ভাই, আমিই তো তাকে সেখানে বসিয়ে রেখে এসেছি।

কখন?

বেশীক্ষণ হয়নি।

গোলাম হায়দর বললো, কিন্তু তুমি তার এতসব দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি জানলে কেমন করে?

আমি সারাদিন তার পেছনে ধাওয়া করেছি। যখনই সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ছিল সংগে সংগেই আমি শোর গোল করে তাকে উঠিয়ে দিচ্ছিলাম। যখনই সে ঝিলের পাড়ের উঁচু জায়গার পেছনে লুকাচ্ছিল তখনই আমি তাকে দেখে ফেলেছিলাম। ঝোপ ঝাড় অতিক্রম করে যখন সে আখের ক্ষেতের মধ্যে ঢুকছিল তখনও আমার দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছিল। তারপর আমি তার পিছু নিয়েছিলাম। তোমাদের বিশ্বাস না হলে গিয়ে দেখে এসো। ঝিলের পাড়ের পেছনে তার লাঠি পড়ে আছে। তার কাছেই ঝোপের কাঁটাগাছের ডালে তার পাগড়ি ঝুলছে। আর আমাদের আখের ক্ষেতে দৌড়াদৌড়ি করার কারণে তার মুখ ও পা ছিলে গেছে।

লছমন সিং বললো, কিন্তু সে কি এখনো সেখানেই বসে আছে?

যদি আমি তাকে ডাকতে না যাই তাহলে কেবল আজই নয় বরং আগামীকালও সারাদিন সে ওখানে বসে থাকবে। তার বিশ্বাস লড়াইয়ে বহু লোক মারা গেছে। পুলিশ এসে গেছে এবং গ্রামে এখন ধর পাকড় হচ্ছে।

লোকেরা উচ্চ কণ্ঠে হাসতে হাসতে চৌধুরী রমজানের খোঁজে বের হয়ে পড়লো। ইসমাঈল মাছ উঠিয়ে নিয়ে বাড়ির পথ ধরলো।

রাতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। চৌধুরী রহমত আলী এশার নামায পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়েছিল এমন সময় দরোজায় দেখলো ইন্দার সিং দাঁড়িয়ে রয়েছে।

চৌধুরী রহমত আলী! আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।

কে? ইন্দার সিং?

হ্যাঁ, চৌধুরী! আমি। এখনি শের সিং আমাকে বলেছে এবং আমি জীবনে এই প্রথমবার মাথা নত করে তোমার কাছে এসেছি।

আর কোনো কথা নয় ইন্দার সিং। দুটি পাত্র এক জায়গায় থাকলেও ঠোকাঠুকি হয় আর আমরা তো মানুষ। হ্যাঁ, শের সিং তোমাকে কি বলেছে?

চৌধুরী, সত্যি বলো তুমি কিছুই জানো না?

কার সম্পর্কে?

গতকালের রাতের ঘটনা সম্পর্কে আফজাল তোমাকে কিছুই বলেনি?

কই না তো, গতকাল রাতের কোনো কথা আফজাল আমাকে বলেনি। কেন, কি হয়েছিল কাল রাতে?

ইন্দার সিং কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু ইত্যবসরে আফজাল মসজিদের দরোজা থেকে বের হয়ে বললো।

আব্বাজী! কাল রাতে শের সিংয়ের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। সে আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে সন্ধি করতে চাচ্ছিল। আমি আপনাকে রাজি করিয়ে নেবো বলে তার কাছে ওয়াদা করেছিলাম।

ইন্দার সিং কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু মসজিদ থেকে কিছু লোক বের হয়ে এসে তাদের কাছে দাঁড়ালো। ইন্দার সিং নিরবে আফজালের দিকে তাকিয়ে রইলো।

রহমত আলী ইন্দার সিং এর কাঁধে হাত রেখে বললো, চলো, আমরা বসি।

ইন্দার সিং কোনো কথা না বলেই তাদের সাথে চলতে লাগলো। বাইরের হাবেলীর ফটক অতিক্রম করতে করতে সে বললো, ভগবানের লীলা বুঝা দায়। গতকালও আমার মনে এ চিন্তা আসতে পারেনি যে, আমি বা আমার বংশের কেউ এ দরোজার কাছে কোথাও পা রাখবে কিন্তু আজ আমি অনাহূতভাবে তোমার কাছে এসে গেছি।

রহমত আলী বললেন, আমার আফসোস হচ্ছে, এমন একটা নেক কাজে আমি নিজে অগ্রবর্তী হলাম না কেন? আমাদের দুজনের চুল সাদা হয়ে গেছে। জীবনের কোনো ভরসা নেই। মানুষ মরে যায় কিন্তু তার কাজ থেকে যায়।

আঙিনায় চারপাই বিছানো ছিল। চৌধুরী রহমত ও ইন্দার সিং একটি চারপাইয়ের ওপর বসে পড়লো। আফজাল তাদের সামনে অন্য খাটের ওপর বসলো। ইন্দার সিং রাতের ঘটনার ব্যাপারে নিজের লজ্জা প্রকাশ করতে এসেছিল। তার বিশ্বাস ছিল আফজাল তার বাপ ও ভাইদেরকে সব ঘটনা বলেছে। কিন্তু রহমত আলী যখন কিছু না জানার কথা বললো এবং আফজাল সব কিছু উপেক্ষা করার চেষ্টা করলো তখন সে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলো যে আফজাল তার পরিবারকে অপদস্থ করবে না। যদি সে তার বাপকেও একথা না বলে থাকে তাহলে আর কাউকেও বলবে না।

শের সিংয়ের শাদীর সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। ইন্দার সিং আশংকা করছিল এ রকমের কথাবার্তা যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে শের সিংয়ের শশুর পক্ষের ওপর এর প্রভাব পড়বে। কিন্তু এখন তার আশংকা দূর হয়ে গিয়েছিল। কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিকতার দৃষ্টিতে সে দেখছিল আফজালকে এবং চাঁদের আলোয় আফজালের চোখের দৃষ্টি তাকে এই মর্মে জানিয়ে দিচ্ছিল, আমি জানি তুমি কি বলতে চাও কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন নেই, এ গোপন কথা আমার মনের কুঠরীতেই লুকানো থাকবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে অন্য চারপাইগুলিও ভরে গেলো। ইসমাঈলও এসে গেলো। সাধারণত এ ধরনের অবস্থায় রহমত আলী নওজোয়ানদের খোলামেলা হাসি তামাশা করার সুযোগ দেবার জন্য উঠে বাড়ির মধ্যে চলে গিয়ে থাকেন। কিন্তু আজ যখন ইসমাঈল এলো তখন তিনি বললেন, ইসমাঈল! ইন্দার সিংকে চৌধুরী রমজানের ঘটনা শোনাও। ইসমাঈল একটু ইতস্তত করলো কিন্তু বাপের কথায় সে বাধ্য হয়ে সেদিনের ঘটনা আবার আনুপূর্বক বর্ণনা করলো। শ্রোতাদের অট্টহাসি আশপাশের বাড়ির লোকদেরকেও সেদিকে আকৃষ্ট করলো। ঘর থেকে বের হয়ে তারা দৌড়ালো [illegible] দিকে।

[illegible] সিং গিয়ে চৌধুরী রমজানকে বের করে আনলো তার ঘর থেকে। কাকু [illegible] ও চৌকিদার পিরানদিতা হরিসিংকে ধরে আনলো।

রহমত আলী বললেন, আফজাল যাও শের সিংকে ডেকে আনো।

বর্ষাকাল হয় কৃষকদের বিশ্রামের দিন। এমনিতেও গ্রামে মিনিট ও সেকেণ্ড ধরে সময়ের হিসাব করা হয় না। ফলে রাতের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত এ মহফিল সরগরম থাকলো। ইসমাঈল প্রথমে চৌধুরী রমজানের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর ওপর বক্তৃতা করলো এবং তারপর এলো হরি সিংয়ের পালা। কেউ ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালে অন্যজন তাকে ধরে সোজা করে বসিয়ে দিয়ে বলতো, আরে বোকা! পালাও কেন, ঘুমুবার জন্য রয়েছে আগামীকাল সারাটা দিন।

শেষে ইসমাঈল বললো, আচ্ছা ভাই, আমিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আর তোমরাও [illegible] হচ্ছো দেখতে পাচ্ছি, এখন তোমরা চৌধুরী রমজানকে বলো তার [illegible] কিসসাটা শুনিয়ে দিক।

চৌধুরী রমজান একথা শুনতেই তার হুকাটা সামলে নিয়ে উঠবার উপক্রম করলো। কিন্তু লছমন সিং তার হাত টেনে ধরলো এবং বললো, না, চৌধুরী সেটি হচ্ছে না, কিসসাটা শুনিয়ে যাও।

রমজান রেগেমেগে বললো, আমার ভীমরতি হয়েছিল তাই এখানে এসে গিয়েছিলাম। আগামীতে আর তোমাদের মহফিলে আসবো না। সে তার হাত ছুটাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু লছমন সিং প্রৌঢ় বয়স্ক হলেও কোনো তুখোড় জোয়ানের চেয়ে কম ছিল না। এ বয়সেও আটখানা রুটি খেতো সে। বাধ্য হয়ে বসে পড়লো চৌধুরী রমজান। কিন্তু লোকদের শত পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও মুরগীর কিসসা শোনাতে রাজি হলো না।

ইসমাঈল বললো, আচ্ছা চৌধুরী! তুমি যদি মুরগীর কিসসা শোনাতে না চাও তাহলে ঠিক আছে তোমার মণ্ডীর কিসসাটা শুনিয়ে দিচ্ছি আমি।

চৌধুরী রমজান মণ্ডীর কিসসা গোপন করার জন্য অনেক বেশী মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিল। সে বললো, আচ্ছা ভাই, শোনাচ্ছি ঃ আমি গুড় জ্বাল দিচ্ছিলাম। জালাল মেশিনে আখ ভরে দিয়ে রস বের করছিল। এমন সময় মুরগীর খোঁয়াড়ে বিল্লি ঢুকে পড়লো। জালালের মা চিল্লাচিল্লী ডাকাডাকি করতে লাগলো।

এ পর্যন্ত বলে রমজান থেমে গেলো। লোকেরা বললো, তারপর কি হলো চৌধুরী?

রমজান একটু ইতস্তত করে বললো, খোঁয়াড়ের মধ্যে মুরগীগুলি চিৎকার ছুটাছুটি ও ঝাপটাঝাপটি করছিল। আমি বিল্লিকে ভয় দেখালাম, কিন্তু সে ভয় পেয়ে এক কোণায় ঘাপটি মেরে বসে পড়েছিল। আমি খোঁয়াড়ের মুখ খুলে তার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম। কিন্তু সেখানে ছিল ঘন অন্ধকার। জালালের মাকে বললাম, লম্ফ আনো। সে লম্ফ আনলো। আমি বললাম তুমি খোঁয়াড়ের মধ্যে লম্ফটা এগিয়ে ধরো, আমি বিল্লিটার কল্লা মটকাই। সে সামনে ঝুঁকে হাত লম্বা করে লম্ফটা আগে বাড়িয়ে দিল।

কাকু হেসে বললো, তারপর কি হলো চৌধুরী?

তারপর তাই হলো যে জন্য তোমরা দাঁত বের করে থাকো। আমি জালালের মাকে বললাম, লম্ফটা আরো সামনের দিকে আনো। সে লম্ফ সামনে আনলো। আমি একটু উপরে নিতে বললাম এবং সে উপরে ধরলো আমার পাগড়ির কাছাকাছি। আমার মন ছিল বিল্লির দিকে আর ওদিকে আমার পাগড়ি জ্বলছিল। খোঁয়াড়ের একদিকে আমার মাথার ছায়া পড়ছিল। আমি জালালের মাকে বললাম, লম্ফ নিচে ধরো। সে নিচে নামিয়ে আনলো, একেবারে আমার দাড়ির নিচে। দাড়ির আগুন আমি হাতের ঝাপটা মেরে নিভিয়ে ফেললাম কিন্তু পাগড়ির আগুনের কথা আমি ততক্ষণ পর্যন্ত জানতে পারিনি যতক্ষণ না সমস্ত খোঁয়াড় ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল। বিল্লি আমার মুখে তার পাঞ্জা মেরে চেহারা রক্তাক্ত করে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি মাথা বাইরে বের করলাম। জালালের

দা দিয়ে উঠলো, ওগো তোমার মাথায় আগুন। সে আমার পাগড়ি উঠিয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিল। পাগড়িটা পা দিয়ে ডলে তার আগুন নিভালাম। আবার [illegible] মধ্যে ভালো করে দেখলাম। বিল্লি আমার দু' মুরগীর ঘাড় মটকে [illegible]। এটা হাসির কথা নয়। কোনো কোনো দিন [illegible] বড়ই অপায়া। [illegible] কলে বেশী আখ ভরে দিয়েছিল ফলে কলটাই ফেটে গিয়েছিল। তারপর [illegible] গিয়ে দেখলাম কড়াইতে সমস্ত গুড় পুড়ে গিয়ে একেবারে কালো হয়ে [illegible]।

হাসির রোলে পুরো মহফিল গমগম করে উঠলো। হাসিতে অনেকে লুটোপুটি খাচ্ছিল। চৌধুরী রমজান উঠে দাঁড়িয়ে কাউকে ঠেলে ডিঙিয়ে একদৌড়ে নিজের বাড়িতে ঢুকে তবে দম নিল।

রমজানের চলে যাবার পর ইসমাঈল ইন্দার সিংকে সম্বোধন করে বললো, চাচা! [illegible] একটি কথা শুনুন। চৌধুরী রমজানের ঘোড়ার বাচ্চা হলো। সে চাইলো, তার [illegible] পর্যন্ত এ বাচ্চা যেন সওয়ারির যোগ্য হয়ে যায়। তার পিঠে চড়ে সে বিয়ে করতে যাবে। কাজেই ঘরের লোকদের থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সে তাকে মোষের দুধ [illegible] লাগলো। ফলে ঘোড়া তাড়াতাড়ি তাগড়া হয়ে গেলো। যখন বিয়ের দিন বরযাত্রী রওনা হলো তাদের সাথে সে তার ঘোড়ায় চড়ে চললো বরবেশে। পথে [illegible] ঘোড়া দৌড়ালাম জোরে। কিন্তু তার ঘোড়ার ওপর ছিল মোষের প্রভাব। [illegible] গরম সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিল না। ফলে শ্বশুরদের গ্রামে যখন আমরা [illegible] তখন দুলহা মিয়াকে নিয়ে তার ঘোড়া গিয়ে নামলো একটা ময়লা [illegible]পূর্ণ পুকুরে।

ইন্দার সিং হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। রাত অনেক হয়েছিল। ইসামাঈলের ঘুম [illegible]। সে উঠে দাঁড়ালো। তার সাথে সাথে লোকেরাও দু একজন করে চলে যেতে [illegible]।

এ মহফিল শেষ হলে ইন্দার সিং উঠতে উঠতে বললো, চৌধুরী রহমত আলী! [illegible] যে কাজের জন্য এসেছিলাম তার কথা আর মনে নেই। এখন ব্যাপার হচ্ছে, আগামী চাঁদের দশ তারিখে শের সিংয়ের বিয়ে। তোমাদের সবাইকে বরযাত্রী [illegible] যেতে হবে। তহশীলদারকেও লিখে দাও। দুদিনের ছুটি নিয়ে যেন আসে।

রহমত আলী বললেন, অবশ্যই যাবো। শের সিংয়ের বিয়েতে আমরা সবাই [illegible]। হ্যাঁ, টাকা পয়সার দরকার হলে কোনো সূদী মহাজনের কাছে যেয়ো না [illegible]। আমিই সব ব্যবস্থা করে দেবো।

চৌধুরী জী! তোমার বড়ই মেহেরবানী। ভগবানের কৃপায় আমি সব ইন্তিজাম [illegible] ফেলেছি। শেঠ রামচাঁদ ঘরে এসে আমাকে আট'শ টাকা দিয়ে গেছে।

রহমত আলী একটু চিন্তিতভাবে বললেন, ভাই, ছেলেদের ওপর ঋণের বোঝা [illegible] চাপানো উচিত। আমি শুনেছি ইতিপূর্বে তুমি রামচাঁদের কাছে দেনদার হয়ে [illegible]।

মামুলী দেনা। পরিশোধ করা কঠিন হবে না চৌধুরীজী। তবে হ্যাঁ, বরযাত্রিদের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।

ঘোড়ার জন্য ভাবতে হবে না। এছাড়া আর কোনো প্রয়োজন হলে বলতে দ্বিধা করো না।

সেলিম, মজিদ, রামলাল ও গোলাপ সিং একসাথে চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। তারা গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরে শহরের হাইস্কুলে ভর্তি হলো। প্রাইমারী স্কুলের গ্রাম থেকে মোহন সিং, মিরাজউদ্দীন ও মাষ্টারের ছেলে আলী আহমদও তাদের সাথে হাইস্কুলে ভর্তি হলো। দাউদ দুবছর আগে প্রাইমারীর পড়া শেষ করে লেখাপড়ায় ইতি টেনেছিল। শহরের একটি কারখানায় সাধারণ মজুর হিসাবে চাকুরী নিয়েছিল সে। জালাল ও বশীর স্কুলের পাঠ সাংগ করে পশু চারণে লেগে গিয়েছিল।

সেলিমদের গ্রাম ও শহরের মাঝখানে আর একটি গ্রামও ছিল। সেখান থেকেও বেশ কিছু ছেলে স্কুলে যেতো। তাদের মধ্যে থেকে দুটি ছেলে বলবন্ত সিং ও মহেন্দর সিং অতি দ্রুত সেলিমের বন্ধু হয়ে গেলো। বলবন্ত সিং সেলিম ও মজিদের সাথে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়তো। আর মহেন্দর সিং ছিল বলবন্তের ছোট ভাই। সে প্রাইমারী সেকশানের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তো। বলবন্ত ও মহেন্দরের বাপ শহরের এক কারখানায় হেড ক্লার্ক ছিল। এ গ্রামে সেলিমের আর একজন সহপাঠী ছিল কুন্দনলাল। তার বাপ রামচাঁদ ছিল এলাকার মশহুর সূদী মহাজন। আশপাশের গ্রামের কৃষকদেরকে সে বিয়ে শাদীতে টাকা ধার দিতো। কৃষকরা তার মহাজনী খাতায় বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে রুপেয়া উধার নিতো এবং ধুমধাম করে নিজেদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে শাদী দিতো। এরপর শেঠ রামচাঁদ তাদের ছেলে মেয়ে ও নাতি নাতনীদের থেকে চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ উসূল করতো। যে বছর বিয়ে শাদী কম হতো সে বছর সে কৃষকদের পরস্পরের সাথে ঝগড়া বিবাদ মারপিট লাগিয়ে দিতো। পুলিশ আসতো এবং মারামারি খুনোখুনিতে লিপ্ত উভয় পক্ষকে গ্রেফতার করে চালান দিতো। শেঠ রামচাঁদ রুপেয়ার থলি নিয়ে গ্রামে পৌঁছে যেতো এবং ঘটনার নাজুকতাকে সামনে রেখে যত টাকা তাদেরকে দিতো রশিদে তার দ্বিগুণ লিখতো। তারপর সে বলতো, দেখো ভাই, দারোগা বড়ই কড়া, আমি এ টাকা নিয়ে তার কাছে যাচ্ছি কিন্তু ভয় হচ্ছে সে আমাকে অপমানিত না করে। লোকেরা তার জন্য দোয়া করতে থাকতো। কারোর নামে দু'শ টাকা লিখলো এক'শ টাকা নিজের কাছে রেখে দিতো এবং এক'শ টাকা দারোগাকে দিয়ে বলতো, দারোগা সাহেব! এই বেচারার কাছে কিছুই ছিল না কিন্তু শুধুমাত্র আপনার খাতিরে আমি তাকে এই এক'শ টাকা কর্জ দিয়েছি। সে আমার আগের কর্জ পরিশোধ করতে পারেনি, এজন্য কোনোদিন আমাকে আপনার সাহায্য নিতে হবে।

জারপর যখন তাদের হাতকড়ি খুলে দেয়া হতো তখন সে কৃষকদেরকে বলতো দেখো ভাই, দারোগাকে কোনোক্রমে মানানো যাচ্ছিল না। দু'শ টাকা সে আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলো। তারপর আমার অনেক অনুনয় বিনয় করার পর কবে ব্যাটা নরোম হলো। এখন টাকা আদায় করার ব্যাপারে গড়িমসি করো না। এভাবে রামচাঁদের পকেট থেকে রুপেয়া বের হতো এক'শ কিন্তু কৃষকের কাছ থেকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের ভিত্তিতে সে আদায় করে নিতো চার'শ রুপেয়া।

দারোগা যদি কোনো ঈমানদার লোক হতো তাহলে রামচাঁদ কৃষকদেরকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে মামলা দায়ের করার পরামর্শ দিতো। ফলে তারা রামচাঁদের কাছ থেকে কর্জ নিয়ে উকিলের পয়সা আদায় করতো। এতসব সত্ত্বেও রামচাঁদের দেবতা তার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত সন্তুষ্ট ছিল এবং তাদেরকে খুশী রাখার জন্য প্রত্যেক রোববার পূঁজা অর্চনার পরে সে পিঁপড়ে ও পোকামাকড়ের গর্তে কয়েক মুঠো করে চিনিও শস্যদানা ঢেলে দিতো।

গ্রাম থেকে স্কুলে যাবার পথে সেলিম তার সাথিদেরকে একটি গল্প শুনাচ্ছিল। গোলাপ সিং ও রামলাল যথারীতি গভীর মনোযোগ সহকারে তার কাহিনী শুনছিল। মজিদের হাতে ছিল রবারের গুলতি। পথ চলতে চলতে সে বিভিন্ন জিনিসের ওপর নিশানাবাজীর কসরত চালাচ্ছিল। একটি গাছে পাখি বসেছিল। মজিদ তার সাথিদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য বললো, আমি এখনি পাখিটিকে মাটিতে ফেলে দিচ্ছি দেখো। কিন্তু গোলাপ সিং ও রামলাল গল্পের মধ্যে এমনই মশগুল হয়ে গিয়েছিল যে, মজিদের আহ্বান তাদের কানেই ঢুকলো না। মজিদ পাখির চিন্তা ত্যাগ করলো এবং দ্রুত তাদের কাছে গিয়ে বললো, সেলিমের গল্প একেবারেই ভুয়া। আমি জানি, সে ঘরে বসেই এসব কাহিনী তৈরি করে।

সেলিম চুপ মেরে গেলো। কিন্তু গোলাপ সিং বললো, তোমার পছন্দ না হলে শুনো না।

আমি শুনতে দেবো না।

আচ্ছা, শুনতে না দিলে আমরা রবিবার তোমার সাথে মাছ ধরতে যাবো না। তোমার সাথে নহরে গোসল করতেও যাবো না। তোমার সাথে খেলবোও না। কি বলো হে রামলাল?

রামলাল মাথা নেড়ে গোলাপ সিংকে সমর্থন দিল, মজিদ নিজের সাথিদেরকে বিদ্রোহ করতে উদ্যত দেখে বললো, ঠিক আছে সেলিম! শুনাও ওদেরকে কাহিনী।

সেলিম রেগেমেগে বললো, না আমি শুনাবো না।

মজিদ বললো, আরে আমি ঠাট্টা করছিলাম। তোমার কাহিনী তো একদম সত্যি।

সত্যি হোক মিথ্যা হোক, আমি শুনাবো না।।

মজিদ, রামলাল ও গোলাপ সিং তাকে বুঝাতে ও তোয়াজ করতে থাকলো। এমন সময় সামনে থেকে কারোর আওয়াজ এলো, সেলিম! সেলিম! আমি কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, জলদি আসবে তো!

এটা ছিল পাটওয়ারীর ছেলে মিরাজ উদ্দীনের কথা। সে যথারীতি এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিল যেখানে তার গ্রাম থেকে শহরে যাবার পাকদণ্ডী তাদের রাস্তার সাথে এসে মিশে যেতো।

এরা নিকটে পৌঁছে গেলে মিরাজ উদ্দীন বললো, আচ্ছা এবার কাহিনী শুরু করো।

মিরাজ উদ্দীনের পীড়াপীড়িতে সেলিম কাহিনী শুনাতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। সে বললো ঃ যখন শাহজাদাকে ক্ষুধার্ত সিংহের খাঁচার মধ্যে ফেলে দেয়া হলো–।

কিন্তু মিরাজ উদ্দীন তার কথায় বাধা দিয়ে বললো, কিন্তু শাহজাদাকে ক্ষুধার্ত সিংহের খাঁচায় ফেলে দেয়া হলো কেন?

একথা আমি এদেরকে বলেছি।

কিন্তু আমি শুনিনি। আমাকে গোড়া থেকে শুনাও।

গোলাপ সিং বললো, না, না, গোড়া থেকে নয়।

এখন গোলাপ সিং ও রামলাল একথা শোনার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল যে, শাহজাদাকে যখন ক্ষুধার্ত সিংহের পিঁজরায় ফেলে দেয়া হলো তখন কি হলো? আর মিরাজ উদ্দীনের জন্য একথা জানা খুব জরুরী হয়ে গেলো যে, বেচারা শাহজাদাকে ক্ষুধার্ত সিংহের খাঁচায় ফেলে দেয়া হলো কেন?

এ বিতর্কের ফলে কাহিনীর ব্যাপারে মজিদের মনেও আগ্রহ জন্মালো। সে বললো, সেলিম শুরু থেকে শুনাও। আমিও শুনবো।

সেলিমকে পুনর্বার শুরু করতে হলো কাহিনী। কিন্তু সে তখনো ক্ষুধার্ত সিংহের খাঁচার কাছে পৌঁছেনি এমন সময় বলবন্ত সিংদের গ্রাম কাছে এসে গেলো। বলবন্ত সিং, মহেন্দর সিং ও কুন্দনলাল পথের ওপর দাঁড়িয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারাও এ কাহিনী শুরু থেকে শোনার জন্য চাপ দিতে লাগলো। এই ছেলেগুলির সাথে সেলিমের বন্ধুত্ব একেবারে আনকোরা। কাজেই তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করা তার জন্য ছিল বড়ই কঠিন। কিন্তু মজিদ বলছিল, না, এমনটি কখনোই হতে পারে না।

বলবন্ত সিং যখন খুব বেশী চাপ দিতে থাকলো তখন গোলাপ সিং তার সাথে লড়তে প্রস্তুত হয়ে গেলো। সে বললো, যাও, সেলিম অন্যগ্রামের ছেলেদেরকে গল্প শুনাবে না।

বলবন্ত সিং ও কুন্দনলাল নারাজ হয়ে চলে গেলো। সবার ছোট ছিল মহেন্দর সিং। কাহিনীর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী আগ্রহ ছিল তার। মুখ বিকৃত করে সেলিমের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। সেলিম ও অন্য ছেলেরা যখন তার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে চলে যেতে থাকলো, তখন সে বই খাতা ব্যাগ একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পথের ওপর বসে পড়লো।

সেলিম এক মুহূর্তের জন্য মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকালো। কিন্তু মজিদ তার হাত ধরে সামনের দিকে টানতে টানতে বললো, চলো সেলিম, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অগত্যা সেলিম অনিচ্ছাকৃতভাবে চলতে থাকলো। বলবন্ত সিং একটি ক্ষেত পার হয়ে পিছন ফিরে দেখলো এবং মহেন্দর সিংকে ডাকলো। কিন্তু মহেন্দর একটুও নড়লো না।

বলবন্ত সিং কয়েকবার ডেকে ডুকে ছোটভাইয়ের পরোয়া না করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। তার ধারণা ছিল তাকে চলে যেতে দেখে মহেন্দর উঠে আসবে। বাকি সবাইও তাই মনে করেছিল। কিন্তু তাদের এ প্রত্যাশা পূর্ণ হলো না। তারা দুটি ক্ষেত পার হয়ে গেলো। কিন্তু মহেন্দর তাদের দিকে তাকাবার প্রয়োজনও অনুভব করলো না।

কৃষ্ণলাল বলবন্ত সিংকে বললো, আরে ইয়ার! তুমি ওকে দুচারটে থাপ্পড় লাগাচ্ছো না কেন?

বলবন্ত সিং এ ধরনের নসিহত কার্যকর করার জন্য সব সময় তৈরি থাকে। সে তখনি বইয়ের ব্যাগ জমিনের ওপর রেখে দৌড়ে মহেন্দরের কাছে গিয়ে তাকে কশে দুটি চড় লাগালো গালে। মহেন্দর সিং আগেই মুখ ফুলিয়ে বসেছিল, এবার মার খেয়ে জমিনে গড়াগড়ি দিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। বলবন্ত সিং হাত ধরে তাকে উঠাতে চাইলো কিন্তু সে জমিনে শুয়ে পড়তে থাকলো। সেলিম তার ব্যাগ কৃষ্ণলালের হাতে দিয়ে দৌড়ে চলে এলো এবং কাছে এসে বললো, বলবন্ত! তুমি অদ্ভুত জালেম। নিজের ছোট ভাইকে মারছো?

বলবন্ত হতাশ স্বরে বললো, একে জিজ্ঞেস করো, কেন বসে পড়লো? আমার স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সেলিম বললো, চলো মহেন্দর! দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মহেন্দর সিং ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো তোমরা যাও আমি যাবো না।

সেলিম তার সামনে জমিনে বসে পড়ে বললো, দেখো মহেন্দর! তুমি আমার ওপর রাগ করেছো?

মহেন্দর তার দিকে তাকিয়ে সরল মনে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো।

আচ্ছা, এখন ওঠো আমি তোমাকে গোড়া থেকে কাহিনী শোনাবো।

মহেন্দর নিজের ভাইয়ের মার ভুলে গেলো। সে জিজ্ঞেস করলো, সব শোনাবে?

হ্যাঁ, সব শোনাবো।

আগামীকালও শোনাবো?

হ্যাঁ, আগামীকালও।

মহেন্দর দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে ব্যাগ তুলে নিল কিন্তু কিছু চিন্তা করে আবার বললো, আমাকে ছাড়াও কি অন্য কাউকে শোনাবে?

না, তোমাকে ছাড়া আর কাউকেও শোনাবো না।

মজিদের চাচাত ভাই এবং একজন তহশীলদারের ছেলে হিসাবে সেলিমকে তার সহপাঠীদের মধ্যে যথেষ্ট মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। তার মেধাশক্তির প্রভাবও ছিল ছেলেদের ওপর। স্কুলে সেই ছিল একমাত্র ছাত্র যে কোনোদিন শিক্ষকের হাতে পিটুনি খায়নি। তাছাড়া সে তার সাথিদেরকে অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী শোনাতো। তার কাহিনী কোনোদিন শেষ হতো না। ছুটির পর অনেক ছেলে কেবল তার কাহিনী শোনার জন্য তাদের গ্রাম পর্যন্ত যেতো। কাহিনী শোনাতে শোনাতে সে থেমে গেলে ছেলেরা অস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করতো, তারপর? তারপর কি হলো সেলিম?

সে জবাব দিতো, বাকি আগামীকাল শোনাবো।

ছেলেরা হতাশ হয়ে চলে যেতো। সেলিম রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাহিনীর বাকি অংশ চিন্তা করে নিতো। পরদিন আবার সে তার দীর্ঘ কাহিনীর নতুন অংশ এমন এক জায়গায় শেষ করতো যেখান থেকে পরবর্তী ঘটনা জানার জন্য শ্রোতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো। সেলিমের এই অস্বাভাবিক যোগ্যতার কথা তার পরিবারের মেয়েরা ও ছোটরাও জানতো। কিন্তু একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটে গেলো যার ফলে পরিবারের মুরব্বীরাও অনুভব করতে লাগলো যে, এ ছেলে লোকদেরকে পেরেশান করার জন্য অদ্ভুত ও অভিনব কাহিনী উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ক্ষমতা ও দক্ষতার অধিকারী। ঘটনাটি হলো, পাটওয়ারীর ছেলে মিরাজ উদ্দীনকে সেলিম একটি কাহিনী শুনিয়েছিল এবং যথারীতি তাকে একটি অভিনব সংকটের আবর্তে নিক্ষেপ করে বাকিটুকু পরদিন শোনাবে বলে কাহিনীর অংশ শেষ করেছিল। তারপর সেলিম ঘরে চলে এসেছিল এবং মিরাজ উদ্দীন তার বাড়িতে চলে গিয়েছিল। কিন্তু মিরাজ উদ্দীন কাহিনীর ঘটনাবলীর মধ্যে এমনভাবে ডুবে গিয়েছিল যে, তার খেয়াল ছিল না আগামীকাল রবিবার ছুটির দিন এবং তারপর আসছে ঈদের দীর্ঘ ছুটি।

ঈদের দিন সেলিম ছেলেদের সাথে বাইরে খেলা করছিল। তার চাচা এসে বললো, সেলিম ঘরে যাও। ভাবীজান তোমাকে ডাকছেন। সেলিম ঘরে গিয়ে দেখলো, পরিবারের মেয়েদের মধ্যে এক ষাট বছরের বৃদ্ধা বসে আছেন। তার ডাইনে বাঁয়ে বসেছিল আরো দুটি ছেলেমেয়ে। তাদের একজন মিরাজ উদ্দীন এবং অন্যজন একটি অপরিচিতা মেয়ে। তার গৌর বর্ণ ও ধূসর কেশ তাকে মিরাজ উদ্দীনের বোন হিসাবে চিহ্নিত করছিল।

সেলিমের মা সেলিমকে দেখেই বলে উঠলো, নিন মাতাজী, সেলিম এসে গেছে।

বৃদ্ধা বললো, এসো বেটা, এসো! তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

সেলিমের চাচাত বোন আমিনা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। অন্য মেয়েরা এবং মহিলারাও বহু কষ্টে হাসি চেপে রাখছিল। সেলিমের দাদী আমিনাকে ধমক দিয়ে মজলিস থেকে উঠিয়ে দিল। তবুও সে দরোজার আড়ালে দাঁড়িয়ে হি হি করে হাসছিল।

সেলিম দাঁড়িয়ে পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। তার মা বললো, সেলিম! ইনি হচ্ছেন তোমার বন্ধুর দাদী। সামনে এসো, ওঁকে সালাম করো।

সেলিম ইতস্ততভাবে এগিয়ে গেলো। বৃদ্ধা সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে বললো, বসো বেটা, বসো! তোমার জন্য আমি আজ ঈদের দিন নিজের ঘর ছেড়ে তোমাদের বাড়িতে এসেছি। মেয়েরা অতি কষ্টে তাদের হাসি চেপে রাখছিল। সেলিম তার মায়ের দিকে তাকালো। মা তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃদ্ধার পাশে বসিয়ে দিল।।

মিরাজ উদ্দীনের দাদী বললো, বেটা! মিরাজ উদ্দীন গত দুদিন দুরাত থেকে স্বপ্নের মধ্যে বিড় বিড় করে কি যেন বলে। সে আমাকে পেরেশান করে দিয়েছে। আজ ঈদের দিন সে এই শর্তে নতুন কাপড় পরেছে যে, আমি তাকে সেলিমদের বাড়ি নিয়ে যাবো। আর এই সকিনাও দুদিন থেকে আমাকে জ্বালাতন করে মারছে। আমি নিজেও চাচ্ছিলাম ঈদের পরেই যখন স্কুল খুলবে, মিরাজের আব্বাকে পাঠিয়ে তোমাকে আমাদের বাড়িতে ডাকিয়ে নেবো এবং তোমার কাছ থেকে বাকি কাহিনী শুনবো। কিন্তু এই ছেলে মেয়ে দুটো এমনভাবে বিরক্ত করতে থাকলো যে বাধ্য হয়ে আজই তোমাদের বাড়িতে আসতে হলো। হ্যাঁ, বেটা! তাহলে বলো, তার পর কি হলো?

সেলিম এখন চিন্তা করছিল, সে কাহিনী কোথায় শেষ করেছিল। মিরাজ উদ্দীনের দাদী বললো, বেটা! আমি কিন্তু কাহিনীর শেষ না শুনে যাচ্ছি না। হ্যাঁ, বলো বাদশাহ অজগরের পেট থেকে বের হলো কেমন করে?

দরোজার কপাটের পেছনে সেলিমের অন্য চাচাত বোন সুগরা ও তার ছোট বোন রুবাইদাও আমিনার পাশে দাঁড়িয়ে তার অট্টহাসিতে শরীক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের অট্টহাসির তুলনায় বয়স্ক মহিলাদের ঠোঁটের ডগায় মুচকি হাসিই তাকে বেশি পেরেশান করছিল। এ অবস্থার জন্য সে পুরোপুরি দায়ী করতে চাচ্ছিল মিরাজ উদ্দীনকে। সে ফয়সালাও করে ফেলেছিল, নিজের জীবনের এই চরম সংকটটি অতিক্রম করার পর সে আর কোনদিন মিরাজ উদ্দীনকে কাহিনী শোনাবে না। তার পালাবার কোনো পথ ছিল না। তার মা, দাদী ও খান্দানের অন্যান্য মেয়েরা তার পাঁজরে আঙুল ঢুকিয়ে তাকে উস্কানী দিচ্ছিল। দুদিন খেলাধুলায় মত্ত থাকার কারণে কাহিনীর নতুন অংশ তৈরি করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদি কেবল মিরাজ উদ্দীনের ব্যাপার হতো তাহলে চিন্তা ও বুদ্ধিশক্তির ওপর জোর না দিয়েও সে অজগরের পেটে

আটক বাদশাহর জন্য কোনো না কোনো পথ বের করে ফেলতো। কিন্তু বৃদ্ধার চেহারার চিন্তাক্লিষ্ট ভাব তাকে জানিয়ে দিচ্ছে, ফেঁসে যাওয়া বাদশাহকে বের করার কোনো অর্থহীন কায়দা কৌশল তার কাছে পছন্দনীয় হবে না।

সেলিমের পেরেশানী আরো বাড়িয়ে দেবার জন্য তার মা বৃদ্ধাকে বলেই দিল, মাজী! সম্ভবত সেলিম কাহিনীর পেছনের অংশ ভুলে গেছে। আপনি সেটুকু স্মরণ করিয়ে দিন।

বৃদ্ধা আশান্বিত কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ বেটা! আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। 'বাদশাহ ভিনদেশের শাহজাদীকে বিয়ে করার জন্য তার অনেকগুলি শর্ত পূরণ করেছিল। এখন কেবলমাত্র একটি শর্ত বাকি ছিল। তাকে পাহাড়ের উপর থেকে সোনার শিংওয়ালা হরিণ ধরে আনতে হবে। বাদশাহ তার সেনাদল নিয়ে কয়েক দিন ধরে সোনার শিংওয়ালা হরিণের পেছনে ধাওয়া করতে থেকেছে। একদিন সেই হরিণ একটি বিরাট পর্বতের গুহায় অদৃশ্য হয়ে গেলো। বাদশাহ ও তার সেনাদল হরিণের পেছনে পেছনে গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো। কিন্তু এটি পাহাড় ছিল না বরং ছিল একটি বিশালকায় অজগর এবং গুহাটি ছিল অজগরের মুখ। বাদশাহ ও তার সেনাদল ভেতরে প্রবেশ করলে অজগর তার মুখ বন্ধ করে নিল।' এরপর কি হলো বেটা?

এখন মেয়েরা সবাই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সেলিমকে দেখছিল।

আমিনা ও সুগরাও তার কাছে এসে বসে গিয়েছিল।

মিরাজ উদ্দীন বললো, দাদীজান! আপনি একথা বলেননি যে, বাদশাহর সেনাদলের সাথে তার হাতি, ঘোড়া ও কুকুরগুলিও অজগরের পেটে চলে গিয়েছিল।

মিরাজ উদ্দীন এ কথা স্মরণ করিয়ে দেবার ফলে সেলিমের সমস্যা আরো বেড়ে গেলো। মানুষ বের করার জন্য পেটের মধ্যে যেমন মামুলি ধরনের একটা সুড়ংগের প্রয়োজন হয় তা হয়তো চাকু ও তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়ে ও কেটেকুটে করা যেতে পারে কিন্তু এখন মানুষের সাথে হাতি ঘোড়াও ফেঁসে গিয়েছিল এবং তাদেরকে বের করার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত পথের প্রয়োজন ছিল।

সমস্যা একাধারে গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক ছিল। এখন মেয়েরা মনে করছিল বৃদ্ধা খামখা আসেনি।

বৃদ্ধা বললো মিরাজ উদ্দীন ও সকিনা যখন আমাকে খুব বেশি বিরক্ত করলো তখন আমি তাদের বাপকে কাহিনীর বাকি অংশ শুনাতে বাধ্য করলাম। কিন্তু সে বললো, সে এ কাহিনী শোনেনি। তবে হ্যাঁ যদি অজগর এত বড় হয়ে থাকে এবং সে মুখ বন্ধ করে নিয়ে থাকে তাহলে বাদশাহ ও তার সেনা সামন্ত অজগরের পেটের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে। কিন্তু সেলিম মিরাজকে বলেছিল অন্যান্য সব বাধা বিপত্তির মতো বাদশাহ এ বাধাও অতিক্রম করে বের হয়ে আসবে। আমি এই বাচ্চাদের নিয়ে মাস্টার সাহেবের বাড়িতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু তিনিও বলছিলেন বাদশাহ মারা যাবে। সেলিমের মা, এতটুকু তো আমিও জানি, শাহজাদীকে বিয়ে

[illegible] আলো বাদশাহ মরতে পারে না। অন্যান্য ছটা শর্ত সে যেভাবে পূর্ণ করেছে [illegible] সপ্তম শর্তও পূর্ণ করবে। কিন্তু বের হবে কেমন করে?

বৃদ্ধা কথা বলছিল আর সেলিম মনোযোগ সহকারে তার মুখের চোয়ালের [illegible] দেখছিল। সে দেখলো তার নিচের মাড়িতে দুটো দাঁত নেই এবং কথা বলার সময় তার জিভের নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে। সেলিম ভাবলো এই ফোকলা মাড়ির [illegible] যদি সে তার আঙুল রেখে দেয় তাহলে হাজার চেষ্টা করেও বৃদ্ধা তাতে কামড় বসাতে পারবে না। বৃদ্ধার অন্য দাঁতগুলিও কথা বলার সময় নড়ছিল। সেলিম ভাবলো, বুড়ো বয়সে দাঁত নড়ে এবং তারপর তা পড়ে যায়। আচানক তার মনে একটা ভাবনার উদয় হলো। সাথে সাথে চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। মাথা তুলে একবার চারদিকে দেখে নিল সে। মজলিসের গুরুগম্ভীর পরিবেশ একথা ঘোষণা করছিল যে, এ রহস্য জাল ভেদ করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে এতে কেবল তার মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হবে না বরং তাদের সমগ্র পরিবারের সম্মান ধূলায় লুণ্ঠিত হবে।

সেলিম বললো, আচ্ছা আমি বাকি কাহিনী শোনাচ্ছি।

বৃদ্ধা বললো, সাবাশ বেটা!

সেলিম সাবাশের মুখাপেক্ষী ছিল না। সে কেবল চাচ্ছিল এদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে। সে বললো, বাদশাহ সোনার সিংওয়ালা হরিণকে ঘেরাও করে ধরে ফেললো ঠিকই কিন্তু তারপরই বুঝতে পারলো সে গুহার পরিবর্তে অজগরের পেটের মধ্যে রয়েছে এবং তার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। তার দাঁতগুলি আমাদের [illegible] ফটকের চাইতেও বড় ছিল। সেগুলি একটার সাথে অন্যটা লেগে গিয়ে, একেবারে সেঁটে গিয়েছিল। কিন্তু অজগর অনেক বুড়ো হয়ে গিয়েছিল এবং তার একটি দাঁত নড়ছিল। বাদশাহ সমস্ত ঘোড়া ও হাতিদের দড়িদড়া জমা করলো এবং সেগুলি পাক দিয়ে একটি মোটা ও মজবুত রশি বানালো। তার এক মাথা দিয়ে বাঁধলো অজগরের নড়বড়ে দাঁতটি এবং অন্য মাথাটির সাথে জুড়ে দিল সমস্ত হাতি ও ঘোড়াকে। দুদিন ধরে তারা 'হেঁইয়ো জোরসে টানো' রব তুলে তৃতীয় দিনে গোড়া থেকে উপড়ে আনলো দাঁতটি। দাঁত সরে যেতেই অজগরের মুখে বিরাট ফাঁক হয়ে গেলো এবং তার মধ্য দিয়ে বাদশাহ তার সমস্ত লোকলস্কর হাতি ঘোড়াসহ বের হয়ে এলো। অজগর এতবড় ছিল যে, এ ব্যাপারে সে কিছু জানতেও পারলো না।

সেলিম এতটুকু বলে বিজয়ীর দৃষ্টিতে তার আশেপাশে একনজর তাকালো এবং উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু বৃদ্ধার এখনো তৃপ্তি হয়নি। সে তার কম্পিত হাতে সেলিমের হাত ধরে বললো, তারপর কি হলো বেটা! আমাকে সমস্ত কাহিনীটা শুনিয়ে তারপর যাও। সেলিম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কথা শেষ করে, দিল ঃ বাদশাহ সোনার সিংওয়ালা হরিণ নিয়ে গেলো শাহজাদীর কাছে। শাহজাদীর সপ্তম শর্তও পূর্ণ হয়েছিল। কাজেই বাদশাহর সাথে তার বিয়ে হয়ে গেলো। ব্যস, আমার কাহিনীও শেষ হলো।

মিরাজ উদ্দীনের দাদী সেলিমদের বাড়ি থেকে বের হবার পর অনুভব করলো তার কষ্ট বৃথা যায়নি। মিরাজ উদ্দীন গর্বভরে বলছিল, দেখলেন দাদীজান! আপনি বলেছিলেন বাদশাহ মারা যাবে।

বৃদ্ধা গর্জে উঠলো, আমি কখন বললাম? আসলে তোমার বাপ ও মাস্টার দুজনই এক নম্বর বুদ্দু।

সন্ধ্যে বেলা সেলিমের মা তাকে বলছিল, সেলিম তুমি বড় দুষ্টু হয়ে গেছো। বড়দেরকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করতে নেই।

সে সরলভাবে বললো, বাহ আমি আবার কাকে নিয়ে ঠাট্টা করলাম?

এদিকে এসো।

সেলিম মার সামনে এসে দাঁড়ালো। মা তার হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করে বললো, সত্যি করে বলো তো, বৃদ্ধা মহিলার ফোকলা দাঁত দেখেই তুমি একথা তৈরি করোনি?

জবাবে সেলিম মাথা নত করে হাসলো।

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের তুলনায় শহরের হাইস্কুলের পরিবেশ সেলিমের জন্য ছিল অনেক ভিন্নতর। এখানে ছাত্রদের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশ। শিক্ষকদের সংখ্যাও বারোজনের বেশি ছিল। কেউ পড়াতো ইংরাজী, কেউ অংক, কেউ সাহিত্য, কেউ বিজ্ঞান, কেউ ভূগোল এবং কেউ আরবী ও ফার্সী। কিন্তু ছাত্রদের কাছে এই শিক্ষকরা ছিল কেবল তিন শ্রেণীর। কম মারধর করে, বেশি মারধর করে এবং খুব বেশি মারধর করে।

সেলিম আগ্রহ সহকারে ছাড়া কোনো কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল না। উর্দু ও ইংরাজী বইতে গল্প ছিল। তাই সাগ্রহে সেগুলি পড়তো সে। ইতিহাস ও ভূগোলের প্রতিও তার আগ্রহ ছিল। কিন্তু শিক্ষকদের বিশেষ ভাষায় প্রশ্নের জবাব মুখস্থ করা ছিল তার কাছে অসহনীয়। অংকের সংখ্যা গণনা এবং জ্যামিতির রেখা অংকনকে সে অপছন্দ করতো। কিন্তু অংকের মাস্টার ছিল বড়ই জালেম এবং দুর্ভাগ্যবশত ছিল আবার সেলিমের আব্বার বন্ধু। অংকের শিক্ষক ক্লাসে ঢুকেই সেলিমকে জিজ্ঞেস করতো, কিহে সেলিম মিয়া! হোম টাস্ক করে এনেছো তো? দুতিন বার বেঞ্চির ওপর উঠে দাঁড়াবার পর সেলিম সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে আগামীতে মাস্টার সাহেবকে কখনো নারাজ করবে না। বাকি সব মাস্টাররাও চাইতো ছেলেরা তাদের প্রতিদিনকার পড়া বাড়ি থেকে মুখস্থ করে আসুক। ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষকরা তাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব বইয়ের বিশেষ ভাষায় শুনতে চাইতো। বিগত কয়েক বছরের শিক্ষকতার অনুশীলনের মাধ্যমে ঐসব বইয়ের বিষয়বস্তু এবং বাক্যগুলিও তাদের মনে গেঁথে গিয়েছিল। ছেলেদেরকে প্রশ্ন করার আগেই তারা নিজেদের ছড়ি হাতের

বুঝিয়ে দিতো। তারপর কোনো ছেলে যদি একটি বা অর্ধেক বাক্য ভুলে যেতো কিংবা একটা শব্দ আগে পিছে করে ফেলতো তাহলে তার দুর্ভাগ্য শুরু হয়ে যেতো। ইংরাজীর মাষ্টার ছিল নরোম দিল। পড়াবার সময় ছাত্রদের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকাবার অভ্যাস তার ছিল না। ফলে ভূগোল ও ইতিহাসের পড়া যারা বাড়ি থেকে তৈরি করে আনতো না তারা ইংরাজী স্যারের পিরিয়ডে বেঞ্চে বসে বসে ভূগোল ও ইতিহাসের পড়া মুখস্থ করতো। অনুরূপভাবে অংকের মাষ্টারের মোকাবিলায় উর্দুর মাষ্টার বেশ নরোম দিল ছিল। ফলে অনেক ছেলে উর্দুর পিরিয়ডে নিজের সতীর্থদের খাতা থেকে অংকের প্রশ্ন নকল করতো। সম্ভবত এ কারণেই ইন্সপেক্টরগণ প্রতি বছর ইতিহাস ও অংকের মাষ্টারদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ততা প্রকাশ করতেন।

স্কুলের ব্যস্ততার পরেও নিজের গ্রামীণ পরিবেশে সেলিমের আগ্রহ কমেনি। স্কুল থেকে ঘরে ফিরেই নিজের ব্যাগ খুলে কিছুক্ষণের মধ্যে হোমটাস্কগুলি করে ফেলতো সে। মজিদ তার খাতা দেখে বিভিন্ন ফলাফল টুকে নিতো। তারপর দুজনে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে গ্রামের বাইরে চলে যেতো। সূর্যাস্তের পর ঘরে ফিরে আসতো তারা। দাদার হুকুম ছিল মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার। নামায শেষ করে এসে খাবার খেতো। তারপর গ্রামের ছেলেদের সাথে বাইরে বের হয়ে যেতো। ক্ষেতের নরোম জমিনে কবাডি খেলতো। কখনো গ্রামের নওজোয়ানরাও চাঁদনী রাতে কবাডি খেলায় মশগুল হয়ে যেতো। বয়স্ক লোকেরাও তা দেখতে আসতো। আফজাল ও শের সিংয়ের বদৌলতে এ গ্রামটি কবাডি খেলায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। কখনো পাশের গ্রামের যুবকরাও খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য আসতো। দর্শকদের দৃষ্টি এ সময় ইসমাঈলের সন্ধানে ফিরতো। ইসমাঈল এসে গেলে চৌধুরী রমজানের সেখানে থাকা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়তো। খেলোয়াড়রা খেলতো কিন্তু বেশিরভাগ দর্শকদের দৃষ্টি থাকতো ইসমাঈলকে ঘিরে। কখনো হাসির ফোয়ারা ছুটলে খেলোয়াড়দের দৃষ্টিও ইসমাঈলের দিকে ফিরতো। এ সময় ছোট ছেলেরা আলাদাভাবে খেলতো। মজিদের পরে সেলিম গ্রামের সর্বোত্তম খেলোয়াড় হিসাবে গণ্য হতো। কবাডি খেলার আগ্রহ ছিল তার অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু ইসমাঈল এসে গেলে খেলার পরিবর্তে হাসির দলে যোগ দেবার জন্য তার কাছে এসে বসে পড়তো সে।

কিছুদিন থেকে ঘরের পরিবেশের প্রতি সেলিমের আগ্রহ অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল। চাচা আফজালের ঘোড়ার বাচ্চাটা এখন বেশ বড়সড় ঘোড়ায় পরিণত হয়েছিল। সেলিম যখন প্রাইমারী স্কুলে পড়তো তখন আফজাল ওয়াদা করেছিল তার ঘোড়া এবার দ্বিতীয় বাচ্চা দিলে সেটি সেলিমের হবে। সওয়ারীর জন্য তাদের আরো ঘোড়াও ছিল কিন্তু এই বাচ্চাটিকে সেলিম ভীষণ ভালোবাসতো। বাড়ির প্রত্যেকটি লোকের হাত ধরে আস্তাবলে নিয়ে যেতো সে এবং বাচ্চাটির

প্রতি ইশারা করে বলতো, দেখো, তার গায়ের রং কেমন, তার চুল কেমন। দেখো আমার আওয়াজ শুনতেই সে কেমন কান খাড়া করেছে। আরবী বংশোদ্ভূত ঘোড়া চেনার ব্যাপারে চৌধুরী রমজানের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। সেলিম বাচ্চার গলার দড়ি ধরে টেনে টেনে নিয়ে যেতো চৌধুরী রমজানের বাড়িতে এবং তাকে বলতো, দেখো তো চাচা! আমার এই ঘোড়া আরবী বংশোদ্ভূত নয় কি? আর চৌধুরী রমজান তার জ্ঞানবত্তার প্রমাণ দেবার জন্য বাচ্চার চারদিকে একটা চক্কর দিতো তারপর ঝুঁকে পড়ে তার ঘাড়ের চুল দেখতো, তার কান নাড়াচাড়া করতো, তার পিঠে দুচারটি থাপ্পড় মারতো এবং সবশেষে নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলতো, হ্যাঁ বেটা এতো আরবী ঘোড়া। আর সেলিম খুশিতে লাফিয়ে উঠতো। ফেরার সময় চৌধুরী রমজান ডাক দিয়ে তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করতো, দেখো বেটা! এ বেশ দ্রুত বড় হচ্ছে। তুমি একে কি খাওয়াচ্ছো?

চাচা, একে ছোলা খাওয়াচ্ছি।

ঠিক আছে, ছোলা ভালো। তবে একে কখনো মোষের দুধ খাওয়াবে না বেটা।

কেন চাচা, মোষের দুধ খাওয়ালে কি হয়?

বড়ই বেইজ্জত হতে হয় বেটা! মেষের দুধ পানকারী ঘোড়া কখনো সওয়ারসহ কাদাপানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বাড়ির মেয়েরা একটা মজার হাসি ঠাট্টার উপকরণ পেয়ে গিয়েছিল। তারা কেবল এতটুকু বললেই হতো, সেলিম! তোমার ঘোড়ার মধ্যে এই খুঁত আছে। আর অমনি সেলিম রেগে মেগে কান্নাকাটি শুরু করে দিতো। একদিন সে স্কুল থেকে এসেছে। বাড়ির কয়েকজন মহিলা চরকায় সুতা কাটছিল। তার চাচী বললো, সেলিম, শুনলাম তোমার ঘোড়ার কান গাধার কানের মতো লম্বা হয়ে যাচ্ছে! বড় হয়ে সে সত্যিই একটা গাধা না হয়ে যায়?

সেলিম ব্যাগ ফেলে দিয়ে সোজা আস্তাবলে চলে গেলো। সে বাচ্চার কান দেখছিল এমন সময় আমিনা তার কাছে গিয়ে হাসতে লাগলো। দাঁড়াও আমিনার বাচ্চা! তোমাকে দেখাচ্ছি হাসি। একথা বলে তাকে করলো তাড়া। আমিনা চিৎকার করতে করতে দাদীর কাছে গিয়ে পৌঁছলো।

সেলিমের চাচী আবার হাসতে হাসতে বললো, কেন সেলিম, তার কান দেখেছো তো? সেলিম কোনো জবাব না দিয়ে তার চরকার সুতা উলটিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বাইরে চলে গেলো।

স্কুলে যাবার আগে সেলিম প্রত্যেক দিন আমিনাকে বলতো, দেখো আমিনা! রাতে যদি আমার কাছে গল্প শুনতে চাও তাহলে আমার ঘোড়ার দিকে নজর রাখবে। আর আমিনা গল্প শোনার লোভে সেলিমের ঘোড়ার খোঁজ খবর নিতো। গামলায় ঘাস কম হয়ে গেলে ঘাস ঢেলে দিতো এবং তার সামনে পানির বালতিতে সব সময় পানি ভরা থাকতো।

এ বাচ্চাটা বাড়ির লোকদেরকে যেমন চিনতো এবং ভালোবাসতো বাইরের লোকজনের প্রতি ঠিক তেমনি উষ্মা প্রকাশ করতো। কোনো অপরিচিত লোক তাকে দেখতে এলে সে তাকে কামড়াতে বা ল্যাং মারতে যেতো। তবুও আফজাল মনে করতো তার এ অভ্যাস ধীরে ধীরে বদলে যাবে।

একদিন সেলিম ও তার সাথিরা স্কুল থেকে আসছিল। গ্রামের কাছাকাছি এসে সে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। দেখা গেলো, আফজাল তার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ক্ষেতের মধ্যে চক্কর কাটছে এবং চৌধুরী রমজান ও আরো কিছু লোক মিলে এ দৃশ্য উপভোগ করছিল।

সেলিম এ দৃশ্য দেখে দৌড়ালো এবং মজিদও দৌড়ালো তার পেছনে পেছনে, আফজালের কাছাকাছি পৌঁছে সেলিম বললো, চাচাজান! চাচাজান!

আফজাল ঘোড়া থামিয়ে সেলিমের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললো, আমি তোমার ঘোড়াকে চালু করে দিয়েছি। যাও, ভাবীজানকে মিষ্টির যোগাড় করতে বলো।

সেলিম এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ার গর্দানে হাত বুলাতে বুলাতে বললো, চাচাজান! আজ আমিও এর পিঠে সওয়ার হবো।

আফজাল ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে নামতে বললো, না, বেটা! এখন নয়, এখনো এ অনেক রুঢ় ও বেয়াড়া প্রকৃতির রয়ে গেছে। আগামী কয়েক দিনেই আমি একে ঠিক করে দেবো। আজতো এ আমাকেও ফেলে দিতে চাচ্ছিল।

চাচাজান! আমি পড়ে যাবো না।

চৌধুরী রমজান বললো, বেটা! আফজাল ঠিকই বলছে। তুমি জিদ করো না।

সেলিম হতাশ হয়ে আফজালের দিকে তাকালো এবং জিজ্ঞেস করলো, চাচাজান! তাহলে কবে পর্যন্ত এ ঘোড়া ঠিক হয়ে যাবে?

পনের বিশ দিনে একেবারে ঠিক হয়ে যাবে। তারপর তুমি এর পিঠে চড়ার অনুমতি পাবে। আচ্ছা বেটা, এখন তুমি একে ঘরে নিয়ে যাও।

সেলিম ঘোড়ার লাগাম হাতে নিল এবং নিজের ব্যাগ মজিদের হাতে দিল।

পথে মজিদ বললো, সেলিম তোমার ঘোড়া আমাকেও চড়তে দেবে?

আমি চাচার কাছ থেকে এজন্যেই নিয়েছি যে, আমরা দুজন এর পিঠে চড়বো। আমরা আর কাউকে চড়তে দেবো না। চাচা আফজাল আমার সাথেও ওয়াদা করেছেন, আগামী বছর যে বাচ্চাটা জন্মাবে সেটা আমাকে দেবেন।

কিন্তু মজিদ! তাকে মোষের দুধ পান করাবে না যেন খবরদার।

পাগল! আমি চৌধুরী রমজান নাকি?

আমি চাচা আফজালকে ভয় করি। নয়তো আজই এর পিঠে সওয়ার হতাম।
না, না, সেলিম! তুমি পড়ে যাবে।
না, এ ঘোড়া আমাকে কোনোদিন ফেলে দেবে না।
আমি তোমাকে আজ এর পিঠে চড়তে দেবো না। তুমি যদি চড়ো তাহলে চাচা আফজাল আমাকে মারবেন।
অবশ্য আমি নিজে আজ এর পিঠে সওয়ার হতে চাই না। নইলে তুমি আমাকে রুখতে পারতে না।
কেন রুখতে পারবো না? আমি অবশ্যই তোমাকে রুখবো।
সত্যিই তুমি মনে করো এ আমাকে ফেলে দেবে?
হ্যাঁ।
তাহলে তুমি এর পিঠে চড়লে তোমাকেও ফেলে দেবে।
এ আমাকে ফেলে দিতে পারে কেমন করে?
সেলিম কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, যদি আমি একে খুব জোরে না ভাগাই তাহলেও এ আমাকে ফেলে দেবে?
মজিদ জবাব দিল, তুমি না ভাগালেও এ দ্রুত ভাগবে। পশুর তো এ জ্ঞান থাকে না যে, তার পিঠে বসে আছে একটি বাচ্চা।
সেলিম রেগেমেগে বললো, আমি বাচ্চা নই।
মজিদ নিশ্চিন্তে জবাব দিল, চাচা আফজাল তোমাকে এজন্যই রুখেছেন যে, তুমি এখনো বাচ্চা, এতবড় ঘোড়ার লাগাম টানতে পারবে না তুমি।
সেলিম কোনো জবাব দিল না এবং মজিদের বিশ্বাস জন্মালো এরপর যদি সে আরো কথা বলে তাহলে সে তার সাথে ঝগড়া করতে উদ্যত হবে। কাজেই সে নিরবে হাঁটতে লাগলো। পানির নালার কিনারে সবুজ ঘাস জন্মেছিল। ঘোড়া মাথা ঝুঁকিয়ে কচি কচি ঘাস চিবুতে লাগলো। নালা পার হবার পর মজিদ কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে সেলিমের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, এসো সেলিম!
সেলিম ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে তাকে নালার মধ্যে নামিয়ে দিল এবং আচানক নালার পাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে তার পিঠে সওয়ার হয়ে গেল।
মজিদ চিৎকার করে উঠলো, বেকুব! তুমি পড়ে যাবে।
ঘোড়া লাফিয়ে বাইরে বের হয়ে পড়লো। কয়েকবার লম্ফ ঝম্ফ দেবার এবং পিছনের ঠ্যাংয়ের ওপর খাড়া হবার পর একদিকে ছুটতে লাগলো। সেলিম তাকে জড়িয়ে ধরে লাগাম টেনে ধরলো। ঘোড়া থেমে গেলো। সেলিম তাকে আবার নালার কাছে নিয়ে এসে বললো, দেখলে মজিদ! আমি বাচ্চা নই। আমার হাত লাগাম টানতে পারে এবং আমি পড়েও যাবো না।
মজিদ কিছু জবাব দেবার আগেই সে ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে তার পেটে জোরে গোড়ালী ঠুকলো। ঘোড়া উর্ধশ্বাসে দৌড়াতে লাগলো এবং চোখের পলকে কয়েকটা ফসলের ক্ষেত পার হয়ে গেলো। আফজাল দূর থেকে তাকে দেখলো। কয়েক

মুহূর্তের জন্য তার পা জমিনে আটকে গেলো। সে চিৎকার করলো, সেলিম! ওকে সাবধান! বেওকুফ, পড়ে যাবে। কিন্তু সেলিম অনেক দূর চলে গিয়েছিল। প্রায় অনেকখানি চলে যাবার পর সেলিম ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে নিল। সেলিমকে সহী সালামতে ফিরে আসতে দেখে আফজালের রাগ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেলিম যখন তার সামনে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরার পরিবর্তে তাকে ডান দিকে ঘুরিয়ে দিল তখন আফজাল পূর্ণশক্তিতে চিৎকার করে উঠলো, 'ঘোড়া বাম দিকে ঘোরাও, সামনে অনেক বড় নালা।' নালা দিয়ে খালের পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। এটি প্রায় ছয় ফুট চওড়া এবং দুই ফুট গভীর ছিল। এর পাড় ছিল একটু উঁচু। তবুও তার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়াকে সেলিম বিপজ্জনক মনে করলো না। চাচা আফজালের ঘোড়াকে সে কয়েকবার এটা ডিঙিয়ে যেতে দেখেছে এবং মজিদের ছোট আকৃতির ঘোড়াটাও লাফিয়ে এটা পার হতো। কাজেই সেলিম ঘোড়ার মুখ ঘোরাবার বা তাকে থামাবার পরিবর্তে তার গতি আরো বাড়িয়ে দিল।

চৌধুরী রমজানের ছেলে জালাল নালায় গোসল করছিল। সে ঘোড়ার আওয়াজ শুনে উঠে দাঁড়ালো এবং দুহাত উপরে তুলে শোরগোল করতে লাগলো। ঘোড়া হঠাৎ ভয় পেয়ে একদিকে ঘুরে গেলো। সেলিম তার নাংগা পিঠে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলো না এবং উছলে উঠে নিচে পড়ে গেলো।

ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়া সেলিমের জন্য ছিল একটা মামুলি ব্যাপার। ঘোড়সওয়ারী করতে গিয়ে এর আগে আরো কয়েকবার পড়ে গিয়েছিল সে ঘোড়ার পিঠ থেকে। তখন প্রত্যেকবার সে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এবার চাচা আফজাল যখন তাকে উঠালো, সে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো। আফজাল সম্ভবত গরম মাথায় তাকে মারধর করতো কিন্তু তার চেহারা দেখে আফজালের রাগ আশঙ্কায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করলো, আঘাত পাওনিতো?

না, চাচাজান! সেলিম তার কনুইয়ে হাত রেখে বললো।

আফজালের এবার রাগ হচ্ছিল। সে তার কথার ধারা পরিবর্তন করে বললো, তুমি সত্যই বেওকুফ!

ঘোড়া কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। চৌধুরী রমজান তাকে ধরার জন্য দৌড়ালো। কিন্তু ঘোড়া তার দিকে একবার তাকিয়েই সামনের দুই পা উঁচু করলো। রমজান ভয় পেয়ে পেছন ফিরে দৌড়াতে লাগলো। আফজাল নিশ্চিন্তে এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরলো এবং তারপর আবার সেলিমের কাছে এসে বললো, নাও আবার এর পিঠে সওয়ার হও।

সেলিম লজ্জায় মাথা হেঁট করলো।

আফজাল বললো, ব্যস একবার পড়ে গিয়েই ভয় পেয়ে গেলে? এখন চড়ছো না কেন? ঘোড়ার মনে এ চিন্তার উদয় হওয়া ঠিক নয় যে, তার সওয়ার বুজদিল।

রাতে সেলিম জানতে পারলো, দাদীআম্মা তার ঘোড়াকে ছোলা না খাওয়াবার জন্য সহিসকে হুকুম দিয়েছে। মা যখন সেলিমের সামনে খাবার এনে রাখলো, সে

মুখ ফিরিয়ে নিল। মা মুচকি হেসে তার দিকে দেখলো এবং ঝুঁকে পড়ে তার কানে কানে বললো, তোমার ঘোড়ার জন্য আমি ছোলা পাঠিয়ে দিয়েছি।

আম্মাজান! দাদী বলছিলেন ঘোড়াটাকে নাকি হাবেলীর বাইরে বের করে দেবেন? মা সান্ত্বনা দিয়ে বললো, না বেটা! হাত ঠিক হয়ে গেলে তাঁর রাগও পড়ে যাবে।

এই এলাকায় পীর বেলায়েত শাহের ছিল বিরাট প্রতিপত্তি। বহু বছর থেকে তার খান্দানে চলে আসছিল পীর মুরিদীর সিলসিলা। বিপুল পরিমাণ জায়গা-জমি, বাগবাগিচা ছিল তার। কিন্তু লোকেরা যে কারণে তার দ্বারা বেশি প্রভাবিত ছিল সেটি ছিল তাদের খান্দানী কবরস্থান। সেখানে সমস্ত কবরই ছিল মর্মর পাথরের। তাদের প্রপিতার মাজারের গম্বুজটি দেখা যেতো পাঁচ মাইল দূর থেকে।

পীর বেলায়েত শাহ চারবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন তবুও পিতার অকালমৃত্যুতে তার রুহানী কাজ কারবার সামলাবার দায়িত্ব বাধ্য হয়ে তাকেই গ্রহণ করতে হয়। নয়তো বিদ্যার অকুল সাগরে তাকে আরো কয়েক বছর সাঁতার কাটতে হতো। এখন পুলসিরাতের উপর দিয়ে মুরিদদেরকে নিরাপদে পার করিয়ে নিয়ে যাওয়া তার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত হয়েছে। পীর বেলায়েত শাহ পূর্ণ যোগ্যতার সাথে তার এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। আদম সন্তানদেরকে আকাশ ও পৃথিবীর মুসিবত থেকে নাজাত দেবার জন্য তাবিজ লিখে চলছিলেন এবং বাকি সময়টা হাসিখুশির মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেবার জন্য দাবা খেলতেন, সিদ্ধি ও গাঁজা খেতেন, কবুতরবাজী করতেন, বিয়ে করতেন এবং বিয়ে করার পর তালাক দিতেন।

তার আট দশটা ঘোড়া, পাঁচ-ছটা খচ্চর ও পনর বিশটা কুত্তা ছিল। বছরে একবার রাজকীয় শান-শওকত সহকারে সফরে বের হতেন। তিরিশ চল্লিশজন পদাতিক ঘোড়সওয়ার শাগরিদ তার সফর সংগী হতো। মুরিদানের সংখ্যা এত বিপুল ও ব্যাপক বিস্তৃত ছিল যে, একদিনে তাকে কয়েক জায়গায় খানা খেতে হতো। একটি ছোট অগ্রগামী দল পূর্বাহ্নেই গিয়ে মুরিদকে জানিয়ে আসতো, আজ হযরত কিবলা তোমার বাড়িতে তাশরীফ রাখবেন।

পীর সাহেবের খাওয়াটা তেমন কোনো বড় মুসিবত ছিল না কিন্তু যার বাড়িতে তিনি এক দুদিন অবস্থান করতেন সে দেউলিয়া হয়ে যেতো। তার ফলন্ত গম ক্ষেতগুলি অশ্বদের চারণভূমিতে পরিণত হতো। তার বাগানের কাঁচাপাকা কলাগুলি পীর সাহেবের শাগরিদদের পেটে চালান হয়ে যেতো। রুখসাতের সময় পীরসাহেব নজরানা উসুল করতেন। আর পীর সাহেবের চেলারা মুরিদের বাড়ি থেকে বাড়তি বাসনপত্র ও কাপড় চোপড় হাতিয়ে নিতো।

পীর সাহেব যখন অন্য গ্রামের দিকে চলতেন তখন মুরিদ কোনো উঁচু টিলায় উঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতো, হে পরওয়ার দিগার! আঁধি আসুক, তুফান আসুক, ভূমিকম্প আসুক, সূর্য সোয়া নেজা পরিমাণে নেমে আসে আসুক কিন্তু পীর বেলায়েত শাহ যেন দ্বিতীয়বার না আসেন।

কিছুদিন থেকে এলাকার সচেতন লোকদের মধ্যে পীর বেলায়েত শাহের ব্যাপারে ব্যাপক অস্থিরতার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এ অস্থিরতার কারণ ছিল, পীর সাহেব একটি জিনগ্রস্ত মেয়েকে জিনের হাত থেকে উদ্ধার করে নিজের হস্তগত করেছেন। তবুও অশিক্ষিত লোকদের একটি বিরাট অংশ পীর বেলায়েত শাহ প্রভাবিত ছিল। একদল সিদ্ধি, গাঁজা ও আফিমখোর সাঁই ও সাধু ধরনের লোক তাকে নিজেদের গুরু বলে থাকে। তারা প্রচার করেছিল, আল্লাহ বেলায়েত শাহের কথায় এমন আছর দিয়েছেন যার ফলে তিনি যাকে বদদোয়া দেন তার গবাদি পশু মারা যায়, শস্য বরবাদ হয়ে যায়, স্ত্রী বন্ধ্যা হয়ে যায় এবং ছেলেমেয়েরা নানান ধরনের রোগে ভুগতে থাকে। [illegible] লোকেরা বেলায়েত শাহকে জিন-ভূত-পেত্নীদের সাথে কথা বলতে দেখেছে। আল্লাহর এই অদ্ভুত ও বিরল প্রজাতির মাখলুক, সাধারণ মানুষ যাদেরকে চোখে দেখে না, তার ইশারায় তারা নাচে। এক জিন তার জন্য প্রতি রাতে নিয়মিত ফল ও মিঠাই নিয়ে আসে। দ্বিতীয় জিন তার বিছানা তৈরি করে এবং তৃতীয় জিন তার পা দাবায়। বেলায়েত শাহ যখন জালালী মুডে থাকেন তখন কোনো ভয়ংকর জিনকে হুকুম দেন, যাও ওমুককে গলা টিপে শেষ করে দিয়ে এসো। সে বিনা বাক্য ব্যয়ে নির্দ্বিধায় হুকুম তামিল করে। যেসব গ্রামে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম সেখানে এই ধরনের [illegible] বেশি ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়।

পুরুষদের তুলনায় গ্রামের মেয়েরাই পীর বেলায়েত শাহের প্রভাব বেশি গ্রহণ করেছিল। পীর সাহেব নানা ধরনের ঝাড়ফুঁক করতেন ও তাবীজ দিতেন। মেয়েদের জন্য সব সময় এগুলির চাহিদা থাকতো। অসুস্থ শিশুদের রোগমুক্তি, জিনগ্রস্ত পুরুষ ও মেয়েদেরকে জিনের হাত থেকে উদ্ধার এবং দ্বিতীয় বিবাহ করতে উদ্যত স্বামীকে সোজা পথে আনার জন্য এই সব ঝাড়ফুঁক ও তাবীজের প্রয়োজন হতো।

সেলিমদের গ্রামের কয়েকজন লোক পীর বেলায়েত শাহের মুরিদ ছিল। এই মুরিদদের অন্যতম ছিল চৌধুরী রমজান। সে মনে প্রাণে তার প্রতি উৎসর্গীত ছিল। তার এই ভক্তি শ্রদ্ধা অনর্থক ছিল না। জিন-ভূতের ভয়ে সব সময় আতংকগ্রস্ত থাকতো সে। এই আতংক দূর করার জন্য পীর সাহেব তাকে তাবীজ দিয়েছিলেন। জিন ভূতের পর সে ভয় করতো পুলিশকে। পুলিশকে তার বাড়ি থেকে দূরে রাখার

জন্য বেলায়েত শাহ তাকে আরেকটি তাবীজ দিয়েছিলেন। এই উভয় তাবীজ সে বেঁধে রাখতো নিজের গলায়।

চৌধুরী রমজানের পীড়াপীড়িতে পীর বেলায়েত শাহ একবার এ গ্রামে এসেছিলেন এবং তারপর দ্বিতীয়বার আর এ গ্রামমুখো হবেন না বলে কসম খেয়েছিলেন। এর কারণ ছিল। এ সময় সেলিমের আব্বা চৌধুরী আলী আকবরও ছুটিতে গ্রামে এসেছিল। বেলায়েত শাহের জানা ছিল না এ গ্রামে আলী আকবরের সাথে তার মোলাকাত হয়ে যাবে। জানলে কখনো আসতেন না। আলী আকবর তাকে জানতো ছাত্রজীবন থেকে। তাকে দেখতেই আলী আকবর বলে উঠলো, বেলায়েত! আমি ভাবতাম এখনো তুমি স্কুলেই আছো। শুনাও, এ বছর কটা শাদী করেছো?

একজন পুরাতন পরিচিত জনের পক্ষ থেকে এটা ছিল একটা সূচনা মাত্র। আলী আকবর স্কুলের কথাবার্তা শুরু করে দিল। লোকেরা হাসছিল। কিন্তু মুরিদ যেন আগুনের ওপর এপিঠ ওপিঠ করছিল। রমজানকে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হতে দেখে ইসমাঈলের ভেতরকার রসিক প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। সে বললো, জিনেরা ফল ও মিষ্টি খাইয়ে পীর সাহেবকে অনেক মোটা ও নাদুস নুদুস করে দিয়েছে। আজ তাঁর ঘোড়ার কোমর বেঁকে যাচ্ছিল। আল্লাহর ফজলে এখনো তিনি জওয়ান। কিন্তু আল্লাহর কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে তাঁর ওজন আরো দেড় দুমন বেড়ে যাবে। আমি ভাবছি, তিনি পুলসিরাতের ওপর দিয়ে কিভাবে যাবেন? তাঁর শরীরের বোঝা ওঠাবার জন্য তো মালগাড়ির প্রয়োজন হবে!

বেলায়েত শাহ যদি সিদ্ধির নেশায় মাতাল হয়ে না থাকতেন তাহলে হয়তো তখনই জালালী মুডে এসে যেতেন। তবুও চৌধুরী রমজানের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল।

সে বললো, ইসমাঈল! তহশীলদার তবুও যাহোক পীর সাহেবের স্কুলের সাথি কিন্তু তোমার মুখে অমন কথা সাজে না। বুযর্গদের মুখ থেকে কখনো বদদোয়াও বের হয়ে যায়।

ততক্ষণে চৌধুরী রহমত আলী রমজানের আঙিনায় প্রবেশ করেছিলেন। তিনি বললেন, ইসমাঈল! তুমি বড়ই বেশরম। প্রত্যেকের সাথে হাসি ঠাট্টা করো।

আলী আকবর বললো, আব্বাজী! ইসমাঈল তো তার ভালোর জন্য বলছিল। পীরজী খুব বেশি মোটা হয়ে গেছেন, তার ব্যায়াম করা উচিত।

রহমত আলীর বেলায়েত শাহের প্রতি কোনো ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল না। তবু তিনি তার পূর্বসূরী বুযর্গদের সম্মান করতেন। এ খান্দানের গদীনশীন কোনো মন্দ ব্যক্তি হলেও তাঁর ছেলেদেরকে বদ দোয়া দিয়ে যাবেন এটা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি হুমকি ধমকি দিয়ে নিজের ছেলেদেরকে সেখান থেকে বের করে দিলেন এবং পীর সাহেবকে বললেন, শাহজী! আপনি রাগ করবেন না, আমার দিলে আপনার খান্দানের বুযর্গদের প্রতি বিপুল শ্রদ্ধা আছে।

শাহজী ক্রোধের প্রকাশ অবশ্য করলেন না।

মনে মনে এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই নিয়ে ফেললেন যে, আগামীতে এ গ্রামে আর আসবেন না। কিছুদিন পর চৌধুরী রহমত আলীর দুটি বলদ চুরি হয়ে গেলো। লোকজন বলে বেড়াতো লাগলো, এটা বেলায়েত শাহের বদ দোয়ার ফল। দুদিন পরে বলদ দুটো পাওয়া গেলো। এবার চৌধুরী রমজান প্রচার করতে লাগলো, শাহ সাহেব রহমত আলীর ছেলেদের বেআদবী মাফ করে দিয়েছেন।

সাধারণ অবস্থায় হয়তো বেলায়েত শাহ এ গ্রামে আর দ্বিতীয়বার আসতেন না। কিন্তু কয়েক বছর পর এমন একটা ঘটনা ঘটলো যার ফলে তাকে আবার এ গ্রামে আসতে হলো।

যেদিন সেলিম ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলো তারপর থেকে নিয়ে তৃতীয় দিনে গ্রামের লোকেরা একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিল। চৌধুরী রমজান তার জীবনে সবচেয়ে বড় পেরেশানীর সম্মুখীন হয়েছিল। সাধারণত লোকেরা তার পেরেশানী দেখলে অট্টহাসি দিতো। কিন্তু এবারের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় লোকদের যথেষ্ট চিন্তাক্লিষ্ট মনে হচ্ছিল।

ঘটনাটা হচ্ছে, চৌধুরী রমজান তার দালানের ছাদের ওপর কিছু গম রোদে শুকাতে দিয়েছিল। তার এই দালানের পেছন দিকে ছিল লছমন সিংয়ের হাবেলী। লছমন সিংয়ের হাবেলীর যে প্রান্তটি রমজানের দালানের সাথে লাগোয়া ছিল সেখানে সে বিচালী স্তূপীকৃত করেছিল। সারা বছরে বৃষ্টির ফলে এই স্তূপ একটুখানি বসে গেল। লছমন সিং তার ওপর আরো বিচালী রেখে দিলো। লছমন সিং এই স্তূপকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতো।

শীতের রোদে এই স্তূপের ওপর বসে সে চারপাইয়ের রশি বুনতো। বর্ষার দিনে হাবেলী কাদায় ভরে গেলে নিজের ছাগলগুলির খাবার ব্যবস্থা এখানেই করতো। গ্রীষ্মের রাতে যখন চৌধুরী রমজান তার দালানের ছাদে শয়ন করতো তখন সে এই স্তূপের উপর দিয়ে উঠে তার কাছে গিয়ে আড্ডা দিতো। গমের ফসল কাটা হলে এই বিচালীর খড় দিয়ে বেঁধে সেগুলি ঘরে আনতো। গ্রামে কারোর বিচালীর প্রয়োজন হলে নির্দ্বিধায় সে এখান থেকে নিয়ে নিতো। তাই লছমন সিং এই বিচালীর স্তূপের মাথা কখনো চৌধুরী রমজানের দালানের ছাদের চেয়ে নিচু যেন না থাকে সেদিকে সবসময় দৃষ্টি রাখতো।

যেদিন রমজান দালানের ছাদে গম বিছিয়ে দিয়েছিল সেদিনই লছমন সিং তার ছাগলগুলির গলায় দড়ি বেঁধে সেগুলিকে আটকে ফেলেছিল। কিন্তু তার মোষটা কিভাবে খুলে গিয়েছিল। মোষটা বিচালীর স্তূপের উপর দিয়ে রমজানের ছাদে গিয়ে উঠেছিল।

চৌধুরী রমজান ভেতরে বসে রুটি খাচ্ছিল। উপর থেকে খড়খড় আওয়াজ কানে এলো। কয়েক জায়গা থেকে ছাদের মাটি ধ্বসে পড়লো এবং তারপর হঠাৎ দেখা গেলো দুটি কালো পা ঝুলছে। মোষের পা।

স্বামী-স্ত্রী বিস্ফারিত নেত্রে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইলো। বাইর থেকে জালাল ও তার বোন চিৎকার দিল, মা! মা! লছমন সিংয়ের মোষ বাড়ির ছাদে উঠেছে।

রমজান কোনো ভয়ংকর জিনের কথা ভাবছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বাইরে বের হয়ে এলো সে। কিছুক্ষণ দম নেবার পর কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলো। লছমন সিংয়ের মোষের কল্লাটা ছাদের সাথে লাগনো ছিল। তার সামনের দুটি ঠ্যাং ছাদ ধ্বসিয়ে নিচে বের হয়ে গিয়েছিল। পিছনের পা দুটি তখনো খড়ের গাদার ওপরই ছিল। মোষটা ড্যাব ড্যাব করে অতি করুণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে নিরব প্রতিবাদ জানাচ্ছিল।

চৌধুরী রমজান কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রামের সমস্ত লোককে একত্র করে ফেললো। শিশু-কিশোর ও নওজোয়ানরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। কিন্তু বড়দের জন্য এটা ছিল বিরল ঘটনা। মোষটাকে এ মুসিবত থেকে উদ্ধার করা হলো। তারপর এ ব্যাপারে আলোচনা চলতে লাগলো যে, বাবা আদমের জামানা থেকে নিয়ে আজ তক মোষকে কেউ দালানের ছাদে চড়তে দেখেনি, তাহলে আজ এ ঘটনা ঘটলো কেন?

গ্রামে এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে পারে একমাত্র সাঁই আল্লারাখখা। সাঁইজী সব শুনে বললো, আজ মংগলবার। মোষ রমজানের দালানের ছাদে চড়েছে এবং মোষ হচ্ছে লছমন সিংয়ের। এখন আল্লাহ মেহেরবাণী করুন। আমার আশংকা হচ্ছে, প্রথমত সমস্ত গ্রামের ওপর আর নয়তো দুটি বাড়ির ওপর নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মুসিবত এসে পড়বে।

রমজান ও লছমন সিংয়ের আগেই তাদের স্ত্রীরা একথা সমর্থন করলো। লছমন সিংকে এই মোষটি বিনা মূল্যে কাউকে বিলিয়ে দেবার জন্য তার স্ত্রী পরামর্শ দিলো। অন্যদিকে রমজানের স্ত্রী তার স্বামীকে বলছিল, তুমি এখনি পীর বেলায়েত শাহের কাছে যাও।

রাতে জালালের পেট ব্যথা শুরু হলো এবং লছমন সিংয়ের দালানের ওপর দুটি কুকুর করুন সুরে কান্না জুড়ে দিল। কাজেই তৃতীয় প্রহরে রমজান ঘর থেকে তিরিশটি টাকা নিল এবং লছমন সিং মোষটি খুলে নিল এবং উভয়ে চললো বেলায়েত শাহের কাছে। পথে একজন খরিদ্দার পেয়ে লছমন সিং তিরিশ টাকায় মোষটি তাকে বিক্রি করে দিল। বেলায়েত শাহের কাছে পৌঁছে রমজান বিশ টাকা সামনে রাখলো। লছমন সিংও তার চেয়ে বেশি ফী আদায় করতে রাজি ছিল না। কাজেই সেও পীর সাহেবকে বিশ টাকা দিল এবং দশ টাকা নিজের কাছে রেখে দিল মদ খাবার জন্য।

[illegible] হাত জোড় করে নিজেদের বিপদের কথা শোনালো। বেলায়েত শাহ এ [illegible] আফিমের নেশায় বুঁদ ছিলেন। তিনি বললেন, আচ্ছা ভাই! আমি তো সংকল্প [illegible] এ গ্রামের পথ আর কোনোদিন মাড়াবো না। কিন্তু এখন তোমরা এসে [illegible] কাজেই আমাকে যেতেই হবে। যে জিনটি মোষ উঠিয়ে তোমাদের ছাদের [illegible] রেখেছে সে কোনো যা তা জিন নয়, বড়ই জবরদস্ত জিন। তোমরা খুব [illegible] করেছো, মোষটাকে বিক্রি করে দিয়েছো। এখন সে যে বাড়িতে যাবে তারই [illegible] করবে।

[illegible] চারটায় চৌধুরী রমজান ও লছমন সিং যখন পীর বেলায়েত শাহকে [illegible] এসে পৌঁছলো তখন আফজাল ক্ষেতের মধ্যে ঘোড়দৌড় করছিল। পীর [illegible] শাহ নিজের ঘোড়া থামিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। তার সাথে ছিল [illegible]। তারাও নিজেদের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো।

বেলায়েত শাহ রমজানকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘোড়া দৌড়াচ্ছে লোকটি কে?

এ হচ্ছে আফজাল, চৌধুরী রহমত আলীর ছেলে।

কত টাকায় কিনেছে এ ঘোড়াটা?

পীরজী! এটা তাদের গৃহপালিত ঘোড়ার বাচ্চা। খালেস আরবীয় বংশোদ্ভূত [illegible]। এখন দেখুন এ ঘোড়া নালার ওপর দিয়ে লাফ দেবে।

সে জায়গা থেকে আফজাল ঘোড়া নিয়ে লাফাচ্ছিল সেখানে নালা ছিল যথেষ্ট [illegible]। ঘোড়ার কয়েকটা লাফ দেখার পর বেলায়েত শাহ বললেন, কি বলো চৌধুরী [illegible]! সে কি এ ঘোড়াটা বিক্রি করবে?

রমজান জবাব দিল, পীরজী! যদি আপনি কিনতে চান তাহলে হয়তো তাদের [illegible] ঘোড়ার দরদাম করা যেতে পরে। সেটি এরই বোন। তার গতি আরো দ্রুত। [illegible] শরীফ। এ ঘোড়াটির মুখে এই মাত্র কিছুদিন হলো লাগাম দেয়া হয়েছে। এখনো [illegible] উচ্ছল ও দুর্দান্ত। দুতিন দিন আগে সে তহশীলদারের ছেলেকে ফেলে দিয়েছিল।

পীর সাহেব সওয়ারীর জন্য উচ্ছল দুষ্ট ও দুরন্ত ঘোড়া পছন্দ করতেন। তিনি বললেন, ঘোড়া আমার অনেক আছে, তুমি এই ঘোড়াটার সওদা করার চেষ্টা করো। চৌধুরী রমজান সামনে এগিয়ে গিয়ে ডাক দিল, আফজাল! আফজাল! একটু এদিকে [illegible] তো বেটা।

কিন্তু আফজাল রমজানের আওয়াজ শোনার আগেই নালা ডিঙিয়ে ঘোড়ার মুখ [illegible] দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

রমজান যখন বেলায়েত শাহের ঘোড়ার লাগাম ধরে নিজের বাড়ির দিকে [illegible] তখন আফজাল তার ঘোড়াটা আস্তাবলে বেঁধে রেখে হাবেলীর বাইরে বের [illegible]।

পীর সাহেবকে দেখে সে বললো আসসালামু আলাইকুম পীর সাহেব।

পীর সাহেব অতি আগ্রহ ভরে তার সালামের জবাব দেবার পর বললেন, ভাই চৌধুরী, আমরা দীর্ঘক্ষণ ধরে তোমার ঘোড়ার দৌড় দেখছিলাম। কিন্তু তুমি আমাদের দিকে তাকাওনি। ভাই, ঘোড়াটিও ভালো এবং সওয়ারও ভালো। চৌধুরী আলী আকবর কি বাসায়ই আছে?

জি না, সম্ভবত সামনে মাসে আসবেন।

চৌধুরী রহমত আলী কোথায়?

তিনি শহরে গেছেন। সন্ধ্যের আগে এসে যাবেন।

রমজান বললো, পীরজী! বড় চৌধুরী সাহেব ছেলেদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন না। আফজাল যা বলবে তা তিনি মেনে নেবেন।

আফজাল বললো, কি ব্যাপার চৌধুরী রমজান?

পীর সাহেব মুখ তুলে রমজানকে দেখলেন। কিন্তু এসব ব্যাপারে রমজান দীর্ঘ ভূমিকার পক্ষপাতি নয়। সে বললো, বেটা! ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তোমার ঘোড়াটা পীর সাহেবের খুব পছন্দ হয়েছে। এখন তুমি বলো এজন্য কি দাম নেবে?

আফজালের জন্য এটা ছিল একটা গালি। তবুও সে পীর সাহেবের মর্যাদার কথা চিন্তা করে বললো, এটা আমার ভাতিজার ঘোড়া।

লছমন সিং বললো, আরে বেটা! এখন পীরজী তো আর বাচ্চার সাথে কথা বলতে যাবেন না।

আফজাল বললো, পীর সাহেব! এ ঘোড়া আপনার কাজে লাগবে না এবং আমরা একে বেচতেও চাই না।

বেলায়েত বললেন, আরে ভাই! আমি ধারে কিনবো না, নগদ দাম দেবো।

আফজাল ছিল লাজুক প্রকৃতির। সে পীর সাহেবকে এড়িয়ে যাবার কোশেশ করছিল। কিন্তু পীর সাহেব নগদ দাম দিয়ে কিনে নেবার জন্য জিদ ধরেছিলেন। ওদিকে রমজান ও লছমন সিং পীর সাহেবের পক্ষে সমর্থন যোগাচ্ছিল। গোলাম হায়দর এবং ইসমাঈলও ঘর থেকে বের হয়ে এলো। গ্রামের অনেক লোকও জড়ো হয়ে গেলো। মজিদ গিয়ে সেলিমকেও সতর্ক করে দিল এবং সে নিজের ভাঙা হাত গলায় ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে সেখানে পৌঁছে গেলো।

বেলায়েত শাহের স্বভাব ছিল তিনি নিজের পছন্দের জিনিসের ওপর অন্যের কোনো হক স্বীকার করতেন না। তার মতে ঘোড়াটি ছিল সুদর্শন কাজেই তার আস্তাবলই ছিল তার সঠিক অবস্থান স্থল। তিনি এ আপত্তি শুনতে রাজি ছিলেন না যে, এর সাথে আফজালের ভাতিজার আবেগ জড়িত রয়েছে এবং একে বিক্রি করলে একটি ছোট্ট শিশুর কোমল মনে ব্যথা দেয়া হবে। আফজাল ও তার ভাইরা পীরের জিদ দেখে রেগে যাচ্ছিল। কিন্তু সে দরোজার মুখে দাঁড়িয়ে তাদেরকে আটকে রেখেছিল। তাছাড়া চৌধুরী রমজানের জন্য ছিল মহাসংকট। একবার তার গ্রাম থেকে পীরজী নারাজ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। আবার যেন তার পুনরাবৃত্তি না হয়

[illegible] পীরজী এ গ্রামের প্রতি রুষ্ট হয়ে চলে না যান। তাই রমজান হাত জোড় করে বললো, আল্লাহর ওয়াস্তে পীরজীকে নারাজ করো না।

[illegible] অবাক হচ্ছিল তার ঘোড়া সম্পর্কে সবাই আলোচনা তর্ক বিতর্ক করছে [illegible] তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না।

[illegible] শাহকে উপেক্ষা করা যখন একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল তখন ইসমাইল বললো, পীরজী! যদি এভাবে কেউ আপনার ঘোড়াটি পছন্দ করে বসে তাহলে আপনি তার হাতে সেটি বিক্রি করে দেবেন?

পীরজী শুষ্ক স্বরে বললেন, উপযুক্ত দাম দেবার মতো যদি কেউ থাকে তাহলে আমি এখনি আমার সওয়ারীটি বিক্রি করতে প্রস্তুত আছি। এটা হলো ক্রেতার [illegible] ব্যাপার এর দাম চারশ টাকা।

ইসমাইল বললো, আপনার এই ঘোড়ার দাম যদি হয় চারশ টাকা তাহলে [illegible] ঘোড়ার দাম পাঁচশ টাকা। হিম্মত থাকে তো এগিয়ে আসুন।

কিছুক্ষণের জন্য পীর সাহেবের আগ্রহে ও উৎসাহে ভাটা পড়লো। তিনি এদিক ওদিক দেখে বললেন, ঠিক আছে তোমাদের পক্ষ থেকে ঘোড়ার দাম পাঁচশ টাকা ঠিক হলো। পাকা কথা। আমার যদি হিম্মত থাকে, আমি কিনে নেবো অন্যথায় [illegible] ঘোড়া তোমাদেরই থাকবে। চলো চৌধুরী রমজান!

পীর সাহেব রমজানের বাড়িতে গিয়ে এক মুঠো শুকনো মাটি নিলেন। কিছু [illegible] পর তাতে ফুঁক দিলেন এবং রমজানকে বললেন, এ মাটি তোমার ছাদের উপর ছড়িয়ে দাও। তারপর লছমন সিংকে একটি তাবীজ লিখে দিলেন এবং বললেন, অর্ধরাতে তোমার হাবেলীর মধ্যে দুবিঘত গভীর গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে এটি পুঁতে দেবে। একাজ শেষ করে তিনি ভাং খেলেন, আফিম খেলেন এবং তারপর হুক্কার নল মুখে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কয়েক টান দেবার পর বললেন, রমজান! তুমি আরবীয় বংশোদ্ভূত ঘোড়া চিনতে পারো?

রমজান সামান্য ইতস্তত করে বললো, পীরজী! এ ঘোড়া যথার্থই আরবীয় বংশোদ্ভূত। এ কারণে তারা বেচতে চায় না।

কিন্তু এখন তো তারা বেচতে রাজি হয়ে গেছে।

না, পীরজী! তারা মনে করেছে আপনি দাম শুনে ভয়ে পিছিয়ে যাবেন। তাই [illegible] বলিয়ে দিয়েছে পাঁচশ টাকা।

পীরজী আচানক উঠে বসে বললেন, পাঁচশ টাকাকে আমার জুতার ফিতার সমানও মনে করি না।

হাঁ, পীরজী! পাঁচশ টাকা আপনার জন্য কিছুই নয়। আগামীকাল সকালে আমি ঘোড়াটা ভালো করে দেখবো। তার মধ্যে কোনো রকম খুঁত না থাকলে কালই [illegible] টাকা আদায় করে দেবো।

বটগাছের নিচে তখনো জটলা চলছিল। লোকদের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল রমজানের পীর। আলোচনা হচ্ছিল পীর কত মোটা, তার মোচ কত লম্বা, তার পাগড়ীর ভাঁজ কটা ইত্যাদি। এমন সময় রমজান দৌড়ে এসে বললো, চৌধুরী রহমত আলী কোথায়?

চৌধুরী রহমত আলী হাবেলীর গেট থেকে বের হতে হতে বললেন, কেন রে চৌধুরী! ব্যপার কি?

আমাকে পীরজী পাঠিয়েছেন।

ইসমাঈল বললো, আরে আমরা পীর সাহেবকে যে দাম বলে দিয়েছি ওর আর নড়চড় হবে না।

চৌধুরী রহমত আলী বললেন, আরে ভাই! কিসের দাম?

ইসমাঈল বললো, আব্বাজী! রমজানের পীর এসেছেন। তিনি সেলিমের ঘোড়াটা কিনে নিতে চাচ্ছেন। আফজাল ঘোড়া বিক্রি না করার জন্য অনেক টাল বাহানা করেছিল কিন্তু এ ভাংয়ের নেশা হয় খুবই খারাপ। আমি লাচার হয়ে শেষ পর্যন্ত বলেছিলাম যদি কেনার শখ থাকে তাহলে দাম দিন পাঁচ'শ টাকা। পীরজী একথা শুনে নিরবে চলে গিয়েছিলেন। এখন আবার তিনি রমজানকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। মনে হচ্ছে এবার ভাং খাওয়াটা একটু বেশি হয়ে গেছে।

রমজান ইসমাঈলকে জবাব দেবার পরিবর্তে রহমত আলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, চৌধুরীজী! রাজার ঘরে মোতির আকাল হয় না। পীরজী বলেছেন, তিনি কাল সকালে এসে ঘোড়া দেখবেন। তার মধ্যে যদি কোনো খুঁত না থাকে তাহলে কালই তিনি আপনাকে পাঁচ'শ টাকা দেবেন। তাঁকে আল্লাহ অনেক দিয়েছেন। পাঁচ'শ টাকা তাঁর কাছে কিছুই নয়।

যে যুগে এক মন গম পাওয়া যেতো দেড় টাকায় সে সময় পাঁচ'শ টাকা কোনো মামুলি ব্যাপার ছিল না। মহফিলে কিছু সময়ের জন্য পিন পতন স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। কিন্তু ইসমাঈল অট্টহাসি দিয়ে উঠে বললো, চৌধুরী রমজান! সত্যি করে বলো কতটা ভাং খেয়েছেন তোমার পীরজী?

রহমত আলী ইসমাঈলকে ধমক দিয়ে বললেন, ইসমাঈল! তুমি সবাইকে নিয়ে তামাশা করো না। তারপর তিনি চৌধুরী রমজানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, যাও রমজান, ইসমাঈল যদি ঘোড়ার দাম পাঁচশ টাকা বলে থাকে তাহলে ঠিক আছে, কাল সকালে পীরজীকে এনে ঘোড়া দেখিয়ে দিয়ো।

রহমত আলী একথা বলে মসজিদের দিকে চলে গেলেন। সেলিম দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ আগে সে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল যে, বালা মুসিবত চলে গেছে কিন্তু রমজানের কথা শুনে এখন তার চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে গেলো।

আফজাল সেলিমের দিকে তাকালো এবং তারপর ইসমাঈলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, ইসমাঈল বেলায়েত শাহের অনেক পয়সা আছে, যদি তিনি সত্যই জিদের বশবর্তী হয়ে পড়েন তাহলে খুবই খারাপ হবে। দেখছো না সেলিম দু চোখভরে কেঁদেছে।

ইসমাঈল বললো, আরে এ হচ্ছে রমজানের কথা।

গোলাম হায়দর বললো, না ইসমাঈল সাঁই আল্লারাখখা বলে, পীর সাহেবের যদি কোনো জিনিস একবার পছন্দ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তিনি টাকার পরোয়া করেন না। তিনি একটি কুকুর কিনেছিলেন ষাট টাকা দিয়ে।

ইসমাঈল উঠে সেলিমের কাঁধে হাত রেখে বললো, বেটা! তুমি দুশ্চিন্তা করো না। প্রথমত সকাল পর্যন্ত পীর সাহেবের নেশা ছুটে যাবে এবং এরপরও যদি তিনি এ ঘোড়া কিনেও নেন তাহলে আমি পাঁচশ টাকায় তোমাকে এমন ঘোড়া কিনে এনে দেবো যে, মানুষ অবাক হয়ে দেখতে থাকবে।

সেলিম ঝটকা দিয়ে তার হাত সরিয়ে দিতে দিতে বললো, আমার ঘোড়া দেবো না, আমার ঘোড় দেবো না, এটা আমার, এটা আমার।

রাতে যেহেতু দাদা ও চাচা ওয়াদা করতে পারেননি যে, তারা সকালে পীরজীকে আস্তাবলের ধারে কাছে আসতে দেবে না তাই সেলিম রাতে খাবার খায়নি।

সেলিম আহত হবার পর দাদী আম্মা তার ঘোড়ার প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু এখন তিনি 'কালামুখো পীর' ও রমজানকে যা তা বলার পর ইসমাঈল ও আফজালের প্রতি খড়গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

চৌধুরী রহমত আলী অত্যন্ত কঠোরভাবে তার ফায়সালাগুলি মেনে চলতেন। তাঁর শেষ ফায়সালা ছিল, বেলায়েত শাহ নিজেই যদি তার সংকল্প ত্যাগ না করেন তাহলে তিনি ঘোড়া বিক্রি করতে বাধ্য হবেন।

মা, দাদী ও চাচীদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সেলিম খাবারে হাত দেয়নি। সে নিরবে গিয়ে তার বিছানায় শুয়ে পড়লো।

শেষ রাতে ঘরের মেয়েরা যখন চরকায় সূতা কাটার ও দুধ দোহার জন্য উঠলো তখন সেলিমের মা সেলিমকে তার বিছানায় দেখতে পেলো না। লণ্ঠন হাতে নিয়ে সেলিমকে এদকি ওদিক খুঁজতে লাগলো তার মা। সেলিমের চাচী ইসমাঈলকে জাগালো। ইসমাঈল লণ্ঠন নিয়ে তাকে তালাশ করতে গেলো বাইরের হাবেলীতে।

কিছুক্ষণ পর হাসতে হাসতে ফিরে এলো এবং বললো, চলো তোমাদের দেখাচ্ছি সেলিম কোথায়।

সেলিমের মা বললো, আফজালের কাছে আছে?

না।

তাহলে আবার কোথায়?

চলো তোমাদের দেখাচ্ছি। রাতে তার সর্দি লেগে গেছে বলে আমার আশংকা হচ্ছে।

সেলিমের মা ও চাচী আর কোনো প্রশ্ন না করে ইসমাঈলের পেছনে চলতে শুরু করে দিল।

ইসমাঈল পশুশালে প্রবেশ করে লণ্ঠন উঁচু করে তাদের জন্য আলো করলো। সেলিম ঘোড়ার সামনে গামলার পাশে বসে পেছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছে। মাতৃস্নেহে অধীর হয়ে সেলিমের মা সামনের দিকে এগিয়ে গেলো কিন্তু ঘোড়ার চড়া মেজাজ দেখে তাঁকে সরে আসতে হলো।

ইসমাঈল বললো, ভাবীজী! আপনি আর এগিয়ে যাবেন না। এ সময় ঘোড়া তার মালিককে পাহারা দিচ্ছে। সে আমাকেও সেলিমের কাছে যেতে দেবে না।

সেলিম! সেলিম! মা ভারী গলায় ডাকলো এবং সেলিম যেন কোনো স্বপ্নের ঘোরে বলছিল; 'না, না, এ আমার, আমার ঘোড়া।'

সেলিম! সেলিম! মায়ের আওয়াজ গলায় আটকে গেলো। তার চোখে দেখা গেলো অশ্রু বিন্দু।

সেলিম এখনো ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করছিল। ইতিমধ্যে আফজাল এসে গেলো। কি হচ্ছে এখানে? সে বললো।

ইসমাঈল বললো, আফজাল! সামনে গিয়ে সেলিমকে উঠাও। এ ঘোড়া আমাকে তো ধারে কাছে ঘেঁসতে দিচ্ছে না।

আরে সেলিম এখানে ঘুমুচ্ছে?

সেলিম সম্ভবত সারা রাত এখানে আছে।

আফজাল এগিয়ে গেলো। ঘোড়া তার নাসারন্ধ্র থেকে খুরর্ খুরর্ ধ্বনি বের করতে লাগলো এবং আফজালের গায়ে নাক ঘসতে লাগলো। আফজাল ঝাঁকুনি দিয়ে সেলিমকে জাগালো এবং বুকে জড়িয়ে তুলে নিয়ে এলো। এরপর মা ও চাচীরা তাকে একের পর এক কোলে তুলে নিচ্ছিল। যখন তারা ঘরে প্রবেশ করলো, দাদী আম্মা বাইরে বের হবার জন্য নিজের স্যান্ডেল তালাশ করছিলেন। সেলিমকে দেখতেই বলে উঠলেন ঃ হায়! হায়! হায়! এমন পীরকে আল্লাহ বরবাদ করুন! আমার বেটা সারা রাত শীতের মধ্যে বসে বসে কাটিয়ে দিয়েছে।

এরপর সেলিম কমপক্ষে এতটুকু মানসিক স্বস্তি লাভ করেছিল যে, বাড়ির লোকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তার সাথে রয়েছে। নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। সেলিমের মা তাকে বললো। বেটা! এখন অযু করে নামায পড়ো এবং

আল্লাহর কাছে দোয়া করো। সেলিম নামাজ পড়ার পর অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে দোয়া করছিল ঃ হে আল্লাহ! আমার ঘোড়া যেন না যায়। রমজানের পীরের ঘোড়ার নেশা যেন কেটে যায়।

তারপর বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। সে মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন দেখছিল। সে দেখলো, সে তার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে তাকে সবুজ শ্যামল গম ক্ষেতের মধ্য দিয়ে তৈরি পাকদণ্ডীর ওপর দিয়ে দৌড়িয়ে নিয়ে চলছিল। স্কুলের ছেলেরা চারদিকে জড়ো হয়ে গিয়েছিল এবং সে তাদেরকে বলছিল, দেখো , এই আমার ঘোড়া।

সেলিম, ওঠো! সেলিম, সেলিম, ওঠো! ভীতী বিহ্বলতার মধ্যে সে চোখ খুলে দেখে, জানালা দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করে সমস্ত ঘর আলোকিত করে তুলেছিল। মজিদ বলছিল, সেলিম! জলদি চলো। রমজানের পীর তোমার ঘোড়া দেখতে আসছে। আমি এখন তাদের বাড়ি থেকেই আসছি।

সেলিম খালি পায়েই তার সাথে দৌড়ালো আস্তাবলের দিকে। ততক্ষণে বেলায়েত খাঁ হাবেলীর গেটে দাঁড়িয়ে তার দাদার সাথে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। পীর সাহেব বলছিলেন, চৌধুরীজী! আমি টাকা আনার জন্য লোক পাঠিয়ে দিয়েছি।

ইসমাঈল মাথা ঝুঁকিয়ে সেলিমের কানে কানে বললো, বেটা চিন্তা করো না! আমি পীরের দাওয়াই ঠিক করে ফেলেছি। তুমি গিয়ে ঠিক কাল রাতের মতো চোখ বন্ধ করে গামলার পাশে বসে পড়ো।

সেলিম করুণ আবেদনের সুরে বললো, তারপর কি হবে চাচাজান!

তারপর কিছু হবে না। ইনশাআল্লাহ পীরজী খালি হাতে ফিরে যাবেন। ব্যস, এখন তুমি জলদি করো।

সেলিম দৌড়ে আস্তাবলে ঢুকে গেলো।

চৌধুরী রহমত আলী বললেন, চলুন বৈঠকখানায় গিয়ে বসি।

রমজান বললো, পীরজী একটু ঘোড়া দেখবেন।

চৌধুরী রহমত আলী আফজালকে আওয়াজ দিলেন। কিন্তু ইসমাঈল বললো, চৌধুরীজী! আফজাল বাইরে গেছে ঘোড়ার জন্য ঘাস কাটতে। আমি দেখাচ্ছি পীরজীকে ঘোড়া। আসুন, পীরজী!

পীর সাহেব রমজানের সাথে আস্তাবলে প্রবেশ করলেন। ঘোড়া তাঁকে দেখেই [illegible] শব্দ করলো। রমজান আরবীয় বংশোদ্ভূত ঘোড়া চেনার ব্যাপারে যতই ওস্তাদ [illegible] তাদের থেকে দূরে থাকা পছন্দ করতো। আর এই ঘোড়াটির সাথে প্রথমদিকেও তার বনিবনা হতো না। ইসমাঈল দরোজার ভেতরে আর ঢোকেনি। [illegible] বললো, পীরজী! এ ঘোড়াটা কিছুটা ভয়ংকর।

ভাই, আমি বড় বড় ভয়ংকর ঘোড়া দেখেছি। এ আর এমন কি?

পীরজী নিশ্চিন্তে আগে বাড়লেন। আচানক তাঁর দৃষ্টি পড়লো সেলিমের ওপর। চাচার হুকুম তামিল করার জন্য সে চোখ বন্ধ করে গামলার পাশে বসেছিল। পীরজী বললেন, আরে এখানে কে?

এ হচ্ছে চৌধুরী রহমত আলীর নাতি, রমজান বললো, এ ঘোড়া তো এরই।

পীরজী বললেন, আরে ভাই! এতো বাচ্চাদের সাথে লেগে আছে। একে আবার ভয়ংকর বলে কে?

তিনি বেপরোয়াভাবে এগিয়ে গিয়ে সেলিমের বাহু ধরে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে বললেন, কি হে সাহেবজাদা....!

ব্যস আর যায় কোথায়, পীরজী তাঁর বাক্য পুরা করতে পারলেন না। সেলিমের গায়ে হাত লাগাবার সাথে সাথেই ঘোড়া তাঁর বুকের থলথলে গোশত, যা চলার সময় লাফাতো এবং ওপর নিচে হতো, গপ করে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলো।

বেলায়েত শাহের অবস্থা এখন সেই হাতীর চেয়ে কোনো ক্রমেই কম ছিল না যার শূঁড় চলে গিয়েছিল বাঘের মুখের মধ্যে। তিনি সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করছিলেন। কিন্তু ঘোড়া মুখ খুলছিল না। ঘোড়ার এ কাজটি ইসমাঈলের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। সে ভেবেছিল ঘোড়া কেবল ভয় দেখিয়ে বা পা তুলে লাথি মেরে ক্ষান্ত হবে। সেলিম হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। রমজান এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে প্রচণ্ড শক্তিতে চিৎকার দিয়ে গ্রামের লোকদেরকে জড়ো করে ফেলছিল।

ইসমাঈল যখন অনুভব করলো ব্যাপারটা হাসি তামাশার সীমানা পেরিয়ে গেছে তখন সে সামনে এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ার নাকে দমাদম ঘুঁসি চালাতে লাগলো। ঘোড়ার দাঁতের চাপ শিথিল হয়ে গেলো এবং বেলায়েত শাহ বেহুশ হয়ে ঢলে পড়লো।

কিছুক্ষণের মধ্যে ছোট-বড় ও পুরুষ-নারীতে সমস্ত হাবেলী ভরে গেলো। পাঁচ ছয় জন লোক মিলে পীরজীকে ধরাধরি করে আস্তাবলের বাইরে বের করে আনলো এবং সেখানে বিছানো একটি চারপাইতে শুইয়ে দিল। প্রায় আধ ঘন্টা পরে পীর সাহেবের জ্ঞান ফিরে এলো। ততক্ষণে একের পর এক করে প্রায় সব লোকই তাঁর শরীরের আহত স্থান দেখে নিয়েছিল।

কঠিন যন্ত্রণা ও জনতার উপচে পড়া ভীড়ের কারণে পীর সাহেব নিজেকে মৃত্যু পথযাত্রী মনে করে তাঁর মুরীদ ও শাগরিদদেরকে ওসিয়ত করলেন, এই গ্রামে আমার জানাযা খারাপ হবে। আমাকে এখনি আমার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দাও। সংগে সংগেই তাঁর হুকুম তামিল করা হলো। চারপাইয়ের ওপর শায়িত করে তাঁকে তাঁর নিজের গ্রামে পৌঁছিয়ে দেয়া হলো।

পীরজী প্রায় দেড় মাস বিছানায় পড়ে রইলেন। মুরিদরা তার সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলো। কিন্তু তাঁর বিরোধীরা দূরদূরান্ত থেকে এসে সেলিমের ঘোড়াটি দেখে যেতো। ইসমাঈল তাদের সামনে এ সম্পর্কিত চোখে দেখা ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিতো।

এ ঘটনার এক সপ্তাহ পর ফজু পাহলোয়ান ঘোষণা করলো, সেলিমের হাত একদম সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গেছে। পরদিন সেলিম ক্ষেত ও পাকদণ্ডীগুলিতে তার ঘোড়া দৌড়াচ্ছিল।

শবেবরাতের আগমন ধ্বনী শোনা যাচ্ছিল। স্কুলের পাশেই এক দোকানদার ফুলঝুরি, পটকা, আতশবাজী ইত্যাদি তার দোকানে বিক্রির জন্য রেখে দিতো। ছেলেরা টিফিনের সময় মিষ্টির দোকানের দিকে দৌড়াদৌড়ি না করে পটকা ইত্যাদি কিনে তা ফাটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। সেলিম তার নিজের পয়সা মজিদের হাতে তুলে দিয়েছিল। টিফিনের সময় সে বেশ কিছু পটকা, ফুলঝুরি ও ছুঁচোবাজী কিনে এনেছিল।

টিফিনের পরপরই ছিল উর্দুর ক্লাশ। মাস্টার সাহেবের অনুপস্থিতিতে ছেলেরা গোলমাল করে ক্লাশ মাথায় তুলে নিয়েছিল। মজিদ আতশবাজীর জিনিসপত্র একটি বস্তার মধ্যে বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু সেলিম তা দেখতে চাচ্ছিল। মজিদ বারবার বস্তা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ডেস্কের মধ্যে ভরে রাখছিল। কিন্তু সেলিম আবার তা বের করে আনছিল।

সেলিমের বাঁদিকের ডেস্কে বসেছিল আরশাদ। সে নিজের পকেট থেকে একটি ফুলঝুরি বের করে তাতে আগুন লাগিয়ে ছেলেদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করলো। সেলিমও তার দেখাদেখি মজিদের বস্তা থেকে একটি ফুলঝুরি বের করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিল। আর একটি ছেলে তার অনুসরণ করলো। কিছুক্ষণের মধ্যে কামরার মধ্যে কয়েকটি ফুলঝুরির আগুন ঝরছিল।

আরশাদ সেলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, তোমার ভাই অনেক ফুলঝুরি এনেছে কিন্তু এগুলো কোনো কাজের নয়। আমি কাল এক আনার নিয়ে গিয়েছিলাম তার মধ্য থেকে মাত্র দুটি চলেছিল। মনে হয় এগুলির মধ্যে কয়লা পিশে ভরে দিয়েছে।

সেলিমের আফসোস হলো, একথা তাকে আগেই বলা হলো না কেন? তবুও সে একটি ছুঁচোবাজী বের করে আরশাদকে দেখিয়ে বললো, এর মধ্যে কয়লা নেই, আমি কয়েকজন ছেলেকে এটা চালাতে দেখেছি।

দাও আমি তোমাকে দেখোচ্ছি।

সেলিম ছুঁচোবাজীটা আরশাদের হাতে দিল। সে এদিক ওদিক দেখে দেশলাইয়ের কাঠি বের করে নিশ্চিন্তে তার মাথায় আগুন দিল।

কামরার বাইরে হেড স্যার উর্দুর স্যারকে বলছিলেন, আপনি দেরিতে আসেন এবং ছেলেরা আপনার পিরিয়ডে সবচেয়ে বেশি গোলমাল করে।

আসলে ছেলেরা খুব বেশি শোরগোল করছিল। হেড স্যারের ধমক খাবার পর উর্দুর স্যার প্রচণ্ড রাগে দিশেহারা হয়ে কামরার দিকে আসছিলেন। কিন্তু তিনি কামরার মধ্যে পা রাখার সাথে সাথেই আরশাদ আতংকগ্রস্তভাবে ছুঁচোবাজীটা হাত থেকে ছেড়ে দিল।

ছুঁচোবাজীটা প্রথমে টেবিলের ওপর পড়লো তারপর সেখান থেকে দরোজার দিকে এগিয়ে গেলো এবং তারপর স্যারের দুই ঠ্যাংগের মাঝখানে লুকালো। উর্দুর স্যার লাফাতে লাগলেন এবং শালওয়ার ঝাড়া দিতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে ছেলেরা একজন আরেক জনের পেছনে মুখ লুকিয়ে হাসতে লাগলো।

ছুঁচোবাজীর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার সাথে সাথেই উর্দু স্যার সোজা হেড মাস্টার সাহেবের কাছে গিয়ে নালিশ করে তাঁকে ডেকে আনলেন।

হেড মাস্টার সাহেব তাঁর বেত উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে এ দুষ্টুমিটা করেছে? কেউ জবাব দিল না।

হেড মাস্টার আবার গর্জে উঠলেন, বলো, নয়তো আমি সবাইকে শাস্তি দেবো। ছেলেরা পরস্পরকে দেখতে লাগলো।

সামনের বেঞ্চে যারা বসেছিল তারা জানতো না ছুঁচোবাজী কে ছেড়েছিল। আর পেছনের যেসব ছেলেরা জানতো তারা ভেবেছিল হেড মাস্টার সাহেবের রাগ প্রথম বেঞ্চের কয়েকজনের পিঠের ওপর দিয়েই শেষ হয়ে যাবে। তাই তারা খামুশ ছিল। আরশাদ অনুনয় বিনয়ের দৃষ্টিতে সেলিমের দিকে তাকালো এবং সেলিমের মুচকি হাসি তাকে নিশ্চিন্ত করে দিল।

মজিদ তার বস্তা ডেস্কের ওপর থেকে উঠিয়ে কোলের ওপর রেখেছিল। তারপর এদিক ওদিক দেখে ডেস্কের ভেতরে সেটা লুকিয়ে ফেললো।

হেড মাস্টার কয়েকবার তাঁর বেত বাতাসে ঘোরালেন তারপর ছাত্রদের দাঁড়াবার হুকুম দিলেন এবং একধার থেকে মারতে শুরু করলেন।

বলবন্ত সিং সামনের বেঞ্চে বসেছিল। তাই সবার আগে তার পালা এলো। হেড মাস্টারের হুকুমে চরম অসহায়ত্বের মধ্যে সে নিজের হাত বাড়িয়ে দিল। প্রথম বেত্রাঘাত খাবার পর সে চিৎকার করে উঠলো, না, স্যার! আমি নয়, আমি নয়, আমি ছুঁচোবাজী চালাইনি। কিন্তু মাস্টার সাহেব তার কথা শুনতে রাজি ছিলেন না। 'হাত বাড়াও' মাস্টার সাহেব গর্জে উঠলেন। বলবন্ত সিং দ্বিতীয় হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু বেত যখন শনশন করে হাতের ওপর পড়তে এলো তখন হাত টেনে নিল সে। বেত পড়লো ডেস্কের ওপর। ছেলেরা ভয়ে সিঁটিয়ে গেলো।

মাস্টারজী আমি চালাইনি, এই ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করুন।

তাহলে কে চালিয়েছে বলো? হেড মাস্টার সাহেবের বেত আর একবার বাতাসে শনশন করে উঠলো। হাত বাড়াও নয়তো.....!'

বলবন্ত সিং কাঁপতে কাঁপতে হাত আবার এগিয়ে দিল। কিন্তু যখনই বেতের শন শন আওয়াজ কানে এলো, স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার হাত আবার পেছনে সরে এলো।

বেত দ্বিতীয় বার ডেস্কের ওপর পড়লো এবং হেড মাস্টার সাহেব ক্রোধে দিশেহারা হয়ে গেলেন।

একদিক থেকে সেলিমের নিচুস্বর শোনা গেলো, মাস্টারজী! আমি ছুঁচোবাজী......!

তুমি? হেড মাস্টার অবাক কণ্ঠে বললেন।

জী।

এদিকে এসো।

আরশাদ কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু তার আওয়াজ গলার মধ্যে আটকে রয়ে গেলো। সেলিম এগিয়ে গিয়ে হেড মাস্টারের সামনে খাড়া হয়ে গেলো। হেড মাস্টার বেত উঠিয়ে বললেন, প্রথমে বলোনি কেন?

সেলিম জবাব দেবার পরিবর্তে নিজের হাত এগিয়ে দিল। একের পর এক করে ছয়টি বেত মারার পর হেড মাস্টারের গোস্বা পেরেশানীতে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। সেলিম একবার এহাত এবং একবার ওহাত আগে বাড়াবার পরিবর্তে একসংগে দুইহাত আগে বাড়িয়ে দিয়েছিল। সে ঠোঁট দাবিয়ে রেখেছিল এবং মাথা নিচু করে রাখার পরিবর্তে চোখ তুলে এক দৃষ্টিতে হেড মাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এটা ছিল একটা গোস্তাখী। কমপক্ষে উর্দু স্যার যিনি হেড স্যারের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি একে মনে করছিলেন একটি বড় রকমের গোস্তাখী। যদি সেলিম একবার 'না, জনাব! আমাকে মাফ করে দিন জনাব!' বলতো, তাহলে ব্যাপারটা খতম হয়ে যেতো। কিন্তু তার হিম্মত ও সাহসকে একটি চ্যালেঞ্জ মনে করা হলো।

মজিদ আরশাদের দিকে দেখছিল। তার চোখগুলো আগুনের মতো লাল হয়ে গিয়েছিল। তার সাধ্যের মধ্যে থাকলে আরশাদের ওপর ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তো। হেড মাস্টারের ব্যাপারে মশহুর ছিল, প্রথমত তিনি মারতেন না আর কখনো মারতে শুরু করলে আধ ডজন থেকে এক ডজন হিসাবে বেত মারতেন। আরশাদ বিশ্বাস করেছিল, তিনি সেলিমের মতো ছেলেকে আধ ডজনের বেশি মারবেন না। কিন্তু যখন হেড মাস্টার আধ ডজন পূর্ণ করার পর একটু থেমে আবার বেত উঠিয়ে নিলেন তখন আরশাদের সহ্য শক্তি খতম হয়ে গেলো। সে মজিদের দিকে দেখলো। মজিদ চরম তাচ্ছিল্য ভরে তার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি একটা বুজদিল। আরশাদের সমস্ত শিরা উপশিরায় যেন বিদ্যুত প্রবাহিত হলো। সে চিৎকার করে উঠলো, মাস্টারজী! সেলিম বেকসুর, ছুঁচোবাজী আমিই ছেড়েছিলাম।

হেড মাস্টার সাহেবের বেত থেমে গেলো। আরশাদ এগিয়ে এসে সেলিমের কাছে দাঁড়ালো। হেড মাস্টার ও উর্দুর স্যার চরম পেরেশানীর মধ্যে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিল।

তুমি মিথ্যা বলছো, হেড মাস্টার আরশাদের দিকে তাকিয়ে বললেন। সেলিম জানে ছুঁচোবাজী আমিই ছেড়েছিলাম। মজীদও জানে। অনেক ছেলে জানে। আপনি জিজ্ঞেস করে নিন। সেলিম আমাকে বাঁচাবার জন্য.......

আরশাদের কণ্ঠ বসে যাচ্ছিল। তার চোখে অশ্রুবিন্দু ভেসে উঠলো।

কি হে মজিদ। ঠিক? হেড মাস্টার তার প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বললো।

জী!......

সেলিম দ্রুত মজিদের দিকে তাকালো এবং তার দৃষ্টি মজিদের ঠোঁটে মোহর মেরে দিল। সে আর কিছু বলতে পারলো না।

হেড মাস্টার বললেন, কি আর কথা বলছো না কেন?

মজিদের খামুশী দেখে রামলাল বললো, মাস্টার জী! আরশাদ ছুঁচোবাজী চালিয়েছিল।

ছেলেদের প্রত্যাশার বিপরীত হেড মাস্টার কিছুক্ষণ নিসাড় নিস্তব্ধ হয়ে সেলিম ও আরশাদকে দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে গোস্বার পরিবর্তে পেরেশানী দেখা দিয়েছিল। তিনি বললেন, তুমি বড়ই নালায়েক আরশাদ আর সেলিম তুমিও।.... তুমি আমার সাথে এসো।

সেলিম হেড মাস্টারের পেছনে পেছনে কামরার বাইরে বের হলো এবং আঙিনা অতিক্রম করে, দপ্তরে প্রবেশ করলো।

হেড মাস্টার সাহেব নিজের চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ নিজের কপালে হাত বুলাতে লাগলেন এবং সেলিম টেবিলের অন্য প্রান্তে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। শেষে তিনি সেলিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, সেলিম তোমার মার খাবার শখ হয়েছিল?

সেলিম খামুশ দাঁড়িয়ে রইলো। হেড মাস্টার সাহেব আবার বললেন, তুমি মিথ্যা বললে কেন?

জী, ছুঁচোবাজী আমার ছিল এবং আরশাদ তাতে আগুন লাগিয়েছিল। বলবন্ত সিং বেকসুর ছিল।

কিন্তু তুমি আরশাদকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলে কেন?

আরশাদ জেনে বুঝে দুষ্টুমী করেনি। তার ধারণা ছিল ছুঁচোবাজীতে দাহ্য পদার্থের পরিবর্তে কয়লার গুড়া ভরা কারণ তার প্যাকেটে সে তাই পেয়েছিল। এটাই টেষ্ট করা হচ্ছিল।

এদিকে এসো, হেডমাস্টার সাহেব হাতের ইশারায় তাকে ডাকলেন।

সেলিম টেবিলের ওপার থেকে চক্কর কেটে হেড মাস্টারের সামনে এসে দাঁড়ালো।

তোমার হাত দেখাও।

সেলিম দুটি হাত সামনে মেলে ধরলো। হেড মাস্টার সাহেব দুঃখ ও লজ্জা মিশ্রিত ভাব নিয়ে হাতে বেতের নিশানা দেখে বললেন, তুমি খুব ভালো ছেলে সেলিম। আল্লাহ ভালো কাজের জন্য তোমার এ হাত বানিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। কখনো একটা ভালো কাজ করতে গিয়ে মানুষের হাত জখমীও হয়ে যায়। আজকের মারের জন্য তোমার মনে দুঃখবোধ নেই তো?

সেলিম খামুশ দাঁড়িয়ে রইলো। হেড মাস্টার সাহেব একটুখানি থেমে আবার বললেন, দেখো বেটা! আজ যদি তুমি সাহসিকতার পরিচয় না দিতে তাহলে আরশাদ সম্ভবত সব সময়ের জন্য নিজের ভুল অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তো। তুমি তাকে বুজদিল হওয়া থেকে বাঁচিয়েছো। আমি আশা করি, তুমি আজ তাকে যে শিক্ষা দিয়েছো তা সে জীবনে কোনদিন ভুলবে না। একদিন তুমি গর্ব করে বলতে পারবে যে, একবার তোমার এক সাথির পা যখন কাঁপছিল তখন তুমি তাকে সহায়তা দান করেছিলে। যদি তুমি অন্যদের সামনে এ ধরনের ভালো দৃষ্টান্ত পেশ করতে থাকো তাহলে একদিন আমিও তোমার জন্য গর্ব করবো। আচ্ছা এখন তুমি যাও।

গ্রীষ্মের দিনে অনেক ছেলে ছুটির পর বাড়ির পথ না ধরে খালের দিকে চলে যেতো। এ খালটি ছিল স্কুল থেকে তিন ফার্লং দূরে। এর উভয় পাড়ে দেবদারু গাছ এবং আম ও জামের গাছ ছিল। ছেলেরা গাছের ছায়ায় কবাডি খেলতো। খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তারা খালের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তো। ঠাণ্ডা পানিতে ভালোভাবে শরীর ধোয়ার পর উপরে উঠে আবার খেলায় মেতে উঠতো।

কখনো খালে সাঁতারেরও প্রতিযোগিতা হতো। ছেলেরা সবাই খালের কিনারে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াতো, একসাথে পানিতে লাফিয়ে পড়তো এবং সাঁতার কেটে অন্য কিনারা স্পর্শ করে আবার এপারে ফিরে আসতো।

আম জাম পাকার মওসুম এলে খালের পাড়ে লোক চলাচল বেড়ে যেতো। আম খুব সস্তায় বিক্রি হতো এবং জাম যে কেউ গাছ থেকে পেড়ে ইচ্ছামতো খেতে পারতো।

পুলের পাশ থেকে খালের আর একটা সরু শাখা বের হয়ে গেছে। এই সুঁতি খালে পানির গভীরতা হতো অনেক কম। ফলে ছোট ছেলেদের ভীড় সেখানে অনেক বেশী।

একদিন মজিদ গাছে উঠে জাম পাড়ছিল কয়েকটি ছেলে আঁচল বিছিয়ে নিচে দাঁড়িয়েছিল। মজিদ ওপরে কোনো ডাল নাড়া দিলে নীচে ছেলেরা সংগে সংগেই সেখানে আঁচল পেতে দিতো এবং পড়ন্ত জামগুলোকে মাটিতে পড়ার আগে অক্ষত অবস্থায় কাপড়ে ধরে নিতো। আঁচলের বাইরে পড়ে যাওয়া জামাগুলোও তারা

কুড়িয়ে আঁচলে রেখে দিতো। অন্যান্য জামগাছগুলোতেও বেশ কিছু ছেলে জাম পাড়তে উঠেছিল এবং প্রত্যেকটি গাছের নিচেয় ছেলেরা আঁচল পেতে জাম কুড়াচ্ছিল।

সেলিম কয়েকজন ছেলের সাথে খালে গোছল করছিল। মহেন্দর সাঁতার জানতো না। তাই কখনো সে কিনারার বড় বড় ঘাস ধরে পানিতে কয়েকটা ডুব দিয়ে দিতো এবং তারপর ওপরে উঠে পানিতে ছেলেদের দাপাদাপি দেখতো।

কুন্দন লাল পানি থেকে উঠে মহেন্দরের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে জামা কাপড় পরছিল। মোহন সিংয়ের মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি গজালো। সে পেছন থেকে চুপিসারে এসে কুন্দন লালকে ধাক্কা দিল। কুন্দন লাল নিজেকে সামলে নেবার জন্য পাশে দাঁড়ানো মহেন্দরকে ধরতে গেলো। ফলে দুজন একসাথে পানিতে পড়ে গেলো। কুন্দন লাল সাঁতার জানতো কাজেই সাঁতরে উপরে উঠে এলো। কিন্তু মহেন্দরকে পানির মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে হাবুডুবু খেতে দেখে ছেলেরা শোরগোল শুরু করে দিল। সেলিম এ সময় কিনারা থেকে পাঁচ ছয় গজ দূরে ছিল। সে দ্রুত সাঁতরে তার দিকে এগিয়ে গেলো। মহেন্দর তাকে এগিয়ে আসতে দেখে নিজের পানির ওপর ভেসে থাকার প্রচেষ্টা বন্ধ করে দিল এবং নিজের দুটো হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

সেলিম ঠিক সময় তার হাত ধরতে পারলো না এবং সে পানির মধ্যে তলিয়ে গেলো।

'ডুবে গেলো' 'ডুবে গেলো' 'মহেন্দর ডুবে গেলো' ছেলেরা শোরগোল করতে লাগলো। আচানক মহেন্দর সিং হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে উপরের দিকে ভেসে উঠলো। সেলিম তার মাথার চুল মুঠো করে ধরে ফেললো। সেলিম ভালই সাঁতার জানতো। কিন্তু ডুবন্তকে বাঁচাবার জন্য শক্তি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। মহেন্দর ভীতি ও আতংকের মধ্যে হাত বাড়িয়ে সেলিমের গলা জড়িয়ে ধরলো। ফলে দুজনে পানির মধ্যে হাবুডুবু খেতে লাগলো। কয়েকবার ডুবে যাওয়ার পর সেলিমের হাত খালের কিনারার ঘাস স্পর্শ করলো। ততক্ষণে মজিদ, বলবন্ত সিং ও অন্য ছেলেরা গাছ থেকে নেমে সেদিকে দৌড়াতে লাগলো। বলবন্ত সিং তার ভাইয়ের নাম শুনতেই গাছের আট দশ ফুট উপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাদের সেখানে পৌঁছার আগেই সেলিম মহেন্দরকে বিপদ সীমার বাইরে নিয়ে এসেছিল। পানির বাইরে এসে নিজের হুশ-জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর মহেন্দর সিং কুন্দন লালের প্রতি তাকালো এবং তাকে গালি দিতে থাকলো।

মজিদ ও বলবন্ত সিং কোনো প্রকার ভূমিকা ছাড়াই কুন্দন লালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অন্য কয়েকজন ছেলেও তাদের অনুসরণ করলো। তার ওপর প্রাথমিক হামলা এমন জোরেশোরে হয়েছিল যে কুন্দন লাল কোনোপ্রকার সাফাই পেশ করার সুযোগই পেলো না। তারপর যখন ছেলেদের আক্রমণ কিছুটা শিথিল হলো তখন তার কণ্ঠ তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল না। সেলিম ছেলেদেরকে ধাক্কা দিয়ে এদিক ওদিক সরিয়ে দিতে দিতে বললো, আরে, আরে, ওকে মারছো কেন? ধাক্কা দিয়েছিল

জেলাম সিং। কিন্তু সেলিমের কথা কেবল তখনই ছেলেদের কানে পৌঁছুলো যখন হরনাম লাল মারের চোটে একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। তারপর মোহন সিংয়ের জ্ঞান ফিরে আসা শুরু হলো। কিন্তু ততক্ষণে সে ভেগে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

পরদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে সেলিম যখন মহেন্দর সিংদের গ্রামের পাশে পৌঁছুল তখন মহেন্দর সেলিমের হাত টেনে ধরে বললো, সেলিম! আমাদের বাড়ি চলো। মা বলে দিয়েছেন, আজ তাকে যেমনি করেই হোক বাড়িতে নিয়ে আসবে।

সেলিম দোটানায় পড়ে গিয়ে মজিদ ও তার অন্য সাথিদের দিকে তাকিয়ে বললো, না আজ থাক, অন্যদিন যাবখন।

বলবন্ত সিং সেলিমের দ্বিতীয় হাতটি ধরে বললো, চলো সেলিম! আমাদের গ্রামের আম খুবই মিষ্টি। সত্যি বলছি আমার মা তোমার জন্য অনেক আম রেখেছেন। মজিদ তুমিও চলো।

মজিদ কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় মহেন্দরের মা দরোজায় এসে দাঁড়ালো এবং মজিদ ও সেলিমকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের মধ্যে সেলিম কে?

সেলিম জবাব দেবার আগেই মহেন্দর বলে উঠলো, মা! এই হচ্ছে সেলিম। এ আমাদের বাড়িতে আসতে চাচ্ছে না। মহেন্দরের মা সামনে এগিয়ে গিয়ে মমতা ও স্নেহভরে দুটি হাত সেলিমের মাথার ওপর রেখে বললো, বেটা! দীর্ঘজীবী হও। আমি আজ তোমাদের বাড়িতেও গিয়েছিলাম। চলো, কিছুক্ষণ আমাদের বাড়িতে বসবে। তারপর চলে যেয়ো। আর এ বুঝি তোমার ভাই? মজিদের দিকে দেখে বললো। বেটা তুমিও চলো। তোমরা সবাই চলো।

কিছুক্ষণ পর সেলিম ও তাদের গ্রামের অন্য ছেলেরা মহেন্দরদের বাড়ির আঙিনায় আমগাছ তলায় বসে নির্দ্বিধায় আম খাচ্ছিল। মহেন্দর সিংয়ের বোন, যে তার চেয়ে দু'বছরের ছোট ছিল, কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে দেখছিল। দু'তিনটি আম খাবার পর সেলিম যখন টুকরী থেকে সরে গিয়ে একটু দূরে বসে পড়লো তখন মহেন্দরের মা টুকরী থেকে একটি আম বেছে নিয়ে তার কাছে গিয়ে বললো, বেটা! এ আমটা খাও, খুব মিষ্টি।

সেলিম তার হাত থেকে আম নিয়ে নিল। ছোট্ট মেয়েটি এগিয়ে এসে টুকরী থেকে আর একটি আম বের করে সেলিমের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এটাও খাও, খুব মিষ্টি।

সাথিদের হাস্যরোল সেলিমকে কিছুটা পেরেশান করে দিল। ছোট্ট মেয়ে কিছুক্ষণ থেমে আবার বললো, নাও না! সত্যি বলছি, কড়া মিষ্টি।

সেলিম মেয়েটির হাত থেকে আম নিল। মেয়েটি খুশি হয়ে বললো, তোমার নাম সেলিম, তাই না?

জী, সেলিম অত্যন্ত নিচুস্বরে জবাব দিল।

আমার নাম বসন্ত।

সেলিম চুপ মেরে গেলো। মেয়েটি কিছু চিন্তা করে বললো, তুমি মহেন্দরকে খালে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছিলে?

সেলিম নিরব থাকায় মহেন্দর জবাব দিল, হ্যাঁ, বসন্ত! সে আমাকে খালের পানি থেকে উদ্ধার করেছিল।

মেয়েটি অতি দ্রুত দুটি আম বের করে সেলিমকে দিল। ব্যস অনেক খেয়েছি বলে সেলিম ওজর পেশ করলো।

সেলিমের অস্বীকৃতির ফলে বসন্ত হতাশ হয়ে আম আবার টুকরীতে রেখে দিল এবং কিছু চিন্তা করার পর দৌড়ে ঘরের মধ্যে চলে গেলো। একটি পুতুল হাতে করে সে ফিরে এলো। সেটি সেলিমের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললো, নাও, এটা তুমি নাও। ছেলেরা খিল খিল করে হেসে উঠলো! কিন্তু মেয়েটি তাদের হাসির পরোয়া না করে পুতুলটি দেবার জন্য জিদ ধরলো।

তার মা বললো, আরে পাগলী! ভাইদেরকে পুতুল দিতে হয় না।

জুলাই মাস। স্কুলে গরমের ছুটি হয়ে গিয়েছিল। একদিন সেলিম গ্রামের বাইরে আম বাগানে চারপাইয়ে শুয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তার মাথার কাছে একটি কিতাব রাখা ছিল। মজীদ দৌড়ে এসে তার বাহু ধরে ঝাঁকুনী দিয়ে বললো, আরে ওঠো।

সেলিম হকচকিয়ে উঠে বসলো তারপর একবার মজিদের দিকে তাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

আরে, উঠবে কি না?

মজীদের বাচ্চা, আমাকে বিরক্ত করো না। সেলিম পাশ ফিরতে ফিরতে বললো।

মজীদ চারপাইটি তুলে একদিকে কাত করতে করতে বলতে লাগলো এক, দুই, তিন এবং সাথে সাথে সেলিম একদিকে গড়াতে লাগলো। সে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং আশেপাশে অন্য কিছু না পেয়ে দুহাতে আমের কয়েকটি শুকনো আঁটি নিয়ে মজিদের পিছনে দৌড়ালো। মজিদ কখনো একটি আবার কখনো দুটি আমগাছের পেছনে আত্মরক্ষা করতে কারতে দৌড়াচ্ছিল। কিন্তু সেলিম যখন একটি গাছের তলা থেকে দুটি বড় বড় কাঁচা আম তুলে নিল তখন মজিদ চিৎকার করে বলে উঠলো, আরে থামো। ওদিকে দেখো!

ওদিকে পরে দেখবো, বলে সেলিম আম ফিকে মারলো মজিদকে। একটি গাছের আড়াল নিয়ে মজিদ নিজেকে রক্ষা করলো।

আরে আমি তোমার দোস্তকে নিয়ে এসেছি, মজিদ আবার গাছের আড়ালে আত্মগোপন করতে করতে বললো।

আমি জানি।

অথচ তোমার পিছনে আরশাদ দাঁড়িয়ে আছে, দেখো!

আরশাদের নাম শুনে সেলিম দ্রুত পেছন ফিরে তাকালো। তার রাগ পেরেশানী ও [illegible] মিশ্র অনুভূতিতে বদলে গেলো। আম ও আঁটি জমিনে নিক্ষেপ করে সে [illegible] লাগলো।

আরশাদ এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে বললো, খুব ঘুমাতে পারো দেখছি সেলিম ভাই।

না, আমি মনে করেছিলাম মজিদ আমাকে বিরক্ত করছে। যদি তুমি আমাকে ডাকতে তাহলে সম্ভবত তোমার আওয়াজ শুনেই আমি উঠে বসতাম। একথা বলেই সেলিম মালিকে ডেকে বললো, দেখো মালি! সুন্দরী ও গোল আম বাছাই করে বালতির ঠান্ডা পানিতে ফেলো। আর শোনো, আগে মেহমানের জন্য খানা নিয়ে এসো।

আরশাদ বললো, খানা আমি ঘর থেকে খেয়ে এসেছি ভাই!

আচ্ছা, পানি তো খাও।

পানি মজিদ খাইয়ে দিয়েছে।

সেলিম মালির দিকে তাকিয়ে বললো, আচ্ছা, তুমি আম পাড়তে থাকো।

জী, সুন্দরীও গোল আম সকালে পেড়েছিলাম এবং সেগুলি সব বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়ে গেছে। এখন অন্য কোনো গাছ থেকে পেড়ে দিচ্ছি।

না, আমরা অন্য বাগানে যাচ্ছি।

মজিদ বললো, সেলিম! যদি খুব ভালো আম খাওয়াতে চাও তাহলে চলো সাধুর বাগানে যাই। সেখানকার আম এখানকার সুন্দরীও গোল আমের চেয়েও ভালো।

মালি বললো, জী, ঠিকই বলেছেন, এ তল্লাটে কোনো বাগানে অমন আম নেই।

কিন্তু সে বাগান তো অনেক দূরে।

তাতে হয়েছে কি? আমরা হেঁটে যাচ্ছি না। ঘোড়ার পিঠে আধ ঘন্টার রাস্তা।

সেলিম বললো, আরশাদ! ঘোড়ায় চড়তে পারবে তো?

ভাই, সত্যি বলতে কি, আমের চাইতে বেশি আমার ঘোড়ায় চড়ার শখ। তবে তোমার সেলায়েতশাহ ওয়ালা ঘোড়াকে আবার ভয় করি।

এখন আমার সে ঘোড়া আর দুষ্টুমি করে না। তবুও তোমার জন্য মজিদের ঘোড়াটিই ঠিক হবে। মজিদ তুমি চাচা আফজালের ঘোড়াটি নাও।

চাচা আফজালকে তুমি একটু বলে দাও।

চলো।

কড়া রোদ এবং তার সাথে ছিল প্রচণ্ড গুমোটভাব। আরশাদের সাথে বাড়ির দিকে যাবার সময় সেলিম ও মজিদ উভয়েই অনুভব করছিল এ ধরনের গরমের মধ্যে আফজাল সম্ভবত ঘোড়ায় চড়ার অনুমতি দেবে না।

চাচা আফজাল হাবেলীর দরোজার বট গাছের নিচে এবং খাটের ওপর শের সিং বসেছিল। গাছের চারদিকে উঁচু স্থানটির অন্য প্রান্তে ইসমাঈলকে ঘিরে বসেছিল

আট দশজন লোক। আলোচনার জন্য যুতসই শব্দ চিন্তা করতে বেশ কিছু সময় চলে গেলো। তারপর সেলিম আফজালের কাছে গিয়ে খাড়া হলো। আফজাল কোনো শব্দের জন্য থামলো এবং সংগে সংগেই সেলিম ঝুঁকে পড়ে বইয়ের পাতায় দৃষ্টি বুলিয়ে তার সংশোধন করে দিল এবং বইটি শের সিংয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, চাচা! আপনিও পড়ুন।

শের সিং নিশ্চিন্তে বই খুললো এবং আফজালের দিকে দেখে মুচকি হাসলো।

সেলিম বললো, চাচা! চশমাটা লাগিয়ে নিন না?

না, বেটা! গরম বেশি পড়ে গেছে। আমাকে চশমা ছাড়াই পড়তে দাও। গরমে চশমা চোখে লাগাবার ফলে চোখ জ্বালা করছিল।

খামাখা আমার দুটাকা খরচ হয়ে গেছে।

আচ্ছা, চাচা, পড়েন না?

শের সিং পড়তে শুরু করলো। 'ডুলিতে চড়দীয়াঁ হীরাচীকাঁ......।' আর উঁচু জায়গাটির পাশে মজিদের কাছে দাঁড়ানো আরশাদ তার মুখ দুহাত দিয়ে চেপে রেখেও হাসি রুখতে পারলো না।

সেলিম বললো, চাচা! এতো উর্দু পুঁথি, আপনি তো পাঞ্জাবী পড়ছেন।

এতে কিছু এসে যাবে না, তার লা-পরোয়া জবাব।

এ ফাঁকে সেলিম আফজালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, চাচাজী! আপনার ঘোড়াটাকে একটু বাইরে নিয়ে যাবো?

এই গরমের মধ্যে? খবরদার! তার গায়ে হাত দেবে না। দেখছো না, তোমার ঘোড়াকে দিনে দুবার গোছল করাচ্ছো। এই গরমে আমার ঘোড়া একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

চাচা! শহর থেকে আমার দোস্ত এসেছে। বাগানের ভালো আমগুলো মালি সকালে পেড়ে ফেলেছে। তাই এখন আমরা সাধুর বাগানে যেতে চাচ্ছি।

'দোস্ত' শব্দটির অর্থ আফজালের চাইতে ভালো আর কে জানবে? তার কণ্ঠস্বর আচানক মোলায়েম হয়ে গেলো। কোথায় তোমাদের দোস্ত?

ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেলিম আরশাদকে দেখিয়ে দিল।

আরে, লেখাপড়া জানা ছেলেরা নিজেদের দোস্তকে কি অভ্যর্থনা জানায় এভাবে? আরে এসো, বেটা! এদিকে এসো। আরশাদ উঁচু জায়গার উপর উঠে ইতস্ততভাবে এগিয়ে এলো।

বসো বেটা! বসো!

আরশাদ জড়োসড়ো হয়ে আফজালের কাছে বসে পড়লো।

যাও সেলিম! শরবত নিয়ে এসো।

জী, আমি পানি পান করেছি।

আরে ভাই, আজকাল খুব তাড়াতাড়ি পিপাসা পায়। যাও সেলিম! জলদি করো।

সেলিম দৌড়ে গিয়ে শরবত নিয়ে এলো এবং আরশাদকে এক গ্লাস পান করতে দিল।

আফজাল বললো, কি হে সাহেবজাদা! ঘোড়ায় চড়তে পারোতো?

আরশাদ জবাব দিল, জী, পারি সামান্য। কখনো কোনো গ্রামের রুগী আব্বাজীর জন্য ঘোড়া পাঠিয়ে দেয়। তার পিঠে চড়ে আমি কিছুক্ষণ প্রাকটিস করি। এইটুকুই যা জানা। তবে ঘোড়া দুষ্টু প্রকৃতির হলে আমি তার ধারে কাছেও ঘেঁসি না। এখনো আমি ভালোভাবে ঘোড়সওয়ারী করতে পারি না।

তুমি ডাক্তার শওকতের ছেলে?

জী।

আরে তিনি আমাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান এবং ভাইজানের দোস্ত। সেলিম! তোমার দোস্তের জন্য ঘোড়ার পিঠে জিন বাঁধো খুব ভালো করে।

বহুত আচ্ছা, চাচাজান!

সেলিম ও মজিদ কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোড়ার পিঠে জিন বেঁধে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

যখন তারা সওয়ার হচ্ছিল, আফজাল বললো, দেখো বেটা! ঘোড়াকে খুব জোরে দৌড়াবে না। তোমাদের সাথি অনভিজ্ঞ এবং পথঘাট চেনে না। আর আজ গরমও আবার অনেক বেশি পড়েছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত হয়তো আঁধি বা বৃষ্টিও আসতে পারে। কাজেই জলদি ফিরে আসবে।

জী, চাচাজান! আমরা জলদি ফিরে আসবো।

বাগানে পৌঁছে সেলিম, মজিদ ও আরশাদ ঘোড়াগুলির জিন নামিয়ে ফেলে ঘোড়াদেরকে গাছের সাথে বেঁধে দিল। মালির কাছ থেকে আম নিয়ে বালতিতে পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিল এবং নিজেরা চলে গেলো নহরের স্বচ্ছ পানিতে গোসল করতে। গোসল করার পর নহরের পারে বসে তারা আম খেলো পেট ভরে এবং কিছু কথাবার্তাও হলো।

দীর্ঘদিন পর মজিদ আফজালের ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হবার সুযোগ পেয়েছিল। সে চুপিচুপি উঠে ঘোড়ার পিঠে জিন বেঁধে লাফিয়ে সওয়ার হয়ে গেলো।

কোথায় যাচ্ছো? সেলিম জিজ্ঞেস করলো।

এক চক্কর দিয়ে আসি। এসো তোমরাও এসো। কিন্তু মজিদ যখন একই ক্ষেতের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দুতিনবার পানির বড় নালাটি লাফিয়ে পার হলো এবং প্রত্যেকবার আরশাদের কাছ থেকে বাহবা কুড়ালো তখন সেলিম তার জযবাতের ওপর টিকে থাকতে পারলো না। সে ঝটপট নিজের ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগিয়ে নিল এবং জিন ছাড়াই তার পিঠে চড়ে বসলো।

দুই সওয়ারের এ প্রতিযোগিতা আরশাদের জন্য যথেষ্ট আকর্ষণের বিষয় হলো। সে বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখতে লাগলো। বাগানের মালি এসে বললো, আরে ভাই! তুমিও ঘোড়ার পিঠে চড়ো........!

বাহ্যত আরশাদ মালির প্রতি দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন অনুভব করছিল না। তবুও তার পক্ষে নিছক দর্শকের ভূমিকা পালন করাও কঠিন ছিল। কিছুক্ষণ পর সেলিম তার কাছে এসে বললো, আরশাদ তুমিও এসো। এ ঘোড়াটা দুষ্টু নয়। আজ তুমি একে ছুটিয়ে দেখো। আগামীতে আমি তোমাকে নিজের ঘোড়া দেবো।

আমি তোমাদের মতো খালি পিঠে সওয়ারী করতে পারবো না।

আচ্ছা, আমি তোমার ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে তারা তিনজন বাগান থেকে বেশ একটু দূরত্বে খোলা ময়দানে ঘোড়া দৌড়াচ্ছিল। আরশাদ কিছুক্ষণ ঘোড়াকে সবেগে দৌড়াবার ব্যাপারে আতংকগ্রস্ত ছিল। কিন্তু দ্রুত তার আতংক দূর হয়ে গেলো। তবুও কোনো নালা সামনে এসে গেলে নিজের সাথিদের অনুসরণ করার পরিবর্তে সে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরতো। একবার তার ঘোড়া একটা নালার সামনে এসে তার নির্দেশ অনুযায়ী থেমে না গিয়ে নালার ওপর দিয়ে লাফিয়ে গেলো। এতে তার সাহস বেড়ে গেলো।

সেলিম ভাই! এটা তো বেশ ভালো ঘোড়া। সে খুশি হয়ে বললো।

দেখলে তো! অথচ তুমি খামখা ঘাবড়াচ্ছিলে। সন্ধ্যের কাছাকাছি সময়ে রোদ কমে গিয়েছিল কিন্তু গুমোট হয়ে গিয়েছিল আগের চেয়ে বেশী। এই সাথে পশ্চিম আকাশে আঁধির লক্ষণ ফুটে উঠছিল। সেলিম ঘোড়া থামিয়ে বললো, মজিদ! ওদিকে দেখো, আজ আঁধি আসবে বলে মনে হচ্ছে। চলো ঘরে ফিরে যাই।

মজিদ তার কাছে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে নামতে বললো, ঘোড়ার পিঠের ঘাম শুকিয়ে যেতে দাও তারপর রওনা হওয়া যাবে। নয়তো চাচা আফজাল রাগ করবেন।

আরশাদ বললো, আমার দেরি হয়ে যাবে ভাই, চলো!

সেলিম বললো, আজ আমাদের বাড়িতে থেকে যাও।

না ভাই! আমি বাড়িতে বলে আসিনি। আব্বাজান নারাজ হয়ে যাবেন।

মজিদ বললো, ভয়ের কারণ নেই, সেলিম তোমাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে রেখে আসবে।

সেলিম তার কথা সমর্থন করে বললো, হ্যাঁ আরশাদ! এ ঘোড়া আমরা গ্রামে রেখে দিয়ে তোমাকে আমার সাথে ঘোড়ায় বসিয়ে শহরে পৌছিয়ে দিয়ে আসবো।

আরশাদ এ কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ নহরের কিনারায় ঘোড়াগুলিকে তাজাদম হবার সুযোগ দেবার পর আরশাদ ও সেলিম একযোগে মজিদকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে, এবার তোমার ঘোড়ার ঘাম শুকিয়ে গেছে কাজেই আর দেরি করে লাভ নেই। আর মজিদ প্রত্যেকবার বলছিল, এখনো সন্ধ্যার অনেক দেরি। এত জলদি করছো কেন? যেহেতু পশ্চিম দিকে ঘন গাছের আড়াল ছিল, তাই সেদিকে আকাশে জমাট বাঁধা ধূলির গতিবেগের সঠিক ধারণা তাদের ছিল না কিন্তু হঠাৎ সূর্য ডুবে গেলো এবং মালি ডাক দিয়ে বললো, আরে ভাই আঁধি এসে গেলো। তোমরা তাড়াতাড়ি ঘরে পৌছে যাও।

সেলিম বললো, চলো আরশাদ! আমরা চলি।

সেলিম ও আরশাদ ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো। তারা বেশি দূর যায়নি পেছন থেকে মজিদ দ্রুত তাদের সাথে এসে যোগ দিল। কাঁচা সড়কে প্রায় এক মাইল তিন জনা পাশাপাশি চলতে লাগলো। তারপর এলো ফসলের ক্ষেত। ক্ষেতের মধ্য দিয়ে সরু পাকদণ্ডী দিয়ে এগিয়ে চলার সময় আগে সেলিম মাঝখানে আরশাদ ও পিছনে মজিদ এভাবে তারা চলতে লাগলো। পাকদণ্ডীতে তারা সাধারণ গতিতে চলতে থাকলো। সামনে কোনো নালা দেখা দিলে সেলিম আরশাদকে খবরদার করে দিতো। আঁধির কারণে চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিম দিকের সমস্ত গ্রাম ধুলো ও অন্ধকারের গর্ভে বিলীন হতে চলেছিল।

আরশাদ! একটু সতর্ক হয়ে বসো! সেলিম পেছন ফিরে তার দিকে দেখতে দেখতে বললো। এই সংগে ঘোড়ার গতিও একটু দ্রুত করে দিল। বেশি দূর তখনো তারা যেতে পারেনি আঁধি তাদেরকে ঘিরে ফেললো। প্রাথমিক ধাক্কাটা বেশি ভয়ানক ছিল না। কিন্তু ধূলোবালির আস্তর যে অন্ধকার তৈরি করেছিল তার মধ্য দিয়ে পথ চলা তাদের জন্য হয়ে দাঁড়ালো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আরশাদ চিৎকার করলো, আরে ভাই। আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

মজিদ পেছন থেকে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছিল, তুমি নিশ্চিন্তে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকো। সে তোমাকে সোজা ঘরে পৌঁছিয়ে দেবে।

আচানক এমন প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে লাগলো যে, আরশাদ উড়ন্ত খড়কুটো থেকে চোখ বাঁচাতে গিয়ে চোখ বন্ধ করে নিল।

কিছুক্ষণ পর মেঘের গর্জন শোনা গেলো এবং বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগলো। সেলিম একটি বট গাছের নিচে ঘোড়া দাঁড় করালো এবং তার পেছনে আগমনকারী ঘোড়াগুলি নিজে নিজেই থেমে গেলো।

থেমে গেলে কেন? মজিদ বললো।

ধূলোবালি একটু বসে যাক, তারপর আবার যাবো।

আরশাদ দুহাত দিয়ে চোখ ডলতে ডলতে অনুনয়ের স্বরে বললো, হ্যাঁ ভাই! থেমে যাও। আমার চোখ দুটো ধূলোয় ভরে গেছে, কিছুই দেখতে প্যাচ্ছি না।

মেঘ গর্জনের সাথে মুষলধারে বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যে ধূলো বসে গেলো কিন্তু বাতাস ও বৃষ্টির প্রচণ্ডতা প্রতি মুহূর্তে বেড়ে যেতে লাগলো।

মজিদ বললো, এখন রাত হয়ে গেছে। এখানে দাঁড়িয়ে ভিজতে থাকায় কোনো লাভ তো হচ্ছে না। আরশাদ কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় পশের একটি উঁচু আম গাছের ডাল ভেঙে বট গাছের নিচের ডালের ওপর পড়লো। এক ভয়াবহ শব্দে ভীত হয়ে ঘোড়াগুলি এদিক ওদিক ছিটকে পড়লো।. সেলিম ও মজিদ দ্রুত তাদের ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ করে ফেললো। কিন্তু আরশাদের ঘোড়া চলে গেলো একটু দূরে। সে তার মনের ভীতি ও শংকা দূর করে লাগাম টানবার আগেই একটি গাছের ঝুঁকে পড়া ডালের সাথে তার মাথা ঠুকে গেলো সজোরে।

সেলিম ও মজিদ যখন সাহায্যের জন্য তার কাছে পৌঁছলো তখন সে বেহুশ হয়ে জমিনে শায়িত ছিল। দুজনই একই সাথে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে 'আরশাদ!' 'আরশাদ!' বলতে বলতে তার পাশে বসে পড়লো। সেলিম তার মাথা টেনে নিল কোলের ওপর। বিজলী চমকালো। সে আলোয় সে দেখলো তার মাথা ফেটে গেছে এবং সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। সেলিমের শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু যেন জমাটবদ্ধ হয়ে গেলো। এক মুহূর্ত পরে সে চিৎকার করে উঠলো, 'আরশাদ!' 'আরশাদ!' এবং তার আওয়াজ গলায় আটকে গেলো। চরম অসহায়ভাবে তাকালো সে মজিদের দিকে। মজিদ দ্রুত তার পাগড়ী খুলে তার মাথার ক্ষতস্থান বেঁধে ফেললো শক্ত করে।

'সেলিম' গাঢ় কণ্ঠে বলে উঠলো মজিদ, এবার......তার এই একটি শব্দের মধ্যে লুকিয়ে ছিল কয়েকটি প্রশ্ন এবং অনুনয় বিনয়। এর মাধ্যমে সে বলতে চাচ্ছিল, তুমি বড়, তুমি অনেক কিছু বুঝতে পারো, তুমি অনেক কিছু করতে পারো, বলো এখন কি করা যায়, বলো এখন আমরা কি করবো?

মজিদ এর জবাবে জলদি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তুমি আমার ঘোড়ার লাগাম ধরো, আমি আরশাদকে আমার সাথে উঠিয়ে নিয়ে ঘরে চলে যাই। তুমি ঘোড়ায় চড়ে এখান থেকে সোজা শহরে চলে যাও এবং ডাক্তার শওকতকে ডেকে আনো, ছোট ঘোড়াটাকে ছেড়ে দাও। ওটা নিজে নিজেই বাড়িতে চলে যাবে।

সেলিম আচানক অনুভব করলো তার মধ্যে অস্বাভাবিক শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। সে দ্রুত মজিদের ঘোড়ার লাগাম ধরে নিয়ে এলো। মজিদ আরশাদকে তার ঘোড়ার উপর তুলে দিল। তারপর সেলিমের সহায়তায় ঘোড়ার পিঠে উঠে তার পেছনে বসলো। এই ঝড় তুফানের মধ্যে একজন আহত সংগাহীন সাথিকে ঘোড়ার পিঠে সামনে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা ছিল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মজিদের শারীরিক শক্তি কাজে লাগালো। সে আরশাদের পেছনে বসে একহাত দিয়ে তাকে বুকের সাথে জাপটে ধরে রাখলো এবং অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরলো এবং বললো, সেলিম! তুমি যদি যথাসময়ে ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে আসতে পারো তাহলে তোমার দোস্ত বেঁচে যাবে।

সেলিম দৌড়ে গিয়ে লাফ দিয়ে তার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলো কিন্তু কয়েক কদম গিয়ে আবার মজিদের দিকে ফিরে বলতে লাগলো, দেখো মজিদ! সে জখমী, তাকে সতর্কতার সাথে ঘরে নিয়ে যেতে হবে। আমি এখনি ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে চলে আসছি।

মজিদ জবাব দিল, আরশাদ আমারও দোস্ত। সেলিম! তুমি চিন্তা করো না, জলদি যাও। সেলিম তখনি ঘোড়ার পিঠে গোড়ালী ঠুকলো।

ঘোড়া আঁধি ও বৃষ্টির মধ্যে গর্দান ঝুঁকিয়ে পূর্ণ শক্তিতে দৌড়াচ্ছিল। প্রতি মুহূর্তে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে চলছিল। সেলিম কেবল এতটুকুই জানতো, সে শহরে যাচ্ছে। রাস্তা ও পাকদন্ডির কথা চিন্তা না করে সামনে যা পাচ্ছিল ধান, কুয়া,

বাধাবিপত্তি সবই অতিক্রম করে চলছিল সে। আখের ক্ষেত নিকটবর্তী হলে কোনো জায়গার মধ্যে ঘোড়া নামিয়ে দিচ্ছিল। এভাবে প্রায় দেড় মাইল অতিক্রম করার পর সে পৌঁছে গেলো শহরের দিকে যাওয়ার কাঁচা সড়কের ওপর।

সেলিম সম্ভবত তার জীবনে এই প্রথমবার চরম গুরুত্ব, আন্তরিকতা ও ভাবানুভূতি সহকারে সেই মহান সত্তার দরবারে নম্রতা ও অনুনয় বিনয়ের সাথে দোয়া করছিল, যিনি জিন্দেগী ও মউতের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করেন। প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসে তার দিল থেকে এ দোয়া বের হচ্ছিল ঃ হে আল্লাহ! আরশাদকে জীবন দান করো! আমার মাওলা! তার প্রতি রহম করো। হে আল্লাহ! এটা ছিল আমার ভুল। এর শাস্তি তাকে দিয়ো না। সেলিম বিশ্বাস করতো আল্লাহ তার নেক বান্দাদের দোয়া কবুল করেন। তাই সে বলছিল, হে আল্লাহ! আমি তোমার নেক বান্দা হবো। জিন্দেগীতে আর কোনোদিন নামায ও রোযা কাযা করবো না। আমি আরশাদকেও তোমার নেক বান্দায় পরিণত হতে বাধ্য করবো। হে আল্লাহ! তার মা বাপ তাকে ভালোবাসে। তার ছোট ছোট ভাইবোন আছে। যদি সে......? সেলিমের চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো অঝোর ধারায়। বৃষ্টি, আঁধি, কাদা ও পানির কথা তার কিছুই মনে রইলো না। ঘোড়া কয়েকবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার উপক্রম হলো কিন্তু সেলিম গতিবেগ কম করলো না।

আরশাদের বাড়ির কাছে পৌঁছে সে ঘোড়া থেকে নামলো। আঙিনার গেট ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। ডাক্তার সাহেব! ডাক্তার সাহেব! বলে কয়েকবার আওয়াজ দিল সেলিম। কিন্তু সে অনুভব করলো বৃষ্টি ও আঁধির প্রচণ্ড গর্জনের মধ্যে তার আওয়াজ তলিয়ে গেছে। কয়েকবার গেটে ধাক্কা দেবার পর তার মনে হলো বাইর থেকে গেটের লোহার গরাদের মধ্যে হাত দিয়ে সে গেটের ভেতরের শেকল খুলতে পারে। ফলে সামান্য চেষ্টা করে শেকল খুলে ফেললো। তারপর বাতাসের চাপে গেট খুলে হাঁ হয়ে গেলো। সেলিম ঘোড়ার লাগাম ধরে ভেতরে ঢুকে পড়লো। কামরার মধ্যে বিজলী বাতি জ্বলছিল। জানালা ও দরোজার কাঁচের মধ্য দিয়ে আলো [illegible] বের হয়ে আসছিল।

ডাক্তার সাহেব! ডাক্তার সাহেব! সেলিম আওয়াজ দিল।

কামরার দরজা খুলে গেলো। কেউ বাইরে বের হয়ে এসে বারান্দার বাতি জ্বালিয়ে দিল এবং জিজ্ঞেস করলো, কে?

এ ব্যক্তি ছিল আরশাদদের নওকর। সেলিমকে সে আরশাদের সাথে কয়েকবার দেখেছিল। কিন্তু আজ তার সমস্ত জামা কাপড় কাদাতে পানিতে লেপটে ছিল। তাছাড়া আজ তার আগমন ছিল অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত। সেলিম বললো, ডাক্তার সাহেবকে খবর দাও।

ডাক্তার সাহেব বাড়িতে নেই।

কোথায় গেছেন? সেলিম আতংকগ্রস্তভাবে প্রশ্ন করলো।

এখান থেকে ছয় মাইল দূরে একটি গ্রামে গেছেন এক রুগীকে দেখতে।

আমি সেখানে যাচ্ছি। গ্রামের নাম বলো।

গ্রামের নাম......আমার মনে নেই। আরশাদ জানতো। কিন্তু সেও কোথায় গেছে। সম্ভবত সে বাইর থেকে কোথাও ডাক্তার সাহেবের সাথে চলে গেছে। বাড়ির সবাই তার জন্য খুবই পেরেশান।

আরশাদের আলোচনা করা সংগত মনে না করে সেলিম বললো, বাড়ির ভেতর থেকে জেনে এসো তিনি কোন গ্রামে গেছেন।

ঘরের লোকেরাও জানেনা। আর জানলেও এই তুফানের মধ্যে তোমার পক্ষে সেখানে যাওয়া এখন সম্ভবই নয়। তাছাড়া ডাক্তার সাহেব একজন রুগীকে ছেড়ে দিয়ে তোমার সাথে এই ঝড় তুফানের মধ্যে যাবেনই বা কেমন করে। তার চেয়ে তুমি ভেতরে গিয়ে বসো। ঘোড়াটাকে থামের সাথে বেঁধে দাও। হয়তো ততক্ষণে আমি নামটা স্মরণ করতে পারবো। গ্রামটার নাম বেশ চমৎকার। সেখানে চৌধুরী রহীম বখ্‌শদের বাড়ি। তাঁরই চিকিৎসার জন্য গেছেন তিনি।

নাংগলওয়ালা চৌধুরী রহীম বখ্‌শ?

আরে হাঁ ভাই নাংগল, বড় নাংগল।

আমি যাচ্ছি। সেলিম ঘোড়ার রেকাবে পা রেখে বললো।

আরে ভাই শোনো! আমি তোমাকে কয়েকবার আরশাদের সাথে দেখেছি। দেখো যদি তুমি নাংগলে যাও এবং সেখানে ডাক্তার সাহেবের সাথে আরশাদকে পাও তাহলে ডাক্তার সাহেবকে বলো কারোর হাতে যেন তার খবর ঘরে পাঠিয়ে দেন। এখানে সবাই তার জন্য পেরেশান আছে।

আরশাদের মা বাইরে এসে বললেন, কার সাথে কথা বলছো গোলাম আলী?

—জী, একটি ছেলে। ডাক্তার সাহেবকে ডাকতে এসেছেন। এখন তাকে ডাকতে যাচ্ছেন। আমি তাকে আরশাদের ব্যাপারে বলে দিয়েছি। যদি সে সেখানে থাকে তাহলে ডাক্তার সাহেব আমাদের খবর দেবেন।

আরশাদের মা বললো, হ্যাঁ বেটা! অবশ্যই এ কাজটা করবে।

জী, বহুত আচ্ছা।

আরশাদের মা একটু সামনে এসে বিজলীর আলোয় গভীর দৃষ্টিতে তাকে দেখে বললো, বেটা! এখন প্রচণ্ড ঝড় তুফানে তোমার বাইরে বের হতে ভয় করলো না? ঘরে বড়দের মধ্যে কেউ ছিল না?

সেলিম কোনো জবাব দিল না। আরশাদের মা বললো, তোমার কে অসুস্থ?

সেলিম ইতস্তত করতে করতে জবাব দিল, জী, আমার ভাই ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছে।

আচ্ছা বেটা! যাও, আল্লাহ তাকে সুস্থতা দান করবেন। সেলিম বললো আরশাদের ব্যাপারে আপনি চিন্তা করবেন না। যদি সে ডাক্তার সাহেবের সাথে না আসে তাহলে পাশেই আর একটি গ্রাম আছে, সে গ্রামে আছে তার এক দোস্তের বাড়ি, সেখানেই সে গিয়ে থাকবে। সকাল হবার আগেই আমি আপনাকে তার খবর জানিয়ে দেবো।

তুমি আরশাদকে জানো?

জী হাঁ, আমরা একসাথে পড়ি। একথা বলেই সেলিম ঘোড়ার পিঠে গোড়ালী ঠুকে দিল। ফসলের ক্ষেত, পাকদণ্ডী ও গ্রামীণ পথ সবই পানিতে ভেসে যাচ্ছিল। আকাশের ঝাপটা কিছুটা কমে গেলেও বৃষ্টি সমানে হচ্ছিল। রাস্তা তালাশ করার ব্যাপারে সেলিমকে তেমন কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো না। এ এলাকার এমন কোনো একটি গাছও ছিল না যা সেলিমের কাছে অপরিচিত ছিল। এই আট দশ মাইল এলাকার মধ্যে সে তার ঘোড়া নিয়ে ইতিপূর্বে কয়েকবার চক্কর দিয়েছিল।

যখন সে গ্রামে প্রবেশ করলো, বৃষ্টির তেজ একেবারেই কমে গিয়েছিল, হালকা ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির পর্যায়ে নেমে এসেছিল। তবুও গ্রামের পথঘাটে লোকজন ছিল না। সে একটি বাড়ির দরোজায় করাঘাত করলো। ভেতর থেকে কুকুর ডাকতে লাগলো।

আশেপাশের বাড়িগুলিতে যেসব কুকুর আশ্রয় নিয়েছিল তারা সবাই সমস্বরে ডেকে উঠলো। একজন প্রৌঢ় বয়স্ক লোক দরোজা ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

সেলিম তার প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই জিজ্ঞেস করলো, চৌধুরী রহীম বখশের বাড়ি কোনটি?

এই গলির মোড়ে পাকা গেটওয়ালা দালানটিই তাঁর।

ভাই! একটু মেহেরবানী করে আমার সাথে চলুন। শহর থেকে ডাক্তার সাহেব তাঁর বাড়িতে এসেছেন। আমি তাঁর খোঁজে এসেছি।

চলো, বলেই গ্রাম্য লোকটি সেলিমের আগে আগে চলতে লাগলো। দেউড়ির সামনে পৌঁছে সে বললো, এটাই তাঁর বাড়ি।

দেউড়িতে এক ব্যক্তি চারপাইয়ের ওপর বসে হুক্কা টানছিল। গ্রাম্য লোকটি ডেকে বললো, ভাই ফজলদীন! ডাক্তার সাহেব এখানেই আছেন?

ডাক্তার সাহেব বৈঠকখানায় আছেন। ঐ ঘোড়ার ওপর ছেলেটি কে? এসো বেটা! ঘোড়া ভেতরে নিয়ে এসো। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

না, আমার খুব তাড়া আছে। তুমি ডাক্তার সাহেবকে ডেকে দাও।

তুমি কি তাঁকে নিতে এসেছো?

হাঁ, তাঁর ছেলে আহত। তুমি জলদি তাঁকে ডেকে আনো।

নওকর দৌড়ে ভেতরে গেলো। কিছুক্ষণ পর সে ফিরে এলো। তার হাতে ছিল লণ্ঠন এবং তার পেছনে ডাক্তার শওকত আসছিলেন।

শেখ ডাক্তার শওকত বাইরে উঁকি দিয়ে বললেন।

সেলিম বললো, ডাক্তার সাহেব! আপনি জলদি আমার সাথে আসুন। আরশাদ আহত।
আরশাদ আহত কিন্তু তুমি কে?
জী, আমি সেলিম। আরশাদ আজ আমাদের গ্রামে এসেছিল। সে আমাদের সাথে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলছিল এমন সময় গাছের সাথে ধাক্কা লেগে তার মাথা ফেটে গেছে। আমি শহর হয়ে এখানে এসেছি।
আরশাদ এখন কোথায়?
জী, সে আমাদের বাড়িতে। আপনি জলদি করুন।
ডাক্তার নওকরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, ফজলদীন তুমি এখনি চৌধুরী সাহেবের ঘোড়াটি তৈরি করে দাও।
সেলিম বললো, ডাক্তার সাহেব! ঘোড়া তৈরি করতে যথেষ্ট সময় লাগবে। আপনি আমার পেছনে বসে পড়ুন। আমরা মুহূর্তেই সেখানে পৌঁছে যাবো। আরশাদ বেহুশ হয়ে পড়ে আছে।
ডাক্তার শংকাগ্রস্ত হয়ে বললেন, থামো! আমার ব্যাগটি নিয়ে আসি।
ডাক্তার সাহেব নওকরের হাত থেকে বাতিটি ছিনিয়ে নিয়ে ভেতরের দিকে দৌড়ালেন এবং মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাগ নিয়ে এসে দাঁড়ালেন।
দিন, ব্যাগটি আমার হাতে দিন। সেলিম ডাক্তারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।
ডাক্তার সাহেব বিনা বাক্যব্যয়ে ব্যাগ তার হাতে তুলে দিল। সেলিম ঘোড়াটি দেউড়ির সিঁড়ির পাশে এনে দাঁড় করালো এবং একটি রেকাব থেকে নিজের পা বের করতে করতে বললো, আপনি এই রেকাবের মধ্যে পা রেখে আমার পেছনে বসুন।
নওকর বললো, আরে বেটা! তুমি ডাক্তার সাহেবকে সামনে বসিয়ে দিয়ে নিজে পেছনে বসো।
ডাক্তার সাহেব এ সময় পথ চিনতে পারবেন না।
ডাক্তার সেলিমের পিছনে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সেলিম ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে তার পিঠে গোড়ালী ঠুকে দিল।
ডাক্তার বললেন, আরে বেটা! একটু সামলে চলবে।
জী, আপনি চিন্তা করবেন না।
গ্রাম থেকে বের হবার পর ডাক্তার সাহেবের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের জবাবে সেলিম সমস্ত ঘটনা শুনিয়ে দিল।
তুমি কি আমাদের বাড়িতে আরশাদের আহত হবার কথা বলে এসেছো?
জী না, তাদের খেয়াল ছিল আরশাদ আপনার সংগে আছে। কাজেই আমি তাদের পেরেশান করা সংগত মনে করিনি।
তুমি খুব ভালো কাজ করেছো।
বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল এবং মেঘের ফাঁক দিয়ে কোথাও কোথাও তারাও উঁকি দিচ্ছিল। ব্যাং ও ঝিঁঝিঁ পোকারা আকাশ মাথায় তুলে নিয়েছিল। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত

ঘোড়া গর্দান লুকিয়ে রেখে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করছিল। তবুও যখনই সেলিম তার পেটে গোড়ালীর ঠোকর মারছিল সংগে সংগেই তার গতি দ্রুত হয়ে যাচ্ছিল। বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে ডাক্তার সাহেবের পোশাকও সেলিমের মতো কাদায় ডুবে গিয়েছিল।

আফজাল বাড়ির আরো কয়েকজন লোককে নিয়ে দরোজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল। ঘোড়ার পদশব্দ কানে আসতেই সে দূর থেকে চিৎকার করে উঠলো, সেলিম ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে এসোছো?

হাঁ চাচা নিয়ে এসেছি। সেও বুলন্দ আওয়াজে জবাব দিল।

অনেক দেরি করে ফেললে।

চাচা! ডাক্তার সাহেব নাংগলে গিয়েছিলেন। আরশাদ এখন কেমন?

আল্লাহর শোকর, তার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

সারা পথে সেলিম আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে যেসব দোয়া করেছিল এটা ছিল তারই জবাব। আফজাল এগিয়ে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরলো।

তারা ভেতরে প্রবেশ করে দেখলো, আরশাদ বিছানায় শুয়ে আছে এবং সেলিমের মা তার মাথা কোলের উপর নিয়ে তাকে বাতাস করছে। বাড়ির মেয়েরা তার চারপাশে বসে ও দাঁড়িয়ে আছে।

আফজালের ইশারায় মেয়েরা অন্য কামরায় চলে গেলো। আরশাদ তার বাপের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হয়ে চোখ নিচু করে নিল। ডাক্তার নিশ্চিন্তে তার পাশে বসতে বসতে বললেন, ঘোড়সওয়ার হওয়া সহজ ব্যাপার নয় বেটা!

ডাক্তার সাহেব যখন আরশাদের মাথায় পট্টি বাঁধছিলেন তখন সেলিম গোসল করে পোশাক পালটে মসজিদের দিকে যাচ্ছিল।

নামাযের পর যখন সে আরশাদের কামরায় প্রবেশ করলো, ডাক্তার সাহেব [illegible] দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, বেটা! কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

জী, নামায পড়তে মসজিদে গিয়েছিলাম।

ডাক্তার সাহেব সেলিমের দাদার দিকে তাকিয়ে বললেন, চৌধুরীজী! আপনার নাতি বড়ই বাহাদুর। যখন সে বললো, আমি শহর হয়ে এসেছি, আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

এ হচ্ছে আফজালের শাগরিদ। ঘোড়ার সাথে এর গভীর মিতালী। আল্লাহ আপনার ছেলেকে শেফা দান করুন। আমি খুবই পেরেশান ছিলাম। এখন আর কোনো বিপদ নেই তো ডাক্তার সাহেব?

না, আর বিপদের কোনো কারণ নেই। তবুও কাল ও পরশু তাকে আপনার মেহমান হয়ে থাকতে হবে। তৃতীয় দিন আমি তাকে বাড়িতে নিয়ে যাবো।

না, ডাক্তার সাহেব! তা হবে না। আপনার ছেলে সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত এখানে থাকবে। সেলিমের দাদী তার সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য একটি খাসি মানত করেছে। আপনার স্ত্রী ছেলেমেয়েদেরকে এখানে নিয়ে আসেন। আমাদের বাড়ির একটা অংশ

তাদের জন্য খালি করে দিচ্ছি। আপনাদের কোনো কষ্ট হবে না। যদি আপনি হাসপাতাল থেকে ছুটি না পান তাহলে আমাদের একটা ঘোড়া আপনার কাছে থাকবে। আপনি প্রতিদিন এসে একে দুবার দেখে যেতে পারবেন।

আফজাল বললো, ডাক্তার সাহেব! আরশাদের জন্য আপনার বাড়ির সবাই নিশ্চয়ই অনেক পেরেশান হয়ে আছে। আপনি তাদের সান্ত্বনার জন্য কোনো চিঠি লিখে দিলে আমি এখনি পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

ডাক্তার বললেন, আপনার ভাতিজা খুবই বুদ্ধিমান। সে সেখানে আরশাদের আহত হবার কথা বলেনি। তবে হ্যাঁ তার অনুপস্থিতিতে তারা পেরেশান হবে অবশ্যই।

সেলিম বললো, আমি আরশাদের আম্মীর সাথে ওয়াদা করেছিলাম সকাল হবার আগেই আমি তাঁকে আরশাদ কোথায় আছে তা জানিয়ে দেবো। আপনি একটা চিঠি লিখে দিলে সূর্য ওঠার আগেই আমি সেখানে পৌছিয়ে দেবো।

তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছো বেটা! ডাক্তার সাহেব স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন।

সেলিমের পরিবর্তে আফজাল বললো, যেখানে বন্ধুর জীবনের প্রশ্ন দেখা দেয় সেখানে ক্লান্তি হয়ে দাঁড়ায় একটা গৌন ব্যাপার।

ডাক্তার সাহেব সেলিমের দিকে তাকিয়ে বললো, আচ্ছা বেটা! আমি তোমাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। আমার ব্যাগে কিছু ওষুধ আছে, এখানে সেগুলির দরকার হবে। আরশাদের মা তোমাকে সে ব্যাগটি দিয়ে দেবে। ব্যাগটি সাবধানে আনতে হবে। আরশাদের মা যদি এখানে আসার জন্য জিদ করতে থাকে তাহলে তাকে বলবে, আমি সকাল আট নয়টার দিকে ঘরে পৌছে যাবো এবং তাদেরকে এখানে নিয়ে আসবো।

চৌধুরী রহমত আলী বললেন, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তারা সেলিমের সাথেই চলে আসবে। সেলিম! তুমি মজিদকেও সংগে করে নিয়ে যাও। যদি তারা আসার জন্য তৈরি হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে তোমরা লাগাম ধরে সাথে হেঁটে চলে আসবে।

চৌধুরী রহমত আলীর ধারণা সত্য প্রমাণিত হলো।

সকালেই আরশাদের মা তাঁর স্বামীর চিঠি পড়ার এবং সেলিম ও মজিদকে কয়েকটি প্রশ্ন করার পর ছেলে মেয়েদের নিয়ে তাদের সাথে আসার জন্য তৈরি হয়ে গেলো। আরশাদের ছোটভাই আমজাদ মজিদের ঘোড়ার পিঠে বসলো তার মায়ের সাথে। ওদিকে আরশাদের দুই বোন ইসমত ও রাহাত সেলিমের ঘোড়ার পিঠে বসলো। সেলিম ও মজিদ তাদের ঘোড়ার লাগাম ধরে আগে আগে চলতে লাগলো। নওকর ওষুধের ব্যাগ নিয়ে তাদের পেছনে পেছনে আসতে লাগলো।

পথে আরশাদের মা বললো, বেটা! তোমার ঘোড়া বড়ই ভয়ংকর মনে হচ্ছে, এর লাগাম যেন কখনো হাতছাড়া হয়ে না যায় দেখো।

জী, আপনি চিন্তা করবেন না। এ ঘোড়া আমাকে ছেড়ে কোথাও পালাবে না।

বেটা! তবুও এর লাগাম সাবধানে ধরে থাকবে। পশুর ওপর কোনো ভরসা নেই।

জী, আপনি চিন্তা করবেন না।

কিছুক্ষণ ধরে আরশাদের মা আরশাদের ব্যাপারে মজিদ ও সেলিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো। ইসমত রাহাতের কানে কানে কিছু বললো। সংগে সংগেই সে অভিযোগের সুরে মাকে বললো, আম্মি ইসমত বলছে, এ ঘোড়া নাকি আমাকে খেয়ে ফেলবে।

মজিদ ও সেলিম হেসে ফেললো। ইসমতের চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। রাহাতের বাহুতে চিমটি কাটলো সে। সে চিৎকার করলো, আম্মী! ইসমত আমাকে মারছে।

কি করছো ইসমত? মা ধমক দিয়ে বললো।

ইসমত ছিল নয় বছরের। রাহাত তার চেয়ে তিন বছরের ছোট। আর আমজাদ সেবার চার বছরে পড়েছিল। মায়ের ধমক খাওয়ার পর ইসমত কিছুক্ষণ নিরব থাকলো। তারপর রাহাতের কানে কানে বললো, ওদের গ্রামে ভূত আছে।

তুমি মিথ্যা বলছো। রাহাত বেপরোয়া হয়ে বললো।

তারপর রাহাত সত্যিই কিছু পেরেশান হয়ে সেলিমকে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের গ্রামে কি ভূত আছে?

না, সেলিম জবাব দিল।

সাপ আছে?

বাঘও নেই।

সাপ আছে? রাহাত কিছু চিন্তা করার পর জিজ্ঞেস করলো। ইসমত চাপাস্বরে বললো, গ্রামে বড় বড় সাপ আছে। তারা বাচ্চাদের খেয়ে ফেলে।

রাহাত আবার মায়ের কাছে ফরিয়াদ করলো, আম্মি! আপাজান বলছে কিনা আমাকে সাপ খেয়ে ফেলবে। আমি গ্রামে যাবো না।

মা ইসমতকে ধমকালো। সেলিম রাহাতকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, সাপ গ্রামে আসে না।

পথে বর্ষার পানি ভরা নালা এসে গেলো। ইসমত বললো, এবার তুমি ডুবে যাবে।

সত্যিই কি আমি ডুবে যাবো? রাহাত চিন্তান্বিত স্বরে সেলিমকে জিজ্ঞেস করলো।

না, এ পানি তেমন গভীর নয়। তোমার বোন তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে।

আরশাদের মা ও তার ভাইবোনেরা অতি দ্রুত সেলিমদের পারিবারিক পরিবেশের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। সেলিমের ছোট ভাই ইউসুফ আমজাদকে সাথে নিয়ে তাদের সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সাথে খোলাধূলায় মেতে উঠলো। ইসমত ও রাহাত লাভ করলো আমিনা, সুগরা ও যুবাইদার মতো বান্ধবী।

আরশাদের ব্যাপারে ডাক্তার সাহেব আগেই ঘোষণা করেছিলেন তার অবস্থা সন্তোষজনক এবং তিনি নিজে দুপুরের পরে ফিরে আসবেন বলে ওয়াদা করে শহরে চলে গিয়েছিলেন।

যুবাইদার পীড়াপীড়িতে সেলিম বাইরের হাবেলীতে গাছের শাখায় দোলনা বেঁধে দিয়েছিল। মেয়েরা সেখানে জমা হয়ে গেলো। যেহেতু ডাক্তার সাহেবের নির্দেশ ছিল আরশাদের সাথে বেশি কথা বলা যাবে না, তাই গ্রামের মেয়েরা যাতে তার চারদিকে ভীড় না জমাতে পারে সেদিকে আরশাদের মা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। নিজে আরশাদের মায়ের সাথে সারাদিন আরশাদের কাছে বসে থাকলো। সেলিমের জন্য নিরব থাকার এ হুকুম বড়ই কষ্টকর ছিল। সে কামরায় প্রবেশ করতো তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর বাইরে চলে যেতো। যতক্ষণ সে কামরায় থাকতো আরশাদের দৃষ্টি তার ওপর কেন্দ্রীভূত থাকতো।

আসরের সময় সেলিম তার কামরা থেকে বের হয়ে নামাযের জন্য যাচ্ছিল, আরশাদ দুর্বল স্বরে ডেকে বললো, সেলিম!

সেলিম পেছন ফিরে তার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো। আরশাদ বললো, কোথায় যাচ্ছো? একটু বসো না!

সেলিম তার বিছানায় বসতে বসতে বললো, আমি নামাযে যাচ্ছিলাম।

আরশাদ তার হাত ধরে চাপ দিতে দিতে বললো, আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। রাতে আমাকে গল্প শোনাবে না?

সেলিম এখন কোথাও থেকে গল্প শোনাবার তাগাদা এলে ক্ষেপে যেতো। কিন্তু আরশাদের আবেদনে সে মুচকি হেসে বললো, শোনাবো।

রাতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। ছিটেফোটা বৃষ্টি হচ্ছিল। কামরার মধ্যে ছিল গুমোট ভাব। তাই আরশাদকে বারান্দায় শুইয়ে দেয়া হয়েছিল। ডাক্তার সাহেব সন্ধ্যার সময় ফিরে এসেছিলেন। তিনি খানাপিনা শেষ করে বাড়ির লোকদের সাথে বাইরের হাবেলীর প্রশস্ত বারান্দায় শুয়েছিলেন।

সেলিম এশার নামাযের পরে আরশাদের কাছে বসে গল্প বলতে শুরু করেছিল। আমিনা, সুগরা, যুবাইদা এবং আরশাদের দুই বোন পাশের বারান্দায় চারপাইয়ের ওপর বসে গপগুজারী করছিল। আচানক যুবাইদার কানে সেলিমের আওয়াজ এলো। সে বললো, আমিনা! মনে হচ্ছে ভাইজান গল্প শোনাচ্ছে।

ছুরুর্রের মধ্যে আমিনা, সুগরা ও যুবাইদা সেলিমের চারদিকে জমা হয়ে গেলো।
আমিনা বললো, ভাইজান! আমরাও শুনবো। গোড়া থেকে শোনাও।

সুগরা বললো, ইসমত এসো, তুমিও বসো এখানে। সেলিম ভাই বড় চমৎকার গল্প শোনান।

সেলিম কিছুক্ষণ টালবাহানা করলো। কিন্তু ইসমত ও রাহাত যখন কাছাকাছি এসে বসলো তখন আর সে অস্বীকার করতে পারলো না। সে বললো, তোমাদের কেউ শোরগোল করলে কিন্তু তাকে পিটনী দেবো।

রাহাত শিশুসুলভ কণ্ঠে বললো, আমাকে মারলে কিন্তু আমি ঘরে চলে যাবো।

সেলিমের মা ও চাচীরা আরশাদদের অন্যদিকে চারপাইয়ের ওপর বসে কথা বলছিল তারা হেসে ফেললো।

সেলিম বললো, না, তোমাকে মারবো না। এসো, তুমি এখানে বসো।

রাহাত নির্দ্বিধায় সেলিমের পাশে বসে পড়লো। আমিনা একটি চারপাই টেনে সেলিমের কাছে আনলো এবং অন্য মেয়েরা তার ওপর বসলো।

সেলিম গল্প শুরু করে দিল। কিছুদিন থেকে নিতান্ত বাধ্যবাধকতার কারণে কখনো নিজের বোনদেরকে এড়াবার জন্য সে সংক্ষিপ্ত কাহিনী শুনিয়ে দিয়ে চলছিল। কিন্তু আজ দীর্ঘদিন পর সে এ কাজে আগ্রহ দেখাচ্ছিল। প্রথমে সে ভাবছিল হয়তো আরশাদ তার গল্পে বিশেষ আগ্রহী হবে না। তাই কয়েকবার বাকিটা আগামী রাতে বলার ওয়াদা করে গল্প খতম করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আরশাদ প্রত্যেকবার বলছিল, না ভাই! সবটুকু শোনাও।

ইসমতের ব্যাপারেও সেলিমের ধারণা ছিল সেও তার ভাইয়েরই মতো বুদ্ধিমতী হবে। গল্প শুরু হবার আগেই সে তার ঠোঁটে একটুকরো দুষ্টমি ভরা হাসি দেখেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চেহারার গাম্ভীর্য একথার জানান দিচ্ছিল যে, সে গল্পটিতে বেশি প্রভাবিত হয়েছে।

সেলিমের কাহিনীর শাহজাদা কোনো মরুভূমির বুকে পিপাসায় ছটফট করছিল। ওদিকে প্রদীপের আলোয় ইসমতের সরল দৃষ্টি যেন একথা বলছিল হায়। যদি আমি তাকে পানি পান করাতে পারতাম। সেলিমের কাহিনীর রক্তপিপাসু আততায়ী শাহজাদাকে জিঞ্জীর দিয়ে বেঁধে ফেলেছিল এবং ইসমতের শোকার্ত চেহারা যেন একথাই বলতে চাচ্ছিল যে, হায়! যদি কেউ শাহজাদাকে জাগিয়ে, দিতো এবং যখন কোনো নেকদিল পুরুষ তার জিঞ্জীর খুলে দিচ্ছিল তখন ইসমতের খুবসুরাত চেহারায় আনন্দের জোয়ার দেখার মতো ছিল।

সেলিম মনে মনে কাহিনীর যে পরিসমাপ্তি ভেবে রেখেছিল তা ছিল বড়ই বেদনা বিধুর। শাহজাদা বিয়ের দিন ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মরে যাবে এবং শাহজাদী তার জানাযা দেখে ছাদের ওপর থেকে নিচে লাফ দেবে।

কিন্তু সেলিমকে ইসমতের কথা ভাবতে হলো। শাহজাদা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল এবং শাহজাদীর আর মহলের ছাদ থেকে ঝাঁপ দেবার দরকার পড়লো না।

সেলিম কাহিনী শেষ করলে মেয়েরা আর একটা কাহিনীর দাবী জানালো। সেলিমের মা বললো, না, আজ আর নয়, দ্বিতীয় কাহিনী আগামীকাল হবে। এখন আরশাদকে আরাম করতে দাও।

সেলিম বালাখানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। বাইরের হাবেলিতে বয়স্কদের মহাফিল গুলজার ছিল এবং চাচা ইসমাঈলের অট্টহাসি শোনা যাচ্ছিল। মজিদ ওখানে আছে, একথা চিন্তা করে সেলিম সেখানে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু ক্লান্তির অনুভূতি তাকে বিছানায় শুইয়ে রাখলো। দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লো সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌছে গিয়েছিল সে স্বপ্নের মনোরম উপত্যকায়। সে ছিল একজন শাহজাদা। এক অনিন্দ সুন্দরী শাহজাদীকে উদ্ধার করছিল সে ভয়ংকর হিংস্র পশুর মুখ থেকে। এক ভয়াবহ জিন শাহজাদীকে উঠিয়ে নিয়ে এমন এক পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃংগে রেখে দিয়েছিল যেখানে যাবার সমস্ত পথই ছিল রুদ্ধ এবং সে বাতাসে উড়ে সেখানে যাচ্ছিল। সে মরুভূমিতে পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করছিল এবং শাহজাদী তার জন্য পানি আনছিল। সেই শাহজাদীর চেহারা এই মেয়েটির সাথে হুবহু মিলে যায় যে গতরাতে সাগ্রহে ও গভীর মনোযোগ সহকারে তার কাহিনী শুনছিল।

সকাল হলো। আধো ঘুমের মধ্যে মনে হলো তার চোখে মুখে কেউ পানির ছিটে দিচ্ছে। বিড়বিড় করতে করতে উঠে বসলো সে। দেখলো সামনে আমিনা পানির লোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমিনার বাচ্চা দাঁড়াও, বলে রেগে মেগে উঠে বসলো সে। কিন্তু তার পেছনে যুবাইদা ও ইসমতকে দেখে তার রাগ পানি হয়ে গেলো।

আমিনা বললো, বাহ! ভালো করলে গাল খেতে হয়। নামাযের সময় চলে যাচ্ছে আর তুমি আরামে ঘুমুচ্ছো।

সেলিম কোনো কথা না বলে তার হাত থেকে পানির লোটা নিয়ে নিল। বাইরে যেতে যেতে এক মুহূর্তের জন্য থেমে ইসমতের দিকে তাকালো। তার মধ্যে দেখতে পেলো তার স্বপ্নের শাহজাদীর চেহারা।

ছ'দিন পর আরশাদের বাপ তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আরশাদের আম্মা বিদায় নেবার সময় তাদের বাড়িতে মাঝে মধ্যে যাবার জন্য সেলিমের আম্মা ও চাচীদের থেকে বারবার ওয়াদা নিয়ে নিল। আমিনা, সুগরা ও যুবাইদার কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে ইসমত ও রাহাতের চোখে অশ্রু দেখা গেলো। ফলে সেলিমের দাদীকে ওয়াদা করতে হলো যে, তিনি তাদের সেহেলীদেরকে কখনো কখনো সেলিম ও মজিদের সাথে শহরে পাঠিয়ে দেবেন।

শহর থেকে আরশাদের মা দুতিন সপ্তাহ পরপর একবার অবশ্যই সেলিমদের বাড়িতে আসতো। তার আসতে দেরি হয়ে গেলে সেলিমের মা ও চাচীরা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে শহর চলে যেতো।

আরশাদের বাপ তাকে বাইসাইকেল কিনে দিয়েছিল। একারণে প্রায় প্রত্যেক ছুটিতে সে গ্রামে এসে যেতো এবং সে না এলে সেলিম ঘোড়ায় চড়ে তাদের বাড়িতে চলে যেতো।

মজিদ ছুটির দিন গ্রামের ছেলেদের সাথে কবাডি খেলতো, কুশতি লড়তো এবং রাখালদের কাছে পোলো খেলা শিখতো। সেলিমের কার্যক্রমের প্রতি তার আগ্রহ ছিল কম।

ফেব্রুয়ারীর শেষ দিন ছিল। পাতাঝরা মওসুম শেষে এখন দেখা যাচ্ছিল গাছে গাছে লালচে কুঁড়ির সমারোহ। আলুচা, নাশপাতি ও আড়ু গাছের শাখায় শাখায় ফুলের বন্যা। কুলগাছগুলি ফলভারে নত। শস্যক্ষেতগুলি হলুদ বর্ণের গমের শীষে তরঙ্গায়িত। সরিষাক্ষেত ফুলে ফুলে ভরা। খালি ক্ষেতগুলিও ভরে উঠেছিল নানা রঙের সবুজ ঘাস ও লতাপাতায়। মোটকথা এমন কোনো জায়গা ছিল না যেখানে বসন্তের সবুজ আস্তরণ বিছানো ছিল না। আগাছা ও লতাগুল্মগুলিতেও নানা বর্ণের ফুলের হাসি প্রকৃতিকে মনোরম করে তুলেছিল। ছোট্ট লাল ফুলগুলি যাদের জীবনকাল মাত্র একটি সূর্যোদয় ও একটি সূর্যাস্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ঘাসের সবুজ গালিচার ওপর যাদেরকে ইয়াকুত, পদ্মরাগমনি ও আকীক পাথরের রক্তবুটি মনে হয় যেন প্রকৃতির এক মনোমুগ্ধকর চিত্র এঁকে চলছিল। এদের প্রত্যেকে মূককণ্ঠে বলে চলছিল, আমার দিকে দেখো, আমার ঘ্রান নাও, আমাকে চুম্বন করো। তুমি বিভ্রান্তের মতো কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছো? তুমি কাকে খুঁজে ফিরছো? আমার জীবন স্বল্প সময়ের। কিন্তু তোমার জন্য আমি একটি চিরন্তণ সত্যের পয়গম নিয়ে এসেছি। আমাকে কেউ বানিয়েছেন। তিনি আমাকে বর্ণ, রূপ ও গন্ধ দিয়েছেন। আমি তোমাদের কাছে মহান স্রষ্টার পয়গম নিয়ে এসেছি, যার হুকুমে বায়ু চলে, মেঘ উড়ে বেড়ায়, বৃষ্টিপাত হয় এবং মাটি তার বুকের গোপন সম্পদ উদগীরণ করতে বাধ্য হয়। সেই হাতকে চিনে রাখো যে আমাকে মৃত্তিকার গভীর অন্ধকার গর্ত থেকে টেনে বাইরে বের করে এনেছে, যার হাতের সোহাগ স্পর্শ আমার মুখে হাসি ফুটিয়েছে। এই হাতই রাতের আকাশে লক্ষ তারার প্রদীপ জ্বালায় আবার প্রভাতে সূর্যের চেহারা থেকে নেকাব সরিয়ে দেয়। তুমি কোথায় যাচ্ছো? বিভ্রান্তের মতো কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছো?

আমার দিকে তাকাও!

এ মওসুমে সেলিম গ্রামেই তার সবটুকু সময় কাটাতো। অতি প্রত্যুষে উঠে নামায পড়ে ভ্রমণে বের হয়ে পড়তো সে। গ্রামের বাইরে কোনো ফসলের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের বরফাবৃত শৃংগের পেছন থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখতো। সকালের শিশিরস্নাত ফুল ছিঁড়তো। আকাশে পান কৌড়িদের ঝাঁক উড়ে যেতো বিয়াসের কিনারে ঝিলগুলির দিকে। ময়ূরগুলি ফসলের ক্ষেতে খাবার খোঁজার জন্য গভীর জংগল থেকে বাইরে বের হয়ে আসতো। এসব মনোরম দৃশ্য দেখার পর সে লাফাতে লাফাতে দৌড়াতে দৌড়াতে ঘরে ফিরে আসতো এবং খানা খাবার পর স্কুল রওনা হয়ে যেতো।

এক রোববার সেলিম বাড়িতে আরশাদের ইন্তিজার করতে থাকলো। কিন্তু সে ওয়াদা মোতাবিক আসতে পারলো না। পরদিন সেলিম স্কুলে গেলো। আরশাদকে চিন্তান্বিত দেখে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার আরশাদ? তোমাকে কি কেউ মেরেছে?

আরশাদ কোনো জবাব দিল না। জবাব দেবার পরিবর্তে বড় বড় দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। সেলিম দুশ্চিন্তাগ্রস্তের মতো প্রশ্ন করলো আরশাদ! বলতো বাড়ির সব খবর ভালোতো?

সে জবাব দিল, সেলিম! আব্বাজানের বদলির হুকুম এসে গেছে। আমরা পরশু এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

কোথায়? সেলিম পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করলো।

অমৃতসর।

সেলিম অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারছিল না তার কথার কি জবাব দেবে। ইতিমধ্যে স্কুলের ঘন্টা বেজে গেলো। দোয়ার পর তারা ক্লাসরুমে প্রবেশ করলো। শিক্ষকরা এসে যার যার বিষয় পড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু সেলিমের মাথায় বারবার চক্কর কাটছিল অমৃতসর শব্দটি। কখনো কখনো আরশাদের দিকে তাকিয়ে তাকে যাচাই করতো, সে যথার্থই বলেছে না ঠাট্টা করছে। কিন্তু আরশাদের ম্রিয়মান ও শোকার্ত চেহারা তার সন্দেহের প্রতিবাদ করতো।

ছুটির পর যখন ছাত্ররা নিজেদের ব্যাগ নিয়ে বাইরে বের হয়ে গেলো তখন আরশাদ ও সেলিম নিজেদের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে পরস্পরকে দেখতে লাগলো। মজিদ ও অন্যান্য সাথিরা বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের অপেক্ষা করতে লাগলো।

মজিদ দরোজায় দাঁড়িয়ে ডাক দিল, এসো সেলিম! নয়তো আমরা চলে যাচ্ছি।

'আসছি', বলে সেলিম ব্যাগ হাতে তুলে নিল কিন্তু দুতিন কদম চলার পর দাঁড়িয়ে পড়লো এবং আরশাদের দিকে দেখতে লাগলো।

আরশাদ বললো, আমাদের বাড়িতে যাবে না? আম্মীজান তোমাকে ডেকেছেন।

চলো।

আরশাদ ও সেলিম বাইরে বের হয়ে এলে মজিদ বললো, তোমাদের কথা শেষই হয় না।

সেলিম বললো, মজিদ আমি একটু আরশাদদের বাড়ি যাচ্ছি।

আমি আগেই জানতাম।

আম্মিজান সেলিমের হাতে একটা বিশেষ পয়গাম পাঠাতে চান। চলো তুমিও আমাদের বাড়ি।

রহীম গ্রামের একটি ক্ষেতে তিলির ধরার জন্য ফাঁদ পেতে রেখে এসেছিল এবং তার চিন্তা ছিল সন্ধ্যার আগে সেখানে পৌঁছুতে হবে। তাই সে বললো, না ভাই! আমি যাচ্ছি না।

সেলিম আরশাদের সাথে চললো তাদের বাড়ির দিকে। গেটের কাছে পৌঁছে আরশাদ বললো, তুমি একটু দাঁড়াও। আমি একটা তামাশা দেখাচ্ছি।

সেলিম দেয়ালের পাশে দাঁড়ালো। আরশাদ হাসতে হাসতে বাড়িতে প্রবেশ করলো। তার মা চেয়ারে বসে সোয়েটার বুনছিল। আরশাদকে দেখেই বলে উঠলো, কেটা আমি তোমাকে বলেছিলাম সেলিমকে সাথে করে নিয়ে আসবে।

আম্মিজান! সে আসতে চায়না। আরশাদ তার চেহারায় দুঃখের ভাব ফুটিয়ে তুললো।

আমরা চলে যাচ্ছি, একথা তাকে বলোনি?

বলেছিলাম।

ইসমত দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে এসে বললো, আম্মিজান! তাকে বললে সে নিশ্চয়ই আসতো। ভাইজান তাকে বলেইনি।

আরশাদ বললো, সে বলছিল, ইসমত হচ্ছে একটা পেত্নী। আমি গেলেই সে আমাকে জ্বালাতন করে। কাজেই আমি যাবো না।

আপা পেত্নী, আপা পেত্নী! রাহাত তালি বাজাতে বাজাতে বলতে লাগলো।

তুমি মিথ্যা বলছো। সে আমাকে পেত্নী বলতে পারে না।

যদি সে তোমার মুখের ওপর তোমাকে পেত্নী বলে, তাহলে বিশ্বাস করবে।

আরশাদের ঠোঁটে হাসির আভা দেখে ইসমত গেটের দিকে দৌড়ালো। সেলিম তাকে দেখে হেসে ফেললো। ইসমত মুখ ভ্যাংচাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তার চোখে আনন্দের ঝিলিক খেলে গেলো।

সেলিম তার ব্যাগটি ইসমতের মাথার ওপর রেখে দিল। মুখটি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে সে হাসি লুকাচ্ছিল।

দেখো, ফেলে দিয়ো না, তাহলে আমার শ্লেট ভেংগে যাবে। এই বলে তার দুই হাত তুলে নিল। ইসমত এক মুহূর্তের জন্য নীরব নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিন্তু যখন ব্যাগ পড়ে যাবার উপক্রম হলো তখন দুহাত দিয়ে তা ধরে হাসতে লাগলো।

সেলিম সামনে এগিয়ে গিয়ে আরশাদের মাকে সালাম করলো।

বেঁচে থাকো বেটা। বসো। মা একটি মোড়ার দিকে ইংগিত করলেন। সেলিম বসলো। রাহাত তার হাত ধরে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে করতে বললো, আপা পেত্নী! তাই না ভাইজান?

না, পেত্নীর মাথার চুল চারদিকে ছড়িয়ে থাকে, বাতাসে ওড়ে এবং সে বুঝতে পারে না।

রাহাত পেরেশান হয়ে নিজের পায়ের দিকে দেখলো এবং মাথার ছড়ানো বিক্ষিপ্ত চুলগুলি দুহাত দিয়ে ঠিক করতে করতে নিজের কামরার দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেলো।

মা বললো, ইসমত যাও, সেলিমের জন্য গাজরের হালুয়া নিয়ে এসো।

আরশাদ এক কোণ থেকে একটি তেপায়া তুলে নিয়ে সেলিমের সামনে রেখে দিল এবং চেয়ার টেনে নিয়ে তার সামনে বসে পড়লো।

বেটা! চা খাবে?

না, থাক আম্মাজান!

ইসমত হালুয়ার প্লেট এনে তেপায়ার ওপর রেখে দিল। মা বললো, বেটা! মজিদকেও নিয়ে আসতে।

আমি বলেছিলাম। কিন্তু সে আসেনি।

সেলিম বললো, সে তিলির ধরার জন্য ফাঁদ পেতে এসেছে, সন্ধ্যায় অনেক তিলির ফাঁদে আটকে যায়। কাজেই সে সেখানে যাবার চিন্তায় মশগুল ছিল।

বেটা! আরশাদ তোমাকে নিশ্চয়ই বলেছে যে, তার আব্বাজান অমৃতসরে বদলি হয়ে যাচ্ছেন।

জী হ্যাঁ।

তিনি দশ দিনের ছুটি নিয়েছিলেন। আমরা মনে করেছিলাম যাবার আগে তোমাদের গ্রামে আমরা দুতিন দিন থাকবো। তারপর তোমার মা ও চাচীদের এখানে আসার দাওয়াত দেবো। কিন্তু জালিন্ধরে আরশাদের মামুর শাদী হচ্ছে এবং পরশু আমাদের সেখানে যেতে হচ্ছে। তাই আগামী কাল সকালে আমি তোমাদের গ্রামে যাবো এবং বিকালেই ফিরে আসবো।

ইসমত বললো, আম্মীজান! আমিও যাবো আপনার সাথে।

আমরা সবাই যাবো। তবে সম্ভবত তোমার আব্বাজান লোকদের নিয়ে মালসামান বাঁধা ছাদার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে যেতে পারবেন না।

সেলিম বললো, আমি ঘোড়া নিয়ে আসবো।

না, আমরা টাংগায় চড়ে যাবো। পাকা রাস্তায় টাংগা থেকে নেমে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে যাবো। ফেরার পথে পায়ে হেঁটে আসবো। একটা দীর্ঘ ভ্রমণ হবে যাবে।

সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে সেলিম আরশাদের মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজেদের গ্রামের দিকে চললো। সূর্য পশ্চিম দিগন্ত স্পর্শ করছিল এবং সূর্যের রক্তিমাভা কাংড়ার পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে বরফাবৃত পর্বত শৃংগগুলিকে এক একটি স্বর্ণস্তূপে পরিণত করেছিল। পাখিরা দলে দলে কিচির মিচির করতে করতে বাসায় ফিরছিল। পানকৌড়ি ও হংস বলাকারা অর্ধচন্দ্রাকারে দলবদ্ধ হয়ে কোনো

বকেরা ঠিকানায় উড়ে যাচ্ছিল। ময়ূররা দলে দলে গম, ছোলা ও সর্ষে ক্ষেতগুলি থেকে বের হয়ে গাছে গাছে সমবেত হচ্ছিল।

সূর্য ডুবে গিয়েছিল, কিন্তু তার বিদায়ী হাসি এখনো পাহাড়ের শৃংগে শৃংগে নৃত্য করে বেড়াচ্ছিল।

সেলিম পথে একটি রেহাটে অযু করে নামায পড়লো এবং তারপর ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে রওনা হয়ে গেলো। পাকদণ্ডীতে একটি খরগোশ তাকে দেখে দৌড়ালো কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করলো না সে। নালার কিনারায় এক জোড়া সারশ মুখ উঠিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলো। কিন্তু সে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলো না। সে পেরেশান ছিল। আরশাদ চলে যাচ্ছিল। আমজাদও যাচ্ছিল। ইসমত এবং রাহাতও চলে যাচ্ছিল। তার জীবনের উচ্ছল হাসি আনন্দগুলি ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছিল।

পরদিন নিজ গ্রাম থেকে এক মাইল দূরে সড়কের কিনারে দাঁড়িয়েছিল সে।

টাংগার অপেক্ষা করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লো তখন সর্ষে ক্ষেতে নেমে সর্ষে ফুল ছিঁড়তে লাগলো। ফুল দিয়ে তিনটি তোড়া তৈরি করলো। সবচেয়ে বড়টা ইসমতের জন্য তার চেয়ে ছোটটা রাহাতের জন্য এবং সবচেয়ে ছোটটা আমজাদের জন্য। তারপর কি মনে করে বড় তোড়াটি উঠিয়ে নিয়ে বিভিন্ন লতা গুল্ম থেকে রং বেরংয়ের ফুল ছিঁড়ে তাতে রাখতে লাগলো। তারপর তোড়াটি পথের পাশে রেখে বসে পড়লো এবং শহরের দিকে দেখতে লাগলো।

হঠাৎ দু'ফার্লং দূরে একটা টাংগা দেখা গেলো। ধীরে ধীরে টাংগা নিকবর্তী হতে লাগলো। টাংগা কাছে এসে যেতেই সে ফুলের তোড়াগুলি হাতে তুলে নিল। কিন্তু আবার কিছু চিন্তা করে বড় তোড়াটি গমক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে ফেললো। টাংগা এসে থেমে গেলো পাকদণ্ডীর কাছে। আমজাদ ও রাহাত টাংগা থেকে নামতেই তার হাত থেকে ফুলের তোড়া দুটো ছিনিয়ে নিল এবং ইসমত কিছুটা পেরেশান হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

রাহাত বললো, আপাকেও একটা ফুলের তোড়া দাও!

আমি ফুল নেবো না, ইসমত মুখ বিকৃত করে বললো।

আরশাদের মা বললো, বেটা! তুমি কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছো?

আমি অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

আরশাদ বললো, আমাদের দেরী হয়ে গেছে। আমি মনে করেছিলাম তুমি ঘোড়ায় চড়ে শহরে পৌঁছে যাবে।

যদি আমি এখান পর্যন্ত পায়ে হেঁটে না আসতাম তাহলে হয়তো তাই করতাম।
আরশাদের মা কোচোয়ানকে বললো, এখন তুমি যাও। বিকালে আমরা পায়ে হেঁটে ফিরে যাবো।

আরশাদ আমজাদের আঙুল ধরে আগে আগে চললো এবং রাহাত ও ইসমত চললো তার পেছনে পেছনে। সেলিম ক্ষেতের মধ্যে লুকানো ফুলের তোড়াটি এনে পেছন থেকে ইসমতের মাথায় রাখলো। ইসমত প্রথমে চমকে উঠলো। তারপর সেলিমের দিকে তাকিয়ে দুহাতে ফুলের তোড়াটি ধরে হেসে উঠলো।

গ্রামে পৌছে রাহাত ও ইসমত যুবাইদা ও সেলিমের চাচাত বোনদের সাথে খেলায় মেতে উঠলো এবং আরশাদ, সেলিম, মজিদ, গোলাপ সিং ও অন্যান্য ছেলেরা মিলে ফসলের ক্ষেতের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ওদিকে বাড়ির সব মেয়েদের ইচ্ছা ছিল, আরশাদের মা অন্তত এক রাত তাদের সাথে থাকুক। কিন্তু আরশাদের মা যখন বললো, আগামীকাল সকালে ১০ টার গাড়িতে তারা চলে যাচ্ছে তখন আর কেউ পীড়াপীড়ি করলো না।

আরশাদের মা অমৃতসর থেকে নিয়মিত পত্রলেখার এবং মাঝে মধ্যে দেখা করতে আসার ওয়াদা করলো। ইসমত সেলিমের ছোট বোন যুবাইদা এবং তার চাচাত বোনদের কাছে পত্র লেখার ওয়াদা করলো। ফিরে যাবার প্রস্তুতি করার সময় আরশাদের মা সেলিমের মাকে সম্বোধন করে বললো, বোন! সেলিমকে আমাদের সাথে যাবার অনুমতি দিন। আজ রাতে সে আমাদের সাথে থাকবে। সকালে আমরা গাড়িতে উঠলে সে স্কুলে চলে আসবে।

মা সেলিমকে অনুমতি দিল।

রাতে আরশাদ, ইসমত, রাহাত ও আমজাদ সেলিমের চারপাশে বসে কাহিনী শুনছিল। অন্য কামরায় ডা. শওকত আরাম কেদারায় বসে কিতাব পড়ছিলেন। আরশাদের মা তার পাশে বসে সোয়েটার বুনছিল।

সেলিম বড়ই প্রতিভাবান ছেলে, ডাক্তার তার স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো। আজ আমি আরশাদের সার্টিফিকেট নিতে গিয়েছিলাম। সেখানে হেড মাস্টারও সেলিমের তারিফ করছিলেন।

আরশাদের মা মুচকি হেসে বললো, আজ আমি তার মাকে বললাম, ছেলের জন্য যখন বউ তালাশ করতে বের হবেন তখন প্রথমে আমাদের ঘরে আসবেন। তাতে তিনি খুশি হয়ে ইসমতকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন এবং বললেন, বোন! আমার তালাশ করার প্রয়োজন নেই। আমি আমার বউ নির্বাচন করে নিয়েছি। চাইলে এখনি মিষ্টি বিতরণ করতে পারি।

ব্যস, সেই মেয়েলী কথাবার্তা। বাচ্চা এখনো কোলে দুলছে আর ওদিকে চলছে তার বিয়ের প্রস্তুতি!

ঠিক আছে একটু উঠে দেখো তো, ওদের দুজনকে একসাথে কেমন মানায়। আমি বলতে চাই, দুতিন বছরের মধ্যে কথাবার্তা পাকাপাকি হয়ে যাওয়া দরকার।

আজকাল প্রথমত ভালো খান্দান পাওয়াই যায় না আর পাওয়া গেলেও হয়তো দেখা যাবে ছেলে উৎসন্নে গেছে।

ডাক্তার সাহেব একটু নরোম হয়ে বললেন, খান্দান ভালই, এখন ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা দিলে তখন দেখা যাবে।

তারা কোনো অক্ষম গরীব পরিবার নয়। তার মা বলছিল আমার ছেলেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠাবো।

ডাক্তার সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, তাহলে হয়েছে, একবার বিলাতে গেলে তারপর তার ব্যাপারে আর কোনো ভালো আশা করা যাবে না। তখন সে না হবে ওদের না আমাদের।

আল্লাহর ওয়াস্তে কোনো ভালো ওয়াদা করো।

পরদিন সেলিম স্টেশানে তাদেরকে বিদায় জানাচ্ছিল। গাড়ি ধোঁয়া উড়িয়ে এলো এবং তারা সবাই সওয়ার হয়ে গেলো। তাদের নওকর ট্রাক ভর্তি মালসামান নিয়ে সকালেই রওনা হয়ে গিয়েছিল।

গাড়ি সিটি বাজালো। আরশাদের বাপ বাইরে মুখ বাড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে খোদা হাফেজ বললেন। সেলিম আরশাদের সাথে কোলাকুলি করে দ্রুত তার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিল। আরশাদের চোখে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। দ্রুত হাত ছাড়িয়ে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল সে। জানালার কামরা থেকে ইসমত ও তাহেরা মুখ বাড়িয়ে তাকে দেখছিল। গাড়ি দ্বিতীয় সিটি বাজালো এবং তারপর ইঞ্জিন হিশ হিশ হিশ হিশ করে চলতে শুরু করলো। ইসমত তার ওড়না দিয়ে চোখ মুছছিল। একসময় গাড়ি চলে গেলো এবং সেলিমের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

আরে তুমি কাঁদছো? কেউ তার কাঁধে হাত রেখে বললো।

মজিদের আওয়াজ চিনতে পেরে সে জলদি অশ্রু মুছে নিয়ে কোনো কথা না বলে ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে স্কুলের পথে চললো।

২

সময় এগিয়ে চললো। জীবনের রাজপথে সহজ সরল বিচিত্র ও মনোমুগ্ধকর ঘটনাগুলি অতীতের গর্ভে বিলিন হয়ে যাচ্ছিল। সেলিম স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর লাহোরের একটি কলেজে ভর্তি হয়েছিল। স্কুলের সর্বশেষ পরীক্ষায় ফেল

করার পর মজীদ ফৌজে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। সেলিমের আরো দুজন সহপাঠি গোলাপ সিং ও রামলাল স্কুলের পাঠ শেষ করার আগেই কর্মক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছিল। রামলাল শহরের এক কারখানায় মুন্সিগিরি তথা খাতা লেখার চাকুরী পেয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে গোলাপ সিং কৃষি কাজে তার বাপ ও ভাইয়ের সাথে যোগ দিয়েছিল।

পাশের গ্রামের বলবন্ত সিং ও কুন্দন লাল অমৃতসরের কোনো কলেজে ভর্তি হয়েছিল। যে গ্রামে প্রাইমারী স্কুলটি ছিল সে গ্রামের ছেলে আহমদ জেলার কোনো অফিসে ক্লার্কের চাকুরী নিয়েছিল এবং পাটওয়ারীর ছেলে মিরাজদীন রেলওয়ের বাবু হয়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার শওকতের চলে যাওয়ার পর কিছুদিন পর্যন্ত আরশাদের সাথে সেলিমের পত্রালাপ চলতে লাগলো। এরপর সেলিম কয়েকটি পত্রের জবাব পেলো না এবং পত্রালাপ বন্ধ হয়ে গেলো। ওদিকে যুবাইদা, আমিনা ও সুগরার নামে ইসমতের পত্র আসতে থাকলো। কিন্তু এদের পক্ষ থেকে যথারীতি জবাব না যাওয়ার ফলে তার খামুশ হয়ে গেলো।

কলেজে সেলিমের জন্য বহু আকর্ষণীয় জিনিস ছিল। সে ছিল এমন একজন যুবক যে সব রকম পরিবেশে নিজের বন্ধু ও গুণগ্রাহী লাভ করতো। আনন্দ উল্লাস ও প্রাণ উচ্ছলতার জন্য সে ছিল সমস্ত হোস্টেলের প্রাণপুরুষ। ছাত্রদের কোনো মজলিসে কলেজের প্রতিভাবান ও উচ্চ মেধাবী ছাত্রদের প্রসংগ উত্থাপিত হলে সেখানে সেলিমের নাম অবশ্যই উচ্চারিত হতো। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর সে কয়েকটি কবিতা ও গল্প লিখেছিল। সেগুলি সে লুকিয়ে রাখতো। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভাকে আর কতদিন লুকিয়ে রাখা সম্ভব! সেলিম ভয়ে ভয়ে তার একটি কবিতা পাঠিয়ে দিল কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশের জন্য। সম্পাদক কেবল সেটি প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হলো না বরং এই সংগে একটি সংক্ষিপ্ত নোট দিয়ে কবির প্রশংসাও করলো। এ ছিল তার খ্যাতির সূচনা। এরপর সে লিখলো গ্রামীণ জীবনের ভিত্তিতে একটি গল্প। কবিতার চাইতে বেশি সেটি প্রশংসিত হলো।

এই গল্পটির বদৌলতে তার পরিচয় হলো আখতারের সাথে। আখতার ছিল তার উপরের ক্লাসের ছাত্র। তাকে কলেজের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে গণ্য করা হতো। সে কলেজ ম্যাগাজিন ছাড়াও আরো বিভিন্ন সাহিত্য পত্র-পত্রিকায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতো। তার শরীরের গড়ন ছিল হালকা পাতলা। কিন্তু তার প্রশস্ত ললাট, বড় বড় চোখ ও সরু ঠোঁটের মধ্যে এমন এক ধরনের আকর্ষণ ছিল যে, তার সাথে একবার যার দেখা সাক্ষাত ও কথাবার্তা হয়েছে সে তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেনি। হোস্টেলের খুব কম ছেলের সাথে মেলামেশা করতো সে। খাবার টেবিলে ছেলেরা একজন অন্যজনের সামান্য দুষ্টুমিতে হাসাহাসি করতো কিন্তু সেখানেও সে নিজের গাম্ভীর্য বজায় রাখতো। ছেলেরা কোনো একটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক শুরু করে দিতো এবং প্রত্যেকে অন্যের কথা না শুনে নিজের কথা

[illegible] তাঁরা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়তো। আখতার ছেলেদের এসব কথাবার্তায় সেলিম আকর্ষণ অনুভব না করে খাবার শেষ করে নীরবে নিজের কামরায় চলে যেতো। কিন্তু যখন সে বলতে শুরু করতো, শ্রোতা মনে করতো সে বিতর্কে আলোচনা নয় বরং নিজের ফায়সালা শুনিয়ে দিচ্ছে। কলেজে কখনো সাহিত্য, রাজনীতি ও বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিষয়ে বক্তৃতা হতো। আখতার তাতে অংশগ্রহণ করতো এবং বিষয়বস্তুর পক্ষে বা বিপক্ষে তার বক্তব্যকে চূড়ান্ত মনে করা হতো।

সেলিমের সাথে আখতারের প্রথম সাক্ষাতটি ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। একদিন সে [illegible] হোস্টেলের সিঁড়ি দিয়ে নামছিল এবং আখতার উপরে উঠছিল। দুজনের একটু ধাক্কাধাক্কি হয়ে যায় এবং আখতারের হাত থেকে বই পড়ে যায়।

ওহো, মাফ করবেন, সেলিম পেরেশান হয়ে বলে।

না কিছুই হয়নি। আখতার হেসে বলে।

সেলিম দ্রুত বইগুলি উঠিয়ে তার হাতে দেয় এবং লজ্জিতভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আখতার বললো, কোথায় যাচ্ছেন?

লেটার বক্সে একটি চিঠি ফেলে দিতে যাচ্ছি।

যদি খারাপ না মনে করেন তাহলে আমার চিঠিটাও নিয়ে যেতে পারবেন কি? সকালে লিখে রেখেছিলাম কিন্তু বাইরে যাবার সময় মনে ছিল না।

হাঁ, কেন নিয়ে যাবো না? এখনি দিন। সেলিম আখতারের পেছনে পেছনে তার কামরায় প্রবেশ করলো। আখতার টেবিলের ওপর থেকে পত্রটা তুলে নিতে নিতে বললো, সম্ভবত কলেজ ম্যাগাজিনে 'শেষ হাসি' গল্পটি আপনার লেখা?

জী হাঁ, আমি এমনিই ওটা লিখেছিলাম আর কি।

আপনার লেখার ধরণটা আমার বেশ পছন্দ। গল্পের প্লটটাও বেশ আকর্ষণীয়। কিন্তু গল্পের যে অংশে আপনি গ্রামীণ দৃশ্যাবলী বর্ণনা করেছেন সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে। গ্রামীণ জীবনের সাথে আমি একেবারেই পরিচিত নই, সম্ভবত এটাই এর কারণ হবে। গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে আপনি আরো কিছু লিখেছেন কি?

গ্রীষ্মের ছুটিতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তার শিরোনাম ছিল, 'আমার গ্রাম।' প্রবন্ধটি বেশ দীর্ঘ। আপনি কখনো সময় করতে পারলে আপনাকে দেখাতাম।

আমি অবশ্যই পড়বো। প্রবন্ধটি যদি আপনার সাথেই থেকে থাকে তাহলে আজ এখনি নিয়ে যান। আমার এখন কোনো কাজ নেই।

সেলিম একটু পেরেশান হয়ে বললো, আমার ভয় হচ্ছে, তাতে এমন কিছু ঘটনা আছে যা পড়ে হয়তো আপনি হাসবেন।

আখতার বললো, তাহলে তো আমি অবশ্যই সেটা পড়বো। যান নিয়ে আসুন।

সেলিম নিজের কামরায় গিয়ে একটি কপি এনে আখতারের হাতে দিল এবং কপিটি নিয়ে বাইরে বের হয়ে গেলো।

বিকালে আখতার প্রথমবার সেলিমের কামরায় এলো। দুপুরে সেলিম তাকে যে কপিটি দিয়েছিল সেটি ছিল তার হাতে। নিন সেলিম সাহেব, আপনার প্রবন্ধ। আমি সবটুকু পড়ে নিয়েছি।

তাশরীফ রাখুন।

আখতার চেয়ারে বসতে বসতে বললো, সেলিম সাহেব! আপনার প্রবন্ধ বড়ই হৃদয়গ্রাহী। প্রবন্ধ পড়তে পড়তে আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন ঐ গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছি। রমজান যদি সত্যিই আপনাদের গ্রামের কোনো জীবন্ত নায়ক হয়ে থাকে তাহলে একদিন আমি তাকে দেখবোই। প্রবন্ধটি অবশ্যই পত্রিকায় পাঠাবেন।

এটা ছিল একটা চমৎকার সূচনা। এর পর থেকে সেলিম ও আখতার দিনের পর দিন পরস্পরের আরো কাছাকাছি হয়েছে। আখতারের মধ্যে সেলিম নিজের একজন নিকটতম বন্ধু, অভিভাবক ও নেতার সন্ধান পেয়েছিল। আখতার প্রতিদিন তার জন্য কলেজ লাইব্রেরী থেকে নতুন নতুন বই বাছাই করে নিয়ে আসতো। তার লেখার নিরপেক্ষ সমালোচনা করতো। খুব সকালে উঠে তাকে সাথে নিয়ে একটি মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায পড়তো এবং তারপর সেখানে দরসে কুরআনের মজলিসে বসে যেতো। বিকালেও তাকে সাথে নিয়ে কখনো কখনো ভ্রমণে যেত হতো।

দেশের অতীত ও বর্তমান অবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে আখতার আগামী ভবিষ্যত চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়তো। তার আশংকাগুলো কখনো সেলিমের মনকেও ভারাক্রান্ত করে তুলতো। কিন্তু যে প্রচণ্ড অনুভূতি আখতারকে অস্থির করে রাখতো তার সাথে সেলিম পরিচিত ছিল না। সেলিম যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল সেখানে ছিল চারদিকে প্রস্ফুটিত বসন্তের শোভা। রঙধনুর বিচিত্র রঙ সে পরিবেশের শোভা বর্ধন করতো। সেখানে ছিল রোদ ও ছায়ার মাখামাখি। সে যদি কখনো এক মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হয়ে যেতো তাহলে আবার পর মুহূর্তেই অট্টহাসি দেবার জন্য অস্থির হয়ে পড়তো। অন্তরের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত হয় যে হৃদস্পন্দন তখনো তা ছিল তার কাছে অপরিচিত।

আখতারের প্রতি সেলিমের গভীর ভালোবাসা ও প্রীতি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আখতারের বন্ধুত্ব তার কাছে ভারী বোঝার মতো ঠেকতো। বিশেষ করে যখন সে জাতীয় রাজনীতিবিদ ও নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করার পর আগামী দিনগুলির ভয়াবহ চিত্র অংকন করতো। তখন সেলিমের মনে হতো আখতার সারা দুনিয়ার প্রতি বিরক্ত। সে নিজের গ্রামের কোনো ঘটনা বা চুটকী শুনিয়ে পরিবেশটাকে হালকা করতে এবং কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইতো। কিন্তু আখতারের অগ্নিঝরা দেখে মনে হতো আজ এ ধরনের কথা তার কানে ঢুকবে না। তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি সেলিমের মুখ বন্ধ করে দিতো। সে বলতো, 'সেলিম, আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে। আমাদের সামনে আসছে একটি অত্যন্ত কঠিন ও নাজুক সময়। সামগ্রিক বিপদ ও দুঃখ কষ্টের মুখোমুখি হবার জন্য যে ধরনের সামগ্রিক

সেজন্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রয়োজন তা আমাদের নেই। যদি আমরা চোখ না খুলি তাহলে আমার আশংকা হয় হিন্দুস্তানে আমাদের স্পেনের ইতিহাসের পুনারাবৃত্তি ঘটাতে হবে।'

এ ধরনের বক্তৃতা সেলিমকে পেরেশান করে দিতো। রাতে যখন সে বিছানায় শুয়ে পড়তো, তার কানে আখতারের কথাগুলি অনুরণিত হতো। কিছুক্ষণ সে অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করতো। তারপর তার বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা তাকে তার নিজের গ্রামে নিয়ে যেতো এবং সে অনুভব করতো সে যেন একটি ধূ ধূ মরুভূমি পার হয়ে একটি গাছ গাছালি ঘেরা মরুদ্যানে প্রবেশ করেছে। এ মরুদ্যানে আছে জীবনের আনন্দ কোলাহল, চিরন্তন শান্তির নীড়। কালের স্রোত এখানে এসে থেমে গেছে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত বলতে এখানে কিছুই নেই। তার দুচোখের পাতা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে আসতো। ঘুমের মধ্যে সে শুনতে পেতো পাখির কিচির মিচির ধ্বনি। কৃষক ক্ষেতে হালের মুঠি ধরে গরু হাঁকাচ্ছে সে আওয়াজও তার কানে আসতো। ঝিলের কাঁচের মতো স্বচ্ছ ঝকঝকে পানি থেকে পদ্ম ফুল তুলে আনতো সে। বিকেলে আমগাছের ডালে দড়ি বেঁধে দোলনা ঝুলাতো। আর গম ক্ষেতের আল দিয়ে ওপর দিয়ে জোরসে ঘোড়া দৌড়াতো। কখনো স্বপ্নের জগতে ভেসে ভেসে চলে যেতো সে জীবনের এমন এক প্রান্তে যেখানে জীবনের প্রাথমিক চিহ্নগুলো কালের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল। তারপর স্বপ্নের জগত থেকে ফিরে এসে তার ঘুম ভেঙে যেতো। তখন আখতারের কথাগুলো তার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হতো।

কিন্তু বর্তমানের আয়নায় ভবিষ্যতের চেহারার যে কাঠামো ভেসে উঠছিল তা ধীরে ধীরে ভয়াবহ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছিল। জীবনের দূর দিগন্তে যে কালো মেঘ জমে উঠেছিল, যাকে সেলিম নেহাত দৃষ্টিভ্রম মনে করতো, ধীরে ধীরে তা অনেক কাছে এসে গিয়েছিল। ছোটবেলায় সে একটা গল্প শুনেছিল। গল্পটা ছিল এরকম : এক বিদেশী দেশ ভ্রমণ করতে করতে একদিন একটা নগরে প্রবেশ করলো। নগরের হাটে বাজারে অলিতে গলিতে যেন উৎসবের ধুম পড়ে গিয়েছিল। কোথাও চলছিল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। কোথাও বাজিকর ডুগডুগি বাজাচ্ছিল। তার চারদিকে ভীড় জমে উঠেছিল। এসব আনন্দ উল্লাসের মধ্যে বিদেশী আত্মমগ্ন হয়ে পড়েছিল। নিজের কথা একদম ভুলে গিয়েছিল সে। কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাচ্ছে তাও তার মনে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ আকাশে দেখা গেলো ধূলো বালি ও কালো মেঘের ঘনঘটা। মুহূর্তের মধ্যে চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেলো। ভীড় ভেঙে গেলো। মানুষ জন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যে যেদিক পারে ছুটে পালাতে লাগলো। বিদেশী আতংকগ্রস্ত হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করছিল, ব্যাপার কি? তোমরা পালাচ্ছো

কেন? কিন্তু কেউ তার কথার কোনো জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করছিল না। সবাই উর্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছিল। তার প্রশ্নের জবাব দেবার হিম্মত কারোর ছিল না। শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী সবাই ছুটছিল, ধাক্কা মারছিল, ঠেলাঠেলি করছিল। এই ঠেলাঠেলিতে কয়েকটি শিশু, বৃদ্ধ ও পংগু পায়ের তলায় পিশে গেলো।

বিদেশী ভীতবিহ্বল হয়ে একটি গাছে চড়ে বসলো। ধূলি ঝড় থেমে গেলো। ছিটে ফোটা বৃষ্টিপাত শুরু হলো। কিন্তু বিদেশী অবাক হয়ে দেখলো ঝড় তুফান থেমে গেলেও মানুষের মধ্যে ভীতি বিহ্বলতা কমেনি। তারা আগের চাইতেও আরো বেশি উর্ধশ্বাসে পালাচ্ছে। কেউ কারোর দিকে তাকাচ্ছে না।

আচানক দেখা গেলো এক ভয়াল দৈত্য এগিয়ে আসছে। তার গায়ের রঙ নিকশ কালো। চোখ দুটি যেনো দুটি বড় বড় আগুনের গোলা। তার বিকটাকৃতির দাঁতগুলি থেকে লালা ঝরে পড়ছে টপ টপ করে। তার মাথায় চুলের পরিবর্তে যেন হাজারো সাপ কিলবিল করছে। জমিন তার পায়ের তলায় থর থর করে কাঁপছে। তার অট্টহাসি আকাশের বজ্রধ্বনির চাইতেও ছিল ভীতিপ্রদ। শিশু, নারী ও পুরুষদেরকে হাতের মুঠোয় ধরে শূন্যে ছুঁড়ে মারছিল সে। সেখান থেকে মাটিতে পড়ে যাবার পর তাদেরকে দুপায়ে দলছিল। যুবতী মেয়েরা চিৎকার দিয়ে কূয়ায়, খালে, বিলে লাফিয়ে পড়ছিল। কিছু লোক তাদের ঘরের দরোজা বন্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু তার মজবুত হাতের কাছে এই দরোজার কি শক্তি ছিল! হাতের পায়ের এক একটি আঘাতে সব ভেঙে চুরমার করে ফেলছিল এবং তারপর বিকট অট্টহাসি দিয়ে বলছিল ঃ এবার কোথায় যাবে? এখন আমি স্বাধীন। বছরের পর বছর কয়েদখানায় থাকার পর আজ প্রথমবার মুক্তি পেয়েছি। কয়েদখানায় আমার হাত পা মজবুত শেকলে বাঁধা ছিল। সেখানে অসহায়তার মধ্যে আমি কেবল দাঁতে দাঁত ঘসতেই থেকেছি। সুন্দরী মেয়েদের চিৎকার ও কান্নাকাটি শোনার জন্য আমার কান দীর্ঘদিন ধরে উন্মুখ ছিল। তোমাদেরকে বাতাসে ছুঁড়ে মারার জন্য আমার হাত এবং তোমাদেরকে দলিত মথিত করার জন্য আমার পা অস্থিরভাবে দিন গুণছিল। তোমরা চিৎকার করছো? আচ্ছা, কয়েদখানার নির্জন কক্ষে আমার চিৎকারের কথা একবার ভাবো। তোমাদের শরীরের হাড্ডির কল্পনা করে আমি কয়েদখানার লোহার গরাদগুলি দুমড়ে মুচড়ে ফেলতাম। এই করে আমার হাতে ফোস্কা পড়ে যেতো। তখন আমি শপথ করতাম, মুক্তি পাবার সাথে সাথেই মন ভরে আমার আকাংক্ষা পূরণ করবো এবং তোমাদেরকে মারবো, পিশবো, দলিত ও মথিত করবো। আজ আমি মুক্তির নাচন নাচবো। আমার জন্য তোমাদের লাশের শয্যা বিছিয়ে দাও।

ভারত মাতা হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের দানবের জন্ম দিয়েছিল। তার কাছে আজাদীর অর্থ ছিল দশ কোটি মুসলমানকে তাদের আজাদী থেকে বঞ্চিত করা। হাজার বছর আগে যে সাপের বিষাক্ত ছোবল অচ্ছুতদের শিরা থেকে জীবনের উত্তাপ ছিনিয়ে নিয়েছিল সে সাপ আজ তার গর্ত থেকে মাথা বের করার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল। শত শত বছর আগে বর্ণ হিন্দুরা তাদের দেবতাদের সন্তুষ্টি অর্জন করার

[illegible] অচ্ছুতদের বলিদান করতো। আর দেবতারা অচ্ছুতদের বাসগৃহে জ্বালিয়ে দিয়ে সেখানে নিজেদের বিলাসকুঞ্জ তৈরি করার জন্য তাদের অবাধ অনুমতি দান করেছিল। শত শত বছর ধরে ভারত মাতার আদরের দুলালদের ঐসব জুলুম নিপীড়ন বরদাশত করতে করতে অচ্ছুতদের প্রতিরোধ শক্তি শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পবিত্রতার প্রতি সম্মান প্রদর্শণ করতে গিয়ে তারা নিজেদের সমস্ত মানবীয় অধিকার হারিয়ে ফেলেছিল।

কিন্তু এখন হিন্দুদের সামনে ছিল দশ কোটি মুসলমানের প্রশ্ন। এরা এমন এক জাতি যারা কয়েক'শ বছর এদেশে রাজত্ব করেছিল। হিন্দুরা তাদের বর্ণাশ্রমের শেষ চিহ্ন বানাবার আগে তরবারির সাহায্যে অচ্ছুতদেরকে পরাজিত করেছিল। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ বিন কাসেমের সময় থেকে নিয়ে আহমদ শাহ আবদালী পর্যন্ত এ তরবারি ছিল প্রভাবহীন। পানিপথের যুদ্ধগুলি হিন্দুদের মনে এ অনুভূতি জাগাবার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, তরবারি যুদ্ধে তারা এ জাতির মোকাবিলা করতে পারবে না। কাজেই পুরাতন দেবতাদের থেকে নিরাশ হয়ে তারা একটা নতুন দেবতার সন্ধান করে ফিরছিল। এ দেবতা ছিল ইংরেজ।

ইংরেজরা এমন সময় হিন্দুস্তানে প্রবেশ করে যখন মুসলিম শাসনের স্তম্ভগুলি [illegible] শূন্য হয়ে পড়েছিল। তবুও বাংলায় সিরাজুদ্দৌলা এবং দক্ষিণ ভারতে সুলতান টিপুর ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে তাদের শেষ প্রতিরক্ষা শক্তির যে প্রকাশ তারা দেখেছিল তার থেকে ইংরেজরা অনুভব করতে পেরেছিল যে, এ জাতির ছাইভস্মের মধ্যে এখনো অনেক জ্বলন্ত শিখা রয়ে গেছে। কাজেই এদের মাথা গুঁড়িয়ে ধূলায় মিশিয়ে দেবার জন্য তারা হিন্দুদের দিকে হাত বাড়ালো। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের পর মুসলমানরা আরো বেশি ইংরেজদের কোপানলে পড়লো। চাক্কীর দুই পাট একদিকে ইংরেজ এবং অন্যদিকে হিন্দু এদের মাঝখানে পড়ে সে পেশাই হতে লাগলো।

উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে হিন্দুস্তানে পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্রের চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে হিন্দুর সেই পুরাতন স্বভাব ও প্রকৃতি আবার জিন্দা হয়ে থাকলো যেখানে ব্রাহ্মণ তার পবিত্রতার মালা গলায় জড়িয়ে নিম্ন বর্ণের মানুষকে চিরকালের জন্য মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ফেলেছিল। হিন্দুরা জানতো, একটি কেন্দ্রের আওতাধীনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে মুসলমানদেরকেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অচ্ছুতের মর্যাদা গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারবে। কাজেই হিন্দু বর্ণাশ্রমের জায়গায় এখন তারা এনেছে হিন্দী ন্যাশনালিজম।

হিন্দী ন্যাশনালিজম অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের আলখেল্লা গায়ে চড়িয়ে ময়দানে নেমে এসেছে। এ নতুন আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মনুর বর্ণাশ্রম থেকে আলাদা

ছিল না। পার্থক্য কেবল এতটুকু, মনুর আন্দোলন ব্রাহ্মণের পবিত্রতার আশ্রয় নিয়েছিল অন্যদিকে কংগ্রেসের আন্দোলন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের বলে বলীয়ান হয়ে রাম রাজত্ব কায়েম করতে চাচ্ছিল। মনুর হাতে ছিল ধারালো ছুরি। তিনি নির্দ্বিধায় অচ্ছুতদের জবাই করে ব্রাহ্মণের পদতলে ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীর আস্তিনে ছিল একটা বিষাক্ত ক্ষুর। সেটা ব্যবহার করার আগে তিনি মুসলমানকে রশি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা জরুরী মনে করতেন। মনুজী অচ্ছুতকে ধিক্কার দিয়েছিলেন কিন্তু গান্ধীজীর আশংকা ছিল, এই যে জাতিটাকে নিশ্চিহ্ন করার দায়িত্ব সমাজের পবিত্র দেবতারা তার ওপর অর্পণ করেছিল তারা ঘুমুচ্ছে, মরে যায়নি। তাই তিনি নিজের বিষাক্ত ছুরিটা পরীক্ষা করার আগে তাদেরকে সংজ্ঞাহীনতার ইনজেকশান দিতে চাচ্ছিলেন। গান্ধীজী যদি মনুজীর পদ্ধতি অবলম্বন করতেন তাহলে ঐতিহাসিকরা হয়তো পানিপথের আর একটা যুদ্ধ দেখতেন। আর ইংরেজের বিদায় নেবার পর দিল্লীর লালকেল্লায় যে ঝাণ্ডা উড়তো তার গায়ে অশোক চক্র না হয়ে বরং আঁকা হতো মুহাম্মদ বিন কাসেমের তলোয়ার।

গান্ধীজী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুকে আরো বেশি প্রভাবশালী করার জন্য অচ্ছুতদের জন্য ভারতমাতার অংগন আরো প্রশস্ত করলেন। কয়েকটা মন্দিরের দরোজা তাদের জন্য খুলে গেলো। তাদের অনুমতি দেয়া হলো সমাজের কয়েকজন পবিত্র ব্যক্তির কূয়ার পানি তারা ব্যবহার করতে পারবে। ফলে তাদের আওয়াজ গলার মধ্যে আটকে রয়ে গেলো। শত শত বছর পরে তারা একবার পার্শ্ব বদল করে আবার ভারতমাতার চরণতলে ঘুমিয়ে পড়লো। মুসলমানদের প্রতিরোধ অনুভূতিকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য গান্ধীজী তাদেরকে আজাদীর মরীচিকা দেখালেন। নিরাপত্তার দাবী উত্থাপনকারীদেরকে সংকীর্ণমনা, সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট, ইংরেজের এজেন্ট ও স্বদেশের স্বাধীনতার শত্রু বলা হলো। সে সময়ও মুসলমানদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা এই মরীচিকার আসল রূপ জানতো। তারা গান্ধীজীর আস্তীনের মধ্যে লুকানো খঞ্জরটাকে নিজেদের শাহরগের নিকটবর্তী আসতে দেখছিল। তারা হিন্দু স্বার্থের ডুবন্ত পাহাড়টাকে ধীরে ধীরে পানির ওপর ভেসে উঠতে দেখে জাতিকে এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছিল যে, তোমাদের নৌকাকে রামরাজত্বের ভয়াল পাহাড়ের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। তার সাথে ধাক্কা লেগে এ নৌকা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং তোমরা অচ্ছুতদের মতো জীবন-মৃত্যুর সংঘাতে লিপ্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু এ ধরনের সতর্কবাণী অরণ্যের রোদনে পরিণত হলো। লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক একটা সত্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে সেটা হচ্ছে, কংগ্রেস যে বিপ্লবের শ্লোগান দিচ্ছে তার উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, ইংরেজের রাজত্ব শেষ হবার পর মুসলমানদের ভবিষ্যত হিন্দু সংখ্যগরিষ্ঠের হাতে সোপর্দ করে দিতে হবে।

কংগ্রেস একাধিকবার ইংরেজ সরকারের সাথে সওদাবাজী করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রত্যেকবারেই তার প্রথম শর্ত ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টা উপেক্ষা করে ইংরেজকে একমাত্র তারই একক প্রতিনিধিত্ব মেনে নিতে হবে। কিন্তু

চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে দশ কোটি মুসলমানের অস্তিত্ব ইংরেজ পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেনি। ভারতমাতার আদরের দুলালকে নিশ্চিন্ত করার জন্য দশ কোটি মুসলমানের ওপর বৃটিশ সৈন্যের পাহারা বসাবার মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পায়নি তারা। ইংরেজের ব্যাপারে কংগ্রেস তার পলিসিতে কয়েকটা পরিবর্তন এনেছে। গান্ধীজীর আত্মা কয়েকবার খোলস পালটেছে। কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপারে তাঁর কর্মনীতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

তবুও আজাদীর শ্লোগানের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ ছিল যার ফলে মুসলিম জনতার জোশ ও জযবা এখনো পর্যন্ত কংগ্রেসের সাথেই ছিল।

মুসলমানদের চোখ তখন খুললো যখন অবস্থা একথা প্রমাণ করে দিল যে, কংগ্রেস যাকে আজাদী বলছে তা আসলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের হুকুমতের দ্বিতীয় নাম। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর প্রথমবার হিন্দুস্তানের সাতটা প্রদেশে কংগ্রেসের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। হিন্দু রাজনীতিবিদরা মুসলমানদেরকে নিজেদের ফাঁদে ফেলার জন্য যেমন নিশ্চিন্ততা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিল ঠিক তেমনি ফাঁদে পড়া শিকারকে পদানত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নিতে গেলো। ওয়ার্ধা আশ্রমের মহাত্মার বিষ মাখানো ক্ষুর এবার আস্তিনের বাইরে বের হয়ে এসেছিল। রাম রাজত্বের বরকত এবার ওয়ার্ধা বা বিদ্যা মন্দির ইত্যাদির মতো নাপাক স্কীমের আকারে অবতীর্ণ হতে লাগলো। কাবার রবের সামনে সিজদাবনতকারী জাতির শিশু সন্তানদেরকে শিক্ষায়তনগুলিতে গান্ধীর মূর্তির সামনে হাতজোড় করে দাঁড়াবার সবক দেয়া হচ্ছিল। মুহাম্মদে আরাবীর নাত পাঠকারীদেরকে 'বন্দে মাতরম' সংগীত শেখানো হচ্ছিল। তওহীদের আকিদায় বিশ্বাসী কন্যাদের পাঠক্রমে মন্দিরের দেবদাসীদের নৃত্যকলা অন্তরভুক্ত করা হচ্ছিল। মুসলমানদের গলায় এ বিষ ঢেলে দেবার জন্য এই পরিকল্পনাবিদরা এমন সব লোকদের হাত বেছে নিল যাদের আঙুলে কুরআন মজীদের তাফসীর লেখায় ব্যবহৃত কলমের কালির দাগ এখনো শুকিয়ে যায়নি।

রাম রাজত্বের স্থায়িত্বের জন্য মুসলমানদের সংস্কৃতি ছাড়াও তাদের ভাষা বদলাবারও প্রয়োজন অনুভব করা হলো। কাজেই উর্দুর স্থলে হিন্দী ব্যবহারের প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম জোরেশোরে শুরু হয়ে গেলো।

সন্দেহ নেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে পূর্ণ আগ্রাসন চালাবার জন্য গান্ধীজী সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। সে সুযোগ এখনো আসেনি। কিন্তু হিন্দু জনতা আর দেরি করতে পারছিল না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালাবার জন্য তারা নিজেদের কয়েকটা মন্দির অচ্ছুতদের দ্বারা অপবিত্র হওয়াটাও বরদাশ্‌ত করে নিয়েছিল। কিন্তু এখন তাদের মনের অভ্যন্তরের হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষের আবেগ

অনুভূতিকে আর লুকিয়ে রাখতে পারলো না। এরি ভিত্তিতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের মহল তৈরি করা হয়েছিল। কাজেই মধ্য ভারতীয় প্রদেশগুলিতে লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়ে গেলো। যে শহরে বা গ্রামে হিন্দু মুসলমানের ওপর আক্রমণ করতো সেখানেই হিন্দু সরকারের পুলিশ শালিসের বেশ ধারণ করে পৌছে যেতো এবং মুসলমানদেরকে হিন্দুদের সাথে আপোশ করার জন্য লাঞ্ছনাকর শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করতো।

মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে আপোশ ও সহযোগিতা করার যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল তা প্রত্যাখ্যান করা হলো। জওহর লাল নেহরুর এ ঘোষণা এখনো বাতাসে গুঞ্জরিত হচ্ছিলঃ হিন্দুস্তানে কেবলমাত্র দুটি দল আছে, একটি ইংরেজ এবং দ্বিতীয়টি কংগ্রেস।

রামরাজত্বের এ যুগ স্বল্পকালীন হলেও চিন্তাশীল মুসলমানদের মনে এ অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, যদি তারা চোখ না খোলে তাহলে হিন্দুস্তানে পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে স্পেনের ইতিহাসের। কাজেই ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা চেতনা বাস্তবে রূপায়িত হলো পাকিস্তান প্রস্তাবের মাধ্যমে।

পাকিস্তানের দাবী ছিল পুরোপুরি প্রতিরক্ষামূলক। মুসলমান হিন্দু ফ্যাসিবাদের আসন্ন সয়লাবের মুখে একটি প্রতিরক্ষামূলক দেয়াল উঠাতে চাচ্ছিল। তারা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে হিন্দুদেরকে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়ে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে নিজেদের জন্য স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার চেয়েছিল। তারা হিন্দুস্তানের তিন চতুর্থাংশ এলাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর অধিকার মেনে নিয়েছিল এবং নিজেদের জন্য যে এলাকা চেয়েছিল তা তাদের মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের তুলনায়ও কম ছিল। কিন্তু হিন্দু একটি কেন্দ্রের আওতায় খাইবার পাস থেকে বংগোপসাগর পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতার চিরস্থায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। ওয়ার্ধার মূর্তি মন্দিরগুলিতে এমন সব পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল যার মাধ্যমে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে এতিমে পরিণত করা যেতে পারে।

মুসলমানদের পাকিস্তান দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হতে দেখে ভারতের সুপুত্ররা অনুভব করলো, শিকার হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। হারেমের প্রাণ প্রবাহে উজ্জীবিত মুমিনরা একজাতীয়তার প্রতারণা ফাঁদ চিনে ফেলেছে, যাকে বাহ্যত নির্বিষ বানাবার জন্য অহিংসার চুল্লীতে পুড়িয়ে রঙীন করা হয়েছিল। শিকার ধরার জন্য যে শিকারীরা জাল বিছিয়ে আশায় আশায় দিন গুণছিল তারা বিক্ষিপ্ত উড়ে বেড়ানো পাখিগুলিকে অন্য কোনো দিকে উড়ে যেতে দেখে যার যার গুপ্ত স্থান থেকে বের হয়ে এলো। হতবিহ্বল অবস্থায় তারা মুসলমানদের ধোকা দেবার জন্য নিজেদের চেহারায় যে মুখোশ পরে রেখেছিল তা টেনে খুলে ফেললো। মুসলমানরা দেখলো মুক্ত চিন্তার জয়গানকারী হিন্দু, সংকীর্ণমনা হিন্দু, দেবতা পূজারী হিন্দু, দেবতাদের প্রতি বিতৃষ্ণ

হিন্দু, অচ্ছুতের সাথে গলাগলিকারী হিন্দু, অচ্ছুতকে ঘৃণ্যতম সৃষ্টি বিবেচনাকারী হিন্দু, ইংরেজের তোশামোদ ও পদলেহনের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধাভোগী হিন্দু এবং নিছক পাটনাই ছাগলের দুধ ও ফলের রসের সাহায্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করে ইংরেজকে অনশন করার হুমকিদানকারী হিন্দু সবাই একমন একপ্রাণ হয়ে গেছে। কুফর তার তীরাধারের সবকটি তীর বের করে ফেলেছিল। কিন্তু মুসলমানরা এখনো বিক্ষিপ্ত তীর ও ভেঙে যাওয়া ধনুকগুলি গণনা করছিল।

মুসলমানরা যদি দশ বছর আগে পাকিস্তানের দাবী উঠাতো তাহলে অহিংসার দেবতাগণ ও তার পূজারীবৃন্দ তখনো নিজেদের স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতো। ফলে মুসলমানরা তাদের প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতি নেবার সময় পেতো। কিন্তু তারা এমন এক সময় নিজেদের ভাঙা ঘরের দেয়াল ও ছাদ মেরামত করার কথা ভাবলো যখন আকাশের চারদিক কালো মেঘে ছেয়ে যাচ্ছিল। হিন্দু তার আগ্রাসনকে পরিপূর্ণ রূপ দেবার জন্য যে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সাথে এগিয়ে যাচ্ছিল তার ছিটিফোটাও মুসলমানের মধ্যে ছিল না। আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে ওয়ার্ধার প্রতারণার ফাঁদ দেখার পর মুসলমান ঘুম ঢুলু ঢুলু চোখে কম্পিত পদবিক্ষেপে পাকিস্তানের মনজিলে মকসুদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

বিগত পনের বিশ বছরে হিন্দু যেখানে তার জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করে ফেলেছে সেখানে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা ও অনৈক্যের কয়েকটা বীজও বপন করেছে। যদি এক জাতীয়তাবাদ, অহিংসা ও স্বদেশিকতাবাদের ঘুমপাড়ানি গান মুসলমানদেরকে মৃত্যু ঘুমে আচ্ছন্ন করতে না পারে এবং নিজেদের শাহরগের কাছে তার বিষাক্ত খঞ্জর দেখে তারা আঁতকে ওঠে তাহলে তাদের মুখে ঘুমের বড়ি ঠুঁসে দেবার জন্য এমন সব বুজুর্গানে দীনকেও তারা তৈরি করে ফেলেছিল, যাদের জোব্বা ও পাগড়ী একথা প্রমাণ করে যে জান্নাতের পথ একমাত্র তারাই দেখাতে পারে।

অভিজ্ঞ শিকারী যখন দেখতে পায় পাখিরা তার জাল চিনে ফেলেছে, তারা জালের ধারে কাছে ঘেঁসছে না তখন সে একই জাতের পোষা শিকারী পাখিকে খাঁচায় ভরে জালের আশেপাশে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দেয়। পোষা পাখির আওয়াজ ও ধ্বনিতে বিভ্রান্ত হয়ে আশপাশের ঘুরে বেড়ানো পাখিরা ধোকায় পড়ে জালে আটকে যায়। এ পদ্ধতিতে সাধারণভাবে তিতির ও বুটের শিকার করা হয়। এভাবে যেসব শেখানো পড়ানো পোষা তিতির ও বুটের অন্য পাখিদেরকে জালে আটক করে শিকারীদের পরিভাষায় তাদেরকে বলা হয় 'ডাকপাখি।'

আবার তিলির পাখি শিকারের সময় এ পদ্ধতি বদলাতে হয়। খাঁচায় বন্দী তিলির পাখিকে হাজার খাতির তোয়াজ করলেও তার নিজের জাতির পাখিদেরকে

কখনো জালের দিকে টেনে আনার জন্য সে ডাক দেবে না। তাই তাকে ধোকা দেবার জন্য ঘুঘুকে ব্যবহার করতে হয়। তিলিরের সাথে ঘুঘুর সাপে নেউলে সম্পর্ক। শিকারী একটা ঘুঘু ধরে জালের কাছাকাছি বেঁধে রাখে। তিলির পাখির দল বাঁধা ঘুঘু দেখতেই জালের পরোয়া না করেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ওয়ার্ধার পুরানো ঝানু শিকারী যখন দেখলেন মুসলমানরা হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের প্রতারণা জালে আতংকগ্রস্ত হয়ে পাকিস্তানের মনজিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তিনি বিভ্রান্ত উলামায়ে দীনের একটি গ্রুপকে সামনে এগিয়ে দিলেন যারা আল্লাহর হুকুম পালনের দায়িত্ব পেছনে সরিয়ে দিয়ে দেশপূজায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যারা মুহাম্মদ আরাবীর (স) সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেংটি পরা মহাত্মার সাথে সম্পর্ক জুড়েছিলেন। শিকারী ডাকপাখির সাহায্যে যে কাজ নেয় তাদেরকেও সেই কাজে নিয়োজিত করা হয়।

একদিকে এই ডাকপাখিরা হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের গ্রুপ তৈরি করছিল আবার অন্যদিকে হিন্দু প্রেস ঘুঘুর সাহায্যে তিলির পাখিদেরকে জালে আটকাবার কাজে ব্যপৃত ছিল। মুসলমানদের পাকিস্তান দাবীর পূর্বে হিন্দুরা যখনই অনুভব করেছে যে মুসলমানদের মধ্যে নিরাপত্তার দাবী জোরদার হচ্ছে তখন তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে কয়েকটা শ্লোগান দিয়ে দেয়। ফলে তিলির যেমন ঘুঘুকে দেখে শিকারী ও তার জাল থেকে বেপরোয়া হয়ে যায় ঠিক তেমনি হিন্দুদের ব্যাপারে মুসলমানদের সকল প্রকার সন্দেহ সংশয় ইংরেজ বৈরিতার আবেগের নিচে চাপা পড়ে যায়। স্বাধীনতা প্রিয় মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে মিলে কারাগারে চলে যায়। তারপর গান্ধী অনশন করে বা অন্য কোনো বাহানায় কারাগারের বাইরে চলে আসেন এবং ইংরেজ সরকারের সাথে আপোশের আলোচনা চালাতে থাকেন। হিন্দুরা কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করে অথবা লাভ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু মুসলমানদের প্রতিরক্ষা আন্দোলন অতীত দিনের কাহিনীতে পরিণত হয়।

ওদিকে ইটালী, জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে লাখো মুসলমান সিপাহী ইংরেজের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছিল। আর হিন্দুদের কেবলমাত্র সহযোগিতার আশ্বাসে ইংরেজ এইসব মুসলমানের অনুভূতিকে আহত করতে চাচ্ছিল না। কংগ্রেস কখনো তোশামোদ আবার কখনো হুমকি দিয়ে চলছিল। ইংরেজ এখনি এদেশ ছেড়ে চলে যাক এ ব্যাপারে তাদের কোনো তাড়াহুড়া ছিল না। বরং তারা কেবল এ ব্যাপারে গ্যারান্টি চাচ্ছিল যে, এ দেশের ভাগ্যের ফায়সালা করার সময় ইংরেজ যেন সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি কোনো প্রকার দৃষ্টি না দেয়।

১৯৪২ সালে ইউরোপে চলছিল হিটলারের জয়জয়কার। ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যকে নেস্তনাবুদ করার পর এবার জার্মান সেনাদল রাশিয়া আক্রমণ করছিল। মনে হচ্ছিল এই দুর্বার তরংগের সামনে আর কোনো পাহাড়ও দাঁড়াতে পারবে না, দুনিয়ার কোনো শক্তিরই এর সামনে প্রতিরোধ দাঁড় করাবার ক্ষমতা নেই। জার্মানীর সাবমেরিনগুলি আমেরিকার সমুদ্রোপকূলে টহল দিচ্ছিল। লণ্ডনে বোমা পড়ছিল।

কখনো কখনো এসব ঘটনায় গান্ধীজীর আত্মা দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়তো এবং তিনি উভয় পক্ষকে অহিংসার বাণী শুনাতেন। কিন্তু যখন জাপান যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো তখন অহিংসার ললিত বাণী বিতরণকারী ইংরেজের পরাজয়ের ব্যাপারে আশান্বিত হয়ে হিন্দু সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবনের সকল প্রকার প্রত্যাশা জাপানের সাথে সংযুক্ত করে দিলেন। কাজেই তিনি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করলেন। কংগ্রেসের মহাত্মা কখনো একথাও বলেছিলেন যে, দেশের পূর্ণ আজাদী বলতে আমি বুঝি বাইরের কর্তৃত্ব থাকবে ইংরেজের হাতে এবং দেশের অভ্যন্তরের কর্তৃত্ব থাকবে আমাদের হাতে। এখন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের পরিবর্তে জাপানের জন্য বাইরের কর্তৃত্বের পথ খোলসা করা হচ্ছিল। হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল এই সংকটকালে তারা নিজেদেরকে ইংরেজের দুশমন জাহির করে এ দেশের নতুন বিজেতা অর্থাৎ জাপানীদের কাছে পুরস্কার লাভের অধিকারী হবে। কমপক্ষে জাপানীরা মুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কিত তাদের দৃষ্টিভংগীর প্রতি সমর্থন দেবে অবশ্যই। কিন্তু সম্ভবত মুসলমানদের সৌভাগ্য ছিল, যার ফলে জাপানীদের সয়লাব স্রোত বর্মার এ দিকে আর আসতে পারেনি। আর অহিংস দেবতার পূজারীরা মাত্র কয়েকটি পুল ভেঙে, কয়েকটি টেলিফোনের তার কেটে ও ডাকঘর পুড়িয়ে দিয়ে, কয়েকজন কেরানীকে ধূলো কাদায় মাখিয়ে, কয়েকজন পিয়ন চাপরাশির জামা কাপড় ছিঁড়ে এবং কয়েকটি সরকারী দালান থেকে ইংরেজের ঝাণ্ডা নামিয়ে তার জায়গায় কংগ্রেসের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়েই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কংগ্রেসী দেশভক্তদের চিন্তা অনুযায়ী ভারত মাতার প্রাচীন গৌরবকে নতুন করে সঞ্জীবিত করতে পূর্ব দেশের যে নতুন দেবতার আগমন ঘটতে যাচ্ছিল সে আসামের মনিপুর পার হয়ে আর এগিয়ে আসতে পারলো না।

একজন সাহিত্যিক হিসাবে সেলিম তার হোস্টেলের ছাত্রদের হিরো হয়ে গিয়েছিল। তার কবিতায় ছিল বর্ষার নদীর দুর্বার গতিবেগ, পাখির সংগীত লহরী এবং পুষ্পের ঔজ্জ্বল্য। তার গল্প ও প্রবন্ধে গ্রামীণ জীবনের হাসিকান্না বিধৃত হয়েছিল। আখতার ইতিপূর্বে শুরুতে তাকে বিপুল উৎসাহ প্রদান করলেও এখন তার সাহিত্যিক প্রবণতা ও রচনা ধারায় পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। সে বলতো, সেলিম! তুমি খুব ভালো লেখো, খুবই ভালো কথা বলো কিন্তু এ উদ্দেশ্যহীন সাহিত্য এ জাতির কোনো কজে লাগবে না, যার চারদিকে কেবল বিপদ-মুসিবতের ধুলি ঝড় তার স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে দেবারও উপক্রম করেছে। সন্দেহ নেই তোমার গ্রামের কবুতরের বাকবাকুম বড়ই হৃদয়স্পর্শী, তোমাদের বাগানের ফুলের সুগন্ধও মন ভরিয়ে দেয় এবং তোমার গল্পের গ্রামীণ চরিত্র খুবই হৃদয়গ্রাহী কিন্তু তুমি তুফান ও ঘূর্ণিঝড়কে এড়িয়ে যাচ্ছো, যা কোনোদিন তোমাদের সমস্ত হাসি উল্লাসকে কান্নায়

পরিণত করবে। তুমি এমন আগুনকে অস্বীকার করছো, যা তোমার সুশোভিত বাগিচাকে জ্বালিয়ে ভস্মে পরিণত করবে। তুমি সেই জাতির কথা চিন্তা করো যারা হাজার বছর আগে এদেশে স্বাধীন ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতো। সে জাতির কবিও তোমার মতো শুনতো বর্ষার নদীর কুলুকুলু ধ্বনি। সেও কথা বলতো বসন্তের বিচিত্র বর্ণের ফুলের সাথে। আর তারপর তোমাদের গ্রামের লোকদের মতো সেও হয়তো ঝিমিয়ে পড়া বিকালে ও রাতে জনতার মহফিল গুলজার করতো। শীতের রাতে আগুনের পাশে বসে সেও সবাইকে মজার মজার গল্প শুনাতো। কিন্তু তারপর হিংস্র নেকড়ের পোশাক পরে আচানক একটি দল এসে ছিনিয়ে নিল সেই জনপদ তাদের হাত থেকে। এই সমস্ত মহফিল বাতাসে উবে গেলে কর্পূরের মতো। জানো এরা কারা?

তারপর সে নিজেই জবাব দিল, এরা আজকের হিন্দুস্তানের সাত কোটি অচ্ছুতদের পূর্বপুরুষ, যারা আর্য আক্রমণকারীদের মোকাবিলা করতে পারলো না। পরাজিত হবার পর তারা এদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক এতিমে পরিণত হলো। সেলিম, তুমি বলবে তারা আহাম্মক ছিল। কারণ দুশমনের মোকাবিলায় তারা জানপ্রাণ দিয়ে লড়েনি। কিন্তু তাদের চিন্তাবিদ ও কবিদের কি বলবে, যারা তাদেরকে যথাসময় জাগাতে পারেনি? যারা তখনো গাছের শীতল ছায়ায় বসে জাতিকে শুনাচ্ছিল মিষ্টি গান ও মজার মজার কাহিনী। তখন দুশমন তাদের মাথার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল? আমার বন্ধু! ব্রাহ্মণের শুচিতা ও পবিত্রতার পোশাক পরে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার যে তুফান অচ্ছুতদের ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছিল আজ হাজার বছর পর আবার তার উন্মেষ ঘটছে। আর এবার সে মোড় ঘুরিয়েছে আমাদের দিকে। হিন্দু জাতীয়তাবাদের আকারে হিন্দু সমাজের পুনরজাগরণ হচ্ছে। আমরা যদি এ তুফানের মোকাবিলা করতে না পারি তাহলে আমাদের পরিণাম হবে অচ্ছুতদের চাইতেও খারাপ। অচ্ছুতরা হিন্দু সমাজের ঘৃণিত অংশ হয়ে জীবন ধারণের অনুমতি লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের জন্য দুটি পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা থাকবে না ঃ মৃত্যু বরণ অথবা স্বদেশ ত্যাগ।

সেলিম! তুমি আসন্ন বিপদের কথা একবার ভাবো। তুফান যখন শত শত জনপদকে ধ্বংস ও বিরাণ করে দেবে তখন তোমাদের গ্রামও রক্ষা পাবে না। তখন তুমি বুঝতে পারবে সামষ্টিক ও জাতীয় বিপদের মোকাবিলা করার জন্য সামষ্টিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের প্রয়োজন হয়। তখন তুমি এই বলে আফসোস করতে থাকবে, হায়! যদি আমি জাতিকে মিষ্টি মিষ্টি ঘুম পাড়ানিয়া গান না শুনিয়ে তাকে সজোরে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিতাম।

তারপর আবার সেলিমের চেহারা দেখে আখতারের কণ্ঠে কোমলতার সুর বেজে ওঠে ঃ সেলিম! আমার কথা তোমার কাছে একটু তিক্ত মনে হবে কিন্তু প্রকৃত সত্যকে আমি সুন্দর চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে পারি না। মহান আল্লাহ তোমাকে যে যোগ্যতা দিয়েছেন আমি চাই ভুল পথে যেন তার ব্যবহার না হয়। তোমার লেখায়

যাদু আছে। জাতিকে ঘুম পাড়াবার পরিবর্তে এর সাহায্যে তাকে জাগ্রত করতে হবে। বর্তমান অবস্থায় একমাত্র পাকিস্তানই আমাদের অস্তিত্বের জামানত দিতে পারে। এই উচ্চভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আমরা হিন্দু ফ্যাসিবাদের সয়লাবের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারি। কবি ও সাহিত্যিকরা অনেক জাতিকে ঘুম পাড়ানিয়া গান শুনিয়ে মৃত্যু ঘুমে শায়িত করে দিয়েছে। কিন্তু আবার কিছু কবি সাহিত্যিক এমনও দেখা গেছে যাদের রচনা পরাজিত ও পশ্চাদপসরণকারী জাতির বুকে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। ইসলামের প্রথম যুগে আমরা এমন কবিদের দেখেছি যারা রোম ও ইরানে ইসলামের বিজয় পতাকা বহনকারী মুজাহিদদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদ করেছেন। আজকের কবি যদি পাকিস্তানের গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারে তাহলে আমি বলবো সে তার নিজের পরিবেশ থেকে নিসংগ হয়ে গেছে।

আখতারের সাথে এই ধরনের বৈঠকের পর সেলিম নতুন প্রেরণা ও আকাংখায় উজ্জীবিত হয়ে উঠতো। সে কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়তো এবং পাকিস্তান সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখা শুরু করতো। সে লিখতো ঃ 'ওরা জালেম, ওরা সাম্রাজ্যবাদী, ওরা ফ্যাসিষ্ট, ওরা আমাদের সাথে সেই একই ব্যবহার করবে যা আর্য বিজেতারা ভারতের বিজিত জাতিদের সাথে করেছিল। কিন্তু কেন? ওরা কি মানুষ নয়? আমরা কি মানুষ নই? একজন মানুষ আর একজন মানুষের সাথে এ ধরনের আচরণ করতে পারে কিভাবে?

তারপর সে নিজেই জবাব দিতে থাকে ঃ 'হিন্দুস্তানের প্রাচীন অধিবাসীরা কি মানুষ ছিল না? আর ব্রাহ্মণ মানুষের লেবাস পরে......? কিন্তু এগুলি পুরাতন যুগের কথা। আজ দুনিয়ায় জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।' সে নিজেকে সান্ত্বনা দিতো। সত্যের ভয়াবহ চেহারা কিছুক্ষণের জন্য খোশ চিন্তার ধুম্রজালে অস্পষ্ট হয়ে যেতো। এই চিন্তার দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে পৌছে যেতো সে তার গ্রামের আনন্দ ঘন পরিবেশে। তার ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠতো। কলম রেখে দিতো সে নিশ্চিন্ত হয়ে। তারপর আচানক তার মনের গহীনে আর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে উঠতো, 'আজকের আধুনিক বিশ্বের এই আলোকোজ্জ্বল যুগেও কি দেবদেবীর পূজা অর্চনা করা হচ্ছে না? এইসব দেবদেবীর সামনেই তো এক সময় অচ্ছুতদের বলি দেয়া হতো।'

কলেজের তাত্বিক আলোচনা ও সাহিত্য সভাও কখনো বেশ জমে উঠতো। এখানে একদল ছাত্র পরিকল্পিতভাবে হাততালি ও বাহবা দিয়ে কখনো একজনকে উজ্জীবিত আবার অন্য একজনকে হতোদ্দম করে দিতো। কখনো ছেলেরা আখতারকেও এসব সভায় টেনে আনতো। আখতার এখন পাকিস্তানের আদর্শ প্রচারের ব্রত নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছিল। কিন্তু তার একজন সহপাঠী আলতাফ ছিল আবার পাকিস্তানের ঘোর বিরোধী। সে গান্ধীকে মনে করতো বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মানুষ। গান্ধীর মুসলমান শিষ্যদেরকে মনে করতো তার নিজের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা, যারা রামরাজত্বের প্রয়োজন অনুসারে কুরআনের আয়াত পাঠ

এবং তার তাফসীর করতো। কলেজে সে ছিল ন্যাশনালিস্ট ছাত্রদের নেতা। কখনো খদ্দর পরেও কলেজে আসতো সে।

আখতার বক্তৃতা করতে উঠতেই ওদিকে থেকে আলতাফ দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানালো ঃ জনাব সভাপতি! পাকিস্তান একটি বিরোধপূর্ণ বিষয়। আখতারের বক্তৃতায় দেশপ্রেমিক মুসলমানদের আবেগ অনুভূতি আহত হয়। কাজেই তাকে এ বিষয়ে বলার অনুমতি দেবেন না।

আলতাফের সাথিরা একের পর এক তার সমর্থনে দাঁড়িয়ে যেতে থাকে। জবাবে আখতারের সাথিরা এগিয়ে আসে। তারা দাবী জানাতে থাকে, আমরা আখতারের বক্তৃতা অবশ্যই শুনবো। দুপক্ষের বিবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলে ছ'ফুট দীর্ঘ বিশাল বপু পাঠান আফতাব দাঁড়িয়ে সভাপতির টেবিলের কাছে চলে যায় এবং জোর গলায় চিৎকার করে ওঠে, 'আলতাফ তুমি যদি আখতারের বক্তৃতা শুনতে না চাও তাহলে বাইরে বের হয়ে যাও। নইলে আমরাই তোমাকে বের করে দেবো, তুমি খামাখা সভা পণ্ড করার ফিকিরে আছো।'

সেলিম তার দুহাত আলতাফের কাঁধে রেখে বলে, 'আলতাফ সাহেব! মানে মানে কেটে পড়ুন।' মনসুর কলেজের কাবাডির নামকরা খেলোয়াড়। সেলিমের ইংগিতে সে এসে আলতাফের এক কাঁধে হাত রাখে। সে বলে, 'আরে দোস্ত! খামখা মাথা ঘামাও কেন? বসে পড়ো তো।'

আলতাফ বসে পড়ে। হৈ-হট্টগোলের মধ্যে খুব কম ছেলেই বুঝতে পারে যে, সে বসেনি বরং তাকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

সেলিম এখন অন্য ছাত্রদেরকে সম্বোধন করে তাদেরকে বসে পড়ার অনুরোধ করলো। সে বললো, আলতাফ সাহেব তার আপত্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আলতাফ হঠাৎ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু মনসুর ও সেলিমের হাতের চাপে তাকে অগত্যা বসে থাকতে হলো।

সভায় শান্তি ফিরে এলে আফতাব বলে ওঠে, আলতাফ সাহেব! আল্লাহর কসম, এরপর যদি তুমি বক্তৃতা শেষ হবার আগে কোনো গড়বড় করার চেষ্টা করো তাহলে আর কোনো প্রকার ভদ্রতা করা হবে না। যদি কিছু বলতে চাও তাহলে আখতারের বক্তৃতা শেষ হবার পর স্টেজে এসো।

সভাপতি স্বভাবতই অধিকাংশের মতামতকে গ্রাহ্য করে থাকেন। আর অধিকাংশ ছাত্রই প্রায় আখতারের বক্তৃতা শোনার আগ্রহ প্রাকশ করে থাকে।

বি.এ ডিগ্রী হাসিল করার পর আখতারকে অনুসরণ করে সেলিম ও এম.এ.তে ভর্তি হয়ে গেল। কলেজ ও হোস্টেলে আখতার ছিল পাকিস্তানের একজন নিরলস প্রচারক। এ পর্যন্ত বেশ কিছু যুবক তার দলে এসে ভিড়েছিল। হিন্দু প্রেস ও

প্লাটফরম থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রপাগাণ্ডা চলছিল। এ ব্যাপারে গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করার জন্য সে মুসলিম জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

হোস্টেলে সাহিত্য মজলিসের উদ্যোগে একটি বিতর্কসভা অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছিল। বিষয়বস্তু ছিল ঃ 'পাকিস্তান কি ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যার সঠিক সমাধান?' হোস্টেলের আবাসিক ছাত্ররা ছাড়া কলেজের সমস্ত ছাত্র এতে অংশগ্রহণ করছিল।

বিতর্কসভা অনুষ্ঠানের দুদিন পূর্বে আখতারের সর্দিকাশির সাথে জ্বরও দেখা দিল। প্রথম দিন সে ডাক্তারের কাছে যাবার প্রয়োজন অনুভব করলো না। দ্বিতীয় দিন জ্বর প্রবল হয়ে গেলো। সেলিম ডাক্তার ডেকে আনলো। ডাক্তার জানালো তার নিউমোনিয়া হয়েছে।

ডাক্তারের নির্দেশ অনুসারে সেলিম তাকে ঔষধ পান করাতে লাগলো। রাতে সেলিমের সাথে মনসুর ও আফতাব তার কামরায় বসে থাকলো। রাত দুটোর দিকে আখতারের চোখে ঘুম এলো। ফলে মনসুর ও আফতাব তাদের কামরায় চলে গেলো। কিন্তু সেলিম সেখানে বসে থাকলো।

নির্জনতা এড়াবার জন্য আখতারের টেবিল থেকে একটি বই নিয়ে পড়তে লাগলো সে। কয়েক লাইন পড়ার পর আবার বইটা যথাস্থানে রেখে দিল এবং অন্য একটি বই তুলে নিল। কিন্তু তাতেও কোনো আকর্ষণ অনুভূত না হওয়ায় টেবিলের ওপর ছড়ানো কাগজ পত্রগুলি দেখতে লাগলো। তার মধ্য থেকে একটি কাগজে দেখলো কয়েকটি বাক্য লেখা আছে প্রথম দৃষ্টিতে তার কাছে বাক্যগুলি অসংলগ্ন মনে হলো। কিন্তু একটু চিন্তা করতেই সেগুলির মধ্যে একটা গভীর সংযোগ তার চোখে ভেসে উঠলো। এটা ছিল আখতারের বক্তৃতার বিভিন্ন পয়েন্ট।

বক্তৃতার শিরোনামটা কয়েকবার পড়লো সেলিম। তারপর কাজগটা টেবিলের ওপর রেখে মনে মনে এই ভেবে দুঃখ করতে লাগলো যে, আগামীকাল আখতার বিতর্ক অনুষ্ঠানে শামিল হতে পারবে না। আলতাফ ও তার সাথিরা বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে আসছে বিতর্কে অংশগ্রহণ করার জন্য। আখতারের অনুপস্থিতিতে সম্ভবত তাদের পকিস্তান বিরোধিতার জবাব দেবার কেউ থাকবে না। যদি সত্যিই তারা জিতে যায় তাহলে আখতার মনে ভীষণ আঘাত পাবে। পাকিস্তান ছিল আখতারের স্বপ্নের তাবির। সে বলতো, পাকিস্তানের জন্য আমি নিজের মনের গভীরে দশ কোটি মুসলমানের হৃদিস্পন্দন অনুভব করি। একদিন সে বলেছিল ঃ সেলিম, তোমার মধ্যে এখনো সমষ্টিবদ্ধ জীবনের চেতনা সৃষ্টি হয়নি। এখনো তুমি মনে করো কবিতা ও গল্প লিখেই তুমি সময়ের সদ্ব্যবহার করছো কিন্তু শিগগির এমন সময় আসবে যখন তুমি অনুভব করবে যে, পাকিস্তানের জন্য কিছু কার্যকর কাজ করতে গিয়ে তুমি যে সময়টুকু ব্যয় করেছিলে কেবলমাত্র সে সময়টুকু ছাড়া তোমার জীবনের বাকি আর সমস্ত সময় নিস্ফল প্রয়াসে ব্যয়িত হয়েছে। আজ তুমি কোনো কাল্পনিক প্রেমিকার সন্ধানে সময় ক্ষেপণ করছো কিন্তু সেদিন দূরে নয় যখন পাকিস্তানের এক এক ইঞ্চি

জমিন দুশমনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তোমাকে জীবনের প্রিয়তম আকাংখাগুলি কুরবাণী করতে হবে। সেলিম, আমি তোমাকে দিগন্তের দিক চক্রবালে পুঞ্জীভূত ঘূর্ণিঝড়ের লক্ষণগুলি দেখাচ্ছি। অথচ তুমি আমার চিন্তাকে কল্পনা বিলাস মনে করছো। আমি বৃষ্টির আগে ঘরের চাল মেরামত করতে চাচ্ছি। আর তুমি ভাবছো প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘরের চাল মেরামত করবে। আমার ভাই, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ একটি সমষ্টিগত কর্তব্য ও দায়িত্ব। যদি তুমি নিজের জীবন মৃত্যুকে দশ কোটি মুসলমানের জীবন মৃত্যুর সাথে একাত্ম করে ফেলে থাকে তাহলে এই যুদ্ধ থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারবে না। সেলিম, এসো আমার সাথে। যদি কোথাও আমার পা টলে যায় তাহলে আমি যেন তোমার মজবুত বাহুর সহায়তা লাভ করতে পারি। কমপক্ষে আমি এতটুকু সান্ত্বনা পাবো যে, এ যুদ্ধে আমি একা নই। তবে আগামীর দিনগুলোতে তোমাকে আহত ও পংগুদের উঠিয়ে নিয়ে পাকিস্তানের মনজিলে মকসূদে রওনা হতে হবে।

'আখতার তুমি একা নও। আমি তোমার সাথে আছি।' সেলিম তার দিলে নতুন আকাংখা, নতুন উদ্দীপনা অনুভব করছিল। টেবিল থেকে কলম তুলে নিল সে।। সাদা কাগজে লিখতে লাগলো। থেমে থেমে বক্তব্য শুরুর কয়েকটা বাক্য লিখলো। কিন্তু তারপর তার কলম চললো অবাধগতিতে অমিত তেজে।

লেখাটা যখন শেষ করলো, ফজরের নামাযের সময় শুরু হয়ে গিয়েছিল। নামায পড়ে নিয়ে প্রবন্ধটা আর একবার পড়ার জন্য চেয়ারে বসে পড়লো। কিন্তু রাত্রি জাগরণের ফলে তার মাথা ঝিমঝিম করছিল। কিছুক্ষণ আরাম করার নিয়তে দুহাত টেবিলের ওপর বিছিয়ে তার ওপর মাথাটা ঠেকিয়ে দিল। আর অমনি দুচোখ জুড়ে নেমে এলো ঘুম। রাজ্যের ঘুম।

সকাল হয়ে গেছে। আফতাব কামরায় প্রবেশ করলো। আখতার তখন দেয়ালে হেলান দিয়ে সেলিমের লেখা প্রবন্ধ পড়ছিল। আখতার ভাই, এমন জুলুমটি করবেন না। এই বলে তার হাত থেকে প্রবন্ধটি ছিনিয়ে নিল। তারপর তার নাড়িতে হাত রেখে বললো, আরে ভাই জ্বর তো এখনো নামেনি। তবে একটু কমেছে মাত্র। আল্লাহর ওয়াস্তে আজ বিতর্কে অংশ নেবার চেষ্টা করবেন না। আমরা আপনার জায়গায় আর কাউকে দাঁড় করিয়ে দেবো।

আখতার নিশ্চিন্তে বললো, আফতাব, ঐ প্রবন্ধটা একটু পড়ে দেখো।

আমি না পড়েই আপনাকে বাহবা দিতে রাজি আছি। কিন্তু এই শরীরে রাত জেগে আপনার এ লেখার কি প্রয়োজন ছিল? এমন জানলে সারারাত আমি নিজে আপনার পাহারা দিতাম।

আস্তে কথা বলো, সেলিম ঘুমাচ্ছে।

সেলিমই বা কেমন নালায়েক, আপনাকে মানা করতে পরেনি।

আমি তো এইমাত্র উঠলাম। জানি না ডাক্তারের ওষুধে কি ছিল, আমি তো পাশ ফিরেও শুইনি। আসলে এটা সেলিমের কৃতিত্ব।

কিন্তু কি এটা?

আরে ভাই, পড়লেই বুঝা যাবে।

আফতাব বিছানায় আখতারের কাছে বসে পড়লো। অসাবধানে কয়েক লাইন পড়ার পর মনোযোগ সহকারে আবার শুরু থেকে পড়ার প্রয়োজন বোধ করলো। কিছুক্ষণ পর নীরবে পড়ার পরিবর্তে উঁচু স্বরে পড়ে আখতারকে শুনাচ্ছিল। এ রচনায় ছিল পাহাড়ী নদীর ছন্দোময় গতিশীলতা ও সংগীত মুখরতা। কখনো তা পর্বত কিনার ও প্রস্তর খণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বিপুল ধ্বনি সৃষ্টি করে। আবার কখনো সমতল ভূমিতে পৌঁছে আচানক নিজের উচ্চ কণ্ঠধ্বনিকে গভীর ও মিষ্টি সুরে নামিয়ে আনে। তারপর একটি ঢালু পার্বত্য এলাকা এসে পড়ে এবং এ সুরধ্বনি ধীরে ধীরে বুলন্দ হতে থাকে। এমনকি এক সময় তা একটি প্রকাণ্ড জলপ্রপাতে পরিণত হয়। সেলিম কখনো পাকিস্তানের উদ্যান সম্পর্কে এক কবির কল্প চিত্র এঁকে মিল্লাতের সদস্যদেরকে আসন্ন প্রলয়ংকারী ঝড়ের সংকেত শুনাতে থাকে—আবার কখনো যুক্তি প্রমাণের পর্বত প্রাচীর নির্মাণ করে পাকিস্তান বিরোধীদের কণ্ঠরুদ্ধ করে দেয়। শেষ বাক্য'টি আফতাব এমন উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করে যে, সেলিমের গভীর ঘুম ভেঙে যায়। আফতাবের এবং তার চেয়ে বেশি আখতারের চেহারায় নিজের লেখার প্রভাব প্রত্যক্ষ করে সে মনে মনে খুশি হয়। রচনার পাঠ শেষ হলে দুজন সেলিমের দিকে তাকালো।

আফতাব বললো, সেলিম ভাই, তোমাকে মুবারকবাদ দিচ্ছি। এই প্রথমবার তুমি নিজের কলমের সঠিক ব্যবহার করেছো। এখন সময় খুব কম রয়ে গেছে তবুও তুমি এই বক্তৃতাটা যদি মুখস্ত করে ফেলতে পারো তাহলে খুব ভালো হবে। ওদিকে আখতারের অসুস্থতায় আলতাফ খুব খুশি হয়েছে।

আমি এ বক্তৃতা বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশ নেবার জন্য তৈরি করিনি। একটি কাগজের টুকরায় আখতারের বক্তৃতার শিরোনাম দেখে আমার মধ্যে একটা অনুভূতি জাগলো এবং আমি লিখে ফেললাম। এখন জানি না কি লিখেছি।

সেলিম, খুব কম লোকই এমন হয় যারা যথাসময় জানতে পারে, দুনিয়ায় তাদের মিশন কি? অনেকের মধ্যে জাতির সিপাহী হবার যোগ্যতা থাকে। আল্লাহ তাদেরকে জাতির সম্মান ও স্বাধীনতার প্রহরী ও সংরক্ষক করে পাঠান। কিন্তু তারা কবি ও গায়ক হয়ে যায়। অনেক লোক নিছক কবি হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা জাতির নেতা হয়ে বসে। অনেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অতি উন্নত পর্যায়ের মেধা নিয়ে আসে কিন্তু নিজেদের অবহেলা ও অপরিচর্যার কারণে জাতির কাহিনীকার হয়ে যায়। অনেক সময় এমনও হয়, এক ব্যক্তি নিজের মন ও মস্তিষ্কের দিক দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের একক প্রতিভার অধিকারী হয়। কিন্তু জাতির সামগ্রিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে সে নিজের একক প্রতিভার বিনাশ ঘটিয়েছে। সে একজন কবি, একজন সাহিত্যিক। তার দিল অত্যন্ত সংবেদনশীল। ফুলকলিদের মুচকি হাসিও তার হৃদয় তন্ত্রীতে সুমধুর ঝংকার তোলে। সে একজন চিত্রকর। মহান স্রষ্টা তার হৃদয়ে সাত

রঙা রংধনুর রং ভরে দিয়েছেন। সে একজন গায়ক। পাখির কলকাকলি ও জলপ্রপাতের উৎক্ষিপ্ত তরংগের অন্তরনিহিত সুর তার কণ্ঠলগ্ন হয়েছে। কিন্তু তার জাতির ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়েছে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে জাতির সদস্যবর্গ রক্ত সাগরে স্নান করছে। জাতির কন্যাদের নারীত্ব সতীত্ব মহাবিপদের সম্মুখীন। এহেন অবস্থায় এইসব লোক তাদের ব্যক্তিগত আশা আকাংখাকে তাদের সামষ্টিক প্রয়োজনে কুরবাণী করে দিতে প্রস্তুত হয়। কবি ফুলের হাসির পরিবর্তে জাতির নিষ্পাপ শিশুদের হৃদয় বিদারক চিৎকারে প্রভাবিত হয়। সে জাতিকে ঘুম পাড়ানিয়া গান শোনায় না বরং ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দেয়। চিত্রকর কলম তুলি ফিকে ফেলে দিয়ে তলোয়ার হাতে তুলে নেয়। গায়কের গানে ও সুরে পাখির কলকাকলির পরিবর্তে বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা ও কামানের গর্জন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। জাতির কবি সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি সেবীদের অতি অল্পই আছেন যারা বর্তমান অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। জাতির সমগ্রিক চেতনা ও সামগ্রিক চরিত্রকে জাগ্রত করার পরিবর্তে তারা তার মধ্যে এমন একটি মানসিক নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছেন যা বর্তমান অবস্থায় আমাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। দুশমন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ময়দানে দাঁড়িয়ে আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে আর আমাদের কবি এদিকে জাতির নওজোয়ানদের বলছে, দাঁড়াও আমি তোমাদের একটা নতুন গান শোনাচ্ছি। আমি একটা নতুন কবিতা লিখেছি। এটা হচ্ছে সাহিত্যের খাতিরে সাহিত্য। সাহিতিকের কোনো জাত বিচার নেই। এটা একটা নতুন যুগের উন্মেষ।

আমরা একটা ভাঙা নৌকায় চড়ে পাকিস্তানের পথে রওনা দিয়েছি। প্রতিটি পদক্ষেপেই আমরা একটা নতুন ঘূর্ণাবর্তের সম্মুখীন হচ্ছি। অথচ নৌকার এক কোণে বসে আমাদের আর্টিস্টি তার বাদ্যযন্ত্রের তার মেরামত করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। সেলিম! আমি তোমার কবিতা ও সাহিত্যে নব দিগন্তের উন্মেষ দেখতে চাই, যা জাতিকে আশার বাণী শোনাবে। আমি বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবো না। কারণ আমাকে ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। তবে তোমার বক্তৃতা নিশ্চয়ই শুনবো।

আফতাব বললো, আখতার ভাই, আজ সেলিমের জায়গায় আপনি কবি হয়ে গেছেন। ঠিক আছে এখন শুয়ে পড়েন এবং সেলিম তুমি পাশের কামরায় গিয়ে বক্তৃতাটা মুখস্থ করে ফেলো।

রাত আটটায় হোস্টেলের কমন রুমে বিতর্ক অনুষ্ঠান চলছিল। সভাপতি ছিলেন কলেজের একজন নবীন অধ্যাপক। আখতার তার নিজের কামরার পরিবর্তে কমন রুমের পাশে অন্য একটি কামরায় শায়িত হয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য

শুনছিল। মনসুর তার পরিচর্যার জন্য পাশে বসেছিল। খাটের পাশে যে জানালা ছিল সেখান দিয়ে বক্তাদের কথা পুরোপুরি শোনা যাচ্ছিল।

আলতাফ ও তার সাথিরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেই একই যুক্তি প্রমাণ উত্থাপন করছিল যা ইতিপূর্বে হিন্দু পত্র পত্রিকাগুলি করে আসছিল। আলতাফ তার গান্ধীভক্ত ছাত্রদের একটি সংগঠিত গ্রুপ সাথে নিয়ে এসেছিল। তারা তার বক্তৃতার মাঝখানে বারবার হাততালি দিচ্ছিল। তারপর আফতাব মঞ্চে এলো। তার বক্তৃতা ছিল পাকিস্তান বিরোধীদের জন্য প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা। শ্রোতারা অনুভব করছিল, যদি চেয়ারে সভাপতি সাহেব সমাসীন না থাকতেন তাহলে হয়তো সে নিজের আবেগের বাস্তব প্রয়োগই করে বসতো।

সবশেষে সভাপতি ঘোষণা করলেন এখন বিষয়বস্তুর সমর্থনে জনাব সেলিম বক্তৃতা করবেন।

সেলিম চেয়ারে বসে রাতে লেখা কাগজগুলো ওলট পালট করছিল। রাতে লেখা বক্তৃতা প্রায় তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আলতাফের বক্তৃতা তার চিন্তাকে কিছুটা এদিক ওদিক করে দিয়েছিল। সে অনুভব করছিল আলতাফের মুখ বন্ধ করার জন্য তার লেখাগুলো যথেষ্ট নয়। তার গালির জবাবে সে কবিতা লিখে ফেললো। আলতাফের পরে তার সাথিরা যখন বক্তৃতা করছিল তখন তাদের জবাবে সে নতুন নতুন যুক্তি উদ্ভাবন করছিল। এভাবে যখন তাকে মঞ্চে আহ্বান করা হলো, তৈরি করা বক্তৃতা তখন প্রায় তার মাথা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। কি বলবে সে ঠিক করতে পারছিল না। এভাবে দোটানার মধ্যে সে ইতস্ততভাবে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালো।

তার চেহারার ভাব লক্ষ করে আলতাফ হঠাৎ বলে উঠলো, সেলিম সাহেব বক্তৃতা করবেন, নাকি কবিতা পাঠ করবেন?

ওদিক থেকে আফতাব বলে উঠলো, সেলিম সাহেব মিল্লাতের বিশ্বাসঘাতকদের শোকগাথা শুনাবেন।

শ্রোতারা কিছুক্ষণ হই চই করতে থাকলো। শেষে সভাপতি উঠে তাদেরকে থামালেন। সেলিম ইতস্ততভাবে বক্তৃতা শুরু করলো। কয়েক মিনিট বক্তৃতা করার পর লেখা কাগজগুলো একনজর দেখে সেগুলো একপাশে রেখে দিল। তারপর একটুখানি থেমে নতুন করে বক্তৃতা শুরু করলো। শব্দগুলো থেমে থেমে উচ্চারিত হচ্ছিল। শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো। কিন্তু আচানক সে নিজেকে সামলে নিল। তার কণ্ঠধ্বনি সুস্পষ্ট ও উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে লাগলো। সে চিন্তার নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করলো। সে বলছিল ঃ

উপস্থিত ভায়েরা! যদি আলতাফ সাহেব ও তার সাথিরা অখণ্ড ভারতের সমর্থনে বক্তৃতা করতে লজ্জা অনুভব না করে থাকেন তাহলে পাকিস্তানের সমর্থনে কবিতা লিখতেও আমার কোনো লজ্জা নেই। অখণ্ড ভারত আলতাফ সাহেবের গলায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের গোলামীর শিকল পরিয়ে দেয়। আর পাকিস্তান আমাকে একটি স্বাধীন

জাতির সদস্যের মর্যাদা দান করে। যদি হিন্দুর চিরন্তন গোলামী ও লাঞ্ছনা তার কাম্য হয় তাহলে আমি স্বাধীনতা প্রেমী এবং জাতীয় মর্যাদাই আমার কাম্য। কিন্তু আফসোস! যদি এ সমস্যাটির সম্পর্ক কেবল আমার ও আলতাফ সাহেবের সাথে অথবা আমরা যারা এ বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছি কেবল তাদের সাথে হতো! এ অবস্থায় আমরা আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তার মধ্যে বিতর্ককে সীমাবদ্ধ রাখতাম। কিন্তু এতো দুই জাতির সমস্যা। এখানে দুটি মতবাদ ও দুটি সভ্যতার সংঘাত। হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ এখানে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে। হিন্দু চায় অখণ্ড ভারত। কারণ নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তারা মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্ব করতে চায়। খাইবার গিরিপথ থেকে আসামের পার্বত্য এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে চায় রামরাজ্য। শাসন কর্তৃত্ব লাভ করার পর কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তারা মুসলমানদেরকে ব্রাহ্মণ সমাজের পদতলে পিষ্ট ঘৃণিত মানব গোষ্ঠীতে পরিণত করতে চায়।

মুসলমানরা পাকিস্তান চায়। কারণ তারা এক জাতি। একটি জাতির বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও উন্নতি বিধানের জন্য একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজন। কেননা তারা মানুষ। আর একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের গোলামী করার জন্য দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়নি, মুসলমান যখন পাকিস্তানের শ্লোগান দেয় তখন তার চিন্তায় থাকে এমন একটা প্রতিরক্ষামূলক মোর্চা যেখানে অবস্থান করে সে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের আক্রমাণাত্মক উদ্দেশ্যের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। আর হিন্দু যখন অখণ্ড ভারতের শ্লোগান দেয় তখন তার চিন্তায় থাকে এমন একটা প্রশস্ত শিকার ক্ষেত্র যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের নেকড়েরা কোনো প্রকার বাধা প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সংখ্যালঘিষ্ঠের ছাগল ভেড়াদের শিকার করতে পারে।

হিন্দুরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে গেছে। মহাসভাপন্থী হিন্দু, কংগ্রেসী হিন্দু, সনাতন ধর্মী হিন্দু, আর্যসমাজী হিন্দু, হিংসানীতির প্রতি বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী হিন্দু ও অহিংস নীতির প্রচারক হিন্দু, আপাতদৃষ্টে মুসলমানদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্বাস দানকারী হিন্দু এবং পর্দান্তরালে মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ও আকালী দলের সৈন্য গঠনকারী হিন্দু সবাই একজোট হয়ে গেছে। আর যদি আমরা নিজেদের ভবিষ্যতের দিক থেকে চক্ষু বন্ধ করতে না চাই তাহলে আমাদেরও একজোট হতে হবে।

হিন্দুরা সারা ভারতবর্ষের সর্বত্র তাদের দেবতাদের মন্দির নির্মাণ করতে চায়। তারা তাদের সেই অতীতের দিকে ফিরে যাবার জন্য পাগলপারা হয়ে উঠেছে যখন তারা নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অচ্ছুতদের বলিদান করতো। অন্যদিকে মুসলমানরা ভারতের এক কোণে নিজেদের মসজিদগুলি হেফাজত করতে চায়, যেখানে তওহীদের প্রদীপ জ্বলছে, যেখানে অস্পৃশ্যতার শিকলে অবদ্ধ মানবতাকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির পয়গাম শুনানো হয়। হিন্দু অখণ্ড ভারতে ব্রাহ্মণের কর্তৃত্ব

চায়। মুসলমান পাকিস্তানে আল্লাহর কর্তৃত্ব চায়। কিন্তু আজো আমরা জানতে পারিনি ন্যাশনালিস্ট বা গান্ধীভক্ত মুসলমানরা কি চায়?

আফতাব নিচু স্বরে বললো 'ডাল রুটি'। আর অমনি সমস্ত হল প্রচণ্ড অট্টহাস্যে গমগম করে উঠলো।

সেলিম একটু থেমে আবার তার বক্তৃতা শুরু করলো ঃ

এরা ভারতে দশ কোটি মুসলমানের পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করছে। এদের মতে পাকিস্তান দাবী সাম্প্রদায়িক, সংকীর্ণমনতা ও রক্ষণশীলতা এবং এই ভয়াবহ দোষারোপ থেকে বাঁচার জন্য এরা দশকোটি মুসলমানকে এক জাতীয়তাবাদের রশিতে বেঁধে এমন একটা গভীর অন্ধকার খাদে নিক্ষেপ করতে চায় যেখান থেকে এখনো অচ্ছুতদের কাতরানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এরা স্বদেশ ভক্ত এবং স্বদেশের দেবতা দশকোটি মুসলমানের রক্তপানের জন্য লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এরা অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ এবং এরা এজন্য মর্মাহত যে, পাকিস্তান ভূখা ও নাংগা হবে। কিন্তু আফসোস, জাতির এই দরদীরা যদি একটু সাহস করে একথা বলে দেন যে, তারা কেবল ডাল রুটিরই চিন্তা করেন এবং পাকিস্তান গঠনের পর তারা এই মাণ্ণা ও সালওয়া থেকে মাহরুম হয়ে যাবেন যা ওয়ারধার আকাশ থেকে তাদের জন্য নাজিল হয়।

পাকিস্তানের জয় পরাজয়ের ফায়সালা হবে কোনো পানিপথের ময়দানে কিন্তু এই পরাজিত মানসিকতার অধিকারী লোকেরা তো মৃত্যুর আগেই নিজেদের কবর খুঁড়ে বসে আছে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে যদি কোনো আশংকা থাকে তাহলে সে আশংকা সৃষ্টি করবে এই পরাজিত মনোবৃত্তিধারীরা। আমি তাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আজ তাদের কপালে জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার যে দাগ আমরা দেখতে পাচ্ছি আগামীকাল পর্যন্ত সবাই তা দেখে চিনে ফেলবে। এরা আর বেশি দিন জাতিকে এদের এই সৎপরামর্শ দিতে পারবেন না। এরা শান্তিপ্রিয় লোক। এদের মতে পাকিস্তানের শ্লোগান শুনলে হিন্দু মহাসভায়ীরা ক্ষেপে যায় এবং এর ফলে নিজেদের মধ্যে দাংগা ফাসাদ বেড়ে যায়। আর দাংগা ফাসাদ বেড়ে গেলে তাতে গান্ধীর আত্মা দুঃখ পাবে। কাজেই মুসলমানরা যদি পাকিস্তানের শ্লোগান পরিত্যাগ করে হিন্দুদের চিরন্তন গোলামী কবুল করে নেয় তাহলে এর ফলে হিন্দু মহাসভা ক্ষিপ্ত হবে না, ফাসাদও বাড়বে না এবং গান্ধীজীর আত্মাও দুঃখ পাবে না। আর এর সবচেয়ে বড় লাভ হবে এই যে, দুনিয়াবাসী আমাদেরকে সংকীর্ণচেতা ও ফাসাদকারী হিসাবে স্মরণ করবে না। অর্থাৎ আমরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে যদি অখণ্ড ভারতের কবরস্তানে কবর রচনা করতে রাজি হয়ে যাই তাহলে প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণ আমাদের মাজার দেখে বলবেন, এখানে এমন এক জাতি শায়িত আছে যারা হিন্দুদেরকে নিজেদের শরাফতী, শান্তিপ্রিয়তা, সদুদ্দেশ্য ও উদারমনতার প্রমাণ দেবার জন্য স্বহস্তে নিজেদের গলা টিপে আত্মবলিদান করেছিল। এখানে দিল্লীর জামে মসজিদ ও লালকেল্লার নির্মাতাদের এমন সব উত্তরধিকারীরা শায়িত আছেন

যারা বিশ শতকে হিন্দু কর্তৃত্বের প্রাসাদ নির্মাণ করার জন্য নিজেদের কুঁড়েঘরগুলিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এগুলি এমন সব শান্তি প্রিয় ছাগল ভেড়ার হাড্ডির স্তূপ যারা নেকড়েদেরকে নিজেদের রাখাল ও রক্ষক বানিয়েছিল।

এদেশে পাকিস্তানকে আমরা নিজেদের সর্বশেষ প্রতিরক্ষা মোর্চা মনে করি। হিন্দু ফ্যাসিবাদের সয়লাবকে রুখে দেবার জন্য এটা আমাদের শেষ প্রাচীর। আমরা হিন্দুদের জীবিত থাকার অধিকার দেই। তাদের জনসংখ্যার হার অনুযায়ী হিন্দুস্তানের তিন চতুর্থাংশ বরং তার চেয়েও বেশি অংশের ওপর আমরা তাদের শাসন কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু হিন্দুরা নিজেদের স্বাধীনতার পরিবর্তে আমাদেরকে গোলাম বানাবার চিন্তাই করছে বেশি করে। হিন্দু যখন মুসলমানের দরদীর পোশাক পরে পাকিস্তানের বিরোধিতা করে তখন তার দৃষ্টান্ত এমন ডাকাতের থেকে ভিন্নতর হয় না যে তার প্রতিবেশীকে বলেঃ আরে ভাই, তোমার ঘরের চারদিকে এ দেয়াল বানাচ্ছো কেন? এর অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, তুমি আমাকে ডাকাত মনে করছো। এই ধরনের ভুল বুঝাবুঝির ফলে ভ্রাতৃত্বভাবের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। তাই আমি তোমাকে এ প্রাচীর নির্মাণ করার অনুমতি দিতে পারি না। বুদ্ধিমান ডাকাত সাধারণত ঘরের শত্রু কোনো বিভীষণকে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেয়। এই ঘরের শত্রু এসে মালিককে বলে, আরে দোস্ত! কি ব্যাপার, সারা রাত না ঘুমিয়ে তুমি দরোজায় পাহারা দিচ্ছো। যাও নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ো। নয়তো প্রতিবেশী মনে করবে তুমি তাকে চোর মনে করো। উপস্থিত ভায়েরা! এই কংগ্রেসী মুসলমানরা হচ্ছে আমাদের ঘরের শত্রু।

আলতাফ ও তার সাথিরা প্রতিবাদ করার জন্য দাঁড়ালো। কিন্তু বিরোধীদের শ্লোগান ও 'হিয়ার' 'হিয়ার' ধ্বনির মধ্যে তাদের কণ্ঠ হারিয়ে গেলো। শ্লোগান উঠলো, বসে পড়ো, বসে পড়ো! পাকিস্তান জিন্দাবাদ! ঘরের শত্রু মুর্দাবাদ!

আলতাফ চিৎকার করে উঠলো, সভাপতি সাহেব! সেলিমের সময় শেষ হয়ে গেছে।

আফতাব চিৎকার করে উঠলো, না, আমরা শুনবো।

অধিকাংশ শ্রোতা আফতাবকে সমর্থন করলো।

সভাপতি বললেন, আমি মনে করি উভয় পক্ষই এখানে বুঝবার ও বুঝাবার জন্যই এসেছে। কাজেই আমি মিস্টার সেলিমকে তার বক্তৃতা জারী রাখার অনুমতি দিচ্ছি। তার বক্তব্য শেষ হবার পর বিরোধী পক্ষের নেতা কিছু বলতে চাইলে আমি তাকেও অনুমতি দেবো।

উপস্থিত ছাত্রদের অধিকাংশই হাততালি দিয়ে সভাপতির সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানালো। ফলে সেলিম পুনরায় তার বক্তৃতা শুরু করলো ঃ

উপস্থিত ভায়েরা! পাকিস্তানকে যদি নিছক একটি তাত্ত্বিক ও আদর্শিক বিষয় মনে করতাম তাহলে আমি এ বিতর্কে অংশ নিতাম না। বক্তৃতা করার শখ আমার নেই। কিন্তু আসলে পাকিস্তানের সাথে আমাদের জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত হয়ে গেছে।

আমি দেখতে পাচ্ছি ঝড় আসছে অত্যন্ত প্রবল বেগে। আজ যারা পাকিস্তানকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে আগামীকাল তারাই একে নিজেদের শেষ আশ্রয়স্থল মনে করবে। রোদ জ্বালানো দুপুরে যখন উষ্ণ বাতাস চলতে থাকে তখন বিক্ষিপ্ত পথিকরা আপনা আপনিই গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ায়। আমি হিন্দুদের ক্রোধ ও আক্রোশের জন্য পেরেশান হচ্ছি না। বরং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য এটাকে সহায়ক মনে করছি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের যুক্তফ্রন্ট আমাদেরকেও পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে বাধ্য করবে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে সেইসব নাম সর্বস্ব মুসলমানদের থেকে সাবধান করে দিচ্ছি যারা পাকিস্তানের বিরোধিতা এবং রামরাজ্যের স্বপক্ষে কুরআনের আয়াত পেশ করতেও লজ্জা অনুভব করে না। বাগদাদের ওপর যখন জার্মানীদের হামলার প্রস্তুতি চলছিল তখন এই ধরনের লোকেরা মুসলমানদেরকে ধর্মীয় মুনাযিরা-বিতর্কে ফাঁসিয়ে রেখেছিল। আজ যখন হিন্দুরা আমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ ও আকালী দলের ফৌজ তৈরি করছে তখন এরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিতর্ক সৃষ্টি করছে। আমার আশংকা হচ্ছে, যতদিন হিন্দুদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ না হয়ে যাচ্ছে এবং যতদিন তাদের মন্দির ও শিখদের গুরুদ্বারগুলো বোমা তৈরির কারখানায় রূপান্তরিত না হচ্ছে ততদিন এই লোকগুলো আমাদেরকে মানসিক বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রাখবে। এদের বিদ্বিষ্ট ও শত্রুতামূলক তৎপরতার কারণে সম্ভবত পাকিস্তান সম্পর্কে মুসলমানদের সংগ্রাম আরো কয়েক বছর নিছক বক্তৃতা, বিবৃতি, মিটিংয়ে প্রস্তাব পাশ ও মিছিলে শ্লোগান দেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং আমাদের যুক্তফ্রন্ট ও সম্মিলিত মোর্চা বানাবার চিন্তা হবে তখন যখন দুশমনরা চারদিক থেকে আমাদের ওপর গোলা বর্ষণ করবে।

আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবে না, বাস্তব ও কার্যকর প্রচেষ্টা-সংগ্রাম ছাড়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আমাদের একথা ভুললেও চলবে না, আমাদের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার দুশমনরা অস্ত্রশস্ত্রে পুরোপুরি সুসজ্জিত হতে চলেছে। এক্ষেত্রে আমরা যদি নিজেদের পরিপূর্ণ ধ্বংস ও বরবাদী না চাই তাহলে আমাদের 'পাকিস্তান অথবা মৃত্যু' শ্লোগান দিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

যারা আমাদের সংগ ত্যাগ করে অন্যের নৌকায় চড়ে বসেছে এবং কাবার রব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভারতের দেবতাদের ওপর ঈমান এনেছে তাদের চিৎকার ও আহাজারীতে আমরা পেরেশোন হই কেন? আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম তাদের জন্য নিবেদিত হওয়া উচিত যারা ইসলামের জন্য জীবিত থাকতে এবং ইসলামের জন্য মৃত্যু বরণ করতে চায়। তাদেরকে বাস্তব ক্ষেত্রে সংগ্রাম করার জন্য আমাদের তৈরি করতে হবে। দেশের প্রত্যেক প্রান্তে ও আনাচে কানাচে আমাদের এ পয়গাম পৌঁছাতে হবে যে, এখন নিজেদের আজাদী ও অস্তিত্বের জন্য আগুন ও রক্তের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় এসে গেছে।

বন্ধুরা আমার! এখন আর বক্তৃতা, বিবৃতি ও প্রস্তাব পাশের সময় নেই। কাজ করার ও এগিয়ে চলার সময় এসে গেছে।

সেলিমের বক্তৃতার পর আলতাফ কিছু বলতে চাচ্ছিল। সভাপতি আলতাফকে দ্বিতীয়বার স্টেজে আসার আহ্বান জানালেন। কিছুটা ইতস্তত করার পর সে উঠলো কিন্তু একজন বুলন্দ আওয়াজে শ্লোগান দিলঃ 'ঘরের শত্রু।' সংগে সংগেই আফতাব দাঁড়িয়ে জবাব দিল ঃ 'ঘর ভাঙে।' চতুরদিকে হাসির রোল পড়ে গেলো। আলতাফ আর এগুতে পারলো না। নিজের চেয়ারে বসে পড়লো।

মজলিস খতম হবার পর সেলিমের কয়েকজন সাথি তার চারদিকে জমায়েত হলো। কিছুক্ষণ তাদের প্রশংসা বাক্য ও বাহবা শোনার পর কামরার বাইরে যাবার জন্য সে পা বাড়ালো। এমন সময় তাঁর কাঁধে একটি হাতের চাপ পড়লো ঃ সেলিম সাহেব, আসসালামু আলাইকুম।

এই মধুর ধ্বনি সেলিমের কানের পর্দা ভেদ করে মনের গভীরে প্রবেশ করলো। ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলে সে পেছনে ফিরলো। দেখলো এক সুসজ্জিত যুবক হাসছে মিটিমিটি। প্রথম দৃষ্টিতে সেলিম তাকে চিনতে পারলো না। কিন্তু তার মন বলছিল, চিনি চিনি আমি তারে চিনি। সেই হাসি, সেই কণ্ঠস্বর, কোথায় যেন হারিয়ে যাওয়া........। দ্বিতীয়বার তার দিকে তাকিয়ে সে যেন সুদূর অতীতে হারিয়ে যাচ্ছিল। তার চেতনা আড়মোড়া ভাঙছিল ঘুম ঘুম চোখে দেখছিল মিষ্টি মধুর হাসি। কানে বাজছিল সুমধুর কণ্ঠস্বর। আকস্মিক জড়তা ভেঙে হঠাৎ দুহাত বাড়িয়ে 'আরশাদ' 'আরশাদ' বলে আগন্তুককে জড়িয়ে ধরলো সে। তুমি কখন এলে? কোথায় ছিলে? এতদিন কোথায় ছিলে? তুমি আমাকে চিঠিও দাওনি। সেলিম জবাবের আপেক্ষা না করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতেই থাকলো।

আচানক নিজের চারদিকে অন্যান্য ছেলেদের উপস্থিতি অনুভব করে বললো, চলো আমার রুমে গিয়ে বসি।

আরশাদ তার সাথে চলতে লাগলো। রুমে পৌঁছে সেলিম ইলেকট্রিক লাইট জ্বালিয়ে তাকে একটি চেয়ারে বসতে বললো তারপর আগের প্রশ্নগুলোর পুনরাবৃত্তি করলো। জবাবে আরশাদ সংক্ষেপে তার কথা বলতে থাকলো ঃ আমি মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে বের হয়েছি। এখন তুমি আমকে রীতিমতো একজন ছোটখাট ডাক্তার বলতে পারো। সেনাবাহিনীতে চাকুরী পেয়েছি। আশা করি শিগগির ডাক আসবে। লাহোরে আমার খালু অসুস্থ ছিলেন। আব্বাজানের সাথে তাঁকে দেখতে এসেছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, তাঁর চিকিৎসার পরিবর্তে তোমার সাথে সাক্ষাত করাই আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল। সন্ধ্যায় এখানে পৌঁছে দেখি বিতর্ক অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহর শোকর, তোমার বক্তৃতাও শুনেছি। পাকিস্তানের জন্য যদি কোনো সেনাদল গঠন করার কাজ শুরু করে থাকো তাহলে আমার নামও লিখে নাও।

লাহোর কবে এলে?

আজ, এই ধরো আজ বিকেলে চারটেয় এসে এখানে পৌছেছি।

কিন্তু আমার সম্পর্কে জানলে কেমন করে?

আরে ভাই, তোমাদের গ্রামেও গিয়েছিলাম।

কবে?

গতমাসের শেষ রবিবারে। আব্বাজান ও আমীও ওখানে গিয়েছিলেন। রাতে আমরা ওখানে ছিলাম তারপর সকালে ফিরে এসেছি।

এর পরও তুমি আমাকে চিঠি লেখোনি?

চিঠির বদলে আমি নিজেই লাহোরে আসার এরদা করেছিলাম।

তাহলে আমাকে তোমার খালুজানের শোকরগুজারী করা উচিত। কারণ তিনি অসুস্থ হয়ে তোমার সদিচ্ছা পূরণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আচ্ছা, আমি তোমার জন্য খাবার আনতে বলছি। আর রাতের খাবার আমিও এখনো খাইনি।

না, না, কষ্ট করার কোনো দরকার নেই। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আমাকে মডেল টাউনে পৌছতে হবে। সেখানে আমার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে।

না, তুমি মডেল টাউনে যাবে না। আমি তোমার জন্য চারপাই ও বিছানার ব্যবস্থা করছি। তুমি রাতে এখানে থাকবে।

কিন্তু আব্বাজান পেরেশান হবেন। আগামীকাল দুপুরে আমাদের ফিরে যেতে হবে। আমি ওয়াদা করছি আগামীকাল একেবারে সকালেই তোমার কাছে চলে আসবো।

তোমার আব্বাজান জানেন তুমি আমার কাছে এসেছো। তিনি বুঝে নেবেন আমি তোমাকে যেতে দেইনি। সকালে তোমার সাথে গিয়ে আমি তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবো।

আরে, একথা তো আব্বাজানই বলছিলেন, তুমি আসতে পারবে না।

হোটেলের বেয়ারা দরোজায় উঁকি দিয়ে বললো, সেলিম সাহেব, খাবার আনবো?

হ্যাঁ ভাই, দুজনের খাবার আনো।

বেয়ারা চলে গেলে সেলিম আরশাদের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি এক লোকের খবর নিয়ে আসি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বো। তারপর নিশ্চিন্তে কথা বলবো।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে সেলিম ও আরশাদ বিছানায় শুয়ে পড়লো। তারা পরস্পরকে বিগত দিনগুলোর কথা শুনাচ্ছিল। কিন্তু সেলিম এখনো তার মনের আসল প্রশ্নটি করতে পারেনি।

আচানক আরশাদ বলে উঠলো, সেলিম! বড়দিনের ছুটিতে তোমাকে অবশ্যই অমৃতসর আসতে হবে। যদি আমি গ্রামের বাড়িতে যাই তাহলে তোমাকেও সাথে নিয়ে যাবো। আম্মিজানও তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য তাকিদ করে বলে দিয়েছেন।

আরে ভাই, এ তো আজই না জানলাম তোমরা গ্রামের অধিবাসী। তুমি তো বলতে, গ্রামের জীবন দেখার সুযোগ আমার খুব কমই হয়েছে।

হ্যাঁ, বুদ্ধিজ্ঞান হবার পর প্রথমবার যখন আমাদের গ্রামে গেলাম তখন আমার ম্যাট্রিকের পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেখানে আমাদের সামান্য একটু জমি ছিল। এর বেশির ভাগ মরহুম দাদাজান বন্ধক রেখেছিলেন। বাকি যেটুকু ছিল আব্বাজান সেটুকু বন্ধক রেখে নিজের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করেছিলেন। চাকুরী লাভের পর আব্বাজান বাড়িটি তাঁর চাচাত ভাইদের হাতে সোপর্দ করেছিলেন। তিনি এ শপথ করে গ্রাম থেকে বের হয়েছিলেন যে, নিজের জমি ছাড়িয়ে নিতে না পারলে আর গ্রামে ফিরবেন না। এখন আব্বাজান কেবল সে জমিই ছাড়িয়ে নেননি বরং তার সাথে আরো কিছু কিনেও নিয়েছেন। গ্রামের বাইরে আমরা একটা ছোটখাট কুঠিও বানিয়ে নিয়েছি। সেলিম তুমি অবশ্যই আসবে। ইসমত ও রাহাত তোমার কথা খুব বলে। ইসমত এখনো তার সোহেলীদেরকে তোমার কাহিনীগুলি শুনিয়ে থাকে।

সে এখন কোন ক্লাসে আছে?

ইসমত দশম এবং রাহাত সপ্তম শ্রেণীতে।

সেলিম দুটি নিষ্কলংক হাস্যমুখর কিশোরীর কথা ভাবতে লাগলো। সে ভাবছিল জামানার আবর্তনে তাদের মধ্যেও কত পরিবর্তন এসে গেছে। সে ভাবছিল ইসমত এখন বড় হয়ে গেছে। জাতীয় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সূত্রে সে এখন হয়তো নেকাব দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখে। এখন আর সে তার জন্য ফুলের গোছা তৈরি করতে পারবে না। এখন সে তার মাথায় হাত রেখে বলতে পারবে না, দেখো, এটা পড়ে না যায় যেন।

আরশাদ ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পর সেলিমও ঘুমিয়ে পড়লো।

বড়দিনের ছুটিতে সেলিম সোজা নিজের গ্রামে না গিয়ে অমৃতসরে নেমে পড়লো। আরশাদের কাছ থেকে সে আগেই শুনেছিল ডাক্তার সাহেব চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নিজের ডিসপেনসারী খুলেছেন। তাদের অমৃতসরের ঠিকানাও সে নিয়েছিল।

দুপুরে দোকান বন্ধ ছিল। সেলিম টাংগাওয়ালাকে বাসার দিকে চালিত করলো। ডাক্তার শওকতের বাসা খুঁজে নিতে বেশি বেগ পেতে হলো না। মহল্লায় প্রবেশ করে প্রথমে যে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলো সেই তাকে নিয়ে ডাক্তার সাহেবের বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়ে আসলো। সেলিম দরোজার কড়া নাড়লো। একটি ছেলে দরোজা

দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললো, ডাক্তার সাহেব নেই। সেলিমের কিছু বলার আগেই সে দরোজা বন্ধ করে দিল। কিছুটা ইতস্তত করে সেলিম আবার কড়া নাড়লো। সেই ছেলেটিই আবার দরোজা খুলে মুখ বাড়িয়ে বললো, আমি একবার বললাম না ডাক্তার সাহেব নেই? এই বলে সে আবার দরোজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল এমন সময় সেলিম বলে উঠলো, আরে আমজাদ! তুমি মেহমানদের সাথে এমন আচরণ করে থাকো নাকি? আরশাদ কোথায়?

ভাইজান বাইরে গেছেন। এখনই এসে যাবেন। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ভেতর থেকে কে একজন তার কান ধরে ঠেলে দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি লাহোর থেকে আসছেন?

জি হ্যাঁ। সেলিম রাহাতকে চিনতে পেরে জবাব দিলো।

রাহাতের চেহারা খুশিতে ঝলমল করে উঠলো। সে আম্মীজান! আপাজান! বলে পেছন ফিরে বাড়ির ভেতরে দৌড় দিল।

মায়ের আওয়াজ ভেসে এলো, আরে রাহাত, কি হলো?

আম্মীজান, তিনি এসে গেছেন।

কে, সেলিম?

হ্যাঁ, তিনি এসে গেছেন।

ইসমত বই ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত কামরার বাইরে বের হয়ে এলো এবং দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালো। আচানক সেলিমও তার দিকে তাকালো এবং তার দৃষ্টি আপনা আপনি ঝুঁকে পড়লো। ইসমত দ্রুত একদিকে সরে দাঁড়ালো।

মা বললেন, রাহাত! তুমি বৈঠকখানার দরোজা খুলে দিয়ে ভাইকে ভেতরে বসাও। আল্লাহ জানে, নওকরটা আজ কোথায় চলে গেলো।

রাহাত আমজাদকে বললো, আমজাদ, তুমি যাও, ওঁকে বৈঠকখানায় বসাও। আমি দরোজা খুলে দিচ্ছি।

ব্যস, চুপ করো, আমি তোমার হুকুম মানছি না। তুমি আমার কান ধরলে কেন?

ওর গালে এক চড় দাও, মা রাগত স্বরে বললেন।

ইসমত এগিয়ে এসে বললো, এতো দেখছি এক নম্বর শয়তান হয়ে গেছে।

আমজাদ এমন মেহমানের আগমনে মোটেই খুশি হতে পারেনি যে এসেই মুহূর্তের মধ্যে ঘরের পরিবেশ বদলে দিয়েছে। তবুও বড়দের সামনে সে ছিল অক্ষম। কাজেই তাকে বাইরে বের হয়ে আসতে হলো। সেলিমকে ডেকে বললো, আসুন জনাব বৈঠক খানায়!

ততক্ষণে রাহাত বৈঠকখানার দরোজা খুলে দিয়েছিল। সেলিম সুটকেসটি হাতে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। রাহাত ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে, এমন সময় তার আম্মা ভেতরে প্রবেশ করলো। সেলিম সালাম দিল।

তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, বেঁচে থাকো বেটা, এই কিছুক্ষণ আগে আমরা তোমার কথাই আলোচনা করছিলাম। আরশাদ এইমাত্র বাইরে গেছে। বসো

বেটা। রাহাত, তুমি এখনো ভাইয়াকে সালাম করোনি! তখনই সে দুষ্টমীভরা হাসি ছড়িয়ে 'ভাইজান, আসসালামু আলাইকুম' বলেই পাশের কামরার দিকে দিল দৌড়। ইসমত দরোজার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। রাহাত তার দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলে উঠলো, আপাজান। এখন তো উনি অনেক বড় হয়ে গেছেন।

শয়তানী, চুপ কর। ইসমত তার বাহু ধরে দরোজা থেকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে গেলো।

বৈঠকখানায় মা সেলিমকে বলছিলেন, বেটা তুমি বসে আরাম করো। আরশাদ এখনি এসে পড়বে। আমি তোমার জন্যে চা পাঠাচ্ছি। আমজাদ, তুমি ভাইজানের কাছে বসো।

তিনি চলে গেলে সেলিম আমজাদের দিকে ফিরে বললো, আমজাদ এখানে এসো। আমজাদ ইতস্তত করে এগিয়ে এলো। সেলিম তার হাত ধরে নিজের পাশে বসালো আমজাদ পাশের বাড়ির একটি ছেলের সাথে ঘুড়ি উড়াবার জন্য বাইরে যেতে চাচ্ছিল। সে পেরেশান হয়ে ভাবছিল আরশাদ ভাইয়া না আসা পর্যন্ত আজ আর তার ছুটি নেই। কিন্তু সেলিম বাচ্চাদের মন জয় করার ব্যাপারে পারদর্শী ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আমজাদের সাথে মিশে গেলো এবং তারা খোলামেলা কথাবার্তা বলতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে আরশাদ এসে গেলো। সেলিম তার সাথে চা পান করলো। তারপর তারা বেড়াতে বের হয়ে পড়লো। রাতে খাবারের পরে সবাই বসে গেলো আলোচনায়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের ব্যাপারে সেলিমের যুক্তিপূর্ণ ও আবেগময় বক্তৃতার বিষয়বস্তু ডাক্তার সাহেব আরশাদের মুখ থেকে শুনে অত্যন্ত উৎসহিত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শোকর, তোমার মত যুবক এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে শুরু করেছে। ওদিকে হিন্দুরা অনেক বেশি প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এখনো একথায় একমত হতে পারিনি যে, আমরা একটি জাতি এবং আমাদের একটি স্বদেশের প্রয়োজন। তোমাদের মতো যুবকদের অনেক কাজ করতে হবে। নয়তো আমার ভয় হচ্ছে, তুফান এসে যাবে এবং আমাদের কোন আশ্রয় স্থলের প্রয়োজন আছে কি নেই এই বিতর্কেই আমরা তখনো সময় ক্ষেপন করতে থাকবো।

আরশাদের মা বললেন, সেলিম! আরশাদ তোমার বক্তৃতার ভীষণ প্রশংসা করছিল। বক্তৃতার কপি যদি সংগে থাকে তাহলে আমাদের একটু শুনিয়ে দাও।

জী, যে বক্তৃতা আমি করেছিলাম তা তো সেদিনই ভুলে গিয়েছিলাম। আমি কেবলমাত্র বিরোধীদের আপত্তির জবাব দিয়েছিলাম।

ঠিক আছে, তাহলে যা লিখেছিলে তাই শুনিয়ে দাও।

সেলিম সুটকেস খুলে তার লেখা বক্তৃতাটাই শুনিয়ে দিল। ডাক্তার সাহেব তার রচনার উচ্চ প্রশংসা করলেন এবং বললেন, আল্লাহ তোমাকে হিম্মত দান করুন। তুমি পাকিস্তানের জন্য অনেক কিছু করতে পারবে।

রাতে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, সেলিম আরশাদের মা ও ছেলেমেয়েদের সাথে গ্রামে যাবে এবং সেখানে তিন দিন তাদের সাথে থাকবে। সকালেই সে তাদের সাথে অমৃতসর থেকে আজনালাগামী বাসে সওয়ার হয়ে গেলো। ডাক্তার শওকত নিজের ব্যস্ততার কারণে তাদের সহযোগী হতে পারলেন না। আজনালার কয়েক মাইল দূরে আরশাদ ড্রাইভারকে বাস থামাতে বললো। সবাই সেখানে নেমে পড়লো। ডাক্তার সাহেবের চাচাত ভাইয়ের পাঠানো গ্রামের চারজন লোক তাদের মালপত্র মাথায় করে নিয়ে চললো এবং তারা তাদের পেছনে পেছনে গ্রামের দিকে হেঁটে চললো।

আরশাদের মা ও ইসমত কালো বোরকায় আবৃত ছিল, ওদিকে রাহাত গাড়ি থেকে নেমেই বোরকাটা খুলে বাগলদাবা করে নিয়েছিল।

আরশাদ সেলিমকে বলছিল, এ রাহাতটা বড়ই পাজী। কিছুদিন আগে সে মনে করলো বোরকা পরলে ছোট মেয়েরাও নির্ভরযোগ্য ও সম্মানীয় বিবেচিত হয়। কাজেই আমাদের বোরকা বানিয়ে দিতে বাধ্য করার জন্য সে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিল। আর এখন সে মনে করছে বোরকায় ভীষণ কষ্ট। যদি একদিন সে বোরকা পরে তাহলে দুদিন আর মাথায় দোপাট্টা দেবারও দরকার মনে করে না। এখনই আমরা গ্রামে পৌঁছলে তুমি দেখবে গ্রামের ছেলেমেয়েদের ওপর নিজের দাপট দেখাবার জন্য সে আবার বোরকা পরে নিয়েছে।

প্রায় দুমাইল পরিমাণ পথ পায়ে হেঁটে চলার পর আরশাদ সামনের দিকে হাতের ইশারা করে বললো, ঐ দেখো, ঐ আমাদের গ্রাম। আর ওই দেখো, ওই যে আমগাছের সাথে দালানটি ওটি আমাদের নতুন বাড়ি। ঐ গাছটি অনেক পুরোনো। আমার দাদাজান লাগিয়েছিলেন।

সেলিম দুদিন সেখানে থাকলো। ইতিমধ্যে রাহাত ও আমজাদ তার সাথে অনেক খোলামেলা হয়ে গিয়েছিল। রাতে খাবার পর সেলিম তাদেরকে গল্প শোনাতো। সে আরশাদ ও তার আম্মাকে তার গ্রামের রসালো ঘটনা শোনাচ্ছিল। তারা শুনে বেদম হাসছিল। এই সংগে মাঝে মাঝে পাশের কামরা থেকেও কারোর চাপা হাসির মধুর ধ্বনিও তার কানে আসছিল। সে এমন একটি প্রাচীরের অস্তিত্ব অনুভব করছিল যা সময়ের ব্যবধান তার ও ইসমতের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

পরদিন রাতে সেলিম তাদেরকে একটি সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত তার নিজের প্রবন্ধ 'আমার গ্রাম' পড়ে শোনাচ্ছিল।

রাহাত বললো, ভাইজান! সেই পীরের ঘটনা শোনান যে আপনার ঘোড়া কিনতে এসেছিল।

সেলিম পীর বেলায়েত শাহের ঘটনার সাথে সাথে রমজানের দালানের ছাদে মহিষের আরোহনের ঘটনাও শুনিয়ে দিল। সেলিমের কথা শেষ হবার পর যখন সবাই হেসে কুটিকুটি হচ্ছিল, আমজাদ হাসতে হাসতে আচানক গম্ভীর হয়ে গেলো এবং আরশাদের দিকে তাকিয়ে বললো, ভাইজান! আমাদের দালানের পেছন দিকে কাউকে বিচালীর স্তূপ করতে দেবো না।

আরশাদ সেলিমকে বললো, এবার যখন তোমাদের বাড়িতে গেলাম, দেখলাম বৈঠকখানায় সেই ঘোড়াটির ছবি টাঙানো আছে। শুনে আমার খুব দুঃখ হলো যে, ঘোড়াটি মরে গেছে।

আরশাদের মা জিজ্ঞেস করলো, কেমন করে মরলো ঘোড়াটি?

আমার অনুপস্থিতিতে ইউসুফ তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ছোলা খাওয়াতো। সে মনে করতো, তাকে পেট ভরে খাওয়ানো হচ্ছে না। একদিন সে তাকে অনেক বেশি ছোলা খাইয়েছিল। ঘোড়াটি মরে যাওয়ার পরই ঘরের লোকরা জানতে পারলো, সে ইউসুফের মহব্বতের শিকার হয়েছে।

আমজাদ ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, এই ইউসুফটা কে?

সে আমার ছোট ভাই। তুমি তার সাথে খেলা করতে। তাকে ভুলে গেলে?

আপনি যখন জানলেন, ঘোড়াকে সে বেশি ছোলা খাইয়ে দিয়েছিল তখন তাকে কিছুই বলেননি?

আরে ভাই, সে কি জানতো, বেশি ছোলা খাওয়ালে ঘোড়া অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং মরে যাবে।

আমজাদের মনে হঠাৎ নিজের মজলুমীর অনুভূতি জেগে উঠলো। সে বললো, একদিন আমি ভাইজানের টেবিল থেকে দোয়াত ফেলে দিয়েছিলাম। তিনি আমার কান ধরে দুতিনটি থাপ্পড় দিয়েছিলেন। একদিন বড় আপার কলম ভেঙে ফেলেছিলাম। তিনিও আমাকে মেরেছিলেন।

আরশাদ হাসতে হাসতে তাকে নিজের কোলে উঠিয়ে নিয়ে বললো, সেলিম ভাই! এ বড় ভয়ংকর লোক!

রাহাত বললো, ভাইজান! এ হলো কংগ্রেসী আর সব কংগ্রেসী হয় ভয়ংকর। আমজাদ রাগে ক্ষোভে মুখ বেঁকাতে লাগলো।

মা বললেন, খবরদার! আবার যদি আমার ছেলেকে কংগ্রেসী বলেছো কেউ.........!

পরদিন সেলিম বিদায় নিল। আরশাদ মহাসড়ক পর্যন্ত তার সাথে এলো। তারপর তাকে একটি বাসে উঠিয়ে দিল। গ্রামের কাছে পৌঁছে সেলিম দেখতে পেলো সেই পুরাতন বটগাছটি তাদের বাড়ির সামনে ঠিক তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেমন সে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে। সে বাড়ির সামনের আমগাছগুলিও

দেখলো। সেগুলির শাখা প্রশাখা আঙিনার চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। সে ভাবছিল, আম ও বটের শাখা প্রশাখাগুলি যদি একটা আর একটার সাথে মিলে যেতে পারতো তাহলে কতই না ভালো হতো। অতীত দিনের চিন্তা ভাবনাগুলি তার মনের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। সে ভাবনার গভীরে ডুবে গেলো।

মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে এসেছিল। গ্রামের বাইরে রেহটের পানি দিয়ে অযু করলো সেলিম। তারপর নামাযের জন্য দাঁড়ালো। নামাযের পর দোয়া শেষে উঠে দাঁড়াতে গেলে পেছন থেকে কে একজন তার চোখ টিপে ধরলো। সেলিম তার হাত ও মাথা হাতড়িয়ে চিৎকার করে উঠলোঃ মজিদ, তাই না?

মজিদ খিলখিল করে হেসে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরলো। মজিদের পাশে দাঁড়িয়েছিল আর একজন অত্যন্ত বলিষ্ঠ পেশীধারী নওজোয়ান। সেলিম তার সাথে মুসাফাহা করলো এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মজিদের দিকে তাকাতে লাগলো। মজিদ বললো, এবার তোমার পরীক্ষা, বল দেখি এ কে?

সেলিম গভীর দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগলো। আচানক অতীতের বিস্মৃতির পাতাগুলি তার সামনে ভেসে উঠতে লাগলো এবং সে চিৎকার করে উঠলো, আরে দাউদ যে।

মজিদ হাসতে হাসতে বললো, দাউদ! বের করো একটা টাকা। দেখো সেলিম, দাউদ শর্ত লাগিয়েছিল, তুমি তাকে চিনতে পারবে না।

হ্যাঁ, আমার চিনতে একটু দেরি হয়েছে ঠিকই। তবে এখন আবার খুর দিয়ে চুল কামিয়ে ফেলার পরিবর্তে বাবরি রেখেছে, কাজেই একটু সময় তো লাগবেই। যা হোক দাউদ! কবে এলে?

আজ আট দিন হলো এসেছি। আজই জানলাম চৌধুরী মজিদ এসেছে। তাই দেখা করতে এখানে চলে এলাম। দেখা করে যাচ্ছিলাম পথে তোমার সাথে দেখা হয়ে গেলো।

ব্যস, এসেই চলে যাচ্ছো, আর কিছুক্ষণ থাকবে না?

হ্যাঁ, ভাই দাউদ! এখন আর তুমি যেতে পারো না।

রাতে মজিদ ও দাউদ তাদের ফৌজী জিন্দেগীর কার্যক্রম শুনাচ্ছিল। মজিদ এখন জমাদার হয়ে গিয়েছিল। তবে দাউদ এখনো সিপাহী ছিল।

মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এখন বৃটিশ মন্ত্রীসভা হিন্দুস্তানকে স্বাধীনতার এমন এক গাছের ফল বন্টন করতে যাচ্ছিল যাকে জাপান ও জার্মানীর উত্তপ্ত বাতাস থেকে রক্ষা করার জন্য গোলাম জাতিদের কাছে তাদের রক্ত ও ঘামের ভিক্ষা চাওয়া হয়েছিল। আপাত দৃষ্টে ইংরেজ হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক সংগ্রামে একপক্ষের পরিবর্তে একজন শালিসের ভূমিকায় নেমে গিয়েছিল। ১৯৪২ সালে যে কংগ্রেস জাপানের বেয়নেটের ছত্রছায়ে হিন্দু সাম্রাজ্যবাদের পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখে

'ভারত ছাড়ো' শ্লোগান দিয়েছিল এখন আবার তারাই হতাশ হয়ে টোকিওর পরিবর্তে লণ্ডনকে তাদের আশা ভরসার কেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছিল।

ইংরেজ অবশ্যই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু কবে যাচ্ছে? কি অবস্থায় যাচ্ছে? কংগ্রেসের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তার সামনে ছিল একটিই লক্ষ্য। সাদা সাম্রাজ্যবাদ যেসব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হস্তান্তর করবে সেগুলি সবই কালো ফ্যাসিবাদের হাতে চলে আসতে হবে। ইংরেজ কর্তৃত্বের প্রদীপের তেল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেস চাচ্ছিল তার নিবু নিবু শিখা থেকে হিন্দু কর্তৃত্বের মশালটি জ্বালিয়ে নিতে। বৃটিশ সিংহ হয়ে পড়েছিল বার্ধক্যের শিকার। তার দাঁতগুলো ঝরে পড়েছিল। এখন সে হিন্দুস্তানের বিশাল শিকার ক্ষেত্র ত্যাগ করতে চলছিল। তাই এদিকে ভারতের নেকড়েদের মুখ থেকে লালা টপকে পড়ছিল। তারা বলছিল ঃ হে অন্নদাতা! তোমরা চলে যাচ্ছো যাও, তবে এ শিকার ক্ষেত্রটি আমাদের হাতে দিয়ে যাও। দেখো, এখানে আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। যেসব ভেড়া-বকরির দল পাকিস্তানের দাবী করছে তোমরা তাদের দেখে পেরেশান হয়ো না। তারা আমাদের কবজায় আছে। আমরা তাদের দেখাশুনা করি অথবা শিকার করি এ নিয়ে তোমাদের পেরেশান হবার কোনো অধিকার নেই।

হিন্দুর সামনে কেবলমাত্র একটি যুদ্ধক্ষেত্র ছিল এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করার জন্যে সে তার সমস্ত শক্তিকে সক্রিয় করে তুলেছিল। এ যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস একদিকে উন্মাদদের ফউজ তৈরি করছিল। মানবকিতার ইতিহাসে তারা জুলুম, নিপীড়ন, হিংস্রতা ও বর্বরতার একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করতে চলছিল। অন্যদিকে লজিক ছিল ঃ এ ধরনের মুসলমানরা আমাদের ভাই। কজেই স্বাধীন ভারতবর্ষে আমাদের অংশে যা আসে তা আমাদের দিয়ে দাও এবং মুসলমানদের অংশে যা আসে তাও আমাদের দিয়ে দাও। আর কেবল এতটুকুই নয় বরং তোমরা চলে যাওয়ার আগে রাজত্ব ও কর্তৃত্ব অশ্বের পৃষ্ঠে আমাদের সওয়ার করিয়ে দিয়ে যাও। আমাদের হাতে গুলী ভরা পিস্তল দাও এবং মুসলমানদেরকে রশিতে বেঁধে আমাদের সামনে ফেলে দাও। তারপর তোমরা নিশ্চিন্তে চলে যাও। এরপর আর কোনো ঝগড়া হবে না। আর কোনো দাংগা হবে না। এদেশে বিরাজ করবে শান্তি– অনাবিল শান্তি। যদি তোমরা পাকিস্তানের শ্লোগানে কান দাও তাহলে আমরা বলবো, তোমরা সাম্প্রদায়িক দাংগার ভিত রচনা করে যাচ্ছো। আমরা পবিত্র ভারত মাতাকে দুটুকরো করতে দেবো না।

দৌড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা পাকিস্তানকে তাদের শেষ প্রতিরক্ষা ব্যূহ মনে করে তুফানের আগে সেখানে পৌঁছে যেতে চাচ্ছিল। আর হিন্দু ফ্যাসিবাদ নিজের ধ্বংসকর উদ্দেশ্যের সামনে পাকিস্তানকে হিমাচল সদৃশ প্রতিবন্ধক মনে করে তার চারদিক ঘিরে ফেলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল।

হিন্দু ফ্যাসিবাদ তার পূর্ণ সংগঠিত শক্তি নিয়ে এগিয়ে চলছিল। কিন্তু মুসলমানদের পথে কয়েকটি বাধা ছিল। তাদের পথে তথাকথিত ন্যাশনালিস্ট মুসলমানরা কাঁটা বিছাচ্ছিল। অথচ এদেরই পূর্বসূরীরা কখনো শিখ আবার কখনো ইংরেজদের থেকে নিজেদের জাতির শহীদদের খুনের মূল্য আদায় করেছিল। এই সুযোগ সন্ধানীরা ইংরেজ শাসনের অবসানের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেই হিন্দু ফ্যাসিবাদের সাথে নিজেদের ভবিষ্যত জুড়ে দিয়েছিল। পাঞ্জাবকে এরা নিজেদের পৈতৃক মীরাস মনে করতো। এদের জীবনের একটিই উদ্দেশ্য ছিল। এরা চাচ্ছিল নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে এবং তা করতে গিয়ে ইংরেজদের বুট চাটতে বা হিন্দুর পায়ে প্রণাম করতে হলেও তাতে এরা পিছপাও নয়। কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী হিন্দুরা কার্যকর প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। মুসলমানদেরকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত করে রাখার জন্য জাতির বিশ্বাসঘাতকরা কয়েকটি নামে ও কয়েকটি বেনামে ময়দানে এসে গিয়েছিল এবং নানা ধরনের কথা বলে চলছিল। যেমন–

–কংগ্রেস একজন মুসলমানকে 'রাষ্ট্রপতি' উপাধি দিয়ে মুসলমানদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। কাজেই এখন আর পাকিস্তানের প্রয়োজন নেই।

–পাঞ্জাবের ওমুক মৌলবী ও ওমুক প্রফেসার বলেছেন, মুসলিম জনসাধারণ পাকিস্তান চায় না। কাজেই পাকিস্তান নিছক একটি শ্লোগান ছাড়া আর কিছুই নয়।

–সিন্ধুর ওমুক সাইয়েদ ও ওমুক হাজী পাকিস্তানকে মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর মনে করে। কাজেই বুদ্ধিমান মুসলমানরা পাকিস্তানের বিরোধী হয়ে গেছে।

–বেলুচিস্তানে এক ব্যক্তি মাথা থেকে কারাকুলি টুপি নামিয়ে গান্ধী টুপি পরে নিয়েছে। কাজেই পাকিস্তানের প্রশ্নই উঠে না।

–সীমান্ত প্রদেশের ওমুক খান সাহেব গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা থেকে ওঠার পর এ বিবৃতি দিয়েছে যে, গান্ধীজী বড়ই ভালো মানুষ। ছাগলের দুধ খান। অনশন করেন। চরকা কাটেন। কাজেই মুসলমানদের মুক্তি পাকিস্তান বানানোর মধ্যে নেই বরং আছে চরকা কাটার মধ্যে।

মুসলমানরা পেরেশান ও দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের কাঁধে ছিল ল্যাংড়া, লুলা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিহীন নেতাদের লাশ। তাদের মাথায় সওয়ার হয়েছিল মুনাফিক ও জাতির বিবেক বিক্রেতাদের ভূত। এই নেতারা বিভিন্ন পথ ধরে যার যার দলবল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল এমন এক রাজনৈতিক কবরস্তানের দিকে যেখানে কংগ্রেস তাদের কাফন দাফনের যাবতীয় ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

এই আকাশচুম্বী হতাশার মধ্যে একটি আওয়াজ তন্দ্রাচ্ছন্ন ও ভীত-সন্ত্রস্ত মুসলমানদের কানে ইসরাফীলের শিংগাধ্বনির মতো বেজে চলছিল। একজন হালকা পাতলা চেহারার বয়োবৃদ্ধ নেতা তাদেরকে মনজিলে মাকসুদের পথ দেখাচ্ছিলেন। তিনি কখনো নিজের সরু চিকন হাত দুটি দিয়ে জাতির নৌযানের পুরানো ছেঁড়া

পাগড়িগুলি মেরামত করছিলেন আবার কখনো দুশমনের চেহারা থেকে লোক দেখানো ও প্রতারণার নেকাব টেনে নামিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর গুরু গম্ভীর আওয়াজ শ্রোতাদের শিরায় উপশিরায় বিদ্যুতের মতো প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি পথের কাঁটা দুপায়ে দলে বিরোধিতার পাহাড় টপকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগের সাথে কংগ্রেসের মনোভাব যতটা আপোশহীন ছিল ঠিক ততটাই সে ঝুঁকে পড়ছিল ইংরেজের দিকে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজের এখন আর উত্তর ভারত থেকে সিপাই ভর্তি করার প্রয়োজন ছিল না। যেসব দুসাহসিক নওজোয়ান জাপান ও জার্মানীর সয়লাব রুখে দেবার জন্য বুক পেতে দিয়েছিল এবং নির্দ্বিধায় বুকে গুলি খেয়েছিল এখন আর তাদের কদর ছিল না। এখন বৃটেনের তেজারতী উদ্দেশ্যাবলী সম্পাদন করার জন্য মোটা মোটা ভুঁড়িওয়ালা মহাজনের সহায়তার প্রয়োজন ছিল। প্রাচ্যদেশসমূহে আমেরিকার ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া কর্তৃত্বের আশংকা অনুভব করে বৃটি শিল্পপতিরা কংগ্রেসের টাটা, বিড়লা ও ডালমিয়াদের সংগে যোগসাজশ করছিল। কংগ্রেসের পুঁজিপতি পৃষ্ঠপোশক দলের নেতা শেঠ বিড়লা বৃটেনে নিজের ব্যবসায় অভিযানের জন্য গান্ধির আশীর্বাদ লাভ করে বিষয়টির প্রতি পরোক্ষ ইংগিত করেছিলেন যে, ইংরেজ ও কংগ্রেসের রাজনৈতিক সমঝোতার মধ্যে বৃটিশ ব্যবসায়ী ও হিন্দুস্তানী মহাজনের সওদাবাজীকে একটি অপরিহার্য শর্ত গণ্য করা হবে।

কেন্দ্রে অন্তরবর্তীকালীন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠনের উদ্দেশ্যে আহূত শিমলা কনফারেন্সের ব্যর্থতার কারণ ছিল এই যে, কংগ্রেস মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি দল বলে মেনে নিতে রাজি ছিল না। সে কেন্দ্রে হিন্দু ও মুসলিম প্রতিনিধিদের সমান প্রতিনিধিত্বের নীতির বিরোধী ছিল। এছাড়াও সে মুসলমানদের অংশ থেকেও অন্তত একজন ন্যাশনালিস্ট মুসলমানকে মনোনয়ন দেবার অধিকারের পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করতে চাচ্ছিল, যাতে প্রয়োজনের সময় তাকে ওয়ার্ধার সাম্রাজ্যবাদী জোয়ালে জুতে দেয়া যায়।

বাহ্যত এই ন্যাশনালিস্ট বা রাজনৈতিক এতিমদের দলটি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমঝোতার পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আসলে এটি ছিল এমন একটি নিষ্প্রাণ পাথর যার আড়ালে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস হিন্দুর সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের গায়ে অসাম্প্রদায়িকতার প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা চালাচ্ছিল।

শিমলা কনফারেন্সের ব্যর্থতার পর প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদগুলিতে সাধারণ নির্বাচন মুসলিম লীগের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় ছিল। অন্য কোনো হিন্দু দলের সাথে মোকাবিলার ভয় কংগ্রেসের ছিল না। হিন্দু জনতার কাছে

সে প্রমাণ করেছিল যে, ইসলাম বৈরিতা বা পাকিস্তানের বিরোধিতা করার ব্যাপারে তার মানসিকতা হিন্দু মহাসভা থেকে ভিন্নতর নয়। কিন্তু মুসলিম লীগকে একাধিক ক্ষেত্রে লড়াই করতে হচ্ছিল। প্রত্যেক প্রদেশে কোনো না কোনো নামে বিশ্বাসঘাতকদের গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। তাদেরকে মুসলিম লীগের মোকাবিলায় কামিয়াব করার জন্য কংগ্রেসী মহাজনরা তাদের অর্থ ভাণ্ডারের দরোজা খুলে দিয়েছিল।

পাঞ্জাবে ছিল ইউনিয়নিস্ট দল। তারা দেখলো তাদের মাথার ওপর থেকে ইংরেজের ছত্রছায়া উঠে যাচ্ছে। তাই তারা নিজেদের কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য হিন্দু বেনিয়াদের ছত্রছায়া গ্রহণ করলো।

বাইরের হামলার তুলনায় ভেতরের হামলা বেশি ভয়াবহ হয়। জাতিদেরকে ধ্বংস করে দুশমনদের তুলনায় গাদ্দাররাই বেশি। আর এখানে গাদ্দার একজন দুজন ছিল না ছিল হাজার লাখো জন। মুসলমানদের কোনো পল্লী, জনপদ, শহর ও মজলিস তাদের অস্তিত্বমুক্ত ছিল না। আজ পর্যন্ত কোনো জাতি দুনিয়ার বুকে এমন ধরনের গাদ্দারের জন্ম দেয়নি যারা ভরা মজলিসে মঞ্চে দাঁড়িয়ে জাতিকে একথা বুঝাবার দুসাহস করেছে যে, তোমাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য স্বাধীন স্বদেশভূমির প্রয়োজন নেই। সাধারণ জনগণ যতই দুর্বল হোক না কেন, জাতির বিশ্বাসঘাতকদেরকে তারা কখনো রাজনৈতিক যুদ্ধ করার জন্য মল্লবীর হিসাবে মঞ্চে ওঠার অনুমতি দেয় না। এই বিশ্বাসঘাতকরা জাতির চোখের সামনে বিষের পেয়ালা হাতে নিয়ে বলে না যে, মৃত্যুর পরে তোমাদের লাশের কোনো ক্ষতি হবে না দুশমনের পক্ষ থেকে আমরা এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি বরং তারা গোপনে বিশৃংখলার বীজ বপন করে।

কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে সামষ্টিক চেতনা ছিলইনা বললে চলে। ফলে দুশমনদের উচ্ছিষ্টভোজী জাতির এই ঈমান বিক্রেতাদের প্রকাশ্য বাজারে লাফালাফি এবং চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে দেখা যেতো। তাদের দল ছিল, সংগঠনও ছিল। প্রকাশ্যে জাতির সামনে বুলন্দ আওয়াজে তারা ঘোষণা করে ফিরছিল, হে আমাদের জাতি! যদি তোমরা পাকিস্তান হাসিল করে নাও তাহলে তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। আজাদী, স্বাধিকার ও স্বাধীনতা তোমাদের জন্য ক্ষুধা, অনাহার, অভাব, দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ ডেকে আনবে। হিন্দু নারাজ হয়ে যাবে এবং মাহাত্মা গান্ধীর দিলে বিরাট চোট লাগবে। হে মুসলমানরা। তোমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর কর্তৃত্বে আশংকা অনুভব করছো, তোমাদের এ কেমন কাপুরুষতা! তোমরা এতই সংকীর্ণমনা, দুনিয়াবাসী কি ভাববে!

উত্তর পশ্চিম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় পাঞ্জাব মেরুদণ্ডের ন্যায়। এখানে কামিয়াবি হাসিল না করে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তানের মনজিলে মকসুদের দিকে এক কদম এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না।

বাংলার অবস্থা ছিল আশাব্যাঞ্জক। সেখানে কংগ্রেস যেসব মুসলমানকে তার ক্রীড়নকে পরিণত করতে চাচ্ছিল তারা নিজেদের জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু পাঞ্জাবে হিন্দু ফ্যাসিস্টরা তাদের বন্দুক রাখার জন্য ইউনিয়নিস্টদের কাঁধের সহায়তা লাভ করছিল। কংগ্রেস বুঝতে পেরেছিল যে, মুসলিম জনসাধারণ তার পুরাতন বন্ধু তথা ন্যাশনালিস্ট মুসলমানদেরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। তাই পাঞ্জাবে মুসলিম লীগকে পরাস্ত করার জন্য তারা ইউনিয়নিস্টদের সাথে সমঝোতা করে নিল এবং নিজেদের সমস্ত উপায় উপকরণ তাদেরকে বিজয়ী করার জন্য উৎসর্গ করে দিল। তারা নির্বাচন যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য ইংরেজ-ভক্ত শাসকদের সহায়তায় লাখো লাখো টাকা সংগ্রহ করে ফেলেছিল। কংগ্রেসী মহাজনদের পৃষ্ঠপোশকতায় তাদের পুঁজি আরো কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

এহেন অবস্থায় মুসলিম যুব সমাজ বিশেষ করে শিক্ষিত শ্রেণী সামষ্টিক বিপদের সামনে চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারলো না। তারা নিজেদের শিক্ষায়তন, স্কুল, কলেজ ত্যাগ করে এই চক্রান্তকারীদের পরাজিত করার জন্য ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লো। পাকিস্তানের পক্ষে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির তুলনায় মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলির মুসলমানদের জোশ ও জযবা অনেক বেশি ছিল। এর কারণ, হিন্দুদের ইসলামের বিরুদ্ধে দুশমনী তাদের কাছে বেশি সুস্পষ্ট ছিল। তাই ঐসব প্রদেশের বিপুল সংখ্যক ছাত্র, যাদের অধিকাংশই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করছিল, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের বিভিন্ন ময়দানে পৌঁছে গিয়েছিল।

গুরুদাসপুর জেলার একটি ছোট শহরে স্থানীয় মুসলিম লীগের নির্বাচনী জনসভা হচ্ছিল। একজন রিটায়ার্ড স্কুল মাষ্টার সভাপতির আসনে বসেছিলেন। বক্তৃতা করছিল এক নওজোয়ান। জনসভা শুরু হবার আগে শহর ও আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে ঘোষণা করা হয়েছিল, জনৈক পীর সাহেবের সাহেবজাদা এই জনসভায় সভাপতিত্ব করবেন। তাঁর সাথে আরো কয়েকজন স্বনামধন্য নেতাও এখানে আসবেন। গ্রামের লোকেরা বড় বড় নেতাদের দেখার এবং পীর সাহেবের সাহেবজাদার প্রতি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধার প্রমাণ দেবার জন্য বিপুল সংখ্যায় সভাস্থলে হাজির হয়েছিল। জনসভার সময় শুরু হয়ে গিয়েছিল। সাহেবজাদার পয়গাম পৌঁছে গেলো যে, তাঁকে পথে রুখে দেয়া হয়েছে এবং তিনি পরদিন এসে পৌঁছুবেন। এ পর্যন্ত বক্তাদের কোনো খবর নেই।

স্থানীয় দারোগা ও পুলিশ ইন্সপেক্টর এই জনসভার বিরোধী ছিলেন। তহশীলদার সাহেব দুদিন আগেই শহরের আশেপাশের গ্রামগুলিতে বিশ্বস্ত লোকদের ডেকে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, উর্ধতন কর্তৃপক্ষ এলাকায় অশান্তি ও গোলযোগের

আশংকা করছেন তাই তারা যেন জনগণকে জনসভায় যোগদান করা থেকে বিরত রাখার আহবান জানান। দারোগা সাহেব শহরের মাইক্রোফোন দোকানদারকে মুসলিম লীগের সভায় লাউড স্পীকার দিলে তার পরিণাম ভালো হবে না বলে হুমকি দিয়েছিলেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর সাহেবও কনস্টেবলদের দলবল নিয়ে গ্রামে এক চক্কর দিয়ে এসেছিলেন। কয়েকজন ভাড়াটে মৌলবী এলাকার সবচেয়ে বড় হিন্দু মহাজনের মোটর গাড়িতে বসে সরলপ্রাণ গ্রামবাসীদেরকে এ কথা বলে এসেছিলেন যে, পাকিস্তানের শ্লোগান তাদের জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনবে। কিন্তু এই গ্রামগুলিরই বেশ কিছু ছেলে অমৃতসর ও লাহোরের কলেজে পড়তো। স্থানীয় স্কুলগুলির বিপুল সংখ্যক ছাত্রও তাদের প্রভাবাধীন ছিল। তারা সংগঠিত ও দলবদ্ধ হয়ে এইসব গ্রামে এবং আশেপাশের জনপদগুলিতে জনসভার ঘোষণা দিয়ে এসেছিল।

বিকেল চারটায় জনসভার সময় ঘোষণা করা হয়েছিল। গ্রামের ছাত্ররা দুপুরের আগেই যার যার গ্রামের লোকদের নিয়ে দলে দলে শহরের পথে রওয়ানা দিয়েছিল। ছাত্রদের হাতে ছিল সবুজ পতাকা। প্রত্যেক দলের আগে আগে একজন চলছিল ঢোল পিটিয়ে জোরেশোরে। স্থানীয় ইউনিয়নিস্ট প্রার্থী জেলা কংগ্রেস সভাপতিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখানে কয়েকজন হুশিয়ার মৌলবী দরকার।

পীর সাহেবের সাহেবজাদার পয়গাম পাওয়ার পর জনসভা সংগঠকদের সামনে এখন জনসভার সভাপতিত্ব কে করবে এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। দারোগা, পুলিশ ইন্সপেক্টর ও উর্ধতন কর্তৃপক্ষের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে একজন বয়োবৃদ্ধ রিটায়ার্ড স্কুল মাস্টার আপাতত সভাপতির আসনে হাজিরা দিচ্ছিলেন। কিন্তু নেতাদের ইন্তিজার করা হচ্ছিল। সাড়ে চার বেজে গেলো। উপস্থিত জনতার মধ্যে বেচইনি শুরু হয়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত এক নওজোয়ান বক্তৃতা শুরু করলো। সে পাকিস্তানের পক্ষে যুবসুলভ উত্তেজনাপূর্ণ ও উদ্দীপনাময় বক্তৃতা করে চলছিল। কিন্তু দূর দূরান্ত থেকে আগত লোকেরা একজন হ্যাংলা পাতলা বয়োবৃদ্ধ মাস্টার সাহেবকে পীরের সাহেবজাদার এবং একজন উঠতি বয়েসী যুবককে জাতীয় নেতার বিকল্প ভাবতে পারছিল না। নওজোয়ানের বক্তৃতার প্রভাব মঞ্চের চারপাশেই সীমাবদ্ধ ছিল। দূরে উপবিষ্ট লোকেরা মোটেই সেদিকে কান দেয়নি। তারা পরস্পর কথা বলেই চলছিল।

আচানক সভাস্থল থেকে প্রায় একশ কদম দূরে দুটো নতুন সুদৃশ্য মোটর কার এবং তাদের পেছনে একটি ট্রাক এসে থামলো। ট্রাকে লাউড স্পীকার ফিট করা ছিল। ইউনিয়নিস্ট প্রার্থী মোটর কার থেকে বের হলেন। তার সাথে একজন কংগ্রেসী মৌলবী এবং স্থানীয় এলাকার তিন জন প্রভাবশালী জমিদারও কার থেকে বের হয়ে এলেন। অন্য মোটর গাড়িটি থেকে বের হলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর ও কয়েকজন পুলিশ, একজন সাদা পোশাকধারী এবং তিনজন কনস্টেবল। একজন কনস্টেবল, নাথা সিং দারোগা ও করিম বখশ হাবিলদার সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানালো। ইউনিয়নিস্ট প্রার্থীর ইংগিতে প্রপাগাণ্ডা চলছিল। ট্রাকে রাখা লাউড

স্পীকারে গ্রামোফোন রেকর্ড লাগানো হলো। ফলে মুসলিম লীগের জনসভা থেকে পেছনের সারির লোকেরা ধীরে ধীরে উঠে সড়কের উপর জমায়েত হতে লাগলো। কংগ্রেসী মৌলবী সাহেব ট্রাকের ছাদে উঠে পড়লেন এবং মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে কুরআন তেলাওয়াত শেষ করে বক্তৃতা শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মুসলিম লীগের জনসভার লোকজন অর্ধেকে এসে ঠেকলো।

মুসলিম লীগের মোকাবিলায় ইউনিয়নিস্ট নেতার সমাবেশ সফলকাম করার জন্য আশেপাশের গলির হিন্দু ও শিখেরা যোগদান করলো। মুসলিম লীগের জনসভার নওজোয়ান বক্তা এ অবস্থায় শ্লোগান লাগানো শুরু করলো, 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ!' 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ!'

এর জবাবে মোটর কারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতারত মৌলবী সাহেব শ্লোগান দিলেন, 'নারায়ে তাকবীর।' জবাবে একই সময় দুটি বিভিন্ন আওয়াজ উঠলো। মুসলমানরা বললো, 'আল্লাহু আকবর' এবং শিখ ও হিন্দুরা হক- চকিয়ে গিয়ে 'জিন্দাবাদ' বলে দিল। মুসলমানরা হেসে ফেললো। তারা পরস্পর নিজেদেরকে বুঝাচ্ছিল, আরে ভাই, মৌলবী সাহেব যখন 'নারায়ে তাকবীর' বলবেন তখন 'আল্লাহু আকবর' বলে তার জবাব দিতে হবে। এর কিছুক্ষণ পরে মৌলবী সাহেব যখন বুলন্দ আওয়াজে বললেন, 'হিন্দু-মুসলিম ইত্তিহাদ' তখন শিখ ও হিন্দুরা 'জিন্দাবাদ' বলে প্রথম ভুলের কাফফারা আদায় করলো।

আচানক সড়কের ওপর একটি জীপের উদয় হলো। তাতে মুসলিম লীগের ঝাণ্ডা উড়ছিল। ড্রাইভারের সাথে সামনের সিটে বসেছিল সেলিম। পেছনের সিটে আরো চারজন নওজোয়ানও বসে ছিল। সেলিমের ইশারায় ড্রাইভার জিপটি মুসলিম লীগের মঞ্চের পাশে এনে রাখলো। গ্রামের লোকেরা এখনো মনের ওপর জোর খাটিয়ে সেখানে বসেছিল। তারা উঠে উঠে জীপ থেকে নেমে আসা যুবকদেরকে দেখছিল। কেউ একথাও বলছিল, নেতা এসে গেছেন। কেউ বলছিল, আরে না ইয়ার, ইনি নেতা নন। নেতা এদের পেছনে আসছেন।

সেলিম ও তার সাথিরা জীপ থেকে নামলো। তাদের মধ্যে ছিল দুজন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাদের কালো আচকান ও চিপা পাজামা দেখে কেউ কেউ বলতে লাগলো, এঁরাই নেতা। নওজোয়ান বক্তা মঞ্চ থেকে নেমে সেলিম ও তার সাথিদের সাথে মুসাফাহা করলো। তাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে সেলিম পরিস্থিতি আন্দাজ করে ফেলেছিল। সে সভার আয়োজকদের সান্ত্বনা দিয়ে বললো, আপনারা ভাববেন না। আমাদের কাছে লাউড স্পীকার আছে। ওটা জীপ থেকে নামিয়ে স্টেজে দাঁড় করিয়ে দিন।

তারপর তার সাথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, আরে নাসের ভাই, এ সেই মৌলবী সাহেব যাকে আমরা গতকাল অমৃতসর থেকে ভাগিয়েছিলাম।

'আরে এ কচ্ছপ এখানেও এসে গেছে।' কালো আচকান ওয়ালা নওজোয়ান বিস্ময়ের সুরে বললো, ইয়ার, এতো বড়ই বেহায়া, বেশরম।

লাউড স্পীকার ফিট করা হলো। সাথে আনা দুটো হর্ণও দুদিকে বেঁধে দেয়া হলো। সেলিম বললো, নাসের আলী, কিছু নাত শুরু করো ভাই।

নাসের আলী মঞ্চে দাঁড়িয়ে নাত গাইতে শুরু করলো। সামনে বক্তৃতারত মৌলবী সাহেবের আওয়াজ নাতের সুমধুর ধ্বনির মধ্যে হারিয়ে গেলো। যেসব শ্রোতা ইতিপূর্বে জনসভা ছেড়ে উঠে গিয়েছিল তারা সবাই এখন ফিরে আসতে লাগলো।

নাত শেষ হতেই সেলিম মাইকের সামনে খাড়া হয়ে গেলো। কিন্তু তার বক্তৃতা শুরু করার আগেই দারোগা ও হাবিলদার করিম বখশ সেখানে হাজির হয়ে গেলো। দারোগা মঞ্চের কাছাকাছি এসে বললো, শহরে দাংগার আশংকা আছে, কাজেই আপনারা অন্যত্র সভা করুন।

সেলিম বললো, তা না হয় বুঝলাম কিন্তু ওখানে সড়কের ওপর কি হচ্ছে?

ওখানে মৌলবী সাহেব বক্তৃতা করছেন।

তাহলে আপনি কি মনে করেন আমরা এখানে পটকা ফাটাতে এসেছি?

জনতার মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেলো। দারোগা নিজের মূঢ়তা ঢাকার চেষ্টা করে বললো, তুমি কে?

আপনি কি ঐ মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছেন, তুমি কে?

তোমার তা নিয়ে মাথাব্যথা কেন? তুমি আমার কথার জবাব দাও।

সরদারজী, আপনি কি পাকিস্তানের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করতে চান?

দারোগা নরোম সুরে বললো, দেখো হে, আমি এখানে এক জায়গায় দুটি সভা করার অনুমতি দিতে পারি না। তোমাদের মাঝখানে অন্তত এতটুকু দূরত্ব থাকতে হবে যে, একজনের আওয়াজ অন্যজন শুনতে পাবে না। এটা আমার ডিউটি।

ঠিক আছে সরদার সাহেব। ওরা খামখা সভা পণ্ড করার জন্য ট্রাক নিয়ে এসে এখানে খাড়া করে দিয়েছে। আপনি যে এখানে ডিউটিতে আছেন একথাও ওরা খেয়াল করেনি। এই ইউনিয়নিস্টরা বড়ই হঠকারী ও ঝগড়াটে। এরা বিরোধ-বিশৃংখলার বীজ বপন করে। শেষে দুর্নামের ভাগী হয়। আপনি এতবড় একজন অফিসার, আপনি ওদের বলুন এখান থেকে মোটর ও ট্রাক অন্য কোথাও সরিয়ে নিক। আর যদি পেট্রোল না থাকার কারণে মোটর গাড়ি এখানে আটকে গিয়ে থাকে তাহলে সিপাহীদের বলুন এটাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসুক।

হাবিলদার করিম বখশ তিক্ত স্বরে বললো দেখো, তুমি বক্তৃতা করলে আমরা লাঠিচার্জ করবো।

সেলিম নিশ্চিন্তে বললো, তুমি কেমন বেআদব! আমি তোমার অফিসারের সাথে কথা বলছি আর তুমি খামখা মাঝখানে বাগড়া দিচ্ছো। তোমার এতটুকুও তমিজ নেই, তোমার জেনে রাখা দরকার যখন দারোগা সাহেব কারোর সাথে কথা বলেন তখন হাবিলদারের খামুশ থাকা উচিত।

দারোগা প্রথমেই এই সংকট মুক্ত হবার উপায় খুঁজছিল। এখন হাবিলদারকে এক ধমক দিল। তুমি মাঝখানে কথা বলার কে? লাঠিচার্জ করার হুকুম দিল কোন উল্লু কা পাঠঠা?

কিছুক্ষণ পরে সেলিম বক্তৃতা শুরু করে দিল। দারোগার অবস্থা ছিল না ঘরকা না ঘটকা। ইতিউতি তাকাচ্ছিল আর নিজের ঠোঁট চিবাচ্ছিল।

গত তিন সপ্তাহ ধরে অমৃতসর ও গুরুদাসপুর জেলা সফর করার পর সেলিম বুঝতে পেরেছিল, শহরবাসীদেরকে পাকিস্তানের সমর্থক বানাবার জন্য এখন আর বক্তৃতার প্রয়োজন নেই। শহরের ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও চাকুরীজীবি মুসলমানরা হিন্দু মানসিকতার সাথে ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়ে গেছে। ফলে কংগ্রেস-ইউনিয়নিস্ট মুসলমানদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে এখন আর তাদেরকে ধোকা দিতে পারবে না। শহরের শিক্ষিত সমাজ সজাগ হয়ে গেছে। কিন্তু গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা অনেক কম। তাদের বেশির ভাগ গ্রামের বাইরে চাকুরীস্থলে অবস্থান করতো। আর চাষী ও কৃষক সমাজের যারা কিছুটা শিক্ষিত ছিল তার স্থানীয় দারোগা, পুলিশ প্রধান, তহশীলদার, পুলিশের সিপাহী, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ও মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী টাউটদের ভয়ে ভীত ছিল। সেলিম একটা জরীপ করে দেখেছিল তাদের শতকরা সত্তর আশি ভাগ বাহ্যত সুযোগ সন্ধানী ইউনিয়নিস্টদের সাথে ছিল। তবে সময় এলে তারা ভোট দেবে পাকিস্তানের পক্ষে। সময়ের পূর্বে যদি তারা বুঝতে পারে যে, এই নির্বাচনের পরে পঞ্চনদের দেশ থেকে এই জাতিদ্রোহীদের কর্তৃত্ব খতম হয়ে যাবে তাহলে তারা পাকিস্তানের শ্লোগান দিয়ে প্রকাশ্যে রাজপথে বের হয়ে আসবে। গ্রামের অশিক্ষিত লোকদের সমস্যা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ভোটের মূল্য আদায় করার জন্য জোতদার সমিতির চাঁদার ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে অর্জিত সুদ ও কালোবাজারের শেঠ মহাশয়দের বাড়তি টাকা ব্যবহার করা হচ্ছিল। গ্রামবাসীরা এখন দেখছিল যেসব মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা পাঁচ টাকার বিনিময়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য দশ মাইল পায়ে হেঁটে শহরে যেতো তারা এখন সুদৃশ্য মোটর কারে বসে ইউনিয়নিস্ট প্রার্থীদের শ্লোগান হাঁকিয়ে চলছে। তারা গ্রামীণ লোকদের সাথে এভাবে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় আলাপ করতো ঃ

তোমাদের কেরোশিন দরকার?

জি হ্যাঁ।

আর তোমরা চিনিও পাওনা।

জি না, চিনিও পাই না।

তোমাদের কাপড়ও দরকার?

জি হ্যাঁ, এখন তো মুরদার কাফনের জন্যও কাপড় পাওয়া যাচ্ছে না।

ইউনিয়নিস্ট প্রার্থীকে ভোট দাও। কেরোশিন তেল পাবে, চিনি পাবে এবং মুরদাদের জন্য কাফনও পাবে। কাফন বিনামূল্যে পাবে।

একেবারে বিনামূল্যে?

হ্যাঁ, বিনামূল্যে। ইউনিয়নিস্ট পার্টি জোতদার কৃষকদের পার্টি। তোমাদের জন্য প্রত্যেক গ্রামে স্কুল ও হাসপাতাল দেয়া হবে। বিজলী বাতির ব্যবস্থা করা হবে। খাজনা একেবারেই কমিয়ে দেয়া হবে। হ্যাঁ, কাফনের কাপড়ের যদি কারোর প্রয়োজন হয় তাহলে এখনি বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। প্রার্থী নিজেই বিতরণ করবেন।

গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সুন্দর সুন্দর মোটর কারের চারপাশ ঘিরে ধরে। তাদের বড়দের মোটরের আরোহীদের সাথে খোলা মেলা আলাপ করতে দেখে তারাও মোটর গাড়ির সাথে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। কেউ হর্ণ বাজায়। কেউ গাড়ির মিডগার্ডে বসে আখ চুষতে থাকে। বড়রা তাদেরকে ধমক দেয়। কিন্তু কারওয়ালারা বলে, আরে ভাই, বাচ্চাদের কিছু বলো না। ড্রাইভার, ওদেরকে একটু ঘুরিয়ে আনো। হ্যাঁ, বাচ্চারা, একটু শ্লোগান দাও-ওমুক চৌধুরী জিন্দাবাদ! চাষী-জোতদার জিন্দাবাদ! আর গ্রামের ছেলেমেয়েরা এটাকে মোটরের ভাড়া মনে করে জোরে জোরে শ্লোগান দেয়।

এই ধরনের প্রপাগাণ্ডায় যাদেরকে প্রভাবিত করা হচ্ছিল এই জনসভায় তাদেরই বেশি সংখ্যক লোককে সেলিম উপস্থিত দেখতে পাচ্ছিল। কাজেই তার বক্তৃতা শহরের লোকদের সামনে করা বক্তৃতার তুলনায় ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সে বলছিল ঃ

ভাইয়েরা, আজ আমি বড়ই আনন্দিত। কারণ আমাদের সামনে একজন মুসলমান মৌলবী সাহেব বক্তৃতা করছেন এবং তাঁর চারদিকে মুসলমানদের চাইতে বেশি জমায়েত হয়েছে শিখ ও হিন্দু ভাইয়েরা। আবার তারা আনন্দে শ্লোগানও দিচ্ছে। কিন্তু সত্যি করে বলুন, আপনারা কি ইতিপূর্বে আর কখনো এ ধরনের তামাশা দেখেছেন? এক মৌলবী সাহেব ওয়াজ করছেন এবং হিন্দু ও শিখ ভাইয়েরা তা শুনছে, আজব ঘটনা!

শ্রোতাদের কেউ কেউ বলে উঠলো, না কখনো দেখিনি।

আচ্ছা ভাই, আপনারা কি কখনো এও দেখেছেন যে, এই ধরনের ফেরেশতা সুরাত মৌলবী সাহেব কুরআন হাদীস শুনাচ্ছেন এবং হিন্দু ও শিখভায়েরা তার গলায় ফুলের মালা দিচ্ছে?

না, জনতা জবাব দিল।

আচ্ছা ভাইয়েরা বলুন, ঐ যে দুটি মোটর কার এবং যে ট্রাকটিতে চড়ে মৌলবী সাহেব বক্তৃতা করছেন ওগুলি কার?

এক যুবক দাঁড়িয়ে জবাব দিল, ইউনিয়নিস্ট প্রার্থীর।

কিন্তু ভাই, আমি তো শুনেছিলাম, তাঁর শুধুমাত্র একটি টাংগা ছিল এবং তাও এখন ভেঙে গেছে। তাহলে এ নতুন গাড়িগুলি কোথা থেকে এলো?

এক ব্যক্তি জবাব দিল, এই দুটি মোটর কার শেঠ ধনিরামের এবং ট্রাকটি সরদার গোপাল সিংহের।

তাহলে বিষয়টি এই দাঁড়ালো ঃ শেঠ ধনিরাম মুসলিম লীগ বিরোধী প্রার্থীকে নির্বাচন যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য নিজের গাড়ি দিয়ে দিয়েছেন। গোপাল সিং তার ট্রাক দিয়েছেন এবং লাউড স্পীকারও সম্ভবত কোনো সরদার সাহেব বা শেঠ সাহেব দিয়েছেন। প্রয়োজনের সময় আমাদের এক গরীব ভাইকে তারা সাহায্য করেছেন এজন্য আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হিন্দু মহাজন যখন গরীব কৃষক থেকে ঋণের টাকা আদায় করে তখন তার ঘর থেকে দুআনার রুটি সেঁকার তাওয়াটাও ক্রোক করে নিয়ে যায়। কিন্তু আজ ইউনিয়নিস্ট প্রার্থীকে তারা নিজেদের মোটর কার দিচ্ছে, টাকা-পয়সা দিচ্ছে। গতকালও তারা কাফনের কাপড় কালোবাজারে বিক্রি করতো। কিন্তু এখন মুসলিম লীগ বিরোধী প্রার্থীদেরকে শত শত থান কাপড় বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে, যাতে তারা বিনামূল্যে কাফনের কাপড় বিতরণ করে তোমাদের ভোট বাগাতে পারে। আমি জিজ্ঞেস করি, আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা যারা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের টাকা আদায় করে এক আনাকে এক টাকা বানাতে অভ্যস্ত তারা হঠাৎ আজ এতো ফজুল খরচ করছেন কেন? এ প্রশ্নের জবাব হয়তো আপনারা দিতে পারবেন না। ঠিক আছে, আপনারা বলুন হিন্দু পাকিস্তানের বিরোধী কিনা?

বিরোধী, শ্রোতারা চিৎকার করে বললো।

আর ঐ চৌধুরী সাহেব, যিনি হিন্দুদের টাকায় মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ইলেকশানে লড়ছেন?

তিনিও বিরোধী।

আর শিখেরা, যারা তাঁকে ট্রাক দিয়েছেন?

হ্যাঁ, তারাও বিরোধী।

আর এই মৌলবী সাহেব, যার বক্তৃতায় হিন্দু ও শিখ ভাইয়েরা বাহবা দিচ্ছেন?

তিনিও বিরোধী।

আর ঐ দারোগা সাহেব যিনি এইমাত্র আমার ওপর নারাজ হচ্ছিলেন?

তিনিও বিরোধী?

কিন্তু কেন এরা বিরোধী?

লোকেরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। সেলিম একটু থেমে বললো ঃ

আরে ভাই, পাকিস্তানের অর্থ হচ্ছে, যে এলাকায় মুসলমান বেশি সেখানে মুসলমানের হুকুমত হওয়া উচিত। এ কথায় আপনাদের কোনো আপত্তি নেই তো?

না, মোটেই না।

কিন্তু হিন্দুদের আপত্তি আছে। তারা বলে, যেখানে হিন্দু বেশি আছে সেখানে হিন্দুর রাজত্ব হতে হবে আবার যেখানে মুসলমান বেশি আছে সেখানেও হিন্দুর রাজত্ব হতে হবে। মাত্র কয়েকদিনের জন্য পাকিস্তানের বিরোধিতাকারী প্রার্থীকে যদি তারা নিজেদের মোটর গাড়ি, চিনির বস্তা ও কাফনের কাপড় দিয়ে

মুসলমানদেরকে চিরদিনের জন্য গোলাম বানাতে পারে তাহলে তারা মনে করে তাদের এ ব্যবসায় ঘাটতির ব্যবসা হবে না। মহাজনী কারবার তাদের হাতে থাকবে। আইন হবে তাদের এবং আদালত তারাই পরিচালনা করবে। আজ যদি তারা এক টাকা খরচ করে থাকে তাহলে আশা করা যায় আগামীতে এর বদলে এক লাখ টাকা হাসিল করতে পারবে। যদি তারা পাঁচশ বা এক হাজার লোককে বিনামূল্যে কাফন সরবরাহ করে দশ কোটি মুসলমানকে লাঞ্ছনা, দারিদ্র ও গোলামীর গোরস্তানের দিকে ঠেলে দিতে পারে তাহলে তার চেয়ে ভালো ব্যবসায় আর হতে পারে না।

কংগ্রেসী মৌলবী সাহেব ইতিপূর্বেও এ ধরনের বক্তৃতা শুনে এসেছেন। অমৃতসরের একটি মফস্বল শহরে সেলিমের সাথে তাঁর মুখোমুখি হয়েছিল। তিনি জানতেন এই সাদামাটা বক্তব্যের পর তার ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যাবে তা হবে বড়ই ভয়াবহ। তিনি বক্তৃতা করতে করতে থেমে গেলেন এবং বিরোধী পক্ষের কোনো বক্তব্য শোনার পর আবার বলতে শুরু করলেন। কিন্তু আসলে তার বক্তব্য উলট পালট হয়ে গিয়েছিল। আর জমলো না।

সেলিম বলছিল, কংগ্রেসী হিন্দু ও শিখ এ জন্য পাকিস্তানের বিরাধী যে, তারা সমগ্র হিন্দুস্তানের ওপর হিন্দুর রাজত্ব কায়েম করতে চায়। মুসলমানদের এই ইউনিয়নিস্ট দলটি এজন্য পাকিস্তানের বিরোধী যে, তারা ইংরেজের পর হিন্দুদেরকে তাদের অন্নদাতা মা-বাপ বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আপনারা অবাক হবেন এই ফেরেশতা সুরাত মৌলবী সাহেবকে দেখে যার মাথায় না আছে হিন্দুর মতো টিকি, না শিখদের মতো ঝুঁটি আর না ইউনিয়নিস্টদের মতো পাগড়ি, তিনি পাকিস্তানের বিরোধিতা করে কি পাচ্ছেন?

সেলিমের এক সাথি উঠে জবাব দিল, ডাল রুটি আর কি!

এখন লোকেরা মৌলবী সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করছিল। সেলিম নিজের হাসি লুকিয়ে বলতে লাগলো ঃ না ভাই, শুধুমাত্র ডাল রুটির জন্য কেউ এত বড় দুর্নাম কিনতে রাজি হবে না। এটা হচ্ছে মুরগীর রান ও হালুয়ার মেকুর। কিন্তু আমাদের মৌলবী সাহেব জানেন না আমাদের হিন্দু ভাই হালুয়া ও পোলাও খাইয়ে তাঁকে দিয়ে কি কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। আপনারা জানেন মাছ শিকারী কিভাবে বঁড়শি দিয়ে মাছ শিকার করে? সে সূতোর ডগায় বঁড়শিটা বাঁধে। বঁড়শিতে একটা কেঁচো গেঁথে দেয়। তারপর বঁড়শিটা পানির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মাছ মনে করে এটা তার খাদ্য। সে মুখ হাঁ করে সেদিকে দৌড়ে গিয়ে বঁড়শি গিলতে যায়। ফলে কাঁটা তার গলায় আটকে যায়। আরে ভাই, আপনারা হচ্ছেন মাছ, হিন্দুরা শিকারী, ইউনিয়নিস্ট প্রার্থী বঁড়শি এবং এই মৌলবী সাহেব হচ্ছেন কেঁচো। তাঁর চেহারা দেখে প্রতারিত হবেন না। ইনি বড়ই ভয়ংকর। হিন্দু শিকারী মনে করছে চেহারা সুরাত দেখে মুসলমানরা ধোকায় পড়ে যাবে।

এভাবে কংগ্রেসী বক্তার বিরুদ্ধে সেলিম একের পর এক তীর নিক্ষেপ করছিল। সে বক্তৃতা করতে করতে একটু থেমে গেলেই স্কুলের ছেলেরা সমস্বরে বলে উঠছিল 'মৌলবী কেঁচো', 'মৌলবী কেঁচো' কংগ্রেসী মৌলবী কেঁচো হায় হায়!' কিছু ছেলে সভাস্থল ছেড়ে একটি দোকানের ছাদে গিয়ে উঠলো এবং তাদের শ্লোগান এবার মোটর গাড়ি ও ট্রাকের আশে পাশে দাঁড়ানো লোকদের কানেও পৌছে গেলো।

মৌলবী সাহেব ছিলেন যথেষ্ট সচেতন। তিনি সবকিছু হজম করতে রাজি ছিলেন কিন্তু কংগ্রেসের সব রকমের ইনাম অনুগ্রহের বিনিময়ে নিজের জন্য এই নতুন পদবীটি তিনি কোনক্রমেই গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। এখন আবার ছেলেদের শ্লোগানের সাথে সাথে গ্রামবাসীদের অট্টহাসি যুক্ত হয়ে বিশ্রী ধ্বনি সৃষ্টি করেছিল। এখন ছাদে দাঁড়ানো ছেলেদের 'কংগ্রেসী মৌলবী কেঁচো' ধ্বনির সাথে সাথে কিছু হিন্দু-শিখ শ্রোতাও হো হো করে হেসে উঠছিল। এবার মৌলবী সাহেবের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। কায়েদে আজমের বিরুদ্ধে কয়েকটি কঠিন শব্দ উচ্চারণ করতে করতে তিনি নিচে নেমে এলেন।

তার মোটর গাড়ি রওনা দিতে লাগলে ছেলেরা এগিয়ে গিয়ে শ্লোগান দিতে থাকলো। একটি ছেলের গালে থাপ্পড় মারতে চাইলেন জোরসে। কিন্তু গোস্বায় চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। মেরে দিলেন গাড়ির দরোজার কাঁচে। ব্যথায় সিঁটিয়ে গিয়ে হাতটা দ্রুত তুলে নিলেন। মুখটা বিকৃত হয়ে গেলো। সাথে বসা দারোগা বলে উঠলো, আরে জালেম! মেরে ফেললো।

সামনের সিট থেকে ইউনিয়নিস্ট প্রার্থী পেছন ফিরে দেখলেন। দারোগা চোখে হাত বুলাচ্ছিল। কি হলো চৌধুরী সাহেব? তিনি জিজ্ঞেস করলেন। মৌলবী আমার চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে। তওবা, নখ নয় যেন ক্ষুর। দারোগা বলেই চললো।

ওদিকে বাইরে মৌলবী সাহেবকে সমানে কেঁচো বলা হচ্ছিল। তার হাতের আঙুলে বেশ চোট লেগেছিল। সেখানে যন্ত্রণা হচ্ছিল। এখন আবার তার নখের প্রশংসা চলছিল। মৌলবী সাহেব লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা পড়তে পড়তে বললো, দেখুন জনাব, আমার হাতের নখ বড় না?

দারোগা তার পাগড়ির কাপড় মুঠোর মধ্যে পাকিয়ে গোল করে চোখে ঠেসে দিয়ে বললো, আল্লাহর শোকর আপনার নখ বেশি বড় নয়। নয়তো আপনি আর একটু জোর দিলেই আমার চোখটা বের হয়ে পড়তো। বাব্বাহ যেভাবে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

রাতে সেলিম ও তার সাথিরা শহরের একজন কন্ট্রাক্টরের বাড়িতে অবস্থান করলো। খাবার শেষে তারা পরদিনের কর্মসূচি তৈরি করছিল। এমন সময় শহরের কিছু গণ্যমান্য লোক সেখানে এলো। তাদের সাথে নিজের সাথিদের পরিচয় করিয়ে

নিতে গিয়ে সেলিম বললো, ইনি হচ্ছেন জনাব নাসের আলী এবং ইনি জনাব যাফর আলী। এঁরা আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নাসের সাহেব বিহার প্রদেশের এবং যাফর সাহেব উত্তর প্রদেশের অধিবাসী। আর এঁরা হচ্ছেন লাহোরের অধিবাসী জনাব আজীজ ও জনাব জাফর।

লোকদের দৃষ্টি নাসের আলী ও যাফর আলীর প্রতি আকৃষ্ট হলো। একজন প্রশ্ন করলো, আপনাদের প্রদেশে তো মুসলিম লীগের সাফল্য নিশ্চিত, তাই না?

নাসের জবাব দিল, জী হ্যাঁ, সেখানে আমাদের কোনো ভয় নেই। সেখানকার মুসলমানরা হিন্দুদের নির্যাতন সয়ে আসছে। কংগ্রেসের এজেন্টরা সেখানে কাউকে ধোকা দিতে পারছে না। সিন্ধু, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে পাকিস্তানের প্রয়োজনের অনুভূতি না থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, এ সব এলাকায় হিন্দুরা অত্যন্ত সংখ্যালঘু, ফলে তারা মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করছে না। যদি কোন পাঞ্জাবী বা পাঠানকে বলা হয়, হিন্দুরা বড়ই জালেম ও বর্বর তাহলে সে তা মেনে নিতে রাজি হবে না। কারণ তারা এখানে ঢিলের জবাবে পাটকেল মারতে পারে। তারা কল্পনাও করতে পারে না যে, হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে অসদ্ব্যবহার বা জুলুম করতে পারে। এ কারণে সীমান্ত প্রদেশে পাকিস্তানের শ্লোগান এখনো পর্যন্ত বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। উত্তর প্রদেশ, বিহার ও অন্যান্য মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোয় আমাদের বয়স্কদের তো কথাই আলাদা শিশু কিশোররা পর্যন্তও পাকিস্তানের জন্য জান কোরবান করতে প্রস্তুত। সেখানে হিন্দুরা মুসলমানদেরকে যে দৃষ্টিতে দেখে তা হচ্ছে এই যে, হিন্দু হালুইকরের কড়াই যদি কুত্তা জিব দিয়ে চাটে তাহলে সে তাকে খারাপ মনে করে না কিন্তু কোনো মুসলমান যদি তার কড়াই ছুঁয়ে দেয় তাহলে তাকে জানে মেরে ফেলতে পর্যন্ত উদ্যত হয়।

এক নওজোয়ান বললো, এ কথা তো আপনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠরা অবশ্য লাভবান হবে। কারণ তারা স্বাধীনতা লাভ করবে এবং তাদের নিজেদের সরকার গঠিত হবে। তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আপনারা যারা মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশে বাস করছেন আপনাদের এতে কি লাভ? আমার প্রশ্নের অর্থ এ নয় যে, আপনাদের ত্যাগের কোনো মূল্য আমার কাছে নেই বরং আমি অনুভব করছি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে হিন্দুরা যদি আপনাদের ওপর প্রতিশোধ নেয় তাহলে তো আপনাদের অসহায়ত্বের সীমা থাকবে না। তখন আপনারা কি করবেন?

উপস্থিত লোকেরা এ প্রশ্নে কিছুটা বিব্রত বোধ করলেও নাসের নিশ্চিন্তে বললো, আপনারা হয়তো মনে করবেন পাকিস্তানের প্রতি আমাদের সমর্থন নিছক আবেগপ্রসূত এবং নিজেদের ভবিষ্যতের কথা আমরা ভাবিনি। তবে হ্যাঁ, আমরা ভেবেছি অন্যভাবে। আমরা জানি হিন্দুস্তানের দশ কোটি মুসলমানের জন্য দুটিই পথ আছে ঃ অখণ্ড ভারতে হিন্দুদের গোলামী কবুল করে নিতে হবে অথবা হিন্দুস্তানের

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলোয় নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। প্রথম অবস্থায় আমরা সবাই হিন্দুদের দয়া ও করুণার পাত্র হয়ে থাকবো। তারা খাইবার পাস থেকে নিয়ে বাংলার কক্সবাজার পর্যন্ত রামরাজত্ব কায়েম করবে। এ অবস্থায় আমরা সবাই জুলুম নির্যাতনের শিকার হবো। আমাদের সবার ভবিষ্যত হবে একই ধরনের অন্ধকারাচ্ছন্ন। অন্যদিকে দ্বিতীয় অবস্থায় কমপক্ষে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো হিন্দুদের গোলামী থেকে মুক্তি পাবে এবং আমরা বলতে পারবো, পাকিস্তান আমাদের আযাদ ভাইদের দেশ। নিসন্দেহে হিন্দুরা আমাদের সাথে বড়ই নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন আচরণ করবে কিন্তু আমরা এই আশা নিয়ে বেঁচে থাকবো যে, আমাদের ভাইয়েরা একটি স্বাধীন দেশের মালিক হয়েছে এবং তারা আমাদের অবস্থার ব্যাপারে বেপরোয়া থাকবে না। রাজা দাহিরের কয়েদখানায় একটি মুসলিম মেয়ের ফরিয়াদ যদি দামেশকের রাজদরবারে তুফান সৃষ্টি করতে পারে তাহলে তিন চার কোটি মুসলমানের ফরিয়াদ শুনে নিশ্চয়ই আপনারা কানে আঙুল দিয়ে বসে থাকবেন না। মুসলিম মায়েরা যদি বন্ধ্যা না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই কোনো মুহাম্মদ বিন কাসিম ও কোনো মাহমুদ গজনবী জন্ম নেবে। পাকিস্তানের সরজমিন থেকে কোনো মর্দেমুজাহিদ আমাদের ফরিয়াদ শুনে নিশ্চয়ই লাফিয়ে উঠবে। সন্দেহ নেই এমন একটি সময় যাবে যখন আমাদের চারদিকে থাকবে কেবল অন্ধকারই অন্ধকার। কিন্তু আমাদের দিলে আশার আলো জ্বলতে থাকবে। আমাদের অন্ধকার গুহায় বসে আমরা পাকিস্তানের ধূলিকণা থেকে উদিত কোনো সূর্যের অপেক্ষা করতে থাকবো। ধরুন পাকিস্তানের আযাদ ভাইয়েরা আমাদের কথা ভুলে গেলো অথবা আমাদের ফরিয়াদ তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারলো না তাহলে এ অবস্থায় কি আমরা একে মনে করবো একটি ঘাটতির ব্যবসায়? না, বরং মরার সময়ও আমরা এই নিশ্চয়তা নিয়ে মরতে পারবো যে, আমাদের গলা দাবিয়ে দিয়েছিল যে নিষ্ঠুর হাতগুলো সেগুলো আমাদের ভাইদের শাহরগ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না। আমরা যদি ইজ্জত ও আযাদীর জিন্দেগীতে তাদের সাথি না হয়ে থাকি তাহলে এটা আমাদের তকদীরের লিখন কিন্তু লাঞ্ছনা ও গোলামীর মৃত্যুতেও আপনাদেরকে আমাদের সাথে শরীক করতে আমরা কখনোই প্রস্তুত হবো না। আপনাদের সাথে সাঁতার কেটে যদি আমরা তীরে পৌঁছুতে না পারি তাহলে এর অর্থ এ নয় যে, আপনারাও আমাদের সাথে ডুবে যান।

নাসেরের কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠেছিল এবং চোখে অশ্রুবিন্দু টলমল করছিল।

সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া প্রত্যেক প্রদেশে মুসলিম লীগ জয়লাভ করলো বিপুল সংখ্যাধিক্যে। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্টদের নৌকা নির্বাচনী ঘূর্ণীতে ডুবে গেলো। মুসলিম লীগের মোকাবিলায় বিপুল ভোটে হেরে গেলো তারা। লীগের ৮০ জন প্রার্থীর মোকাবিলায় তাদের জয়লাভ করলো মাত্র ৯ জন। কিন্তু শিখ ও হিন্দুরা

ইউনিয়নিস্টদের পড়ন্ত দেয়ালে ঠেকা দিল। ইংরেজ গবর্ণর তাদের অভিভাবকত্ব করলো এবং প্রাদেশিক পার্লামেন্টের সবচেয়ে বড় পার্টি মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে ইউনিয়নিস্টের খিজির হায়াতকে মন্ত্রীসভা গঠন করার আহ্বান জানালো। গুটিকয় বিশ্বাসঘাতকের কারণে পাঞ্জাবের মুসলমানরা নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধীন হয়ে পড়লো। মুসলিম লীগ একজন হিন্দু বা শিখকেও নিজের সাথে মিলাতে পারলো না। কারণ পাঞ্জাবে লীগ মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠার ফলে পাকিস্তান আন্দোলন শক্তিশালী হতে পারে বলে তারা আশংকা করছিল। কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কামান দাগাবার জন্য কংগ্রেস এমন সব নব 'খচ্চর' পেয়ে গিয়েছিল যাদেরকে ইংরেজ তার রাজনৈতিক আস্তাবলে লালন করেছিল অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে।

সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল। সিন্ধুতেও মুসলমানদের একটি সুযোগ সন্ধানী দল মন্ত্রীত্বের টোপ দেখে কংগ্রেসেরা কর্তৃত্বের জোয়ালে কাঁধ দেবার জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বাংলার মুসলিম লীগ এত বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতায় জয়লাভ করেছিল যে, সেখানে কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র করার কোনো সুযোগই ছিল না। মোটকথা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হয়েছিল। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সেখানকার হিন্দু জনতাকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইর জন্য সংগঠিত করা হচ্ছিল। কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পৃষ্ঠপোশকতায় হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের স্বেচ্ছা সেনাদল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছিল। হিন্দু মহাজনরা তাদেরকে টাকা পয়সা দিচ্ছিল। হিন্দু করদ রাজ্যগুলি থেকে তারা লাভ করছিল সামরিক সাহায্য। আত্মরক্ষার লড়াই করার জন্য মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ। কিন্তু এখানকার শিখদের গুরুদ্বারগুলি অস্ত্র নির্মাণ কারখানায় রূপান্তরিত হতে লাগল। হিন্দুদের মন্দির ও স্কুলগুলিতে রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের সেনাদলের ট্রেনিং চলছিল। কিন্তু নিজের জাতির অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার বিনিময়ে মন্ত্রীত্বের সওদাকারী শাহপুরের রাজনীতিবিদ তখনো খামুশ ছিলেন। পাঞ্জাবের মোর্চা মজবুত করার জন্য হিন্দু ও শিখ সীমান্ত প্রদেশ থেকে অস্ত্র পাঠাচ্ছিল। কিন্তু অহিংসার মহান দেবতার নিবেদিত প্রাণ সীমান্ত শিষ্য সাহেব এতে মোটেই পেরেশানি অনুভব করছিলেন না।

হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে কংগ্রেস বাহ্যত আইনানুগ লড়াই চালাচ্ছিল কিন্তু পর্দান্তরালে তারা নিজেদের আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছিল।

মুসলমানদের চিন্তাশীল ও সচেতন গোষ্ঠী এ অবস্থা থেকে বেখবর ছিল না। কিন্তু পাঞ্জাবে ও সীমান্তে তাদের কতিপয় ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতা বা অদূরদর্শিতার কারণে তাদের প্রতিরক্ষা মোর্চাগুলি দুশমনদের কবজায় চলে গিয়েছিল।

বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশন তাদের নিজস্ব প্রস্তাব নিয়ে হিন্দুস্তানে এলো। তাদের সে প্রস্তাবে কংগ্রেস যে অখণ্ড ভারত চাচ্ছিল তা যেমন ছিল না তেমনি মুসলিম লীগ যে

পাকিস্তান দাবী করছিল ঠিক তাও ছিল না। গ্রুপ ভিত্তিক গঠন প্রনালীর কারণে মুসলমানদের নিরাপত্তার সামান্য একটু সম্ভাবনা দেখে মুসলিম লীগ তার নিজের দাবী প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। কিন্তু কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়াটুকুও মেনে নিতে পারলো না। তাদের ফ্যাসীবাদী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর সীমাহীন কর্তৃত্ব অপরিহার্য ছিল। গ্রুপ ভিত্তিক গঠনপ্রণালীর ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি যে সামান্যতম স্বাধিকারের স্পর্শ লাভ করতে পারতো তাতেই কংগ্রেসের রাজনৈতিক মহাত্মা তাঁর মহাসত্যী দূরবীণের বদৌলতে দেখতে পাচ্ছিলেন পাকিস্তানের ভয়ংকর কীটগুলি বেড়ে বেড়াচ্ছে। কাজেই তিনি এই প্রস্তাব উপস্থাপকদের এ কথা বুঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে, তোমাদের প্রস্তাবের অর্থ নিশ্চয়ই তা নয় যা তোমরা মনে করছো। অন্তরবর্তীকালীন সরকারের জন্যও কংগ্রেস মুসলিম লীগের মোকাবিলায় কিছু বেশি সদস্য চাইছিল। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের জন্য ভইসরয় সদস্যের ক্যাবিনেটকে ছয় জন কংগ্রেস পাঁচ জন মুসলিম লীগ ও দুজন সংখ্যালঘুতে রূপান্তরিত করলেন। এরপর কংগ্রেস দীর্ঘকাল ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের লম্বা ভাষায় ওয়ার্ধার ভাষ্য আরোপ করার ওপর জোর দিয়ে চলছিল। তারপর যখন প্রস্তাব উপস্থাপকগণ বলে দিলেন যে, তাদের প্রস্তাবের অর্থ তাই যা তারা বলে দিয়েছেন তখন গান্ধীর আত্মা শোকাহত হলো এবং প্রত্যাখ্যাত হলো।

ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করেছিলেন, কোনো পক্ষ রাজি না হলেও অন্তরবর্তীকালের জন্য কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট গঠন করা হবে। ঘোষণা অনুযায়ী এখন মুসলিম লীগকে ক্যাবিনেট গঠনের সুযোগ দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু শীঘ্রই মুসলিম লীগ জানতে পারলো ইংরেজের প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা করে তারা প্রতারিত হয়েছে।

আসলে হিন্দু ও ইংরেজের এই সমস্ত টালবাহানার উদ্দেশ্যই ছিল পাকিস্তানের দাবী থেকে মুসলিম লীগকে সরিয়ে আনা। মুসলিম লীগ তখন বাতাসের গতি দেখে নিয়েছিল। কাজেই কয়েক কদম এদিক ওদিক ফেলার পর এখন আবার সে তার আসল মনজিলে মকসূদ অর্থাৎ পাকিস্তানের দিকে এগিয়ে চলছিল।

মুসলমানরা ময়দান থেকে বের হয়ে যেতেই আবার হিন্দু ইংরেজ গলায় গলায় মিলে গেলো। লর্ড ওয়াভেল অন্তরবর্তীকালের জন্য কংগ্রেসকে মন্ত্রীসভা গঠন করার আমন্ত্রণ জানাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম লীগের শেষ অস্ত্র ছিল ডাইরেক্ট এ্যাকশান। এটি ছিল ইংরেজের হিন্দু তোষণ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কিন্তু হিন্দুরা নিজেদেরকে ইংরেজের স্থলাভিষিক্ত মনে করে ময়দানে নেমে এসেছিল। বোম্বাই, আহমদাবাদ, এলাহাবাদ এবং হিন্দুস্তানের অন্যান্য শহরে যেখানে মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘু সেখানে হিন্দুরা লুটপাট ও হত্যাকাণ্ড শুরু করলো। এরপর এলো কলকাতার পালা। এখানে ডাইরেক্ট এ্যাকশনের দিন মুসলিম লীগের মিছিলের ওপর ইঁট, হাতবোমা ও বন্দুকের গুলী চালানো হলো ঢালাওভাবে। এ অবস্থায় ভাইসরয় সাহেব আগুনে তেল ঢেলে দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন। তিনি কেন্দ্রে কংগ্রেসের

মন্ত্রিসভা গঠন করে দিলেন। যে হিন্দুরা শাসন কর্তৃত্ব হাসিল করার আশায় এতদ জয়েছিল এখন তারা কর্তৃত্বের নেশায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। পণ্ডিত নেহরু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেই ঘোষণা করলেন, আমার সরকার বিরোধীদের কর্তৃত্বপরতাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। সরদার প্যাটেল বোম্বাইতে বক্তৃতা করলেন এবং সেখানে সাম্প্রদায়িক দাংগার আগুনের তেজ বেড়ে গেলো আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি।

এই নতুন পরিস্থিতিতে স্যার ক্রিপস এ কথা বলে কংগ্রেসকে সংকট থেকে উদ্ধার করলেন যে, কংগ্রেস দীর্ঘকালের জন্য প্রস্তাব মেনে নিয়েছে কাজেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে।

এখনো পর্যন্ত কোনো সংখ্যাগুরু মুসলিম এলাকায় বা শহরে সাম্প্রদায়িক দাংগা হয়নি। কিন্তু কলকাতায় যে আগুন হিন্দুরা লাগিয়েছিল তার কয়েকটা স্ফুলিংগ গিয়ে পড়েছিল নোয়াখালিতে। এটা ছিল মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকা। কলকাতার কিছু মার খাওয়া বিধ্বস্ত লোক হিন্দুদের হাতে তাদের নির্যাতনের কাহিনী শোনাবার জন্য সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। কাজেই সেখানে দাংগা বেধে গেলো। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার সদস্য ও নেতৃবর্গ সংগে সংগেই সেখানে পৌঁছে গেলেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েমের আবেদন জানালেন। শীঘ্রই পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেলো। মুসলিম প্রেস সরবরাহকৃত খবর অনুযায়ী মৃত হিন্দুদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ থেকে একশ'র মধ্যে। কোনো কোনো নেতা মৃতের সংখ্যা দুয়শত পর্যন্ত বলেছেন।[১] বিপরীত পক্ষে এ সময় একমাত্র কলকাতা শহরেই তিন হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানের হত্যার মধ্যে অনেক ফারাক ছিল। মহাত্মা গান্ধীর আত্মা যেখানে ধৈর্য ও নিশ্চিন্ততার সাথে বোম্বাই, এলাহাবাদ, আহমদাবাদ, কানপুর এবং অন্যান্য শহরের হাজার হাজার মুসলমানদের নিধন প্রত্যক্ষ করছিল সেখানে নোয়াখালিতে শতাধিক হিন্দু নিহত হওয়ায় বেচইন হয়ে উঠলো এবং মহাত্মাজী দিল্লীর মেথর কলোনী থেকে মুসলমানদের বর্বরতার বিরুদ্ধে শোরগোল করতে করতে নোয়াখালী পৌঁছে গেলেন। সেখান থেকে খবর আসতে লাগলো, আজ মহাত্মাজী এত মাইল পায়দল সফর করেছেন।

---

১. এখানে আসলে সংখ্যা কম করে দেখানো উদ্দেশ্য নয়। মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকায় কিছু হিন্দু হত্যা বড়ই দুঃখজনক সন্দেহ নেই। এর পেছনে যদি মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা বা অন্য কোনো দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের হাত থাকতো তাহলে তা হতো আরো বেশি লজ্জাজনক। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী বাংগালী হিন্দুদের বর্ণনা এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে যে, কেবল মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার সদস্যবর্গ ও লীগ নেতৃবৃন্দই এই দাংগা প্রশমিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তাই নয় বরং মুসলমানরা নিজেদের গৃহে হিন্দুদের আশ্রয়ও দিয়েছে। এই সত্যের আলোকে এ কথা বলা যথার্থ হবে না যে, এটা স্থানীয় মুসলমানদের চক্রান্ত ছিল বরং এটা এমন একটা দুর্ঘটনা ছিল যার উপাদান বোম্বাই, কলকাতা এবং অন্যান্য শহরগুলি থেকে সরবরাহ করা হয়েছিল।

আজ মহাত্মাজীর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল এবং হিন্দুস্তানের দূর প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তার শিষ্যবর্গ তার অশ্রু মুছে ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আগুন প্রবল বেগে জ্বলেই উঠলো। ভারত মাতার বুকের ভেতর দীর্ঘদিন ধরে যা ধিকিধিকি জ্বলছিল। অহিংসার দেবতার পূজারীরা বিহারের মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলছিল এবং তাদের ঘরবাড়ি সহায় সম্পদ জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। ভারতের ইতিহাসে হিন্দু ফ্যাসিবাদ ও বর্বরতার এক নতুন অধ্যায় সূচিত হলো।

মজিদের বিয়ের প্রস্তুতি চলছিল। লায়ালপুর থেকে তার বোন আমিনা ও দুলাভাইয়ের দুপুরের ট্রেনে আসার কথা। সেলিম ও মজিদ তাদেরকে নেবার জন্য স্টেশনে এসেছিল। দেখতে দেখতে ট্রেন এসে স্টেশনে ভিড়লো। ইন্টারক্লাসের কামরা থেকে তাদের দুলাভাই বের হলো। দুজনে দৌড়ে গিয়ে সালাম বিনিময় ও গলাগলি করলো। পাশের কামরার জানালা থেকে আমিনা বোরকার নেকাব উঠিয়ে বাইরে মুখ বাড়ালো। সেলিম দৌড় গিয়ে কামরায় উঠে আমিনার কোল থেকে আট মাসের তুলতুলে শিশুটিকে কোলে তুলে নিল। আমিনা মা হবার পর এই প্রথম সেলিমকে দেখলো। কোথা থেকে একরাশ লজ্জা এসে যেন তাকে ঢেকে ফেললো। নওকর মালসামান নামিয়ে ফেলেছিল। মজিদ তার দুলাভাইয়ের সাথে আলাপরত ছিল। সেলিম প্লাটফরমে বটগাছটির নিচে আমিনাকে বসিয়ে বললো, ভীড় একটু কমে যাক তারপর আমরা বাইরে যাবো। ততক্ষণে সেলিম ও তার দুলাভাই সেখানে পৌছে গিয়েছিল। মজিদ নওকরকে হুকুম দিল, তুমি মালসামাণগুলি টাংগায় রেখে এসো। আমরাও আসছি। নওকর চলে গেলো। আমিনার স্বামী সেলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, সেলিম সাহেব, আপনার বোন আপনার প্রতি নারাজ।

সেলিম আমিনার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললো, পেত্নীটা আবার আমার প্রতি নারাজ হয়ে গেলো, কেন রে, বল তো?

আমিনা বোরকার নেকাব উঠিয়ে কৃত্রিম ক্রুদ্ধভংগীতে বললো, ভাইজান, আমি আপনার সাথে কথা বলবো না।

আরে আরে এতো রাগ ভালো নয়। মজিদ ভাই, আমাদের মধ্যে আপোশ করিয়ে দাও।

আমিনা তার ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, ভাইজান আপনি না হয় সেনাবাহিনীতে ছিলেন তাই আসতে পারেননি কিন্তু ওনাকে জিজ্ঞেস করেন লাহোর থেকে লায়ালপুর যেতে ওনার কী এমন কষ্ট হতো। প্রথমে পরীক্ষার বাহানা করতেন কিন্তু এখন কিসের বাহানা?

আমিনার স্বামী বললো, হ্যাঁ ভাই সাহেব, প্রথমে উনি আমাকে লিখলেন, পরীক্ষা শেষ হলে নিশ্চয়ই যাবো। তারপর জানালেন, বই লিখছি, এটা শেষ করে যাবো।

শ্ট হাপা হয়ে আমাদের হাতে পৌঁছে গেলো কিন্তু ইনি আর গেলেন না। আমিনা বলতো তার শিকারের শখ খুব বেশি এবং আমি প্রতিদিন তার জন্য বন্দুক সাফ করতাম।

আসলে আমি আব্বাজানের সাথে শিয়ালকোট গিয়েছিলাম। সেখান থেকে তিনি কাশ্মীরে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে এখন আমার আর কোন কাজ নেই। ইনশাআল্লাহ এবার লায়ালপুর যাবো এবং যতদিন আমার বোন চাইবে সেখানে থাকবো।

রেলওয়ে প্লাটফরমের গেটে, টিকেটচেকার কার সাথে কথা কাটাকাটি করছিল। মজিদ উঠে বাইরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাইলো। সেখানে বেশ ভীড় জমে উঠেছিল। মজিদ বাইরের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে সেলিমকে ডাকলো হাত ইশারায়। সেলিম দ্রুত কদম উঠিয়ে মজিদের কাছে গিয়ে বললো, কি হয়েছে এখানে?

মজিদ হাসি চেপে বললো, আরে দেখো, চৌধুরী রমজান চেকার বাবুর সাথে কেমন ঝগড়া করছে। চৌধুরী রমজানকে বাবুর সাথে ঝগড়া করতে দেখে সেলিম এগিয়ে যেতে চাইলো। মজিদ তার হাত টেনে ধরে থামিয়ে দিল। বললো, আরে একটু থামো না, ব্যাপারটা কি একটু শোনা যাক।

বাবু বলছিল, তোমাকে সাড়ে তিন টাকা দিতে হবে। আমার সাথে তর্ক করো না।

বাহ, বাহ, যদি তোমাকে তিন টাকা দিতে হয় তাহল টিকেট কাটলাম কেন?

আরে বাবা, আমি টিকেটের কথা বলছি না। তোমার মালের ওজন বেশি। আমি তার ভাড়া চাচ্ছি।

আল্লাহর কসম, এ হাঁড়িগুলি সবই অন্যের। আমার নিজের ঘরের জন্য আমি মাত্র একটি হাঁড়ি কিনেছি।

হাঁড়ি কার তার সাথে আমার কি সম্পর্ক? তুমি নিজের জন্য কিনেছো বা অন্যের জন্য, এসব তোমার। কাজেই এখানে যা মালসামান আছে আমি তার ভাড়া তোমার কাছ থেকে আদায় করবো।

দেখো বাবু সাহেব আমি একবার আপনাকে আগেই বলেছি, পিসরোর- এ আমার এক আত্মীয়ের সাথে মোলাকাত করতে গিয়েছিলাম। গ্রামের মেয়েরা এসে বললো, পিসরোরের হাঁড়ি বড়ই চমৎকার, আমাদের জন্য নিশ্চয়ই আনবেন। ফাজ্জী, সুগ্রাতী, হারনামকোর, ভাগুতীলান, রহমত বিবি, রেশমী জুলহায়ী এবং প্রতিবেশী আরো কয়েকটি মেয়ে এসে আমাকে ধরলো। তারা আমাকে পয়সা দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু আমি ভাবলাম, গ্রামের মা বোনদের হাঁড়ি পাতিল, এক দু টাকা না হয় আমার পকেট থেকে গেলো। বাবুজী, আমি কি কোনো খারাপ কাজ করেছি? আচ্ছা আপনিই বলুন, আপনি যদি আমার গ্রামের বাসিন্দা হতেন আর আপনার মা যদি আমাকে বলতেন, চৌধুরী রমজান! আমার জন্য পিসরোর থেকে একটা হাঁড়ি আনবে, তাহলে আমি কি না করতে পারতাম?

ব্যস, অনেক হয়েছে চুপ করো, বাবু ধমকের সুরে বললো, ভাড়া বের করো।

আমি কি জানতাম হাঁড়ির ভাড়া তাদের দামের চেয়ে বেশি হবে?

ঠিক আছে আজ জানতে পারলে তো, ভবিষ্যতে আর এমন ভুলটি করো না।

বাবুজী, আল্লাহ যদি আপনাকে কারোর সাথে নেকী করার তওফীক না দিয়ে থাকেন তাহলে অন্তত অন্যদের নিষেধ করেন কেন?

ঠাট্টা করো না। আমি ডিউটিতে আছি।

আমি কি জানতাম আপনি ডিউটিতে আছেন? তাহলে আমি এ হাঁড়িগুলি আনতাম না।

লোকেরা হাসছিল আর বাবুর রাগ বেড়ে যাচ্ছিল। বাবু চিৎকার করে উঠলো, মুখ বন্ধ করো এবং ভাড়া বের করো।

রমজান আরো বেশি পেরেশান হয়ে বললো, বাবুজী! আপনি খামাখা নারাজ হচ্ছেন। যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় তাহলে হাঁড়ির বস্তাটা এখানে রেখে দিন। গ্রামের মেয়েরা যার যার হাঁড়ি নিতে আসবে। তাদের প্রত্যেকের থেকে দু আনা করে নিয়ে নেবেন। আপনার ভাড়ার টাকা উঠে যাবে। আর নয়তো আমার টিকেট ফেরত দিন, আমি এ হাঁড়িগুলি পিসরোরে রেখে আসি।

তুমি কোনো জংগল থেকে আসোনি তো?

বাবুজী, পিসরোর শহর কোনো জংগল নয়।

বয়োবৃদ্ধ স্টেশন মাস্টার এ অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন এবং ধীরে সুস্থে চৌধুরী রমজানকে রেল বিভাগের নিয়ম কানুন বুঝাতে লাগলেন।

চৌধুরী রমজান ফরিয়াদীর ভাষায় বললো, আল্লাহর কসম, গাড়িতে এত ভীড় ছিল যে, সারা পথ আমি হাঁড়ির বস্তা নিজের কোলের ওপর বহন করে এনেছি। হাঁড়ির দাম আমিই দিয়েছি। টিকিটের পয়সা তো দিয়েছি আমিই। কষ্ট আমিই করেছি। এখন আপনিই বলুন, যদি সাড়ে তিন টাকা এই বাবুকে দিই তাহলে এতে আমার কি লাভ?

লাভ এই হবে যে, তোমাকে জেলে যেতে হবে না এবং মান ইজ্জত রক্ষা পাবে।

বাবুজী, আমি কি চুরি করেছি যে জেলে যাবো? এই হাঁড়ি পাতিলের নিকুচি করি এই নিন সাড়ে তিন টাকা। এ কথা বলে পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করে গুণে গুণে বাবুর হাতে দিল। তারপর নিচু হয়ে বস্তার মুখ খুলে ফেললো এবং একটি হাঁড়ি বের করে 'এটা চাচী ফাজ্জীর নামে' বলতে বলতে প্লাটফরমের মেঝের ওপর আছাড় মারলো। তারপর আর একটা উঠালো এবং বললো, 'এটা সুন্নাতীর নামে।' এভাবে এক একটা উঠাতে লাগলো এবং এক একজনের নামে উৎসর্গ করতে লাগলো।

হাঁড়ির সংখ্যা যতই কমতে লাগলো ততই তার জোশ ও গোস্বা বেড়ে যাচ্ছিল। সেলিম, মজিদ ও অন্য লোকেরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। চৌধুরী শেষ হাঁড়িটি উঠালো। এ সময় মনে হয় আর কোন নাম মনে পড়লো না তাই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বাবুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'এটা বাবুজীর মায়ের' এবং সজোরে জমিনের ওপর আছাড় মারলো।

বাবু রেগে গিয়ে হাত উঠালো মারার জন্য। পেছন থেকে সেলিম চৌধুরীকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো।

বাবু সেলিমকে চিনতো। বললো, দেখুন জনাব, ও আমাকে গালি দিচ্ছে। একে পুলিশে সোপর্দ করবো।

সেলিম ষ্টেশান মাষ্টারকে একদিকে ডেকে নিয়ে বললো, সে গরীব মানুষ আমার গ্রামের লোক। কিন্তু আমি পয়সা দিলে নেবে না। আপনি নিজের পক্ষ থেকে তাকে এই পাঁচটি টাকা দিয়ে দিন। একথা বলে পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে ষ্টেশান মাষ্টারের হাতে গুঁজে দিল।

চৌধুরী রমজান এখন নতুন করে লোকদেরকে তার কাহিনী শোনাচ্ছিল। ষ্টেশান মাষ্টার তার পাশে এসে বললেন, আরে ভাই চৌধুরী, নারাজ হয়ে ফিরে যেয়ো না। এ নাও আমি পাঁচ টাকা দিচ্ছি। তবে এর পর পিসরোর থেকে হাঁড়ির বস্তা আনার আগে তা বুক করে নেবে মনে রেখো।

না জনাব, আপনার টাকা আপনার পকেটে রাখুন। এমন ধরনের নেকী আমি আর করছি না।

না ভাই নিয়ে নাও। জরিমানা ও হাঁড়ির দাম তোমাকে ফেরত দিচ্ছি।

চৌধুরী রমজান মজিদ ও সেলিমের দিকে তাকালো। তাদের ইশারায় নোট নিয়ে পকেটে গুঁজলো এবং খালি বস্তাটা কাঁধে উঠালো।

মজিদ বললো, চৌধুরীজী, আমাদের টাংগা রেডি আছে, চলুন আমাদের সাথে।

টাংগায় উঠে বসার পর চৌধুরী বললো, দুনিয়ায় শরাফতের কোনো মূল্য নেই। বেঁজি মুখো বাবুটি বলছিল, আমি এখন ডিউটিতে আছি কিন্তু তোমাকে ও সুবেদারকে দেখতেই বড় বাবু চুপিচুপি পাঁচ টাকা বের করে হাতে গুঁজে দিলেন।

মজিদ বিয়ে করে ফিরে এসেছিল। বাড়ির ভেতরে মেয়েরা দুলহিনকে চারপাশে ঘিরে রেখেছিল। মজিদের মা, চাচী, দাদীকে মোবারকবাদ দেয়ার পালা চলছিল। একজন বয়স্ক মহিলা মজিদের দাদীকে জিজ্ঞেস করলো, তহশীলদারের মা! সেলিমের বিয়ে হচ্ছে কবে?

বোন, ওটা আমার ক্ষমতার আওতায় থাকলে আমি আজই করে ফেলতাম। কিন্তু আলী আকবর বলছিল, সে যদি কোন চাকরী না পায় তাহলে ওকালতি শেখার জন্য আরো তিন বছর পড়তে হবে। কাজেই এখন বিয়ে দিলে তার ওপর একটা বোঝা চেপে বসবে।

হায় হায়, সারা জীবন পড়তেই থাকবে। তার সাথিরা সবাই তিন চারটি ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে গেছে। অথচ সে আরো তিন বছর পড়বে। কোথাও মেয়ে তালাশ করেছেন কি?

আরো বোন অনেক মেয়ের প্রস্তাব আসে। কিন্তু সেলিমের মা একটি মেয়েকে পছন্দ করে বসে আছে এবং সে আর কোনো মেয়ের নাম নিতেই দেয় না। দু'বছর হলো তার মাও এসে বলে গেছে আর কোথাও ছেলের সম্বন্ধ ঠিক করবেন না কিন্তু। গতকাল আলী আকবরের কাছে তাদের চিঠি এসেছে। সম্ভবত সামনের মাসে তারা নিজেরাই এখানে আসবে।

বাইরের হাবেলীতে শামিয়ানার নিচে বসে সেলিমের বাপ, দাদা ও চাচারা প্রায় একই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছিলেন। সেলিম কোনো জিনিস নেবার জন্য বাড়ির ভেতরে আসতেই তার বোন যুবাইদা অন্য মেয়েদেরকে আওয়াজ দিয়ে বললো, আমিনা, সুগরা, হালিমা, আয়েশা এখানে এসো ভাইজান এসে গেছেন। দেখতে দেখতে এক মুহূর্তেই সেলিমের চাচাত, খালাত, ফুফাত, মামাত বোনেরা তাকে ঘিরে ধরলো। আমিনা শুরু করলো, ভাইজান! ভাবীকে কবে আনছেন?

কোন ভাবী? দুষ্টু ফাজিল মেয়ে, চুপ করো। নয়তো পিটনী খাবে।

ঠিক আছে, পিটনী খেতে রাজি কিন্তু ভাবীজানকে আনতে হবে।

মেয়েরা শোরগোল শুরু করে দিল। সেলিম তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে ঘরের বাইরে চলে এলো। উঠানে তার মা বললো, সেলিম! আমার মনে ছিল না তোমার দুটি চিঠি এসেছে। তোমার টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছি।

সেলিম দ্রুত ভেতরে গিয়ে ড্রয়ার থেকে চিঠি বের করলো। একটি চিঠি ছিল অতি সংক্ষিপ্ত আখতারের পক্ষ থেকে। তাতে সে লিখেছিল ঃ স্বেচ্ছাসেবকদল নিয়ে আমি বিহারে যাচ্ছি। তুমি যেতে চাইলে দুচার দিনের মধ্যে লাহোরে এসে যাও।

দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছিল নাসের। এটা বেশ দীর্ঘ চিঠি ছিল। সেলিম দ্রুত শেষ পৃষ্ঠা উলটিয়ে লেখকের নামটি দেখে নিল এবং সেটি নিশ্চিন্তে পড়ার জন্য পকেটে পুরে বাইরে বের হয়ে এলো। বাইরে শামিয়ানার নিচে মহফিলে বেশ রসাত্মক আলোচনা চলছিল। সেলিমের এখন সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। তাই সে চলে গেলো বৈঠকখানায়। নাসের আলীর চিঠির বিষয়বস্তু ছিল ঃ

আমার পাকিস্তানী ভাই!

আমি কলকাতার একটি হাসপাতাল থেকে তোমাকে এ চিঠি লিখছি। বিহারে আগুন ও খুনের দরিয়া পার হয়ে আমি এখানে এসেছি। যা কিছু স্বচক্ষে দেখলাম তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। আর বর্ণনা করলেও তুমি বিশ্বাস করবে না। তুমি কি একথা মেনে নিতে পারবে, দুহাজার মানুষের একটি জন বসতি, যেখানে এক দিন প্রভাতে জীবন জোয়ার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সন্ধ্যা হতে হতেই সেখানে কেবল ছাইয়ের স্তূপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না? সূর্যের প্রথম আলো যেখানে হাস্যমুখর জীবন্ত মানুষদের চেহারা দেখেছিল সেখানে পড়ন্ত সূর্যের আলো দেখছিল ছড়ানো হাজারো লাশের কর্তিত ও অগ্নিদগ্ধ দেহাবয়ব। তাদের দাফন কাফন করারও কেউ ছিল না।

সেলিম! এটা ছিল আমার গ্রাম। বিহার প্রদেশের যে শত শত মুসলিম জনবসতির শিশু-বৃদ্ধ-যুবা-নারী-পুরুষ সবাই অহিংসা ও শান্তির পতাকাবাহীদেরকে তাদের স্বরূপে প্রত্যক্ষ করেছে আমাদের এ গ্রামটি তাদের অন্যতম। পুরুষ ও নারীদের হাত পা নাক, কান ও শরীরের অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ কেটে মসজিদের সিঁড়িতে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। ছোট ছোট শিশুদেরকে শূন্যে নিক্ষেপ করে বর্শাবিদ্ধ করা হয়েছিল। যুবতী মেয়েদের সতীত্ব ও নারীত্বের চরম অবমাননা করা হয়েছিল এবং বাপ ভাইদেরকে বেয়নেটের মুখে তাদের স্ত্রী-বোনদের সতীত্বের চরম লাঞ্ছনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

তুমি হয়তো আমাদের আত্মমর্যাদাহীনতা ও কাপুরুষতার জন্য র্ভৎসনা করবে। কিন্তু বিশ্বাস করো এ ধরনের অবস্থার জন্য আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। কংগ্রেস আমাদের বিরুদ্ধে নেকড়ের পাল লেলিয়ে দেবার পূর্বে আমাদের হাত-পা বেঁধে ফেলেছিল। যে পুলিশরা একদিকে আমাদের বাড়িঘর তল্লাশি করে ছোট একটা চাকু পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল তারাই আবার অন্যদিকে হিন্দুদেরকে বন্দুক ও পিস্তলে সজ্জিত করেছিল। সরকার তাদের, আইনও তাদের, পুলিশ ও অস্ত্রও তাদের। আমরা নিরস্ত্র কতক্ষণ লড়তাম তাদের সাথে? বাধা দিতে যারাই এগিয়ে গেছে তারাই নিহত হয়েছে। যে সব বুকে ঈমানের শিখা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত ছিল সেগুলি গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

আমাদের গ্রামের পাঁচশত যুবক লাঠি দিয়ে চার ঘন্টা ধরে নিজেদের চাইতে আট দশগুণ বেশি দাংগাড়ে হানাদারদের মোকাবিলা করেছে। তাদের অনেকে বন্দুক, পিস্তল এবং অন্যরা তরবারি ও বর্শায় সজ্জিত ছিল। প্রথম রাউণ্ডে আমরা তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু কয়েক ঘন্টা পর আবার তারা ফিরে এলো। তখন তাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও বেশি এবং পুলিশের বেয়নেট তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছিল। আমরা হেরে গেলাম। কিন্তু এটা কি আমাদের হার ছিল? গুলীবৃষ্টির মধ্যে পাঁচশত যুবক যদি দশহাজার হানাদারের মোকাবিলা করে খতম হয়ে যায় এবং তারপর তাদের শিশু সন্তান ও বৃদ্ধদের হত্যা করে ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয় তাহলে কি একে আত্মরক্ষাকারীদের পরাজয় বলা যাবে? আবার এরপর বৃদ্ধ পিতাকে গাছের সাথে বেঁধে রেখে তার চোখের সামনে তার যুবতী মেয়েকে ধর্ষণ করে নিষ্ঠুরভাবে তাদেরকে হত্যা করা হয়। সেলিম আমি এসব কিছু দেখেছি। তারা আমাকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে গিয়েছিল। আমি ভেবে পাই না আমি এখনো কেন বেঁচে আছি।

আমার খান্দান ও আমার গ্রামের লোকদের ধ্বংসের কাহিনী শুনে তুমি আফসোস করবে, এজন্য এ পত্র আমি তোমাকে লিখছি না। বিহারে একটি খান্দান বা একটি পল্লী ধ্বংস হয়নি বরং এ পর্যন্ত প্রায় ষাট হাজার লোক নিহত

এবং চার লাখ গৃহ হারা হয়েছে। কিন্তু এতবড় ধ্বংসলীলার পরও আমার মনে হচ্ছে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের এখনো অনেক কিছু দেখতে হবে। এখনো হিন্দু ফ্যাসিবাদ তার সমগ্র ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম সহকারে পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করেনি। বিহারে ক্ষুদ্রপরিসরে এটা তাদের একটা প্রাথমিক পরীক্ষা বলে মনে হচ্ছে। অহিংসার আস্তিনের ভেতরে লুকানো খঞ্জর এখনো পুরোপুরি বের হয়ে আসেনি। হিন্দু ফ্যাসিবাদের অগ্নিগর্ভ পাহাড় থেকে সবেমাত্র কয়েকটি অগ্নিশিখার উদগীরণ হয়েছে। এখনো সময় আছে মুসলমানরা যদি সাবধান হয়ে যায় বিশেষ করে সংখ্যাগুরু প্রদেশের মুসলমানরা, যাদের প্রতিরক্ষা শক্তির সাথে সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানরা তাদের জীবন ও অস্তিত্বের আশা আকংখাকে সম্পর্কিত করে ফেলেছে। আমাদের জন্য না হলেও অন্তত নিজেদের অস্তিত্বের লড়াই করার জন্য পাঞ্জাবের মুসলমানদের তৈরি করুন। বিহারের ঘটনাবলীর পরও যদি আমাদের চোখ না খোলে তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় আমরা জীবিত থাকার অধিকার রাখি না।

আমাদের নেতাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, জাতির প্রত্যেকটি দুঃখ ব্যথার নিরাময় হিসাবে তারা খবরের কাগজে একটি বিবৃতি দেয়াই যথেষ্ট মনে করেন। দেখো হিন্দুরা কি করছে, কতগুলো ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং কত মানুষ হত্যা করেছে দুনিয়াবাসীকে কেবল এতটুকু জানিয়ে দিলেই তাঁরা দায়িত্বমুক্ত হয়েছেন বলে মনে করেন। প্রতিরক্ষা কমিটি বানানো হলো এরপর কার্যকরী কমিটি গঠন করা হলো কিন্তু বিবৃতি প্রদানের মধ্যে তাদের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ হয়ে রইলো। আল্লাহর দোহাই, জাতির যুব সমাজকে জাগ্রত কর। পানি মাথা বরাবর পৌঁছে গেছে।

আমার জখম সেরে উঠছে। ইনশাআল্লাহ পাঁচ সাতদিনের মধ্যে একটি স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে বিহারের বিভিন্ন জায়গায় সফর করবো ।

তোমার একান্ত

নাসের আলী

চিঠি পড়া শেষ করে সেলিম নিথর হয়ে বসে রইলো। বৈঠকখানার বাইরে নারী পুরুষের শোরগোল হাসি হুল্লোড় তার কাছে অপ্রীতিকর মনে হচ্ছিল।

ইউসুফ হাঁপাতে হাপাতে বৈঠকখানায় ঢুকে বললো, ভাইজান, আপনাকে কতক্ষণ থেকে খুঁজছি। আপনার বন্ধু এসেছেন।

কে?

মহেন্দর সিং।

তাকে এখানে নিয়ে এসো।

ইউসুফ দৌড়ে বাইরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর মহেন্দর সিং বৈঠকখানায় প্রবেশ করলো। সেলিম দাঁড়িয়ে তার সাথে মুসাফাহা করলো এবং নিজের পাশের

সেখানে বসালো। মহেন্দর বললো, আমি আপনার কাছে এসেছি মাফ চাইতে। গতকাল বলবন্ত সিংয়ের আসার কথা ছিল তাই আমি মজিদের বরযাত্রায় শামিল হতে পারিনি।

বলবন্ত এসে গেছে?

জী হ্যাঁ।

তাকে এখানে নিয়ে এলে না কেন? তার সাথে সেই কবে কোন কালে দেখা হয়েছিল।

আজ সকালে সে তার শ্বশুর বাড়িতে গেছে। কাল বা পরশু আপনার কাছে আসবে।

এখনো কি সে কাশ্মীর সেনাবাহিনীতে আছে?

জী হ্যাঁ এখন সে বলছে খুব শিগগির ক্যাপ্টেন হয়ে যাবে।

ভালো কথা মহেন্দর, চা খাবে তো?

না, এইমাত্র চা খেয়ে এলাম। আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম পরশু যদি সময় থাকে তাহলে আপনাকে নিয়ে শিকার করতে যাবো।

পরশু পর্যন্ত হয়তো আমি এখানে থাকবো না।

কোথাও যাচ্ছেন?

অনেক দূরে যেতে হবে।

আপনাকে বেশ পেরেশান মনে হচ্ছে?

সেলিম কিছুক্ষণ পেরেশান থাকার পর বললো, মহেন্দর, নির্বাচনের সময় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র এখানে এসেছিলেন আমি তার সাথে তোমার মোলাকাত করিয়ে দিয়েছিলাম মনে আছে?

হ্যাঁ, এখনো তার সেই গজল আমার মনে আছে যা এখানে তিনি শুনিয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন বিহারের অধিবাসী।

মহেন্দর কিছুটা অস্থিরভাবে বললো, কি ব্যাপার, তার সম্পর্কে কোনো খারাপ খবর আছে কি?

তার চিঠি এসেছে।

বিহার সম্পর্কে বড়ই দুঃখজনক খবর শুনছি। কি লিখেছেন তিনি?

এ তার চিঠি। তুমি পড়তে পারো।

চিঠি পড়ার পর মহেন্দর কিছুক্ষণ সেলিমের দিকে তাকিয়ে রইলো তারপর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, তাহলে আপনি বিহারে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

হায়, যদি আমিও আপনার সাথে যেতে পারতাম! হায়, যদি আমার মতো একজনের কুরবাণী ধ্বংসের এই তুফানের পথরোধ করতে পারতো। আমি দেখছি এ তুফান একদিন এখানেও আসবে। হিন্দু ফ্যাসিবাদ মানবতাকে ধ্বংস করার জন্য যে চিতা তৈরি করছে পাঞ্জাবে আমাদের সম্প্রদায় তার ইন্ধনে পরিণত হবে। ভাই

সেলিম, এ আগুন এখানে ছড়াবার আগে রুখে দাঁড়ান। নয়তো পঞ্চনদের পানি একদিন লালে লাল হয়ে যাবে। কিন্তু না, আপনি রুখতে পারবেন না—কেউ রুখতে পারবে না। আমার সম্প্রদায় নিজেদের গুরুদ্বার ব্যবহার করার জন্য এই ফ্যাসিস্টদেরকে অনুমতি দিয়েছে। শিখেরা মুসলমানদের ঘর জ্বালাবার উন্মত্ততায় নিজেদের ঘরও জ্বালাবে। আর হিন্দুরা আগুন ও তেল সরবরাহ করার পর আনন্দে তামাশা দেখবে।

মহেন্দর, যতদিন তোমার মতো লোকেরা আছে ততদিন আমি পাঞ্জাবে অতটা অন্ধকার দেখছি না।

সে সময় আমার মতো লোকের কথা কেউ শুনবে না। তখন আমার মতো লোকের গলা টিপে ধরা হবে।

আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বোম্বাই ও বিহারের আগুন উত্তর প্রদেশের দিকেও এগিয়ে যাচ্ছিল। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে গুণ্ডা ও দাংগাড়েদের যে বাহিনী সংগঠিত হচ্ছিল তারা কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলির পৃষ্ঠপোশকতা ও নেতৃত্ব লাভ করছিল। কিন্তু পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের মন্ত্রীসভা দুটি মুসলিম অস্ত্রধারীদের হাত পা শৃংখলিত করে রেখেছিল।

পাঞ্জাবের বিশ্বাসঘাতক মুসলিম শাসকদল তাদের হিন্দু অভিভাবকদেরকে আরো বেশি খুশি করার জন্য মুসলিম লীগ স্বেচ্ছাসেবক দলকে বেআইনী ঘোষণা করলো। বাহ্যত এ পদক্ষেপটি নেয়া হয়েছিল পাঞ্জাবে শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা কায়েম রাখার জন্য কিন্তু মুসলমানদের সামান্য প্রতিরক্ষা শক্তিটুকুও গুঁড়িয়ে দিয়ে ভারতীয় নেকড়েদের জন্য ময়দান সাফ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এ পদক্ষেপটিকে নিরপেক্ষ প্রতিপন্ন করার জন্য হিন্দু মহাসভার সেবকদলকেও বেইআইনী ঘোষণা করা হলো। কিন্তু কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক দলের ওপর কোনপ্রকার আইনগত বাধা নিষেধ আরোপ করা হলো না। অন্য কথায় বলা যায়, হিন্দুমহাসভার স্বেচ্ছাসেবকদের নিজেদের কর্মতৎপরতা জারী রাখার জন্য কেবলমাত্র সাইনবোর্ডটি বদলাবার প্রয়োজন ছিল। এই হুকুমনামার বাস্তব প্রয়োগ কেবল মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

পাঞ্জাবের মুসলমানরা এমন একটি মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো যারা তাদের সংখ্যাগুরু প্রদেশেও তাদের ওপর সংখ্যালঘুদেরকে চাপিয়ে দিয়েছিল। ফলে মুসলিম লীগের অফিসগুলিতে তল্লাশী শুরু হলো। কতিপয় নেতা গ্রেফতার হলো। অন্যেরা মর্যাদা ও খ্যাতি অর্জন করার জন্য স্বেচ্ছায় কারাবরণ করলো। কিছুদিনের মধ্যে ছোট বড় সকল নেতাই, যারা এতদিন কেবল বিবৃতি দিয়েই মিল্লাতের সকল দুঃখ কষ্ট নিরাময় করতো, অন্যের দেখাদেখি অতি দ্রুত কারাগারে

পৌঁছে গেলো। এদের মধ্যে অনেকে এমনও ছিল যারা মনে করতো, একদিন পরে জান্নাতে পৌঁছে গেলে সম্ভবত তাদেরকে নেতৃত্বের শেষের দিকে ঠেলে দেয়া হবে।

আপাতদৃষ্টিতে এ আন্দোলন প্রবীণ ও বয়োবৃদ্ধ নেতাদের হাত থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। তবে এর ফলে নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল মধ্যবিত্ত ঘরানার সচেতন ও সক্রিয় যুব সমাজের হাতে। ফলে এটি গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। জাতি খিজির হায়াত খান ও তার পৃষ্ঠপোশকদের চ্যালেঞ্জ কবুল করে নিয়েছিল। সাহসী মুসলিম নওজোয়ানরা জাতীয় বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেছিল। কারাগারগুলি ভরে গিয়েছিল। পুলিশের লাঠি ভেঙে গিয়েছিল। কাঁদানো গ্যাসের শেল ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল। মুসলিম খবরের কাগজগুলি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পাঞ্জাবে এমন কোনো গ্রাম ছিল না যেখানে পুলিশ বিভাগের তামাম কর্মতৎপরতা সত্ত্বেও গোপন আন্দোলনের নির্দেশাবলী যথা সময়ে পৌঁছে যায়নি। একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারী করে চারজন লোকের একত্র সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু এমন কোনো মফস্বল শহর ছিল না যেখানে হাজার হাজার লোকের মিছিল বের হয়নি। পাঞ্জাবের বিশ্বাসঘাতক অনুভব করছিল নিজের জাতিকে মৃত মনে করে হিন্দুর হাতে বিক্রি করে দেবার ব্যাপারে সে একটু বেশি তাড়াহুড়া করে ফেলেছে।

সীমান্ত প্রদেশে প্রায় একই অবস্থা ছিল। খাইবার পাসে রাম রাজত্বের ঝাণ্ডা উড়াবার নিয়তে কংগ্রেস যে লাগামহীন উটের পিঠে সওয়ার হয়েছিল সে চোরাবালিতে ফেঁসে গিয়েছিল। পাঠানের চোখ চরকার যাদুমুক্ত হয়েছিল।

একটি ট্রাক গুরুদাসপুরের দিক থেকে এসে অমৃতসরের বাস ডিপোয় থামলো। সেলিম ও তার সাথে আর একটি যুবক দ্রুত বাস থেকে নামলো। তারা নিকটের একটি দোকানে দাঁড়িয়ে লাসসি পান করছিল এমন সময় পেছন থেকে কে একজন সেলিমের কাঁধে হাত রেখে বললো, আসসালামু আলাইকুম।

সেলিম পেছন ফিরে তার সালামের জবাব দিল কিন্তু তাকে চিনতে পারলো না।

আজ কোন্ দিকে অভিযান চালাবেন?

সেলিমের এখন মনে হচ্ছে কোথাও যেন সে এ ব্যক্তিকে দেখেছে। সে বললো, আমি লাহোর যাচ্ছি।

আর মিয়া মুহাম্মদ সিদ্দীকও কি লাহোর যাচ্ছেন? সেলিমের সাথির দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো।

জিনা, আমি শিয়ালকোট যাচ্ছি।

বলুন আমি আপনাদের কি খিদমত করতে পারি? সেলিমের সাথি জবাব দিল, জিনা, আপনার বড়ই মেহেরবানী।

পাশেই রাস্তার অপর পাশে অমৃতসর থেকে লাহোর যাবার বাসের কন্ডাক্টর চিৎকার করছিল, চলুন ভাই লাহোর, গাড়ি তৈরি। সেলিম ও সিদ্দীক সেই লোকটির সাথে মুসাফাহা করে বাসে উঠে পড়লো।

গাড়ি চলা শুরু করলে সেলিম জিজ্ঞেস করলো, লোকটি কে বলোতো সিদ্দীক।

এ সেই করিম বখশ হাবিলদার। আপনি ভুলে গেছেন। ইলেকশানের সময় সে আপনার সাথে বেশ কিছুটা ঝগড়া করেছিল।

আরে দোস্ত, আমি চিনতেই পারিনি। আসলে সে পুলিশের পোশাক ছাড়াই ছিল তো।

সে বদলী হয়ে অমৃতসরে এসে গেছে। আমার মনে হচ্ছে এখন সে সি আই ডি বিভাগে আছে।

আরে ভাই, খিজির হায়াতের পুলিশেরা তো আজকাল এমনিতেই সাদা পোশাকে ডিউটি করছে। সে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমাদের দেখছিল।

লাহোর পৌঁছে সেলিম সিদ্দীককে বললো, তুমি এখানে বাস স্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করো, আমি ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে ফিরে আসছি।

কিছুক্ষণ পরে সেলিম শহরের সংকীর্ণ গলিপথ অতিক্রম করে একটি মসজিদের সাথে লাগোয়া পান দোকানের সামনে এসে থামলো। দোকানদারকে গভীর মনোযোগ সহকারে দেখার পর জিজ্ঞেস করলো বলুনতো জনাব নার্গিস ফুল কোথায় পাওয়া যাবে?

দোকানদার মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকে কয়েকবার দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো তারপর হাতের ইশারা করে বললো, আসুন আমার সাথে।

সেলিম তার পেছনে চলতে লাগলো। দোকানদার গলির মোড়ে একটি ঘরের বন্ধ দরোজার দিকে ইশারা করে চলে গেলো। সেলিম থেমে থেমে পাঁচবার দরোজায় টোকা দিল। ভেতর থেকে একজন বললো, কে?

এটাই কি একাশি নম্বর বাড়ি?

এক নওজোয়ান দরোজা একটু ফাঁক করে বাইরে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কাকে চান?

আখতার সাহেব এখানে আছেন?

না, তিনি কোথাও গিয়েছেন। আপনার নাম কি সেলিম?

জি হ্যাঁ, দশটার আগে আমার এখানে পৌঁছুবার কথা ছিল কিন্তু গাড়ি ঠিকমত পাইনি।

আপনি ভেতরে আসুন।

সেলিম ভেতরে ঢুকলে নওজোয়ান দরোজা বন্ধ করতে করতে বললো, আপনার জিনিস আমাদের কাছে তৈরি আছে, আসুন আমার সাথে।

সেলিম তার পেছনে পেছনে দেউড়ি পার হয়ে একটি কামরায় প্রবেশ করলো। কামরার এক কোণে পাঁচটি ছেলে একটি টেবিল ঘিরে বসেছিল। সেলিম তার পকেট

থেকে কয়েকটি কাগজ বের কর টেবিলে রেখে বললো, আমি প্রচারপত্রের জন্য এ বিষয়বস্তু লিখে এনেছি। আখতার সাহেব কখন ফিরে আসবেন?

এক নওজোয়ান চেহারা সুরাতে এ দলের নেতা মনে হচ্ছিল, বললো, তাঁর ব্যাপারে কিছুই বলা যাচ্ছে না। তবে আপনার লেখার ব্যাপারে তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং আপনাকে একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন দেবার কথাও বলেছেন। আমি অবাক হচ্ছি, আপনাদের স্থানীয় লীগের কাছে একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিনও নেই?

আরে ভাই, আমাদের লীগ অফিসে একটি ভাঙাচোরা হুক্কা ছিল, এখন সেটাও সম্ভবত পুলিশের হাতে চলে গেছে।

আচ্ছা সেলিম সাহেব, আপনি আমাদের সাথে কিছু কাজ করবেন, না চলে যাবেন?

আপনারা আমাকে হুকুম করতে পারেন। তবে আজ রাতে আমার ফিরে গেলেই ভালো হবে। আমাদের এলাকায় প্রচারের কোনো ব্যবস্থা নেই।

দশ বারো বছরের একটি মেয়ে কামরায় প্রবেশ করে বললো, আমরা বিশ হাজার ইশতেহার ছেপে দিয়েছি। বড় আপা বলছেন, বুলেটিনের জন্য লেখা দিন এবং কাগজেরও বন্দোবস্ত করুন।

মেয়েটি অন্য কামরায় চলে গেলো। নওজোয়ান সেলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, আমাদের বোনেরা অনেক কাজ করেছে এবং আমাদের এক মুহূর্ত বসে থাকতে দেয় না। ভালোই হলো প্যামপ্লেটের লেখাও এসে গেলো। তাদেরকে আরো কয়েক ঘণ্টা ব্যস্ত রাখতে পারবো। আচ্ছা আপনাকে আর দেরী করাবো না। আসগর, সেই সুটকেসটি সেলিম সাহেবকে দিয়ে দাও। তবে ভাই একটু সতর্কতা অবলম্বন করবেন। আজকাল পুলিশ এ জিনিসগুলিকে বোমার চাইতেও বেশি আশংকাজনক মনে করছে। যদি ধরা পড়ে যান তাহলে পুলিশদেরকে এ ঠিকানা দেবেন না। চাইলে আপনার সাথে অমৃতসর পর্যন্ত কাউকে পাঠিয়ে দিতে পারি।

তার দরকার হবে না। আমার সাথে আরো একজন আছে। তাকে বাস স্ট্যাণ্ডে রেখে এসেছি।

সন্ধ্যা পাঁচটা। সেলিম ও তার সাথি বাসে চড়ে আবার অমৃতসর এলো। করিম বখশ তখন মিষ্টির দোকানের সামনে একটি চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। সিদ্দিকের দৃষ্টি হঠাৎ তার ওপর পড়লো। সেলিমকে বললো, আরে দেখো সেই বদমাশটা এখনো এখানে আছে।

কে?
করিম বখশ। সে আমাকে দেখতেও পেয়েছে।
দেখো সিদ্দিক, ব্যাপারটা যদি তেমন খারাপের দিকে গড়ায় তাহলে আমি তাকে সামলাবো। তুমি যদি সুটকেস নিয়ে পালাবার সুযোগ পেয়ে যাও তাহলে আমার কথা ভেবো না। অমৃতসরে কাউকে জানো?
আমার কয়েকজন আত্মীয় এখানে আছে।
এতক্ষণে করিম বখশ দোকান থেকে উঠে তাদের কাছাকাছি চলে এসেছিল। চৌধুরীজী, খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন লাহোর থেকে? সে এসেই জিজ্ঞেস করলো।
জি হ্যাঁ, সেখানে তেমন বেশি কিছু কাজ ছিল না।
আজ রাতে আমার বাসায় থাকেন।
বহুত মেহেরবানী। তবে বাড়িতে আমার অনেক জরুরী কাজ আছে।
কোনো সভাটভা হবে?
হ্যাঁ, সভা তো প্রায়ই থাকে। আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ। আর দেরী করা যাচ্ছে না। গুরুদাসপুরের বাস আবার চলে না যায়।
বাস অনেক। কোন চিন্তা করবেন না। মিয়া মুহাম্মদ সিদ্দীক, আপনি তো শিয়ালকোট যাচ্ছিলেন?
সিদ্দীক এই প্রথমবার অনুভব করলো, একটা ভুল হয়ে গেছে। সে ঘাবড়ে গিয়ে জবাব দিল, জি হ্যাঁ, তবে আমিও ওনার সাথে ফিরে এলাম।
করিম বখশ সেলিমকে বললো, সকালে মনে হয় আপনাদের কাছে এ সুটকেসটি ছিল না?
না, আমার জিনিসপত্র লাহোর রেখে এসেছিলাম। সিদ্দীক চলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, হাবিলদার সাহেব, আসসালামু আলাইকুম।
হাবিলদার বললো, এই আড্ডায় এখন কোনো বাস নেই। অন্য আড্ডায় পেয়ে যাবেন। চলুন আমি আপনাদের সেখানে রেখে আসছি। দিন আমার হাতে দিন, আমি আপনাদের সুটকেট বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।
না, অনেক মেহেরবানী। এটা তেমন ভারী নয়।
সিদ্দীক বললো, দিন আমি নিচ্ছি।
সেলিম সুটকেসটি সিদ্দীকের হাতে দিল। পুলিশের একজন সিপাই লাঠি হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। করিম বখশ হাঁটতে হাঁটতে হাতের ইশারায় তাকে ডাকলো এবং সে তাদের পেছনে পেছনে চলতে লাগলো। সেলিম তার এ চালাকি দেখে ফেলেছিল। সে দ্রুত রাস্তার ওপর দিয়ে এক ব্যক্তির প্রতি ইশারা করে বললো, সিদ্দীক! দেখোতো ঐ মুনাওয়ার যাচ্ছে মনে হয়, ডেকে আনোতো গাধাটাকে। সংগে সংগেই সিদ্দীক মুনাওয়ার! মুনাওয়ার! ও মুনাওয়ারের বাচ্চা! বলতে বলতে জোরে দৌড়ে এগিয়ে চলে গেলো। মুহূর্তের মধ্যে সিদ্দীক প্রায় তিরিশ কদম এগিয়ে গিয়েছিল।

হাবিলদার ও কনস্টেবল পেরেশান হয়ে সেলিমের কাছে দাঁড়িয়েছিল। আচানক করিম বখশ সেলিমের হাত ধরে চিৎকার দিল, গেণ্ডা সিং! ঐ সুটকেসওয়ালার পেছনে ছুটে যাও। দেখো সে যেন পালিয়ে যেতে না পারে। হুইসেল বাজাও।

গেণ্ডা সিং হুইসেল বাজাতে এবং লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে দৌড় দিল। কিন্তু সিদ্দীকের গতি ছিল তার চেয়ে অনেক দ্রুত। সাধারণ মানুষ পুলিশের ব্যাপারে সজাগ হয়ে গিয়েছিল। একজন তাগড়া নওজোয়ান তার পাটা সামনে বাড়িয়ে দিল এবং গেণ্ডা সিং মুখ থুবড়ে জমিনের ওপর আছড়ে পড়লো। লোকেরা তার চারদিকে জমায়েত হয়ে হাসাহাসি করতে লাগলো।

কনস্টেবল ক্রোধে গর্জন করতে করতে উঠে দাঁড়ালো। সুটকেসওয়ালা অপরাধীর চাইতে এখন সে বেশি খুঁজে বেড়াচ্ছিল তাকে ল্যাংমারনেওয়ালাকে।

কি ব্যাপার সান্ত্রীজী? একজন বয়স্ক ব্যবসায়ী এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো। অমনি গেণ্ডা সিং দু কদম এগিয়ে গিয়ে ঝট করে তার গালে মারলো কশে এক চড়।

তৎক্ষণে করিম বখ্‌শও সেলিমের হাত ধরে টানতে টানতে সেখানে পৌছে গিয়েছিল। সে চিৎকার করে উঠলো, গেণ্ডা সিং, দৌড়াও, তার পিছনে দৌড়াও।

গেণ্ডা সিং আবার দৌড়ালো। কিন্তু এবার সে জানতো না তার মনজিলে মকসূদ কোথায়। সামনে আসছিল বিক্ষোভকারীদের একটি মিছিল। সিদ্দীক তার মধ্যে গায়েব হয়ে গিয়েছিল।

আরো দুজন কনস্টেবল করিম বখশের কাছে পৌছে গিয়েছিল এবং সে ক্রোধে চিৎকার করছিল–বাবুজী, বলুন কি ছিল সেই সুটকেসে? সেটা কোথায় পাঠালেন?

সেলিম বেপরোয়া হয়ে জবাব দিল, তুমি আমার সময় নষ্ট করছো। তুমি কে বাপু?

একজন সিপাই বললো, হাবিলদার সাহেবের সাথে সাবধানে কথা বলো।

আচ্ছা, ইনি হাবিলদার সাহেব।

করিম বখশ চিৎকার করে উঠলো, একে থানায় নিয়ে চলো। এর কাছে বোমা ছিল।

পুলিশের মারধরের পর সেলিম হাজতখানায় উপুড় হয়ে পড়ে ব্যথায় কোঁকাচ্ছিল। দারোগা নিজের এলাকায় টহল দেয়ার পর রাত আটটায় ফিরে এলো। দুজন সিপাই সেলিমকে হাজতঘর থেকে বের করে এনে তার সামনে পেশ করলো।

দারোগার টেবিলের সামনে সেলিমকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। তার দাঁতের দাড়ি ও নাক থেকে রক্ত ঝরছিল। গর্দান ঝুলে পড়েছিল। দারোগা কিছুক্ষণ

টেবিলের কাগজপত্রগুলি ঘাঁটাঘাঁটি করার পর সেলিমের দিকে মুখ তুলে তাকালো। প্রথম দৃষ্টিতেই দুজন দুজনকে চিনতে পারলো। সাবইন্সপেক্টর মনসুর আলী কলেজে তার সহপাঠী ছিল। সে লজ্জা, পেরেশানী ও অস্থিরতার মধ্যে সেলিমের দিকে তাকাচ্ছিল। সেলিমের ঠোঁটে ছিল একটি হালকা হাসির রেখা। কয়েক সেকেন্ড চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকার পর আচানক সে মেঝের ওপর পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। দারোগা উঠে দাঁড়ালো।

এ ভান করছে জনাব! এক সিপাই পা দিয়ে ঠোকর মেরে বললো।

দারোগা এগিয়ে এসে তাকে এক ধাক্কা দিল। দূরে ছিটকে পড়লো সে। তারপর সিপাইদের দিকে তাকিয়ে বললো? গেণ্ডা সিং, এর হাতকড়া খুলে দাও এবং মীরাণ বখশ, এর জন্য পানি নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেলিমের জ্ঞান ফিরে এলো। দারোগার হুকুমে সিপাইরা তাকে ধরধরি করে বারান্দার একটি চারপাইয়ে শুইয়ে দিল।

যে সিপাইটি পা দিয়ে ঠোকা মেরেছিল এবং গেণ্ডা সিং যাকে হাতকড়া খুলতে বলা হয়েছিল তারা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দারোগা পুনরায় নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বললো, কে ওকে মেরেছে?

সিপাহীরা গেণ্ডা সিং ও মীরাণ বখশের দিকে তাকাতে লাগলো।

গেণ্ডা সিং বললো, জি, তার কাছে বোমা ভর্তি সুটকেস ছিল।

আচ্ছা, সেই বোমা ভর্তি সুটকেসটা কোথায়?

জী, আরেকজন সেটা নিয়ে পালিয়ে গেছে।

সুটকেসওয়ালা পালিয়ে গেছে আর যে খালি হাতে ছিল তাকে তোমরা ধরে এনেছো, এই কথা না?

জী হ্যাঁ।

শাবাশ! তুমি বড়ই বুদ্ধিমান। কিন্তু তাকে ধরে আনলে না কেন যার হাতে বোমা ছিল? সে কোথায়?

জি, তার সম্পর্কেই তো আমরা একে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম। এ তিনবার বেহুশ হয়েছে কিন্তু তবুও বলেনি সুটকেসওয়ালা কোথায় গেছে।

দারোগা গর্জন করে উঠলো, কিন্তু তোমরা তাকে ধরে আনলে না কেন? তোমাদের এই বাপকে কেন ধরে এনেছো?

জী, আমি রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলাম এবং এই সুযোগে সে পলিয়ে গিয়েছিল।

তুমি তার সুটকেস দেখেছিলে?

জী, দেখেছিলাম তো।

কি রংয়ের ছিল সেটা?

সম্ভবত সবুজ।

তুমি বোমা দেখেছিলে?

জী না, হাবিলদার সাহেব দেখে থাকবেন।

দারোগা গর্জে উঠলো, হাবিলদার কোথায়?

জী, তিনি ক্লান্ত হয়ে এইমাত্র গেছেন।

কিভাবে ক্লান্ত হলো?

জী, অপরাধীকে মারপিট করতে করতে। তিনি বলছিলেন, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, খানা খেয়ে এখনই আসছি।

হাবিলদার এসে গেলো। সে এসেই বললো, আমাকে তলব করেছেন?

তুমি কোতোওয়ালীতে আমাকে ফোন করছিলে, কোথাও নাকি তুমি বোমা দেখেছো। কোথায় সে বোমা?

জী, সে সুটকেস নিয়ে পালিয়ে গেছে। সে এর সাথি। আমি তাকে জানি।

তুমি সুটকেসে বোমা দেখেছিলে?

না, আমার সন্দেহ বরং আমার বিশ্বাস। এরা সকালে লাহোর গিয়েছিল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসেছিল।

দারোগা ধমক দিয়ে বললো, কেমন হে গেণ্ডা সিং, অমৃতসর ও লাহোরের মধ্যে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কত লোক সফর করে?

জী, হাজার হাজার।

আচ্ছা বলো, তারা সবাই কি বোমার কারবার করে?

জী না।

হাবিলদার বললো, এদের কাছে সুটকেস ছিল। সকালে যখন তারা গিয়েছিল........।

দারোগা আবার ধমকের সুরে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার। কেন হে গেণ্ডা সিং, অমৃতসর ও লাহোরের মধ্যে যাতায়াতকারী কোন ব্যক্তির হাতে সুটকেস দেখলে তুমি কি তাকে গুলী করবে?

গেণ্ডা সিং ভয় পেয়ে বললো, জী, তা কেমন করে হয়?

কারণ তোমার হাবিলদার সাহেব মনে করেন সুটকেসে বোমা ছাড়া আর কিছু থাকে না।

জী, হাবিলদার সাহেব যদি হুকুম দেন তাহলে আমাকে গুলী চালাতে হবে। তবে সব সুটকেসে তো আর বোমা থাকে না।

করিম বখশ বললো, তাহলে আমি আপনাকে সমস্ত ঘটনা শোনাচ্ছি।

দারোগা চিৎকার করে বললো, আমি কিছুই শুনতে চাই না। তুমি বোমা ভর্তি সুটকেস নিয়ে এক ব্যক্তিকে পালাবার সুযোগ দিয়েছো। যদি এ ঘটনা সত্য হয়ে থাকে তাহলে তুমি পয়লা নম্বরের বেকুব। তুমি বোমাওয়ালাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একজনকে ধরে নিয়ে এসেছো। যদি এটা ভুল হয়ে থাকে এবং এ ব্যক্তিকে তুমি অকারণে মারপিট করে থাকো তাহলেও আমি তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে দেবো। অমৃতসরে কোনো ব্যক্তি সুটকেসে বোমা ভরে নিয়ে এসেছে এবং দুজন পুলিশ মিলেও তাকে পাকড়াও করতে পারোনি। এস. পি. সাহেব সম্ভবত এ ঘটনাটি বরদাশত করতে পারবেন না। তুমি গেণ্ডা সিংকে নিয়ে চলে যাও এবং তাকে

গ্রেফতার করো। আমি এস. পি.কে টেলিফোন করছি তিনি তোমাদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন।

করিম বখশ অনুযোগের সুরে বললো, খান সাহেব, হতে পারে আমি ভুল করেছি কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি এদেরকে জানি। এ যুবক এবং এর সাথি কড়া মুসলিম লীগার–ইলেকশানের দিনগুলিতে......

দারোগা বললো, গেণ্ডা সিং! আজ শহরে মুসলিম লীগারদের কত বড় মিছিল বের হয়েছিল?

জনাব, পঞ্চাশ হাজারের বেশি লোকের মিছিল হবে।

তোমার হাবিলদারকে বলো, বোমা বহন করার অভিযোগে এদের সবার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করুক। হ্যাঁ, করিম বখশ সুটকেসটি কি রংয়ের ছিল?

জি, কালো রংয়ের।

কি বলো, গেণ্ডা সিং! কি রংয়ের ছিল?

গেণ্ডা সিং দারোগা সাহেবের মেজাজ দেখেছিল। সে বললো, জনাব আমি যে সুটকেসটা দেখেছিলাম সেটা সম্ভবত সবুজ রংয়ের ছিল।

করিম বখশ দিশেহারা হয়ে বললো, আল্লাহার কসম তার রং ছিল কালো।

দারোগা কঠোর স্বরে বললো, করিম বখশ, সাফ বলছো না কেন, তুমি তার থেকে তোমার ব্যক্তিগত শত্রুতার বদলা নিতে চাও? তুমি খুব বাড়াবাড়ি করেছো। আমি সিভিল সার্জনকে ফোন করছি।

করিম বখশ বললো, খান সাহেব! মানুষ ভুল করে।

কিন্তু আগামীতে আমি আর এ ধরনের ভুল বরদাশত করবো না। সে কোনো ভালো পরিবারের লোক বলে মনে হচ্ছে। এখন তোমার পক্ষ থেকে আমাকেই তার কাছে মাফ চাইতে হবে।

গেণ্ডা সিং বললো জী, একথা ঠিকই বলেছেন। হাবিলদার সাহেব তার পিঠে তিরিশ ঘা বেত মেরেছেন কিন্তু তিনি গালি দেয়া তো দূরের কথা একবার উহুও বলেননি।

দারোগা বললো, মীরাণ বখশ, তাকে গাড়িতে শুইয়ে দাও।

রাত দশটায় পুলিশের গাড়ি শহরের একটি গলির মধ্যে এসে থামলো। সাব ইন্সপেক্টর মনসুর আলী নিচে নেমে টর্চের আলোয় একটি বাড়ির সাইনবোর্ড দেখে বললো, এই বাড়িটিই। তারপর সেলিমকে নিজের মজবুত বাহুর সাহায্যে আঁকড়ে ধরে নিচে নামিয়ে দিয়ে বললো, চলো, তোমাকে পৌছিয়ে দিই।

না, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি ঠিক আছি।

মনসুর আলী ইংরেজীতে বললো, আমি তোমাদের সাথে আছি। গত পরশু আমি এখানকার চার্জ নিয়েছি। যদি তুমি এখানে থাকো তাহলে আগামীকাল অথবা পরশু কোনো সময় আমি তোমার সাথে সাক্ষাত করবো।

সেলিম যখন তার সাথে মুসাফাহা করছিল তখন তার পা কাঁপছিল। মনসুর তার হাত চেপে ধরে বললো, হিম্মত করো, গাদ্দারের কর্তৃত্ব শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছে। আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ। ড্রাইভার চলো।

গাড়ি চলে গেলো। সেলিম ইতস্ততভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর কম্পিত পায়ে বাড়ির দরোজার দিকে এগিয়ে গেলো। ডাক্তার সাহেব! ডাক্তার সাহেব! সে কম্পিত স্বরে ডাকলো। কিন্তু ভিতর থেকে কোন আওয়াজ এলো না। সে ভাবলো তার ক্ষীণ স্বর দেউড়ি পার হয়ে ভিতর বাড়িতে পৌঁছুতে পারেনি। তখন দরোজার কড়া নাড়তে লাগলো। আচানক সে ভাবলো, হয়তো বাড়িতে কেউ নেই। সবাই গ্রামে চলে গেছে। সে হিম্মত হারিয়ে ফেলেছিল। তার মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল। দুহাত দিয়ে মাথা চেপে ধরে দহলিজের সিঁড়ির ওপর বসে পড়লো সে। তারপর কিছু চিন্তা করে হাত দিয়ে দরোজা হাতড়াতে লাগলো। বাইরের শিকল খোলা ছিল। সে হিম্মত করে আবার কড়া নাড়তে লাগলো।

গলির অন্য দিক থেকে একজন তার ঘরের দরোজা দিয়ে মুখ বের করে জিজ্ঞেস করলো, কে?

সেলিমের কানে এ কণ্ঠটি বড়ই মধুর লাগলো এবং সে প্রশ্নকারীর পরোয়া না করেই আওয়াজ দিল, ডাক্তার সাহেব!

প্রতিবেশী বললো, ডাক্তার সাহেব গ্রেফতার হয়ে গেছেন। সেলিমের দিল বিবস হয়ে পড়লো। প্রতিবেশী আবার বললো, যদি বাড়ির লোকদের কারোর সাথে কোনো কাজ থাকে তাহলে বেল বাজাও।

সেলিমের এতক্ষণ পর্যন্ত কলিংবেলের কথা মনে পড়েনি। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে কলিংবেলে তার হাত পড়লো এবং সে বেলের বোতাম দাবালো। তারপর দরোজায় ঠেস দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। এক মিনিট পর বাড়ির মধ্য থেকে কয়েকটি পরিচিত আওয়াজ তার কানে এলো। সে আবার বেল বাজালো। কেউ দেউড়ির বালবটি জ্বালিয়ে দিল এবং দারোজার কপাটের ফাঁক এবং উপরের ভেন্টিলেটার দিয়ে আলোর আভা দেখা গেলো।

কে? ভেতর থেকে আওয়াজ এলো।

আমি সেলিম। ক্ষীণ কণ্ঠে সেলিম জবাব দিল।

দেউড়ির দরোজা খুলে গেলো এবং ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে রাহাত বললো, ভাইজান আপনি? এ সময়?

সেলিম জবাব না দিয়ে টলতে টলতে ভিতরে ঢুকে পড়লো। দেউড়ির অন্যদিকে রাহাতের মা এবং তার পেছনে ইসমত দাঁড়িয়েছিল। আচানক সেলিমের জামায়

রক্তের ছোপ এবং চেহারার ক্ষত রাহাতের চোখে পড়লো। সে দ্রুত দরোজা বন্ধ করে দিয়ে চিৎকার করলো, আম্মীজান, ভাইজান জখমী।
মা সামনে এসে সেলিমের বাহু ধরে বললেন, বেটা কি হয়েছে তোমার?
সেলিম অর্ধ নির্মীলিত চোখ উপরে উঠিয়ে ক্ষীণ স্বরে বললো, আমি পুলিশের হাতে পড়েছিলাম।
মা বললেন, চলো বেটা ভিতরে চলো।
চলুন আমি ঠিক আছি। এমনি মাথা ঘুরে গিয়েছিল। হঠাৎ সেলিম দুহাত দিয়ে কপাল চেপে ধরে মাথা হেঁট করলো। এতক্ষণ মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে ইসমত কথাবার্তা শুনছিল, এখন এগিয়ে এসে বললো, আম্মী! তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। এ কথা বলতে বলতে সে সেলিমের অন্য বাহুটি ধরে ফেললো। সেলিম যেন স্বপ্নোত্থিতের মতো বলে চলছিল, আমার কিছুই হয়নি, আমি ঠিক আছি, আপনারা চিন্তা করবেন না, মাথাটা এমনিই চক্কর দিয়ে উঠেছিল। ওরা আমার মাথায় আঘাত করেছিল।
ইসমত ও তার মা তাকে ধরাধরি করে কামরার মধ্যে নিয়ে গেলো। কিন্তু সে আগের মতোই বলে চলছিল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন, খামাখা তাকলীফ করবেন না, আমি ঠিক আছি।
মা বললেন, বেটা শুয়ে পড়ো।
সে ঘাড় উঁচু করে বিছানার দিকে দেখলো এবং মুখ থুবড়ে তার ওপর পড়ে গেলো।

ইসমত সেলিমের শরীরে মলম লাগাচ্ছিল। তার হাত কাঁপছিল। সে বলছিল, আম্মী, এই পুলিশওয়ালারা একেবারে কসাই হয়ে গেছে। দেখুন এগুলি বেতের দাগ। রাহাত জলদি পানি গরম করো। মাথার জখমে রক্ত জমে গেছে।
ইসমত যখন তার মাথায় গরম পানির ফোঁটা টপ টপ করে ফেলছিল তখন সেলিম চোখের পাতা খুললো। ইসমতের মা ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো, বেটা! এখন কেমন লাগছে?
জী, আমি একদম ভালো আছি।
ইসমত ইতস্তত করে বললো, আম্মীজান! তার বলতে কষ্ট হচ্ছে।
মা হেসে বললো, ঠিক আছে ডাক্তার সাহেবা!
ইসমত জখমের ওপর মলম লাগিয়ে পট্টি বাঁধলো তারপর টেবিল থেকে গ্লাস উঠিয়ে সেলিমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, নিন। এটুকু পান করুন।
সেলিম উঠে বসে গ্লাস হাতে নিয়ে ইতস্তভাবে ইসমতের দিকে তাকালো। মা বললেন, পান করো বেটা।
সবটুকু? সে পেরেশান হয়ে বললো।

রাহাত বললো, এটা অষুধ নয়, গ্লুকোজের পানি।
গ্লুকোজের পানি পান করার পর বালিশে মাথা রেখে সেলিম আবার বললো, আব্বাজান সাহেব কবে গ্রেফতার হয়েছেন?
গতকাল সন্ধ্যায় পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেছে। বিক্ষোভ করার জন্য তিনি গ্রাম থেকে পাঁচশ লোকের একটি মিছিল নিয়ে শহরে প্রবেশ করেছিলেন। আমাদের অনেকেও তাঁর সাথে গ্রেফতার হয়ে গেছে।
আমি আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। এবার আপনি আরাম করুন।
বেটা, আল্লাহর শোকর, তুমি এখানে পৌঁছে গেছো। সকালে তোমার ঘটনা বলবো। এখন আরাম করো। দেখছো না ডাক্তার সাহেবা আমার দিকে কেমন কটমট করে তাকাচ্ছে।
পাশের কামরা থেকে আমজাদ চোখ মলতে মলতে বের হয়ে এসে অবাক হয়ে বললো, ভাইজানের কি হয়েছে?
মা তাকে ধরে অন্য কামরায় নিয়ে গেলেন। রাহাত বললো, ভাইজান! এখন মাথার কষ্ট কিছু কমেছে?
ইসমত তাকে ইশারায় কিছু বুঝালো এবং সে সেলিমের দিকে তাকিয়ে বললো, ভাইজান আপনার আপত্তি না থাকলে আপাজান আপনাকে একটি ইনজেকশান দিতে চাচ্ছেন।
মা অন্য কামরা থেকে বললো, হ্যাঁ বেটি! ইনজেকশান অবশ্যই দাও।
সেলিম বললো, ডাক্তারের সাথে একমত না হয়ে এখন আর কোনো উপায় নেই।
ইসমত তার বাপের ব্যাগ থেকে ইনজেকশানের জিনিসপত্র বের করলো। পানি গরম করে পিচকারী পরিষ্কার করলো। তাতে অষুধ ভরলো। রাহাত সেলিমের জামার হাতা উপরে উঠিয়ে বাহুতে স্পিরিট ঘসছিল। মা উচ্চস্বরে বললো, বেটি, একটু সাবধানে।
ইসমত ইতস্তত করে এগিয়ে গেলো। স্কুলের ক্ষুদে পরীক্ষার্থীর মতো তার দিল কাঁপছিল। সেলিম তার কম্পিত হাত দেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ইসমত ঠোঁট চিপে আচানক বাহু মুঠি করে ধরে সুঁই ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। রাহাত কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করে রইলো। ইনজেকশান শেষ করার পর ইসমত রাহাতের দিকে তাকালো। তার চোখে আনন্দের আভা ফুটে বেরুচ্ছিল।
মা দরোজার কাছে এসে বললেন, কি ঠিকমতো লাগিয়েছো ইনজেকশান?
ইসমত লজ্জামিশ্রিত স্বরে বললো, জী হ্যাঁ।
এবার সবাই পাশের কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। সেলিম অনেকক্ষণ জেগে থাকলো। তার প্রত্যাশার চাইতে অনেক বেশি সে পেয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাকে কোথায় এনেছিলেন। ইসমত তার জখমের ওপর নিজ হাতে পট্টি বেঁধেছিল। কাজেই এখন পুলিশের মারের জন্য তার কোন আফসোস ছিল না। এখন এই জখমগুলোর

দাম তার কাছে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তার কানে একটি মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠস্বর বাজছিল। একটি কম্পিত সুন্দর হাতের কল্পনা তার স্নায়ুতন্ত্রীতে একটি চমৎকার আবেশ ছড়িয়ে দিচ্ছিল। তার মহব্বতের দরিয়া চোখের সামনে তরংগায়িত হচ্ছিল এবং সেই সুন্দর চেহারাটি বারবার সেখানে ভেসে উঠছিল যাতে ছিল দুধ, মধু ও গোলাপের আমেজ।

সকালে রাহাত সেলিমের বিছানার সামনে তেপায়ার ওপর চা-নাশতা রেখে বললো, ভাইজান! খেয়ে নিন, এখনি ডাক্তার সাহেবা এসে যাবেন।

রাহাত, তোমার আপা ডাক্তার হয়ে গেলো কবে থেকে?

রাহাত দরোজা দিয়ে অন্য কামরায় উঁকি দিয়ে দেখে হাসতে হাসতে বললো, আপাজান তো শহরের নাম করা ডাক্তার। তিনি সর্দি কাশির চিকিৎসা করতে পারেন। কাশির বড়ি বিনামূল্যে বিতরণ করেন। গলির শিশুদের চোখে অষুধ দিয়ে দেন।

ইসমত লাজনম্র পদক্ষেপে ভেতরে প্রবেশ করলে রাহাতের ঠোঁটে দুষ্টুমিভরা হাসির রেখা ছড়িয়ে পড়লো। সে বললো, ডাক্তার সাহেবা! মোবারক হোক, আপনার চিকিৎসা কামিয়াব হয়েছে।

ইসমতের চেহারায় লজ্জার আভা ছড়িয়ে পড়লো। সেলিমের দিকে এক নজর তাকিয়ে বললো, এখন আপনার শরীর কেমন?

আমি একদম ভালো হয়ে গেছি।

আরে জনাব, এত মশহুর ডাক্তারের চিকিৎসাধীন আছেন আর আপনি ভালো হয়ে যাবেন না, এটা কখনো হয়?

ইসমত রেগেমেগে রাহাতকে বললো, বড় শয়তানী বনে গেছো দেখছি।

সেলিম বললো, কেন ডাক্তার হওয়া তো খারাপ কথা নয়?

তা ঠিক কিন্তু সে তো ঠাট্টা করছে। আমি ম্যাট্রিকের পরে ফার্স্ট এইড এর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। আর সে আমাকে ডাক্তার বলা শুরু করেছে।

তবুও তোমার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। একজন ভালো ডাক্তারের কাছ থেকে এর চেয়ে ভালো চিকিৎসার আশা করা যেতো না।

আব্বাজান আমাকে কয়েকটি ওষুধের কার্যকারিতা শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

ইসমতের মা কামরায় প্রবেশ করলেন। সেলিমের কাছে চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, বেটা, শেষ রাতে তোমাকে দেখতে এসেছিলাম। তখন তুমি ঘুমুচ্ছিলে। এখন শরীর কেমন?

জী, এখন শরীর একদম ভালো।

পুলিশ এখানে তোমাকে ধরলো কেমন করে?

ইসমত তার কামরায় যাবার এরাদা করেছিল কিন্তু মায়ের প্রশ্ন শুনে দরোজার কাছে থেমে গেলো। মা বললো, বেটি, বসে পড়ো। সে জড়ো সড়ো হয়ে কামরার এক কোণে বসে পড়লো। সেলিম সংক্ষেপে তার ঘটনা শুনিয়ে দিল।

বেটা এ সরকার বিদায় নিচ্ছে কবে?

এটা নির্ভর করছে আমাদের হিম্মতের ওপর। আমি মনে করি মুসলমানদের মধ্যে যদি এ পর্যায়ের জোশ ও জযবা থাকে তাহলে বর্তমান সরকার দুসপ্তাহের বেশি টিকতে পারবে না।

আরশাদের আব্বাও এ কথাই বলেন।

তৃতীয় দিন সেলিম সেখান থেকে বিদায় নিল। তখন সে অনুভব করছিল ইসমত তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে অবস্থান করছে। সে তার সাথে খুব কম কথা বলেছিল। সম্ভবত এমন কোনো কথাও সে বলেনি যা থেকে তার মানসিক অবস্থা ফুটে ওঠে। তবুও সেলিম প্রত্যেকটি শব্দের সাথে তার সরল ও নিস্পাপ হৃদয়ের স্পন্দন শুনেছিল। সে তার লজ্জাবনত দৃষ্টি দেখেছিল, যা নীরবে বলে চলছিল, আমি তোমার। অনাদিকাল থেকে তোমার। আর তুমি আমার। চিরকালের জন্য আমার। একমাত্র আমার।

বিদায়কালে ইসমতের মা সেলিমের হাতে একটি খাম দিয়ে বলেছিল, এটা তোমার মাকে ছাড়া আর কাউকে দেবে না। চিঠিতে কি লেখা আছে তা না জেনেও সেলিম অনুভব করছিল তার জীবনের সাথে এ চিঠিটির গভীর সম্পর্ক আছে।

ইউনিয়নিস্ট সরকারের হিন্দু পৃষ্ঠপোশকদের ধারণা ছিল, পাঞ্জাবে মুসলমানদের জোশ ও জযবা নিছক সাময়িক। পুলিশের লাঠি কিছুদিনের মধ্যে সব ঠাণ্ডা করে দেবে। তখন উত্তর ভারতে হিন্দু ফ্যাসিবাদের জন্য পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারা জানতো, মুসলিম লীগ কোনো সুষ্ঠু কর্মসূচী ও প্রস্তুতি ছাড়াই এ আন্দোলন চালাচ্ছে। ইংরেজ যেমন কয়েকবার কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করে কংগ্রেসের বড় বড় আন্দোলন স্তব্ধ করে দিয়েছিল তেমনিভাবে মুসলিম লীগের নেতাদের গ্রেফতারীর পর পাঞ্জাবে খিজির হায়াতের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে মুসলিম জনতার মোরচা ভেঙে পড়বে বলে তারা মনে করেছিল। কিন্তু অবস্থা প্রমাণ করে দিয়েছে এটা কোনো রাজনৈতিক দলের আন্দোলন ছিল না। হিন্দু স্বার্থের বন্দুক কাঁধে নিয়ে খিজির পাঞ্জাবের মুসলিম জনতাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল এবং এই চ্যালেঞ্জের পরে সে জানতে পেরেছিল যে, লীগ ও পাঞ্জাবের শতকরা নিরানব্বুই ভাগ মুসলমান একাত্ম হয়ে গেছে। সামষ্টিক বিপদ সামষ্টিক প্রতিরক্ষা শক্তিকে জাগ্রত করে দিয়েছিল। আর হিন্দুর ভাড়াটে টাট্টুরা এখন বুঝতে পারছে মন্ত্রীত্বের টোপ গিলে তারা চোরাবালিতে ফেঁসে গেছে।

শেষ পর্যন্ত খিজির হায়াত খান আচানক কংগ্রেসের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে শাসন কর্তৃত্ব থেকে সরে দাঁড়ালো। বাধ্য হয়ে গবর্নর মুসলিম লীগের নেতাকে মন্ত্রীসভা গঠনের দাওয়াত দিল। কিন্তু কংগ্রেস এ অবস্থা বরদাশত করতে পারলো না। যে মাকড়শা বছরের পর বছর মেহনত করে তার সোনালী প্রতারণা জাল বিছিয়েছিল শিকারকে জালের কাছাকাছি এসে আবার ফিরে যেতে দেখে এখন সে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। হিন্দুস্তানের অধিকাংশ প্রদেশে হিন্দুরা ক্ষমতাসীন ছিল, কারণ সেখানে তারা ছিল সংখ্যাগুরু। মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলিতে হিন্দুরা ক্ষমতাসীন থাকতে চাচ্ছিল, কারণ সেখানে কোনো কোনো মুসলিম মাতার গর্ভে বিশ্বাসঘাতক ও জাতির আজাদী বিক্রেতার জন্ম হয়েছিল। আর এখন হিন্দুরা এজন্য ক্রুদ্ধ ছিল যে, পাঞ্জাবের মুসলিম সখ্যাগরিষ্ঠরা তাদের শাসন কর্তৃত্ব থেকে মুক্তিলাভ করছিল। তাদের দৃষ্টিতে পাঞ্জাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বকারী মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়া পঞ্চনদ বিধৃত ভূখণ্ডের কার্যত পাকিস্তানের অন্তরভুক্ত হওয়ার নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই পাঞ্জাব ও কংগ্রেসকে তার পুরাতন নিয়ম বদলাতে হলো। মুসলমানরা এখানেও অহিংসা পূজারীদেরকে তাদের আসল চেহরায় দেখতে পেয়েছিল। কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদ তার পুরাতন হাতিয়ার অকার্যকর দেখে নতুন নতুন হাতিয়ার নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। গান্ধীর আত্মা বলছিল তারা সিংয়ের কণ্ঠে 'হিন্দু ও শিখেরা! তোমাদের পরীক্ষার সময় এসে গেছে। জাপানী ও নাৎসীদের মতো ধ্বংসোম্মাদনায় মেতে ওঠার জন্য তৈরি হয়ে যাও। আমাদের মাতৃভূমি চিৎকার করছে খুন চাই! খুন চাই! আমরা খুন দিয়ে তার পিয়াস মেটাবো। আমরা মোগল রাজত্ব খতম করেছিলাম। এবার পাকিস্তানকে পদতলে দলিত মথিত করবো। আমাদের জীবন দিয়ে হলেও আমরা পাঞ্জাবে মুসলমানদের শাসন কর্তৃত্ব কবুল করবো না।'

ডক্টর গোপীচাঁদ বলছিল, এই সময় এমনভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করো যাতে কেউ ভেগে গিয়ে মুসলিম লীগের সাথে সমঝোতা করতে সক্ষম না হয়।

হিন্দু ও শিখ প্রেস সমবেত কণ্ঠে চিৎকার দিয়ে চলছিল, এমন অবস্থার সৃষ্টি করা আমরা নিজেদের কর্তব্য মনে করছি যার ফলে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগী মন্ত্রীসভা গঠন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কাজেই এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হলো। মাস্টার তারা সিংকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দু-শিখ সংযুক্ত ফ্রন্টের নেতা বানানো হলো। তিনি পাঞ্জাব এ্যাসেম্বলি হলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। শিখদের প্রস্তুতির ভিত্তিতে পাঞ্জাবেও বিহারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। কিন্তু তাদের এ আশা পূরণ হলো না। 'শিখেরা মুসলমানদেরকে পাঞ্জাব থেকে বহিষ্কার করেই ক্ষান্ত হবে'—মাস্টার তারা সিং তার এ ওয়াদা পূর্ণ করতে পারলেন না। মাস্টার তারা সিংয়ের বীর জোয়ানরা আটক পর্যন্ত না পৌঁছে ক্ষান্ত হবে না বলে অংগীকার করে ময়দানে নেমেছিল। কিন্তু ভারতের সুপুত্ররা পেরেশান হয়ে দেখছিল অমৃতসর ও

লাহোরের বাজারে ও রাস্তায় নিরস্ত্র মুসলমানরা ঐসব বীর পুংগবদের কৃপাণ ছিনিয়ে নিয়েছিল। রাওয়ালপিণ্ডি, মুলতান ও অন্যান্য শহরেও তারা কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করতে পারলো না।

শিখদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল অমৃতসর। এখানকার গুরুদ্বার ও মন্দিরগুলিতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ স্তূপাকার করা হয়েছিল। পাঞ্জাবের মুসলমানদের মাথা থেকে পাকিস্তানের চিন্তা বিলুপ্ত করার জন্য যে ফউজ তৈরি করা হয়েছিল এগুলি তাদেরকে যোগান দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের ঘরবাড়ি ও দোকান জ্বালিয়ে দেয়া এবং নারী ও শিশুদের হত্যা করার মধ্যেই তাদের সাফল্য সীমাবদ্ধ ছিল। অমৃতসরের মুসলমানরা আচানক হামলার কারণে শুরুতে যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হলো। শিখেরা নিরস্ত্র পথচারীদের বন্দুক ও পিস্তলের গুলীতে হতাহত করলো। শিশু ও নারীদের ওপর কৃপাণের ধার পরীক্ষা করলো। কিন্তু যখন সাহসী নওজোয়ানদের একটি দল ময়দানে নেমে পড়লো তখন এখানেও লাহোর ও অন্যান্য শহরের মতো এ নিরেট সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, নিষ্ঠুরতা ও কাপুরুষতা একই দুষ্কৃতির এপিঠ ওপিঠ মাত্র।

পাঞ্জাবের মুসলমানরা নীরব দর্শক হয়ে বেশীক্ষণ শিখ ও হিন্দুদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ি জ্বালাবার সুযোগ করে দিতে পারলো না। রাম রাজত্ব কায়েম করার জন্য যেসব কৃপাণ উন্মুখ হয়েছিল তারা সেগুলি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। কাজেই কংগ্রেসের দৃষ্টিতে তারা হয়ে গেলো সন্ত্রাসী। আকালীদল, শিব সেনা ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের বীর পুংগবদেরকে শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা থেকে তারা রুখে দিল। কাজেই তারা হয়ে গেলো সংকীর্ণচেতা ও সাম্প্রদায়িক। তাদের প্রতিরক্ষা শক্তি কংগ্রেসের এ ভুল ধারণা দূর করে দেয় যে, শিখদের শক্তির ভিত্তিতে পাঞ্জাবকে তারা অখণ্ড ভারতের অন্তরভুক্ত করতে পারবে। ফলে ইতিপূর্বে যে কংগ্রেস হিন্দুস্তানকে বিভক্ত করাকে একটি গাভীকে দ্বিখণ্ডিত করার সমর্থক বলে ধিক্কার করছিল এখন সে পাঞ্জাবকে বিভক্ত করার দাবী উঠালো। কেবল এখানেই তারা ক্ষান্ত হলো না, বাংলা ও আসামকেও বিভক্ত করার দাবী তুললো। এ বিভক্তির স্বপক্ষে কংগ্রেসের যুক্তি ছিল ঃ বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানরা হিন্দুস্তানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনাধীনে থাকতে চায় না কাজেই পশ্চিম বংগ ও পূর্ব পাঞ্জাবের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠরাও মুসলমানদের শাসনাধীনে থাকতে চায় না। হিন্দু ও অন্য সংখ্যালঘুদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু ও তাহজীব-তমদ্দুনের হেফাজতের জন্য এ প্রদেশগুলি বিভক্ত করতে হবে।

হিন্দুস্তানের নতুন ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন কংগ্রেসের এ যুক্তি পছন্দ করলেন। কাজেই ৩ জুনের ঘোষণা অনুযায়ী প্রদেশগুলি বিভক্ত করা হলো। আসামের সিলেট জেলা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের জন্য রেফারেন্ডাম করার সিদ্ধান্ত দেয়া হলো।

বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তি সাম্প্রদায়িক দাংগার ফল ছিল এ কথা বলা ঠিক হবে না। সাম্প্রদায়িক দাংগা বিহার, ইউ পি ও হিন্দুস্তানের অন্যান্য প্রদেশেও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এ প্রদেশগুলিতে এমন সব এলাকাও ছিল যেখানে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ছিল। যদি পশ্চিম বংগ ও পূর্ব পাঞ্জাবের হিন্দুদের জন্য পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা বিপদজনক হয়ে থাকে তাহলে বিহার, উত্তর প্রদেশ ও অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের জন্যও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠরা কম বিপদজনক ছিল না। যদি বাংলা ও পাঞ্জাবের দুকোটি অমুসলিমকে পাকিস্তানের বিস্তৃত উর্বর ভূমি কেটে আলাদা করে দেয়া যেতে পারে তাহলে হিন্দুস্তানের চারকোটি মুসলমানও হিন্দুস্তানের কোনো কোনো এলাকায় নিজেদের স্বতন্ত্র অধিকার রাখতো। যদি হিন্দুস্তানের জনসংখ্যার অনুপাতে দেশ ভাগ করা হতো তাহলে দশ কোটি মুসলমান দেশের এক চতুর্থাংশেরও বেশি এলাকার হকদার ছিল। বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করার প্রশ্নই দেখা দিতো না। বরং বিহার, উত্তর প্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ পাকিস্তানে শামিল হতো। হিন্দুস্তানের দক্ষিণেও মুসলমানদের একটি পৃথক অংশ হতো।

কিন্তু এমনটি হয়নি। হিন্দু ও ইংরেজের মিলিত ষড়যন্ত্রই এমনটি হতে দেয়নি। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তিই ছিল মুসলমানদের সাথে বেইনসাফী। এ বেইনসাফীর মোকাবিলা করতে তারা প্রস্তুত ছিল না। আল্লাহ তাদেরকে এ শিক্ষা দিতে চাচ্ছিলেন যে, অন্যায় ও অবিশ্বস্ততার বিরুদ্ধে লড়াই করার হিম্মত যে জাতির নেই তাকে ন্যায় ও বিশ্বস্ততার হকদার মনে করা হয় না। মুসলমানরা স্বাধীন স্বদেশভূমির আকাংখা করেছিল। তারা 'বেঁচে থাকো এবং বেঁচে থাকতে দাও'– নীতি পেশ করেছিল। তাদের নেতারা পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছিলেন, শ্লোগান দিয়েছিলেন, বক্তৃতা করেছিলেন। তারা মনে করতেন পাকিস্তান হচ্ছে ইংরেজ, কংগ্রেস ও তাদের মধ্যকার বুদ্ধিবৃত্তির একটি গ্রন্থীমালা। এ গ্রন্থীটি উন্মোচন করতে সক্ষম হলে তারা পাকিস্তান পেয়ে যাবেন। কিন্তু অতি অল্প লোকেই একথা জানে, ইতিহাসের কোনো কোনো গ্রন্থী উন্মোচনে কলম ও কথার চাইতে তরবারির সাহায্যই লাগে বেশি।

মুসলিম লীগ বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ মেনে নিতে বাধ্য হলো। এর কারণ ছিল কেবল একটিই। এই অন্যায় ফায়সালার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রস্তুতি তার ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম লীগের সিপাহীরা তখনো কাঠের ঘোড়ায় চড়ে বসেছিল।

দেড়শ বছর আগে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ীরা হিন্দুস্তানের রাজা ও নওয়াবদের সাথে সওদাবাজী করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত গড়েছিল। আজ ও

সাম্রাজ্যবাদ তার তল্পী তলপা গুটাবার আগে হিন্দু পুঁজিপতিদের সাথে সওদা করছিল। ফিরিংগী চিকিৎসক কোনো রাজা বা নওয়াবের চিকিৎসা করার পর তার রাজ্যে ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধা চাইতো। আর মাউন্ট ব্যাটেন এমন একজন শল্য চিকিৎসক ছিলেন যিনি ইংরেজ ব্যবসায়ী ও হিন্দু মহাজনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য লাখো মুসলমানের শাহরগ কেটে দিয়েছিলেন। মুসলিম লীগের চোখ অন্ধ ছিল না। সে এই ছুরিটি দেখছিল। কিন্তু লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের ছুরিটি ধরে ফেলার মতো হাত তার ছিল না। মুসলিম লীগ এই ছুরির আঘাত বরদাশত করতে বাধ্য ছিল। কিন্তু মাউন্ট ব্যাটেন ও হিন্দু ছাড়া কেউ জনতো না যে এই জখম তাদের প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি গভীর হবে–আর মাউন্ট ব্যাটেনের বেইনসাফীর পরে র‍্যাডক্লিফের বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা মানব ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক দুর্ঘটনার জন্ম দেবে।

৩

দুপুরে সেলিম বসে বই পড়ছিল। ইউসুফ দৌড়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। চিৎকার দিল, ভাইজান! আম্মীজান আসছেন।

সেলিম তাকে কোনো প্রশ্ন করার আগেই সে একই গতিতে দৌড়ে কামরার বাইরে চলে গেলো। আঙিনায় বের হয়ে জোরেশোরে চিল্লাতে লাগালো ঃ সুগরা আপা! যুবাইদা আপা! চাচীজান! আম্মীজান আসছেন।

সেলিমের দিল ভীষণভাবে স্পন্দিত হচ্ছিল। সেখানে জেগে উঠছিল সুমধুর অনুভূতি। বাড়িতে তার চাইতে বেশি আম্মীর ইন্তিজার আর কেউ করছিল না। যুবাইদা ও তার চাচাত বোনেরা শোরগোল করতে করতে বৈঠকখানায় ঢুকে পড়লো।

যুবাইদা বললো, ভাইজান! আম্মীজান আসছেন।

সুগরা বললো, ভাইজান! মুবারকবাদ। অন্য মেয়েরা একযোগে বলতে লাগলো, ভাইজান, মুবারাক হোক! মুবারক হোক!

আফজালের স্ত্রী ভেতরে ঢুকে বললো, কিসব চেঁচামেচি করছো?

সুগরা বললো, আম্মীজান! চাচীজান আসছেন।

একটি মেয়ে দেউড়ি থেকে হাবেলীতে উঁকি দিয়ে বললো, চাচীজান এসে গেছেন।

চাচীজান! আসসালামু আলাইকুম।

বাড়ির বয়স্ক মহিলারা ও জোয়ান মেয়েরা দেউড়িতে সেলিমের মাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো।

এখন সেলিম বাহ্যত আরো গভীর মনোযোগ সহকারে বই পড়ছিল। কিন্তু তার মানসিক আকর্ষণ দেউড়ির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল। মহিলারা সেলিমের মাকে মুবরকবাদ দিচ্ছিল।

আফজালের স্ত্রী বলছিল, বোন! ভেতরে চলুন। এখানে বেশ গরম ঠেকছে। আরে, পথ ছাড়ো। সুগরা, তোমার চাচীর জন্য শরবত বানাও।

মা সেলিমকে দেখলেন তারপর বৈঠকখানায় চলে এলেন। সেলিম উঠে দাঁড়ালো। সে তার হাসি লুকাবার চেষ্টা করছিল। তার কান ও গাল লাল হয়ে উঠছিল। এবার তাদের মা বেটাকে আরো বেশি উৎসাহ ও জোশের সাথে মুবারকবাদ পেশ করা হচ্ছিল। আচানক সেলিম উঠে বাইরের দিকে যাবার জন্য পা বাড়ালো। কিন্তু মা বললেন, বেটা! দাঁড়াও। চাচী হাসতে হাসতে হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিল কুরসির ওপর।

যুবাইদা জিজ্ঞেস করলো, আম্মীজান! দাদাজান আর দাদীআম্মা আসেননি?

হ্যাঁ, তারা আসছেন?

আচ্ছা বোন বলুন, সেলিমের দাদী কি মেয়ে পছন্দ করেছেন?

সেলিমের দাদীর কথাই বলো না বোন। তিনি তো কনে দেখেই বলে বসলেন, আমি এ সপ্তাহেই বিয়ে দিয়ে নাতবৌ ঘরে নিয়ে যেতে চাই। দুদিন তিনি এক মিনিটের জন্য তাকে চোখের আড়াল হতে দেননি। সে যে কামরায় যায় তিনি তার পেছনে পেছনে সেখানেই চলে যান। সে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি তাকে পাখা দিয়ে বাতাস করেন। সে খানা খেতে থাকলে তার পাশে বসে বলে, বেটি! তুমি তো কিছুই খেলে না। কখনো তার মাকে বলেন, তুমি একে বেশি করে দুধ খাওয়াও। একবার ইসমতকে বলতে লাগলেন, 'বেটি! আমাকে বই পড়ে শোনাও, তোমার আওয়াজ বড়ই মিষ্টি।' একবার হলো কি তার ছোট বোন দুষ্টুমী করে বললো, ইসমত আপার মাথা ব্যথা করছে। তখন সেলিমের দাদী এমন কাণ্ডটা করে বসলো যে আর কি বলবো। ইসমত যতই বলে আমার মাথায় ব্যথা নেই, আমি পুরোপুরি সুস্থ, বাড়ির লোকেরাও হাসছিল কিন্তু তিনি কোনো কথায় কান দিলেন না, শেষ পর্যন্ত বাদাম তেল দিয়ে মাথা মালিশ করে তবেই ক্ষান্ত হলেন।

তার মা নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছেন।

তিনি খুশীও হয়েছিলেন আবার পেরেশানও। এদিক থেকে বলা হচ্ছিল এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়েশাদীর কাজ সমাধা করে ফেলতে হবে আর ওদিকে তারা এত তাড়াতাড়ি বিয়ের অনুষ্ঠান কেমন করে করা যাবে এজন্য পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন।

তাহলে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত কি হলো?

তাদের বক্তব্য ছিল, পাকিস্তানের ফায়সালা হয়ে যাবার পরপরই ডাক্তার সাহেব সেলিমের আব্বার সাথে বসে একটা তারিখ নির্ধারণ করে নেবেন।

আফজালের স্ত্রী মুচকি হেসে সেলিমের দিকে তাকিয়ে বললো, সেলিম বলতো ছেলে ও মেয়ের মতামত ছাড়া তাদের বিয়ে দেয়া এক ধরনের জুলুম কাজেই তাকেও জিজ্ঞেস করে নাও।

সেলিমের মা বললো, পথে আসতে আসতে আমি তার দাদীকে বলেছিলাম, আম্মা! আমার ভয় হচ্ছে সেলিম অস্বীকার না করে বসে। শুনেছি লাহোরে সে কোনো মেমকে পছন্দ করেছে। আমার কথা শুনে তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। বলতে লাগলেন, বলো কি, জুতো মেরে মেরে আমি তার মাথার চুলগুলো সব ফেলে দেবো। আমি বললাম, আমিনাও সেলিমকে কোনো মেমের সাথে বিয়ে দিতে চায়। জবাবে তিনি বললেন, বাড়িতে গিয়েই আমিনাকে পত্র লিখবো সে যেন আর আমাদের এখানে না আসে।

গোলাম হায়দরের স্ত্রী বললো, আম্মা এখনি এসে পড়বেন। আমরা বলবো, আম্মা! সেলিম তো এ বিয়েতে রাজি হচ্ছে না, তারপর দেখো না কেমন তামাশা হয়। কিন্তু তোমরা হেসে ফেললে তিনি সব বুঝতে পারবেন। আর সেলিম, তুমিও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবে। এস বোন, আমরা দালানে গিয়ে বসি।

সেলিমের দাদী বাড়িতে প্রবেশ করলে মেয়েরা পরস্পর কানাকানি করতে লাগলো। তিনি দালানের ভিতরে পা রেখেই বললেন, বেটি! নায়েবকে ডাকো এবং গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতে এক এক ডেলা গুড় পাঠিয়ে দাও।

গোলাম হায়দরের স্ত্রী সাঈদা জিজ্ঞেস করলো, মা-জী আপনারা কি বাগদান করে এসেছেন?

এ প্রশ্নে দাদী হকচকিয়ে গেলেন এবং সেলিমের আম্মার মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। সেলিমের মা গম্ভীর হয়ে গেলো। দাদী অন্য মেয়েদের দিকে তাকাতে লাগলেন এবং পেরেশান হয়ে বললেন, কেন সেলিমের মা তোমাদের বলেনি?

আফজালের স্ত্রী শ্বাশুড়ীর হাতে শরবতের গ্লাস তুলে দিতে দিতে বললো, মা-জী, সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেলিম মানছে না।

দাদী শরবতের গ্লাস ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, কী এত বড় কথা! তোমার মুখে পোকা হোক!

সুগরা ঠোঁট চেপে ধরে হাসি নিয়ন্ত্রণ করতে করতে এগিয়ে এলো এবং বললো, দাদীজান! সেলিম ভাই বলছিলেন লাহোর থেকে মেম বিয়ে করে আনবেন।

দাদী এক লহমার জন্য নিথর হয়ে গেলেন তারপর আচানক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কোথায় সেই বেঈমানটি?

আফজালের স্ত্রী বললো, মা-জী! তাকে ধীরে সুস্থে বোঝাবেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে রাগ-গোস্বা ভালো নয়।

হুঁ, গোস্বা ভালো নয়। আমি জুতিয়ে তার মাথার চুলগুলো সব ফেলে দেবো। সে দশ ক্লাস পাশ করার পর আমি বলেছিলাম বেঈমানটাকে শাদী দিয়ে দাও। কিন্তু আমার কথা কে শোনে? সবাই এক কথা বললো, ওকে বিলাত পাশ করাতে হবে। ওর দাদা বললো, আলী আকবর বি.এ. পাশ করে যদি বিগড়ে না গিয়ে থাকে তাহলে সে বিগড়ে যাবে কেন? তাকে লাহোর পাঠিয়ে দিন। কই, কোথায় সে?

নিজের প্রশ্নের জবাব না পেয়ে দাদী সবার মুণ্ডুপাত করতে করতে কামরার মধ্যে সেলিমকে তালাশ করতে লাগলেন।

সুগরা বললো, দাদীজান! ভাইজান বৈঠকখানায় আছেন।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ির মেয়েরা বৈঠকখানার বাইরে দাঁড়িয়ে খিলখিলিয়ে হাসছিল। দাদী বলছিলেন, কি বলতে চাও, বেঈমান তুমি মেম নিয়ে আসবে আমার বাড়িতে? লজ্জা হয় না তোমার?

সে হাসছিল– বলছিল দাদীজান.......!

ব্যস, আমি তোমার দাদী নই।

দাদীজান! আপনি কোন্ মেমের কথা বলছেন?

আমি তোমার সব কাণ্ড কারখানা জেনে ফেলেছি। এজন্য নতুন নতুন সুট-কোট তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে?

আফজাল দেউড়ির পথ দিয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ করলো। কি হলো? সে প্রশ্ন করলো।

তোমার ভাতিজাকে জিজ্ঞেস করো।

সেলিম বললো, দাদীজান আপনাকে নিয়ে তামাশা করা হচ্ছে।

মিথ্যুক, তুমি বলোনি আমি ওখানে শাদী করবো না?

দাদীজান! আল্লাহর কসম, ওরা তোমার সাথে মশকরা করছে।

আফজাল মেয়েদের অট্টহাসি দেখে হাসতে হাসতে কামরার বাইরে চলে গেলো। কি ব্যাপার ভাবী! সে সেলিমের মাকে জিজ্ঞেস করলো।

কিছুই নয়, এই গরমের মধ্যে সেলিমের দাদী তিন মাইল পায়ে হেঁটে এসেছেন। তাই তিনি একটু গোস্বা করছেন।

একথা শুনতেই দাদী উত্তপ্ত দমকা বাতাসের মতো তেড়ে বাইরে বের হয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন, তবে রে বেঈমান-শয়তানীরা! দাঁড়া তোদের দেখাচ্ছি মজাটা।

সুগরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। দাদী এগিয়ে গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরলেন এবং তাকে মারতে শুরু করলেন। সেলিম কাছে গিয়ে বললো, দাদীজান! আরো এক ঘা লাগাও। বড়ই শয়তান হয়ে গেছে।

দাদী ক্লান্ত হয়ে থেমে গেলেন কিন্তু সুগরার হাসি থামলো না।

মহেন্দর সিংদের গ্রামে শান্তি কমিটির মিটিং ছিল। একটি আম বাগানে নেতৃস্থানীয় শিখ, মুসলমান ও হিন্দু নেতৃবর্গ জমায়েত হলো। শেঠ রামলাল এক বক্তৃতা দিল। গ্রামের শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার জন্য কিছু লোকের খুব প্রশংসা করলো। শেঠজী বলতে থাকলো ঃ বিগত চার পাঁচ মাস থেকে যেখানে পাঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু-মুসলমান-শিখ পরস্পরের রক্তে হোলি খেলছে সেখানে ভগবানের অশেষ কৃপায় আমাদের জেলায় কোনো দাংগা হয়নি। এই এলাকার মুরব্বীদের মধ্যে চৌধুরী রহমত আলী ও সরদার ইন্দর সিংকে আমি সবচেয়ে বেশি প্রশংসার হকদার মনে করি। এই বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদ্বয় এই বয়সেও প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোকদের মধ্যে শান্তির অমিয় বাণী প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। ভাই আফজাল ও ভাই শের সিং যে দায়িত্ব পালন করছেন তা সবার চোখের সামনে আছে। লোকেরা বাইরে থেকে এসে এই এলাকায় দাংগা বাধাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু এরা কাউকে সফল হতে দেয়নি। আজ হিন্দু, মুসলমান ও শিখ বোনেরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছে। তাদের দিকে চোখ তুলে দেখার দুসাহস কারোর নেই। এ সব ভাই আফজাল ও ভাই শেরসিংয়ের হিম্মতের ফল।

ভাইসব। বয়োবৃদ্ধদের তুলনায় যুবকদের মধ্যে জোশ আবেগ ও উত্তেজনা বেশি হয়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য আমাদের এলাকায় সেলিম ও মহেন্দর সিংয়ের মতো উচ্চ শিক্ষিত নওজোয়ানরা আছে। তারা দিনরাত মেহনত করে প্রত্যেক গ্রামে শান্তি কমিটি কায়েম করেছে। আমরা আজ ভাইভাই হয়ে পরস্পর কথাবার্তা বলছি এটা তাদেরই ঐসব প্রচেষ্টার ফল। আমাদের জেলা পাকিস্তানে পড়েছে। সীমানা নির্ধারণ কমিশনের শেষ ঘোষণা এখনো আসেনি। কিন্তু আমরা অংগীকার করেছি সীমানা নির্ধারণ কমিশনের রায় যা-ই হোক না কেন এ এলাকায় কোনো প্রকার দাংগা হতে আমরা দেবো না। চৌধুরী রহমত আলী, তার ভাই, বেটা ও ভাতিজারা এই এলাকার মুসলমানদের পক্ষ থেকে শিখ ও হিন্দুদের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমরা তাদের প্রতি আস্থা রাখি। তারা পবিত্র কুরআন ছুঁয়ে কসম খেয়েছেন যে, তারা আমাদের প্রতি কোনো প্রকার জুলুম ও অন্যায় হতে দেবেন না। তাই মুসলমান ভাইদের কাছে আমাদের সদুদ্দেশ্যের প্রমাণ পেশ করা আমি জরুরী মনে করি। আপনারা জানেন এ এলাকায় আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের কোনো ক্ষমতা নেই। সংখ্যায় আমরা নগণ্য। তবুও আমি গোমাতার গাত্র স্পর্শ করে শপথ করতে রাজি আছি যে, আমাদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার উস্কানীমূলক কোনো কাজ করা হবে না।

শিখদের পক্ষ থেকে চরণ সিং ও ইন্দর সিং গুরুগ্রন্থের ওপর হাত রেখে কসম খেতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করলো।

শেঠ রামলালের বাড়ি থেকে একটি সুদৃশ্য গাভী ও গিয়ানী শরণ সিংয়ের বাড়ি থেকে একটি গুরুগ্রন্থ আনা হলো। প্রায় সকল গ্রামের নেতৃস্থানীয় শিখরা গুরুগ্রন্থ এবং নেতৃস্থানীয় হিন্দুরা গাভী স্পর্শ করে হলফ করলো।

সবশেষে সর্বাধিক বয়োবৃদ্ধ চৌধুরী রহমত আলী, যার চুল দাড়ি ও ভ্রু পর্যন্ত শ্বেত বর্ণ ধারণ করেছিল, ছড়ি হাতে উঠে দাঁড়ালেন এবং দুর্বল কণ্ঠে বললেন, ভাইয়েরা! যেদিন ভাইসরয় ঘোষণা করলেন, গুরুদাসপুর জেলা পাকিস্তানের অন্তরভুক্ত হয়েছে আমি সেদিনই আমার গোত্রের লোকদের ডেকে বলে দিয়েছি, এখন থেকে হিন্দু, শিখ ও খৃষ্টানদের হেফাজাত করা মুসলমানদের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত হয়ে গেছে। তারপর আমি পীর আবদুল গফুর ও মৌলবী মুহসিন আলীকে সাথে নিয়ে প্রত্যেক গ্রামে গিয়েছি এবং মুসলমানদেরকে এই মর্মে বুঝিয়েছি যে, ইসলাম কারোর ওপর জুলুম করার অনুমতি দেয় না। আমাদের হিন্দু ও শিখ ভাইয়েরা যেসব আবেগপ্রবণ লোকদের ব্যাপারে দাংগা ফাসাদ করার আশংকা করতো তাদেরকে মসজিদে ডেকে আল্লাহর নামে শপথ করিয়েছি যে, তারা নিজেদের প্রতিবেশীদের হেফাজত করবে। এটা ছিল আমাদের কর্তব্য। ভাইয়েরা আমার! পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান হয়ে যাবার অর্থ এই নয় যে, আমরা পরস্পরের জন্য হিংস্র হায়েনায় পরিণত হবো। আমরা শত শত বছর থেকে প্রতিবেশীর মতো বসবাস করে আসছি। হামেশা আমরা একে অন্যের সুখ দুঃখে শামিল হয়ে এসেছি। শৈশবে আমরা এইসব গাছের ডালে দোলনা ঝুলিয়ে একসাথে দোল খেয়েছি। আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করবো কেন? এক একটা ইট সংগ্রহ করে আমরা যেসব বাড়ি বানিয়েছি সেগুলি নিজ হাতে জ্বালিয়ে দিতে যাবো কেন? আমরা সবাই যেসব জমিতে মেহনত করে আজ পর্যন্ত রুটি রুজি হাসিল করতে পেরেছি সেগুলি আগামীকালও আমাদের রুটি রুজি দান করবে। আমাদের পূর্বপুরুষরা এই অনাবাদি জমিগুলিকে আবাদযোগ্য বানিয়ে আমাদের জন্য সোনার ফসল ফলিয়েছেন। তাই এ জমিন আমাদের জন্য পবিত্র। এখানে আমাদের পূর্বপুরুষ আত্মীয় স্বজনরা সমাধিস্থ আছেন। এর পবিত্র বুকে আমরা নিরপরাধ মানুষের খুন ঝরাতে পারি না।

ভাইয়েরা আমার! আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যদি আমি এ এলাকার কোনো মুসলমানকে কোনো হিন্দু বা শিখের ঘর জ্বালানো থেকে বিরত রাখতে না পারি তাহলে আমার নিজের রক্তবিন্দু দিয়ে আমি তা নিভাবার চেষ্টা করবো। আমাদের হিন্দু ও শিখ ভাইদেরকে খুশি করার জন্য আমি একথা বলছি না বরং একথা বলার কারণ হচ্ছে আমি মুসলমান এবং এ জেলাটি যখন পাকিস্তানে শামিল হয়ে গেছে তখন আমার কওমের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের হিন্দু ও শিখ প্রজাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়ে গেছে।

সেলিম ও মহেন্দর এ মিটিংয়ে হাজির ছিল। এলাকার আরো কয়েকজন শিক্ষিত নওজোয়ানও তাদের পাশে বসেছিল। মিটিং শেষ হবার পর কুন্দন লাল সেলিমকে বললো, সেলিম ভাই! রেডিওর খবরের সময় হয়ে গেছে, শুনতে চাইলে চলুন।

মহেন্দর বললো, চলুন সেলিম সাহেব! বলবন্ত ভাইও এসে গেছেন।

চলো ভাই।

সেলিম, মহেন্দর এবং আরো চারজন যুবক কুন্দন লালদের বৈঠকখানার দিকে চলে গেলো।

খবর শোনার পর সেলিম বলবন্ত সিংয়ের সাথে দেখা করার জন্য মহেন্দরের সাথে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু কুন্দন লাল বললো, না জনাব! এখানেই বসুন, আমি বলবন্ত সিংকে ডাকিয়ে আনছি। আমি নওকরকে আম আনতে পাঠিয়েছি।

না থাক, বাড়িতে আমার কিছু কাজ আছে। একথা বলে সেলিম উঠে দাঁড়ালো কিন্তু বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে আবার বসে পড়লো। কুন্দন লাল একটি ছেলেকে ডেকে বললো, স্বরূপ যাও, ক্যাপ্টেন সাহেবকে ডেকে আনো।

এক নওজোয়ান সেলিমকে প্রশ্ন করলো, বাউণ্ডারী কমিশনের ফায়সালা সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

ফায়সালা প্রকাশ করার পূর্বেই আমি আর কি মতামত ব্যক্ত করতে পারি?

আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করে থাকবেন, কারোর কারোর মতে কমিশনও জুনের ঘোষণায় সম্ভবত কোনো পরিবর্তন আনবে না।

আমার মতে এটা অসম্ভব। সাময়িক বাটোয়ারার সময় অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিন্দুস্তানের অন্তরভুক্ত করা হয়েছে। আমার মনে হয় চূড়ান্ত পর্যায়ে সীমানা নির্ধারণ করা পর্যন্ত আইন শৃংখলা ব্যবস্থার সুবিধার্থে এমনটি করা হয়েছে। যেমন অমৃতসর জেলার আজনালা তহশীলে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। সেখানে মুসলিম ও অমুসলিম জনসংখ্যার হার হচ্ছে চৌদ্দ ও আট। আর অমুসলিমদের মধ্যে খৃষ্টান এবং অচ্ছুতরাও আছে। এরপর বিসোহা, জালিন্ধর, হোশিয়ারপুর, নিকোদার, ফিরোজপুর ও যীরাহ তহশীলগুলিতে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে এবং এগুলি পাকিস্তানের সাথে লাগোয়া এলাকা।

বলবন্ত সিং শরাব পান করে মাতাল অবস্থায় টলতে টলতে ভেতরে প্রবেশ করলো। সেলিম ও তার সাথিদের সাথে মুসাফাহা করার পর একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে সেলিমের পাশে বসে পড়লো। মহেন্দর অনুভব করছিল তার মুখের শরাবের গন্ধ সেলিমের জন্য অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণের জন্য আলোচনার বিষয়বস্তু বদলে গেলো। বলবন্ত সিং বলছিল কাশ্মীরের মহারাজা পোলো খেলার জন্য তাকে তাঁর নিজের আস্তাবল থেকে একটি ঘোড়া উপহার দিয়েছেন। সেলিম গতবছর শ্রীনগর গিয়েছিল কিন্তু তার সাথে দেখা করেনি এজন্য সে অসন্তোষ প্রকাশ করছিল।

সেলিম ওজর পেশ করে বললো, ভাই! আমি তিন দিন শ্রীনগরে অবস্থান করে তারপর সেখান থেকে গুলবার্গ ও চেহেলগামে চলে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ ভাই, ক্যাপ্টেন হবার জন্য তোমাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

বাদ দাও ইয়ার! এ আর এমন কি কামিয়াবি? আমার যেসব সাথি ইন্ডিয়ান আর্মিতে ভর্তি হয়েছিল তারা মেজর ও কর্ণেল পর্যন্ত হয়ে গেছে। কাশ্মীর আর্মিতে যেসব অফিসারকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠানো হয়েছিল তাদের সবার পদোন্নতি হয়েছে। আমার ধারণা ছিল, কাশ্মীরে যদি কিছু গড়বড় হয়ে যায় তাহলে আমিও একজন বড় অফিসার হয়ে যাবো। কিন্তু সেখানে কেউ মাথা ওঠায়নি। ফলে বাহাদুরি দেখাবার কোনো সুযোগই আমি পাইনি। তবে হ্যাঁ, এখন সেখানে পিপড়ের কিছু ডানা গজাচ্ছে। আশা করা যায় কাশ্মীরে কিছু না কিছু হবেই। আশংকা করেছিলাম আমাদের রেজিমেন্ট ভেঙে যাবে। কিন্তু এ আশংকা এখন আর নেই। মহারাজা সেনাবাহিনী হ্রাস করার পরিবর্তে আরো শিখ ভর্তি করার হুকুম দিয়েছেন।

কুন্দন লাল প্রশ্ন করলো, আপনার মতে কাশ্মীরে বিদ্রোহের আশংকা আছে?

বিদ্রোহ সেখানে আর কী হবে? তবে পাকিস্তানের নাম শুনে কিছু লোক বেতাব হয়ে পড়ছে তাদের জোশ আমরা ঠাণ্ডা করে দেবো দুঘন্টার মধ্যে। মোটকথা পাকিস্তানের কারণে মহারাজা এখন সেনাবাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন।

মহেন্দর সিং সেলিমের চেহারার ভাবভংগী দেখে আলোচনার বিষয়বস্তু বদলাবার উদ্দেশ্যে বললো, ভাইজান! আমরা বাউণ্ডারী কমিশনের ফায়সালা নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

বলবন্ত সিং একটি অর্থবহ হাসি হেসে বললো, বাউণ্ডারী কমিশনের ফায়সালা আমি জানি।

কুন্দন লাল বললো, হ্যাঁ সেলিম ভাই আপনি বলছিলেন আজনালা, হোশিয়ারপুর, বেসোহা, জালিন্ধর, নিকোদার, যীরাহ ও ফিরোজপুর তহশীলগুলি মুসলিম জনসংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু পাকিস্তানে এসে যাবে। কিন্তু এ অবস্থায় আমাদের জেলার পাঠানকোট তহশীলে হিন্দু জনসংখ্যা বেশি তাহলে এটা হিন্দুস্তানে শামিল হবে।

সেলিম জবাব দিল, আমার মতে লুধিয়ানার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত নয় এটাকে পাঠানকোটের সাথে বদল করা যেতে পারে। কিন্তু এমনটি না হলেও পাকিস্তানকে আট দশটি উর্বর তহশীলের বদলে এই অনুর্বর তহশীলটি ছেড়ে দেওয়ায় কোনো ক্ষতি নেই।

বলবন্ত সিং বললো, আরে ভাই! মানচিত্র পেলে আমি নিজেই কিছু বলে দিতে পারতাম।

কুন্দন লাল বললো, মানচিত্র আপনার পেছনে দেয়ালে ঝুলছে।

বলবন্ত সিং উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সেলিম ভাই, তুমি পেন্সিল হাতে নিয়ে দাগ দিতে থাকো তারপর আমি তোমাকে বলবো।

কুন্দন লাল টেবিলের দেরাজ থেকে একটা লাল পেন্সিল বের করে সেলিমের হাতে দিল। সেলিম মানচিত্রের কাছে দাঁড়িয়ে বললো, আমার মতে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের প্রাকৃতিক সীমানা হচ্ছে শতদ্রু নদী। এ অবস্থায় হোশিয়ারপুরের দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলিম তহশীল পাকিস্তানের অন্তরভুক্ত হবে। কিন্তু তার বদলে শতদ্রু পারের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাকে হিন্দুস্তানে শামিল করা যেতে পারে। এখন আসে অমৃতসর জেলার প্রসংগ। তার আজনালা তহশীল সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি সেখানে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। বাকি জেলাগুলিতে শিখেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাছাড়া দরবার সাহেবের কারণে শিখেরা এ জেলাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এজন্য সম্ভবত অজনালাকে বাদ দিয়ে বাকি অমৃতসরের সমস্ত এলাকা ফিরোজপুরের সাথে যোগ করে দেয়া যেতে পারে। এ অবস্থায় বাউণ্ডারী লাইন হবে এভাবে। একথা বলে সেলিম পেন্সিল দিয়ে মানচিত্রের গায়ে একটা রেখা এঁকে দিল।

বলবন্ত সিং বললো, ব্যস তুমি এটাই বুঝেছো?

সেলিম বললো, আমার মতে ইংরেজ যদি হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানে কোনো একজনের ওপর বাড়াবাড়ি করে দাংগা বাধাবার নতুন ফন্দী না এঁটে থাকে তাহলে এটাই হবে সীমানা।

বলবন্ত সিং সেলিমের হাত থেকে পেন্সিল নিয়ে বললো, র্যাডক্লিফের ফায়সালা শোনার পর এ নকশাটা একবার চোখের সামনে অবশ্যই মেলে ধরবে। এ হাত বলবন্ত সিংয়ের নয় বরং একে র্যাডক্লিফ ও মাউন্টব্যাটেনের হাত মনে করো। সেলিম ভাই তুমি কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করে রাখো আমি সেই রেখা আঁকবো যা ইতিপূর্বেই র্যাডক্লিফ ও মাউন্টব্যাটেন এঁকে ফেলেছেন।

সেলিম হেসে জবাব দিল, আরে ভাই! আমি বেহুশ হয়ে যাবো না, তুমি নিশ্চিন্তে আঁকতে থাকো।

বলবন্ত সিং অট্টহাসি দিল। বললো, আরে ভাই, র্যাডক্লিফ যেদিন তার বাক্সের তালা খুলবে সেদিন অনেক বড় বড় জাঁদরেলও বেহুশ হয়ে পড়বে। দেখো! বলবন্ত সিং মানচিত্রের ওপর সেলিমের রেখার তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল অন্য অনেকগুলি রেখা এঁকে দিল। সেলিম পেরেশান হয়ে অবাক চোখে রেখাগুলির দিকে তাকিয়েছিল। বলবন্ত সিং কেবলমাত্র শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্তী সমস্ত মুসলিম প্রধান এলাকাই হিন্দুস্তানের অন্তরভুক্ত করেনি বরং এই সংগে তার রেখার সাহায্যে শকরগড় বাদ দিয়ে গুরুদাসপুরের বাকি এলাকা, অমৃতসর জেলার সমস্ত এলাকা এবং লাহোরের কিছু এলাকাও হিন্দুস্তানের অন্তরভুক্ত দেখাচ্ছিল। মানচিত্র থেকে চোখ সরিয়ে সেলিম বলবন্ত সিংয়ের দিকে নজর উঠালো এবং তারপর আচানক জোরে হেসে উঠে বললো, ইয়ার! আজ তুমি খুব বেশি পান করে ফেলেছো। আমি

সংখ্যাগরিষ্ঠদের এগারো লাখ মুসলমানদের বাঁচাবার চিন্তা করছিলাম আর তুমি কিনা তাদের আরো পনের লাখকে হিন্দুস্তানের দিকে ঠেলে দিলে?

তুমি হাসছো? এখনো আমি তোমাকে তেমন কিছু জানাইনি। তাহলে দেখো এই বলে বলবন্ত সিং উপরের আরো একটি রেখা টেনে প্রথম রেখাটির সাথে মিলিয়ে দিয়ে বললো, পনের লাখ নয় আরো তিরিশ পঁয়ত্রিশ লাখ মুসলমানকে আমি হিন্দুস্তানের দিকে ঠেলে দিয়েছি। কাশ্মীর হিন্দুস্তানে শামিল হবে। ওই রেখাটি দেখো।

আচ্ছা, তুমি কাশ্মীরের জন্য গুরুদাসপুর জেলাকে হিন্দুস্তানের অন্তরভুক্ত করে দিয়েছো। কিন্তু ভাইসরয় সাহেব তো গুরুদাসপুর পাকিস্তানে শামিল করে দিয়েছেন। এখন তুমি তার ফায়সালা বদলে দিতে চাচ্ছো?

বলবন্ত সিং কিছুটা জোশের মাথায় বলে ফেললো, গুরুদাসপুর হচ্ছে কাশ্মীরের দিকে যাবার হিন্দুস্তানের একমাত্র পথ! তাই তাকে অবশ্যই হিন্দুস্তানের সাথে শামিল হতে হবে। মাউন্ট ব্যাটেনকে তার ফায়সালা বদলাতে হবে। পঁয়ত্রিশ লাখ মুসলিম অধ্যুসিত রাজ্যের রাজা যখন হিন্দুস্তানের সাথে থাকতে চায় তখন গুরুদাসপুর জেলার পাঁচ ছয় লাখ মুসলমানের বিরোধিতার পরোয়া করা হবে না।

সেলিম বললো, যদি এভাবে বিচার করা হয় তাহলে আমরাও দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ, ভূপাল ও জুনাগড়ের পথও পাবো।

হায়দরাবাদ, ভূপাল ও জুনাগড় আমাদের পকেটে আছে। এখন আমরা কেবল কাশ্মীর নিয়ে ভাবছি।

কুন্দন লালের নওকর একটি গোলাকার ট্রেতে আম সাজিয়ে টেবিলের মাঝখানে এনে রাখলো। মহেন্দর ও কুন্দন লালের পীড়াপীড়িতে সেলিম একটি আম উঠিয়ে নিল। কিন্তু খাবার সময় সে অনুভব করছিল আজ আমের স্বাদ বদলে গেছে।

কুন্দন লাল বলবন্ত সিংকে বললো, তুমি আম খাবে না?

না আজ আমের জন্য আমার পেটে জায়গা নেই।

সেলিম বললো, বলবন্ত ঠিকই বলেছে। আচ্ছা সত্যি করে বলোতো আজ তুমি ক'বোতল খেয়েছো?

ইয়ার দেখো, এখনো তুমি মনে করছো আমি তোমার সাথে ইয়ার্কি করছি। কিন্তু এ রেখাংকিত মানচিত্রটা তুমি নিজের সাথে নিয়ে যাও, তাহলে কোনোদিন বলতে যে, তুমি কোনো 'উল্লুকে পাঠ্ঠার' সাথে কথা বলোনি বরং বলেছিলে একজন সচেতন মানুষের সাথে।

মহেন্দর তার ভাইয়ের কথায় খুবই পেরেশান হয়ে পড়েছিল। আলোচনার ধারা পরিবর্তন করার প্রয়োজন অনুভব করে সে বললো, ভাইজান! সেলিম সাহেবের বাগদান হয়ে গেছে। আপনি তাকে মোবারকবাদ দেবেন না?

আরে ভাই মোবারক হোক মোবারক হোক! কবে হলো বাগদান?

সেলিমের পরিবর্তে মহেন্দর জবাব দিল, প্রায় দু'সপ্তাহ হয়ে গেছে।

আচ্ছা ভাই, মিঠাই খাওয়াবে কবে?

সেলিম বললো, পনের আগস্টের পর তোমাদের সবাইকে দাওয়াত দেবো।

বলবন্ত সিং বললো, পনের আগস্ট পর্যন্ত আমি এখানে আছি।

এ মজলিস খতম হবার পর মহেন্দর কিছু দূর সেলিমের সাথে এগিয়ে গেলো। গ্রামের বাইরে বের হয়ে সে বিমর্ষ কণ্ঠে বললো, বলবন্তের কথায় আপনি মনে ব্যথা পেয়েছেন। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমার জানা ছিল না এ সময়ও সে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকবে!

সেলিম মহেন্দরের কাঁধে হাত রেখে বললো, মহেন্দর! আমার ব্যাপারে তোমার পেরেশান হবার দরকার নেই। আমি তাকে দেখতেই অনুমান করেছিলাম আজ ব্যাপার কিছু গড়বড় হবে।

সেলিম বাহ্যত বলবন্তের কথাগুলিকে একজন মাতালের মাতলামি ছাড়া আর কিছু নয় বলে বাহ্যত মহেন্দরকে নিশ্চিন্ত করে দিল। কিন্তু যখন সে একাকী নিজের গ্রামের পথে পাড়ি জমালো তখন তার কানে বলবন্তের কথাগুলি বারবার অনুরণিত হচ্ছিল। কল্পনার দৃষ্টিতে বারবার সে বলবন্তের আঁকা লাল রেখা দেখছিল যা সে এঁকেছিল মানচিত্রের গায়ে। আচানক নিজের মনকে সে প্রশ্ন করলো, যদি এটা সত্য হয় তাহলে? কিছুক্ষণের জন্য তার শিরার প্রতিটি রক্ত বিন্দু জমাটবদ্ধ হয়ে গেলো। সেই রেখা এগিয়ে যেতে এবং ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। শেষ পর্যন্ত পাঁচ দরিয়ার ভূমিতে একটি নতুন দরিয়ার চেহারা তার চোখে ভেসে উঠলো। আগুন ও খুনের দরিয়া। এই দরিয়ার সয়লাব পল্লী ও নগরগুলি ধ্বংস করে এগিয়ে চলছিল। এ রেখাটি তার কাছে মনে হচ্ছিল একটি ভয়াবহ আজদাহা। মনে হচ্ছিল হিন্দু ফ্যাসিবাদের দৈত্য তার পিঠে সওয়ার হয়ে বলছে, এখন আমি স্বাধীন হয়ে গেছি—এখন পুরোপুরি স্বাধীনভাবে আগুন ও খুনের খেলা খেলতে পারবো। র‍্যাডক্লিফের কলম এক আঁচড়েই তাকে শতদ্রুর কিনারা থেকে ইরাবতীর কিনারায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিল এবং তাকে কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়ে আনার জন্য গুরুদাসপুরের পথের ওপর মুসলমানদের লাশ বিছিয়ে দিয়েছিল। আর কাশ্মীরের পঁয়ত্রিশ লাখ মুসলমান?

সেলিমের দিল আচানক নতুন করে স্পন্দিত হতে লাগলো। চিৎকার করে উঠলো সে, না না এসব ভুল, মিথ্যা, অসম্ভব। এসব একজন মাতালের উদ্ভট অসংলগ্ন কথাবার্তা। এসব কেমন করে হতে পারে? ইংরেজ এমন বেইনসাফী করতে পারে না। এ রেখা সংকুচিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত তার দৃষ্টিশক্তির বাইরে চলে গেলো এবং সেই দ্বিতীয় রেখাটি তার চোখে ভেসে উঠলো যেটি এঁকেছিল সে নিজের হাতে।

প্রাচীন যুগে ভারতমাতার সুপুত্ররা হত্যা ও লুটপাট করার জন্য যখন বের হতো, তারা কালীমাতার পূজা করতো এবং তার দরগায় মানত করতো। এ কালী

করালীর মূর্তি তার পূজারীদেরকে এমন প্রত্যেকটি অসৎ কাজ করার অনুমতি দিতো মানুষের বিবেক যাকে কোনোক্রমে সমর্থন করতে পারে না। বিশ শতকী সভ্যতার ছায়াতলে বসবাসকারী হিন্দুও আপন প্রকৃতির দিক দিয়ে অন্ধকার যুগের হিন্দুর থেকে মোটেই আলাদা ছিল না। হিন্দু সমাজ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য নিজেদের মনে যে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যবোধের জন্ম দিয়েছিল তারি ভিত্তিতে প্রাচীন হিন্দু সমাজ গড়ে উঠেছিল। শুদ্রদের লাঞ্ছনার মধ্যেই ছিল প্রাচীন হিন্দুদের উচ্চতর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য।

নব্য হিন্দু সমাজের বুনিয়াদ রাখা হয়েছিল মুসলিম দুশমনীর ওপর। তারা নিজেদেরকে উঁচু করার জন্য মুসলমানদেরকে নীচু করা জরুরী মনে করেছিল। শত শত হাজার হাজার বছরের জুলুম নিপীড়ন অচ্ছুতদের শিরা উপশিরায় জীবন শোনিতের ধারা শুকিয়ে দিয়েছিল। হিন্দু কর্তৃত্বের লাঠির সামনে তারা ভেড়ার পালে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপারটা ছিল তাদের থেকে আলাদা। মুসলমানরা কয়েকশ বছর এদেশ শাসন করেছিল। তারা ব্রাহ্মণদের সোমনাথের রুদ্রমূর্তির সামনে মাথা ঝুঁকাবার পরিবর্তে তাদেরকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল। আর পতনের যুগেও তাদের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা এতটা দুর্বার ছিল যার ফলে হিন্দুরা অচ্ছুতদের বিরুদ্ধে তাদের যেসব অস্ত্র ব্যবহার করেছিল সেগুলি মুসলমানদের জন্য ব্যর্থ দেখতে পেলো। হিন্দুরা তাদের পুরাতন দেবতাদের কেরামতি থেকে নিরাশ হয়ে কোনো নতুন দেবতার তালাশে ফিরছিল। নিজেদের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজনের জন্য তাদের কোনো কালী করালীর পরিবর্তে এমন শ্বেত দেবতার প্রয়োজন ছিল যে মুসলমানদেরকে হাতে পায়ে বেঁধে তাদের সামনে ফেলে দেবার ক্ষমতা রাখে।

প্রাচীন যুগে যখন তাদের শূদ্র বিনাশের প্রয়োজন অনুভূত হতো তখন ধরিত্রী মাতার বুক চিরে একাধিক হস্ত ও মুণ্ডধারীর স্বতস্ফূর্ত আবির্ভাব দেখা দিতো। তাদের কারোর নাক হতো হাতির শূঁড়ের চাইতে লম্বা। কারোর মাথায় চুলের জায়গায় সাপ কিলবিল করতো। আবার কারোর লেজ এত লম্বা হতো যে, ব্রাহ্মণ ও উচ্চ বর্ণের লোকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী 'রাক্ষশ' বা 'শূদ্র'রা ভয়ে আতংকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতো। কিন্তু এদেশে মুসলমানদের পদচারণার পর থেকে ধরিত্রী মাতা আর এ ধরনের দেবতাদের জন্ম দিচ্ছে না।

১৯৪৭ সালে একদিন এক বিদেশী দেবতা লণ্ডন থেকে হাওয়াই জাহাজে চড়ে দিল্লীতে এসে নামলো। এই দেবতার গায়ের রং ছিল সাদা। চেহারা সুরাতেও হিন্দু সমাজের ভয়াল দর্শন দেবতাদের থেকে সে ছিল আলাদা। তবুও মরণ ব্রত ও মৌন ব্রত পালনকারী মহাত্মাজীর চেলারা তাকে দেখতেই চিনতে পারলো যে, এ হচ্ছে সেই দেবতা ভারতমাতা দীর্ঘদিন থেকে যাকে তালাশ করে ফিরছিল। তার বাইরটা সাদা হলে কি হবে ভেতরটা এবং তার দিল সম্পূর্ণ কালো কালী করালীর চাইতেও কালো কুচকুচে। কালীর পূজারীদের এ সাদা দেবতা ছিল লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেন।

পাল্লার একদিকে যদি মাউন্ট ব্যাটেনের অপকর্ম এবং অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিগত সমস্ত অপরাধমূলক কার্যক্রম রাখা যায় তাহলে মাউন্ট ব্যাটেনের পাল্লা ভারী হবে। নরহত্যাকারীদের তালিকা প্রণয়ন করা হলে মাউন্ট ব্যাটেনের নাম থাকবে সবার উপরে। চেংগীজ ও হালাকু সর্বত্র খুন ও আগুনের পয়গাম নিয়ে যেতো কিন্তু মাউন্ট ব্যাটেন এসেছিল উপমহাদেশকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র উপহার দেওয়ার জন্য। চেংগীজ ও হালাকু এমন জাতির নেতা ছিল যারা আস্তিনের মধ্যে ছুরি লুকিয়ে রাখার শিল্প কৌশলের সাথে পরিচিত ছিল না। তারা হাতে রবাবের দস্তানা পরে মানুষের গলা টিপে ধরতো না। তারা নরহত্যা করতো এবং মৃতদের মাথার খুলির মিনার তৈরি করতো, যাতে ঐতিহাসিকরা তাদের সম্পর্কে ভুল ধারণা পোশন না করে। কিন্তু মাউন্ট ব্যাটেন ছিল বিশ শতকের একজন সুসভ্য নরহত্যাকারী। নরহত্যাকারীদের এমন একটি গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোশকতা করার দুর্ভাগ্য তাদের হয়েছিল যারা দীর্ঘকাল থেকে নিজেদের নিকৃষ্টতম অপকর্মগুলিকে সর্বোত্তম শব্দের মোড়কে ঢেকে রাখার প্রাকটিস করছিল। হিন্দু জাতির আধুনিক চিন্তাগর্বী সিপাহী মৃতের লাশের ওপর দাঁড়িয়েও একথা বলতে অভ্যস্ত হয়েছিল, 'আমি তোমাদের জন্য বন্ধুত্ব ও নিরাপত্তার পয়গাম নিয়ে এসেছি।'

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন বাহ্যত এসেছিল হিন্দুস্তানকে বিভক্ত ও ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য। কিন্তু মূলত তার মিশন ছিল মুসলিম গণহত্যার জন্য হিন্দুদের হাত মজবুত করা। এ উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য বেশি বেশি মুসলিম জনবসতিকে হিন্দুস্তানের এবং হিন্দুদের যতদূর সম্ভব কম জনবসতিকে পাকিস্তানের অন্তরভুক্ত করা জরুরী মনে করা হয়েছিল। কাজেই মাউন্ট ব্যাটেন উপমহাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির বিভক্তির পরিকল্পনাকে কেবল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি অর্থাৎ বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তি করণে পরিবর্তিত করে দিল। এই অন্যায় বিভক্তি কেবল পাকিস্তানকে তার সর্বোত্তম এলাকাগুলি থেকে বঞ্চিত করেনি বরং এই সংগে হিন্দুস্তানের মুসলিম ও পাকিস্তানের অমুসলিম সংখ্যালঘুদের ভারসাম্যও খতম করে দিল, যার বদৌলতে উভয় রাষ্ট্রে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত থাকার আশা করা গিয়েছিল। পাকিস্তান এলাকা থেকে প্রায় দেড়কোটি মুসলিম এবং প্রায় দুকোটি হিন্দু ও শিখ অধ্যুসিত এলাকা হিন্দুস্তানে শামিল করা হলো। মাউন্ট ব্যাটেনের এই বেইনসাফির ফলে মুসলমানরা কেবলমাত্র সাড়ে ছয়কোটি জনঅধ্যুসিত এলাকা লাভ করলো।

এই তিক্ত ঢোক গিলে ফেলার জন্য মুসলমানদের বাধ্য করা হলো। কিন্তু এটা ছিল সবেমাত্র সূচনা। এরপর এলো ক্ষমতা হস্তান্তরের পালা। মুসলমানদের এমন

রাষ্ট্র দেয়া হলো যার সীমানা তখনো নির্ধারিত হয়নি। তাদেরকে এমন হুকুমত দেয়া হলো যার অংশের সেনাবাহিনীকে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তখনো হিন্দুস্তানের বাইরে রাখা হয়েছিল। পাকিস্তানের অংশের সমস্ত অস্ত্র ও গোলা বারুদ হিন্দুস্তানে রেখে দেয়া হয়েছিল। এসব কিছু করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন হিন্দু ফ্যাসিবাদের সয়লাবের দরোজা উন্মুক্ত করার পূর্বে পাকিস্তানকে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে দিতে চাচ্ছিল না। যে পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হয় ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে অস্বাভাবিক তাড়াহুড়া করা ছিল তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

১৫ আগস্টের পূর্বে দিল্লীর আশপাশ থেকে শুরু করে অমৃতসর পর্যন্ত সমস্ত এলাকায় খুন ও আগুনের তুফান শুরু হয়েছিল। ১৫ আগস্টের পূর্বে পাতিয়ালা, নাভা, কাপুরথলা, ভরতপুর ও ইন্দোরের সেনাবাহিনী পূর্ব পাঞ্জাবে পৌঁছে গিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের দল হিন্দু রাজ্যগুলি থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করে, পাঞ্জাবের পথে পাড়ি জমিয়েছিল। অন্যদিকে সরকার পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলিম পুলিশকে নিরস্ত্র করছিল। অমৃতসরে মুসলমান কনস্টেবলদেরকে নিরস্ত্র করে তাদের ওপর গুলী বর্ষণ করার পর পূর্ব পাঞ্জাব সরকার কোন ধরনের শান্তি ও নিরাপত্তা চায় তার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়েছিল।

১৫ আগস্টের অনেক আগে শিখ, মহাসভা ও কংগ্রেসীদের ঐক্যজোট পাঞ্জাবের বাগিচায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। যদি মুসলমানদের হাত পা বেঁধে এই ফ্যাসিবাদী নেকড়েদের সামনে ফেলে দেয়া হয় তাহলে এর পরিণাম কি হবে মাউন্ট ব্যাটেন তা জানতো। ১৫ আগস্টের পূর্বে যদি পাকিস্তান তার অংশের সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে যেতো তাহলে পাঞ্জাবে শিখ, ডোগরা ও গুর্খা সেনাদলের হাতে মুসলমানদের গণহত্যা বন্ধ করার জন্য পাকিস্তানের আওয়াজ অতটা প্রভাবহীন প্রামাণিত হতো না। আর এস. এস-এর নেকড়েরা এবং হিন্দু ও শিখ রাজ্যগুলির সিপাহীরা পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলতো এবং পাকিস্তানের মুসলমানরা বসে বসে কেবল অশ্রুপাত করতো, এটা কোনোক্রমেই সম্ভব হতো না। কিন্তু লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন হিন্দুস্তানে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার যে সয়লাবের দরোজা খুলতে চাচ্ছিল তার পথের সমস্ত বাধা ও প্রতিবন্ধক দূর করাও জরুরী মনে করছিল। কেউ কেউ হয়তো একথা বলতে পারেন, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন যদি মুসলমানদের এতই দুশমন হয়ে থাকে তাহলে মুসলমানদের ল্যাংড়া লুলা পাকিস্তান দেবারই বা তার কি প্রয়োজন ছিল। লেবার মন্ত্রীসভার কার্যপদ্ধতি থেকে আমরা এর জবাব পেতে পারি। লেবার মন্ত্রীসভা হিন্দুস্তানের রাজনৈতিক সংগ্রামে তৃতীয় পার্টির পরিবর্তে একজন শালিসের অবস্থানে চলে গিয়েছিল। আর শালিস হিসাবে সে হিন্দুকে বেশি বেশি দিয়ে খুশি করতে চাচ্ছিল। হিন্দু চাচ্ছিল সারা হিন্দুস্তান। কিন্তু ইংরেজ নিজের বেয়নেটের আঘাতে দশকোটি মুসলমানকে জখমী ও বিজিত করে হিন্দুর পদতলে ফেলে দিতে প্রস্তুত ছিল না। এ অবস্থায় সে শালিসের পরিবর্তে হিন্দুর সাথে শামিল হয়ে এক

শক্তে পরিণত হতো। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন মুসলমানদের সামনে এমন এক আকৃতির পাকিস্তান পেশ করলো যা তাদের কল্পনায়ও কোনোদিন আসেনি আর এই সংগে হিন্দুকে খুশি করার জন্য তাকে এমন সব জরুরী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে ফেললো যাকে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট মনে করেছিল।[২]

১৫ আগস্ট দিল্লীতে হিন্দুস্তানের স্বাধীনতার সূর্য উদিত হলো। না, বরং ১৫ আগস্ট দিল্লীতে স্বাধীনতার আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হলো। তার জ্বালামুখগুলি ঘুরিয়ে দেয়া হলো সেদিকে যেদিকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা দূর্গের বুনিয়াদ রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। ১৫ আগস্ট ইংরেজ প্রস্তর যুগের বর্বরতা ও পাশবিকতাকে বিশ শতকের যুদ্ধাস্ত্রের ওপর সওয়ার করে দিল।

এরপর যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু পূর্ণ করে দিল র‍্যাডক্লিফের বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা। এখানেও মুসলমানরা ইংরেজের বিশ্বস্ততা ও সদিচ্ছার ওপর ভরসা করার শাস্তি পেলো। র‍্যাডক্লিফের কলম শতদ্রু ও বিপাশার তীরে থেমে না গিয়ে ইরাবতীর তীরে গিয়ে পৌঁছুলো। তার দৃষ্টিকোণ ছিল একশভাগ হিন্দু মহাসভার দৃষ্টিকোণ। শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্তী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি পাকিস্তানের অন্তরভুক্ত করা হলে পানি সেচ ও রেলওয়ে ব্যবস্থায় বিশৃংখলা সৃষ্টি হবার আশংকা ছিল। আবার যেহেতু অমৃতসরের দুটি তহশীলে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তাই সমগ্র অমৃতসর জেলা হিন্দুস্তানের অন্তরভুক্ত করা হলো। ৩ জুনের ফায়সালা অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ গুরুদাসপুর জেলা পাকিস্তানের অন্তরভুক্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু র‍্যাডক্লিফের ফায়সালা অনুযায়ী শক্কর গড় তহশীল বাদ দিয়ে তাকেও হিন্দুস্তানের অন্তরভুক্ত করা হলো। কারণ মাধবপুরের নহরগুলির ওপরও ভারতের নিয়ন্ত্রণ থাকা জরুরী মনে করা হয়েছিল, যেগুলি অমৃতসরের দুটি তহশীলের মোকাবিলায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের আড়াইটা জেলায় পানি সেচ করতো। আজনালা তহশীলে মুসলিম জনসংখ্যা হিন্দু ও শিখের সম্মিলিত জনসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ ছিল কিন্তু যেহেতু এটি হিন্দু ও শিখ সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা অমৃতসরের একটি অংশ ছিল তাই একে হিন্দুস্তানে শামিল করা হলো। লাহোর জেলায় ছিল মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং তার কাসুর তহশীলেও মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তা সত্বেও র‍্যাডক্লিফ সাহেব তার কিছু অংশ হিন্দুস্তানে শামিল করা সংগত মনে করলেন। শতদ্রু পারের ফিরোজপুর জেলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি হিন্দুস্তানের অন্তরভুক্ত করা হলো। কারণ এই এলাকাগুলি পাকিস্তানের সাথে থাকলে পাকিস্তানের কি লাভ হবে র‍্যাডক্লিফ সাহেব তা বুঝতে অক্ষম ছিলেন।

২. এ কারণে কায়েদে আযম অস্ত্র ও সেনাদল বিভক্ত করার আগে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধী ছিলেন। এর ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে তিনি মাউন্ট ব্যাটেনকে পূর্বাহ্নে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সতর্কবাণী 'অরণ্যে রোদন'-এ পরিণত হয়েছিল।

র‍্যাডক্লিফ নিজেই চোখ বন্ধ করে পাঞ্জাবের মানচিত্রের ওপর একটি দাগ কেটে দিয়েছিলেন অথবা এ দাগ কাটার সময় মাউন্ট ব্যাটেন তার হাত টেনে ধরেছিলেন, র‍্যাডক্লিফ নিজেই এ ফায়সালা লিখেছিলেন অথবা মাউন্ট ব্যাটেন প্রয়োজন অনুযায়ী ফায়সালা পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন? এ বিতর্কে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে আমাদের জন্য কেবলমাত্র এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন অনুযায়ী বেইনসাফী ও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল। পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম বাংলার পরে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তার হিন্দুস্তানী পূজারীদেরকে আরো একটি তোহফা দিতে চাচ্ছিলেন। এ নতুন তোহফাটি ছিল কাশ্মীর। যদি শতদ্রু নদীকে সীমানা হিসাবে চিহ্নিত করা হতো তাহলে হিন্দুস্তানের পথে শতদ্রু ও বিপাশা মাঝখানে একটি বিস্তৃত এলাকা এবং এরপর গুরুদাসপুর জেলা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতো। মাউন্ট ব্যাটেন তার ৩ জুনের ঘোষণায় শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্তী সমস্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হিন্দুস্তানের অন্তরভুক্ত করে দিয়েছিল। কাজেই এখন হিন্দুস্তানের পথের শেষ প্রস্তর খণ্ডটি ছিল গুরুদাসপুর জেলা। সম্ভবত চরম অক্ষমতার কারণে তিনি একে পাকিস্তানের অন্তরভুক্ত করেছিলেন। এই প্রস্তর খণ্ডটিকে হিন্দুস্তানের পথ থেকে হটিয়ে দেবার কাজটি সম্পন্ন করলেন র‍্যাডক্লিফ সাহেব।[৩]

যদি গুরুদাসপুর জেলা, আজনালা তহশীল ও বিপাশা পারের ফিরোজপুর জেলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি হিন্দুস্তানের অন্তরভুক্ত না করা হতো তাহলে এর চারটি ফলাফল দেখা দিতো। এক, বিপুল সংখ্যক শিখ পাকিস্তানে থেকে যেতো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করার সাহস তাদের হতো না। আর দাংগা শুরু হলে শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্তী সংখ্যালঘু এলাকার মুসলমানরা সাথে সাথেই সংখ্যাগুরু তহশীলগুলিতে আশ্রয় লাভ করতে পারতো। অমৃতসরের দুটি তহশীলে শিখেরা যদি কোনো বাড়াবাড়ি করার এরাদা করতো তাহলে তাদের আজনালা তহশীল ও গুরুদাসপুর জেলার শিখদের ওপর এর কি প্রভাব পড়বে সে কথা একবার চিন্তা করতে হতো।

এই ধরনের বিভক্তির দ্বিতীয় ফলাফল হতো, হিন্দু ফ্যাসিবাদ পূর্ব পাঞ্জাবে আগুন ও রক্তের সয়লাব প্রবাহিত করার পর কাশ্মীরের দিকে ধাবিত হতো না।

---

৩. গুরুদাসপুরের ব্যাপারে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সংকল্প কি ছিল তা অনুধাবন করা যায় তার ৪ জুনের পরের প্রেস কনফারেন্সে তিনি যে কথা বলেছিলেন তা থেকে। তিনি বলেছিলেন, কোনো এলাকায় একটি সম্প্রদায়ের সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সেটিকে হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানে শামিল করা অপরিহার্য নয়। এ জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি গুরুদাসপুরের নাম নিয়ে বলেছিলেন, সেখানে মুসলমানরা মামুলি সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী। প্রশ্ন হচ্ছে, মাউন্ট ব্যাটেনের দৃষ্টি কেবল গুরুদাসপুর জেলার ওপর পড়লো কেন? অমৃতসর, জালিন্ধর, ফিরোজপুর, হোশিয়ার পুরের ওপর পড়লো না কেন? সেখানে তো হিন্দুরা মামুলি সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী। মাউন্ট ব্যাটেনের নীতি ও যুক্তি অনুযায়ী কেবল পাঠানকোট তহশীল হিন্দুস্তানে পড়ে। কিন্তু তার বদলে পাকিস্তান দশটি তহশীল পেতে পারে। তবে আসলে এখানে মাউন্ট ব্যাটেন কোনো নীতি বা যুক্তির ধার ধারেননি, তাঁর মতলব কেবল একটিই। আর তা হচ্ছে, যে কোনো মূল্যেই হোক হিন্দুস্তানের একটি অংশ কাশ্মীরের সাথে মিলিয়ে দিতে হবে।

এর তৃতীয় ফল হতো, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে পাকিস্তান আরো বেশি মজবুত হতো।

চতুর্থত এর ফলে পূর্ব পাঞ্জাবের মাটিতে লাখো মুসলমানের রক্ত ঝরতো না এবং পাকিস্তানের ভিত নাড়িয়ে দেবার জন্য হিন্দুস্তান জখমী, নাংগা ও ভুখা মুহাজিরদের কাফেলা পাঠাবার কৌশলের মধ্যে নিজের বিজয় অনুভব করতো না।

কিন্তু এসব কথা হিন্দু পূজারী ও তাদের ইংরেজ দেবতার ইচ্ছা বিরোধী হতো।

১৪ ও ১৫ আগস্টের মাঝামাঝি রাতে মুসলমানদের গৃহে স্বাধীনতার শ্লোগান ও আনন্দধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছিল। রাত বারোটা এক মিনিটে স্বাধীন পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করলো। গ্রামের মুসলমানদের বাড়িতে বাড়িতে আলোক সজ্জা করা হচ্ছিল। কম বয়সের ছেলেমেয়েরা পটকা ফাটাচ্ছিল ও আতশবাজী করছিল। বড় মসজিদে জমায়েত হয়ে সবাই শোকরানার নামাজ পড়ছিল।

ঠিক রাত ১২টা এক মিনিটে সেলিম বাড়ির ছাদে উঠে পাকিস্তানের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিল। মজিদ তার পাশে দাঁড়িয়েছিল গ্যাস বাতি হাতে নিয়ে। নিচে বাইরের হাবেলীতে এবং মসজিদের সাথে খোলা জায়গায় সমবেত লোকেরা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিচ্ছিল।

অন্যান্য লোকদের নিয়ে চৌধুরী রহমত আলী মসজিদের বাইরে বের হয়ে এলেন। ইন্দর সিং দরোজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, ভাই মোবারক হোক। চৌধুরী রহমত আলী এগিয়ে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, ভাই তোমারও মোবারক হোক। পাকিস্তান আমাদের সবার দেশ।

গ্রামের অন্য শিখেরাও চৌধুরী রহমত আলী এবং অন্য সব মুসলমানদের মোবারকবাদ দিল।

চৌধুরী রহমত আলী বললেন, আসুন ভাই, সবাই বসে পড়ুন!

চৌধুরী রহমত আলীর সাথে বাইরের হাবেলীতে লোকেরা চারপাই ও চাটাইতে বসে পড়লো। কয়েকজন শিখকে একটু মনমরা মনে হচ্ছিল। কিন্তু ইসমাঈলের অট্টহাসি দ্রুত তাদেরকে তরতাজা করে তুললো। তারা অনুভব করতে লাগলো, এটা তাদের সেই আগের গ্রামই, এখানে কোনো কিছুই বদলায়নি।

একজন বললো, আরে চৌধুরী রমজান কোথায়?

ইন্দর সিং বললো, লছমন সিং যাও, তাকে নিয়ে এসো। তাকে ছাড়া মহফিল জমেই না।

লছমন সিং বললো, আজ সে আসবে না। আমি তাকে অনেক করে বলেছি।

ইসমাঈল বললো, কি করছে চৌধুরী জী?

লছমন সিং বললো, আমার বাড়ির দরোজায় পাহারা দিচ্ছে। সে বলছিল, যদি আজ কেউ বাড়িতে একটা কাঁকরও নিক্ষেপ করে তাহলে আমার নাক কাটা যাবে।

গোলাম হায়দর বললো, আজতো কিছু পরিবেশন করতে হবেই। রমজানের বাড়িতে যদি চোর ঢুকে পড়ে তাহলে সে টু শব্দও করবে না মনে হচ্ছে।

লছমন সিং বললো, কিন্তু ভাই, আমার বিশ্বাস আমার জন্য সে অবশ্যই লড়বে।

পীরাণ দাতা বললো, আচ্ছা আমি যাই, তাকে ধরে আনবো এখনই।

কাকু ঈসায়ী বললো, চলো আমিও যাচ্ছি।

লছমন সিং বললো, আরে ভাই হরিসিংকেও নিয়ে আসবে।

কাকু বললো, হরিসিং বাড়িতে নেই, কি জানি কোথায় গেছে!

রমজানের ব্যাপারে গ্রামের ছেলেদের আগ্রহ কম ছিল না কাজেই পীরাণ দাতা ও কাকুর সাথে কয়েকজন ছেলেও চললো।

হাবেলীর ফটকে একটি ছেলে পটকা ফাটালো। ইসমাঈল বললো, এখন পটকা ফাটাবে না। চৌধুরী রমজান ভয় পেয়ে যাবে।

ইন্দর সিং বললো, ভগবানের অশেষ কৃপা, আমাদের জেলায় কোনো দাংগা ফাসাদ হয়নি। শুনেছি গত কয়েক দিন থেকে অমৃতসরের অবস্থা খুবই খারাপ। চৌধুরী সাহেব, আপনি সেখানে সেলিমের বাগদান করেছেন। যতদিন সেখানে দাংগা ফাসাদ চলছে ততদিন তাদেরকে অন্তত এখানে এনে রাখতেন।

সেলিমের শ্বশুর সাহেব ছেলেমেয়েদেরকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজনালা তহশীলে দাংগার কোনো আশংকা নেই। তারপরও কোনো আশংকা দেখা দিলে এখানে নিয়ে আসা যাবে।

সাঁই আল্লাহ রাখ্‌খা বললো, চৌধুরী ভগত রামের ছেলে রামলাল সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে আমাদের জেলা পাকিস্তান থেকে বের হয়ে হিন্দুস্তানে চলে যাবে।

ভগতরাম বললো তার বলায় কি আসে যায়। সেলিমও তো বলতো, গোটা পাঞ্জাব পাকিস্তানের অন্তরভুক্ত হবে। কিন্তু ইংরেজ এর কয়েকটি জেলা হিন্দুস্তানকে দিয়ে দিল। কিন্তু এখন এ ঝগড়াই খতম হয়ে গেছে। ভাইসরয় তার ফায়সালা কেমন করে বদলাতে পারেন।

বেলা সিং বললো, চৌধুরী জী, পাকিস্তান সরকার সেলিমকে কোনো বড় পদ দিয়ে দেবেন এজন্য আমরা সবাই খুশী। সেলিম বললো, প্রথমে আমি এ গ্রামে স্কুল ও হাসপাতাল দেবো এবং রাস্তাঘাট অবশ্যই পাকা করতে হবে।

লছমন সিং বললো, ইয়ার! স্কুল হোক বা না হোক রাস্তাঘাট অবশ্যই পাকা হতে হবে। বর্ষাকালে রাস্তাঘাটের কাদায় আমার দুপায়ে হাজা হয়ে একদম পচন ধরে যায়।

রহমত আলী বললেন, আরে ভাই, এখন তো নিজেদের সরকার হবে। ইনশাআল্লাহ অনেক কিছু হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে কাকু ও পীরাণ দাতা চৌধুরী রমজানকে নিয়ে হাজির হলো। ইসমাঈল আগের মতো কথাবার্তা শুরু করে দিল। রমজান বলতে লাগলো, ইয়ার ইসমাঈল! দুনিয়া বদলে গেলো কিন্তু তুমি আর বদলালে না। ঠিক আছে, হেসে নাও, তবে কখনো রমজানকে স্মরণ করতে হবে, মনে রেখো।

আফজাল বললো, কোথায় যাবার ইরাদা করছো চৌধুরী?

না, বলছিলাম কি বুড়ো হয়ে গেছি এখন আর জীবনের ভরসা কি!

ইসমাঈল বললো, চিন্তা করো না চৌধুরী, আমাদের কবর পাশাপাশিই হবে!

শের সিং আলোচনার ধারা পরিবর্তন করার প্রয়োজন অনুভব করে সেলিমকে বললো, দেখো বেটা! আমি একথা মানি, আমাদের জেলার মুসলমানরা অনেক সংযম ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে কিন্তু সত্যি বলতে কি এখনো আমাদের গ্রামে এমন লোকও আছে যারা মনে করে মুসলমান কেবল ১৫ তারিখের ইন্তিজার করছে এবং পাকিস্তান হয়ে যাবার সাথে সাথেই তারা শিখদের ওপর হামলা করবে।

চাচাজী আজ রাত ১২টা পর্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল ইংরেজের ওপর। কিন্তু এখন এই জেলার শিখদের হেফাজতের দায়িত্ব পড়ছে পাকিস্তান সরকারের ওপর। আর মুসলমানরা মনে করে দাংগা হলে পাকিস্তানের দুর্ণাম হবে। তাছাড়া তখন আপনাদেরও একথা চিন্তা করা উচিত নয় যে, মুসলমানরা দাংগা করবে। যদি এই জেলার মুসলমানদের নিয়ত খারাপ হয়ে থাকবে তাহলে এতদিন পর্যন্ত তারা শিখদের গৃহের দরোজায় পাহারা দিল কেন? আমি তো মনে করি, আজকের পরে যদি হিন্দুস্তান সরকার নিজেই অসৎকর্মের প্ররোচণা না দেয় তাহলে অমৃতসরেও শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

আরে বেটা, আমাকে কি সান্ত্বনা দিচ্ছো, আমি তো জানি। আসলে আমি তাদেরকে সান্ত্বনা দিতে চাই যারা এখনো পেরেশান হয়ে আছে। আমি তো তোমাদের খুশিতে খুশি। তোমাদের বাড়ি আলোকসজ্জিত করেছো, আমার বাড়িতেও গিয়ে দেখো, আমি চারদিকে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছি।

চাচা, আপনি চিন্তা করবেন না, দুচার দিনেই সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারবে।

১৬ আগস্ট দিনের বেলা সেলিম ও মজিদ শহরে গিয়েছিল। তাদের অবর্তমানে থানার দারোগা কয়েকজন সিপাইসহ গ্রামে এসে সেলিমের দাদাকে বললো, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে, আপনি এলাকায় দাংগা বাধাবার মতলব আঁটছেন। আমি জানি এ অভিযোগ মিথ্যা তবুও অফিসাররা হুকুম দিয়েছেন যতদিন অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে না ততদিন পর্যন্ত আপনাদের বন্দুকগুলি আমাদের কাছে জমা রাখতে হবে।

সেলিমের দাদা একথা মেনে নিতে তৈরি ছিল না কিন্তু দারোগা বললো, যদি আপনি স্বেচ্ছায় বন্দুক জমা দিয়ে দেন তাহলে হিন্দু ও শিখেরা আপনাদের সদিচ্ছা সম্পর্কে আরো বেশি নিশ্চিন্ত হতে পারবে। অন্যথায় পুলিশ আপনাদেরকে বাধ্য করবে এবং হিন্দু ও শিখদের সন্দেহও বেড়ে যাবে।

চৌধুরী রহমত আলী সামান্য ইতস্তত করে আফজাল ও গোলাম হায়দারকে তাদের বন্দুক দারোগার হাতে সোপর্দ করার পরামর্শ দিলেন। চৌধুরী রহমত আলীর ভাই গোলাম নবীর ঘরেও একটি বন্দুক ছিল। দারোগা সেটিও ছিনিয়ে নিল। পুলিশ শহরের দিকে যাবার সময় পথে সেলিম ও মজিদের সাথে দেখা হলো। দারোগার ইশারায় তারা নিজেদের ঘোড়া থামালো। এক নজরেই পুলিশের গাঁঠারীতে বাঁধা তাদের বন্দুক তারা চিনে ফেললো।

মজিদের কোমরে পিস্তল দেখে দারোগা বললো, সরদার সাহেব, আপনাদের গ্রাম থেকে বন্দুকগুলি আমি সীজ করে নিয়ে এসেছি। আপনার জন্যও ভালো হবে যতদিন আপনি ছুটিতে আছেন আপনার পিস্তলটি আমাদের কাছে জমা রেখে দেবেন।

মজিদ রুঢ় স্বরে জবাব দিল, আমার পিস্তলের হেফাজত আমি নিজেই করতে পারবো।

কিন্তু আমাদের হুকুম দেয়া হয়েছে যারা কোনো সরকারী ডিউটিতে নেই তাদের কাছ থেকে অস্ত্র জমা নিয়ে নিতে হবে।

কিন্তু এখনো পর্যন্ত সম্ভবত সেনাবাহিনী পুলিশের হুকুমের অধীন নয়।

কিন্তু আপনি ছুটিতে আছেন।

আমি পাকিস্তান সেনাদলে আছি আর এ জেলাটিও সম্ভবত পাকিস্তানে পড়েছে। দারোগা সাহেব, আপনার পথে অন্য একটি গ্রামও পড়েছিল। আপনি আমাদের বন্দুকগুলি নিয়েছেন কিন্তু সেখানে গেলেন না কেন? যদি আপনার না জানা থাকে তাহলে আমি বলে দিচ্ছি, শেঠ রাম চাঁদের বাড়িতে ২টি বন্দুক আছে আর ক্যাপ্টেন বলবন্ত সিংও আমার মতো ছুটিতে এসেছে তার কাছে ১টি রাইফেল, ১টি শর্টগান এবং ১টি রিভলবার আছে। যদি তল্লাশী নেবার হিম্মত করেন তাহলে তাদের বাড়ি থেকে সম্ভবত আরো অনেক কিছু বের হবে।

আপনি আমাদেরকে ভুল বুঝেছেন। অফিসারদের হুকুম থাকলে আমরা তাদেরকেও ছেড়ে দিতাম না। অফিসারদের পলিসি হচ্ছে মুসলমানদের স্বতস্ফূর্তভাবে অস্ত্র জমা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে কিন্তু হিন্দু ও শিখদেরকে পেরেশান করা যাবে না। এমন করা হলে তারা মনে করবে তাদের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের মতলব ভালো নয়। আপনি একজন ফউজী। আপনার পিস্তল নিয়ে যেতে পারেন কিন্তু ওটা জমা করে দিলেই ভালো হতো।

যদি আমার জমা করার প্রয়োজন হয় তাহলে পুলিশের তুলনায় আমার রেজিমেন্টকেই আমি অগ্রাধিকার দেবো।

আচ্ছা আপনার মর্জি।

মজিদ প্রশ্ন করলো, এ বন্দুকগুলি আমরা ফেরত পাবো কবে?

যখন অফিসাররা হুকুম দেবেন।

পথে সেলিম মজিদকে বললো, মজিদ! আমার মন বড়ই অস্থির হয়ে উঠেছে। গতকাল আমাদের এলাকা থেকে মুসলমান দারোগাকে বদলি করা হয়েছে এবং শিখ হাবিলদার তার চার্জ নিয়েছে। এই থানা ইনচার্জ এই এলাকার আকালি দলের সভাপতি একথাও আমি জেনেছি। আগামীকাল অথবা পরশু বাউণ্ডারী কমিশনের রায় ঘোষিত হবে। বন্দুকগুলি পুলিশের হাওয়ালা করার ব্যাপারে বিরাট ভুল করা হয়েছে।

গুরুদাসপুর জেলার যে সব মুসলমান ১৫ আগস্ট সকালে নিজেদের বাড়ির ছাদে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেছিল দুদিন পরে তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছিল, এখন কি হবে?

রেডিও বাউণ্ডারী কমিশনের ফায়সালা শুনিয়ে দিয়েছিল। এই ফায়সালার পর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পুলিশ বিভাগের সমস্ত মুসলমান কর্মচারীকে নিরস্ত্র করা হয়েছিল।

বাউণ্ডারী কমিশনের ঘোষণা শুনে মুসলমানরা হতভম্ব হয়ে গেলো। বিশেষ করে গুরুদাসপুর জেলার মুসলমানদের যারাই রেডিওতে এ ঘোষণা শুনলো তারাই অবাক হয়ে গেলো। নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না। দূর-দূরান্তের গ্রামবাসীরা একে একটি মজার গুজব মনে করলো। তারা বলতে লাগলো, এটা হতে পারে না, অসম্ভব ব্যাপার। তারা তাদের শিখ প্রতিবেশীদের বুঝাবার চেষ্টা করেছিল ভাইয়েরা, এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা, রেডিও মনে হয় কোনো গুজবের কথাই বলেছে। ঘোষণার পরদিন সেলিম তাদের বাড়ির একটি কামরায় বসেছিল। সারারাত জেগে থাকা এবং অস্থিরতা ও মানসিক পেরেশানির ফলে চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছিল। মা বাইরের কামরায় শোকার্ত কণ্ঠে বললেন, বেটা, কিছু খেয়ে নাও, তুমিতো কাল রাতেও কিছু খাওনি।

আম্মী, আমার খিদে নেই।

অতি দুঃখের মধ্যেও মুখে একটু হাসির রেখা টেনে মা বললেন, বেটা তুমি বলতে, আজনালা তহশীল এবং আমাদের জেলা দুটোই পাকিস্তানে পড়বে। তোমার আব্বাজানও একথাই বলতেন। ডাক্তার শওকত সাহেবের চিন্তাও প্রায় একই ধরনের ছিল। তিনি বলেছিলেন, সীমানা নির্ধারণের পরই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং

পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি নিজে এসে তোমাদের বিয়ের তারিখ ধার্য করে যাবেন। কিন্তু এখন মজিদ বলছে, শিখরা দাংগা থেকে বিরত হবে না। বেটা, এখন কি হবে? তারা আমাদের বন্দুকগুলিও নিয়ে গেছে। গতকাল তোমার আব্বাজানের আসার কথা ছিল। তিনিও এলেন না। হয়তো আজ এসে পড়বেন। গাড়ি এসে গেছে মনে হচ্ছে।

আম্মী, সমস্ত গাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে।

বেটা, তিনি আসতে না পারলে নিশ্চয়ই টেলিগ্রাম করে দিতেন।

আম্মী, এখন টেলিগ্রাম আসতে পারবে না।

মজিদ দৌড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। সেলিম এসো, সে কম্পিত স্বরে বললো।

সেলিম আচানক উঠে দাঁড়ালো। মা আতংকিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, বেটা! কি ব্যাপার? খবর ভালো তো?

না, কিছু নয় চাচীজান, সেলিমকে একজন লোক ডাকছে।

সেলিম মজিদের সাথে বাইরে বের হয়ে এলো। মা আবার বললেন, দাঁড়াও বেটা, আমাকে বলে যাও। সেলিম দাঁড়ালো কিন্তু মজিদ তার বাহু ধরে টেনে নিয়ে বের হয়ে গেলো।

বাইরে আফজাল ঘোড়ার পিঠে জিন চড়াচ্ছিল। তার চেহারায়ও পেরেশানির চিহ্ন। সে বললো, মজিদ! তোমার আল্লাহর দোহাই বলো, কি হয়েছে?

মজিদ এদিক ওদিক দেখে নিয়ে বললো, খুব খারাপ খবর। চাচাজান ফৌজী ট্রাক থেকে নেমে গ্রামের দিকে আসছিলেন। ষ্টেশনের কাছাকাছি শিখদের একটি দাংগাবাজ দল তাঁর ওপর হামলা করে। তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন কিন্তু মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে।

তোমাদের একথা কে জানালো?

ফজ্জু পাহলোয়ান খবর এনেছে।

আফজাল দুটি ঘোড়ার পিঠে জিন বেঁধে দিয়েছিল। তৃতীয়টির মুখে লাগাম লাগাতে যাচ্ছিল। সেলিম দ্রুত এগিয়ে গিয়ে একটি ঘোড়ার লাগাম হাতে নিল। মজিদ দ্বিতীয় ঘোড়াটির লাগাম হাতে নিতে নিতে বললো, চাচাজান! আল্লাহর দোহাই, আপনি এখানে থাকেন। আমি ও সেলিম ফজ্জুকে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি। তার মাধ্যমেই খবর পাঠিয়ে দেবো। আমাদের গ্রামের ওপর যে কোনো সময় হামলা হতে পারে। তাই আপনার এখানে থাকা একান্ত জরুরী। এই নিন আমার পিস্তল। আমার আলমারীতে আরো পঞ্চাশটি গুলী আছে। প্রয়োজন হলে আম্মীজান আপনাকে সব বের করে দেবেন। আপনি গ্রামের সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করেন।

আফজাল গভীর বেদনার্ত কণ্ঠে বললো, আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি না। তবে ফজ্জুকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো।

মসজিদের কাছে জামগাছতলায় রহমত আলী ও ইসমাঈল ফজ্জুর সাথে কথা বলছিল। আফজাল বললো, ফজ্জু ভাই! তুমি এদের সাথে যাবে এবং ফিরে এসে আমাদের খবর জানাবে।

রহমত আলী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, আমাকে যেতে দাও।

আফজাল বললো, না, আপনি ঘরে চলুন। আমাদের এখন শুধু আপনার দোয়ার প্রয়োজন। শেঠ রামচান্দের গ্রামে শিখেরা একত্র হচ্ছে। আমাদের গ্রাম থেকেও কিছু শিখ সেখানে চলে গেছে। শের সিং আমার সাথে ওয়াদা করে গিয়েছিল, সেখানে যদি সে ক্ষতিকর কোনো কিছু ঘটার আশংকা দেখে তাহলে আমাদের খবর দিয়ে যাবে কিন্তু সে এখনো এলো না।

ইতিপূর্বে মহেন্দর সিংদের গ্রামের যে বাগানে সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের বক্তৃতানুষ্ঠান হয়েছিল সেখানে আবার একটি জলসা হচ্ছিল। কৃপাণ ও বর্শা সজ্জিত প্রায় এক হাজার শিখের একটি বাহিনী গাছের ছায়ায় বসে শেঠ রামচন্দের বক্তৃতা শুনছিল। আট দশ জনের হাতে বন্দুক ও রাইফেল ছিল। শেঠ রামচান্দ বললেন, আমার শিখ ভাইয়েরা! তোমরা পাঞ্জাবের শের গুরু গোবিন্দ সিংয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করো না। পাঞ্জাবের কয়েকটা জেলা তোমরা পেয়ে গেছো এতেই তোমাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। ভাইয়েরা আমার! মুসলমানরা পাকিস্তান পেয়ে গেছে। তোমাদের খালিস্তান এখনো হয়নি। কংগ্রেস এই প্রদেশের কয়েকটি জেলা তোমাদের দিয়েছে মাত্র। এখন এই এলাকাকে খালিস্তান বানানো হবে তোমাদের কাজ। তোমাদের কৃপাণই এই এলাকাকে খালিস্তানে পরিণত করতে পারে। তোমরা যে সময়টির ইন্তিজার করছিলে সেটি এসে গেছে। তোমাদের আটক পর্যন্ত চলে যেতে হবে। পূর্ব পাঞ্জাবে তোমাদের সেইসব লোকদের মেরে-কেটে সাফ করে ফেলতে হবে যারা বিপদের সময় তোমাদের পিঠে ছুরি বসিয়ে দেবে। আওরংগজেব থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত মুসলমানরা তোমাদের দুশমন হয়ে আসছে। পূর্ব পাঞ্জাবে যদি মুসলমানরা টিকে যায় তাহলে মনে রেখো সারা পাঞ্জাব তো দূরের কথা তোমরা সেই অংশটিকেও খালিস্তান বানাতে পারবে না যেটি তোমরা ইতিপূর্বে পেয়ে গেছো। তোমাদের নেতা মাস্টার তারা সিং বলেছেন, শিখেরা খাইবার পাসে নিজেদের পতাকা উড়িয়ে তবেই ক্ষান্ত হবে। যে দলের নেতা বাহাদুর সে দল বুজদিল হতে পারে না।

মুসলমানরা পাকিস্তান চেয়েছিল। তাদের পাকিস্তান হয়ে গেছে। কাজেই তাদেরকে সেখানে পাঠিয়ে দাও। পূর্ব পাঞ্জাব থেকে ষাট সত্তর লাখ মুসলমান যখন সেখানে পৌঁছে যাবে তখন পাকিস্তানের শিক্ষা হবে। বাহাদুর শিখেরা! হিম্মত করো। এখন পুলিশ তোমাদের। ফউজ তোমাদের। হুকুমও তোমাদের। কিন্তু তোমাদের

জিম্মায় যে কাজ দেয়া হয়েছে সেটা তোমাদেরকেই করতে হবে। যদি তোমরা হামলা না করো তাহলে অন্য কোনো দল রহমত আলীর বাড়ি থেকে সবকিছু নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা কেবল মুখ হাঁ করে দেখতেই থাকবে।

এরপর চরণ সিং বক্তৃতা করলো ঃ

গুরুজীর শিখেরা! আমাদের দলনায়ক ওয়াদা করেছিল ঠিক দশটায় এখানে পৌঁছে যাবে আর এখন এগারোটা বেজে গেছে। আমরা মনে করেছিলাম আমাদের পাতিয়ালার সেনাদলের সাহায্যের প্রয়োজন হবে। কিন্তু এখন এখানে এত লোক এসে গেছে যার ফলে রহমত আলীর গ্রামের মুসলমানদের দেহের এক একটা টুকরাও আমাদের প্রত্যেকের ভাগে পড়ে কিনা তাও সন্দেহ। আমাদের হাতে বন্দুকও অনেকগুলি এসে গেছে। অন্যদিকে ওদের বন্দুকগুলি আমি দুদিন আগে নীজ করার ব্যাবস্থা করে ফেলেছিলাম। এর চেয়ে ভালো সুযোগ আমরা আর পাবো না। রহমত আলীর, তার ভাইদের ও তাদের সন্তানদের এই এলাকার মুসলমানদের ওপর বিরাট প্রভাব আছে। তারা যদি আমাদের ইরাদা জানতে পারে তাহলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে হাজার হাজার মুসলমানকে তারা একত্র করে ফেলতে পারবে। কিন্তু মুসলমানদের হুশিয়ার হবার আগেই যদি আমরা এ গ্রামটি কবজা করে ফেলতে পারি তাহলে এই এলাকার মুসলমানদের কোমর ভেঙে যাবে। আমার মতে আমাদের দলনায়কের আসার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। সম্ভবত তিনি অন্য কোনো গ্রাম আক্রমণ করতে চলে গেছেন।

একজন শিখ বললো, এই গ্রামেও তো আট দশ ঘর মুসলমান আছে, আগে তাদেরকে সাবাড় করে দেয়া হচ্ছে না কেন?

রামচান্দ উঠে জবাব দিল, এরা তো আমাদের কলসীর মাছ। এদেরকে সাবাড় করতে কতক্ষণ? আর এরা পালাবেই বা কোথায়? কিন্তু আপনাদের প্রথমে রহমত আলীর গ্রামকে ধরতে হবে। নয়তো তারা সতর্ক হয়ে যাবে।

আর একজন শিখ বললো, দেখো ভাই আমরা মুসলমানদের সাথে লড়তে প্রস্তুত আছি কিন্তু আমাদের শিখ ভাইদের সাথে লড়বো না। রহমত আলীর গ্রামের কয়েক ঘর শিখ মুসলমানদের তরফদারী করছে। হামলা করার আগে আমাদের তাদের মনোভাব জেনে নেয়া উচিত।

হরি সিং কর্মকার দাঁড়িয়ে বললো, আমাদের গ্রামের বিশজন শিখ এখানে উপস্থিত আছে। আপনারা হামলা শুরু করলে বাকি শিখেরাও আমাদের সাথে যোগ দেবে। আমরা কেবল ইন্দর সিং ও তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে আশংকা অনুভব করছিলাম। তবে তাদের ব্যবস্থা আমরা করে ফেলেছি। ইন্দর সিংয়ের দুই ছেলে আমাদের সংগে আছে। শের সিংকে আমরা অতিরিক্ত মদপান করিয়ে একেবারে বেহাল অবস্থা করে দিয়েছি। সে এখন রামচান্দের বৈঠকখানার পাশে গাছের নিচে বেহুশ হয়ে পড়ে আছে। অন্যদিকে ইন্দর সিং লাঠিতে ভর দিয়ে ছাড়া চলতে পারে না। এখন থাকে শের সিংয়ের বেটা। প্রথমত সে তার চাচাদের

বিরুদ্ধাচরণ করে মুসলমানদের সাহায্য করবে না। আর যদি সে বিরত না হয় তাহলে আমরা মনে করবো মুসলমানদের মতই সেও দুশমন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যথা সময়ে সে আমাদের সাথেই থাকবে। আমাদের গ্রামের মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ আপনারা আর পাবেন না। গুরুদাসপুর হিন্দুস্থানে চলে গেছে গতকাল থেকে এ খবর শুনে তারা কান্নাকাটি করছে। এখন তাদের কোন হুশ নেই। কিন্তু আগামীকাল পর্যন্ত সম্ভবত অন্যগ্রামের মুসলমানরা সেখানে এসে যাবে। আপনারা নিশ্চয়ই একথা শুনেছেন আলী আকবর মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে।

রামচান্দ দাঁড়িয়ে বললো, সরদারগণ! আমি চাচ্ছি ওখান থেকে যা কিছু পাবেন সেগুলি আপনাদেরই থাকবে। এখন জলদি করুন আগামীকাল পর্যন্ত অন্য কোনো দল এখানে পৌছে গেলে তারাও ভাগ বসাবে। রহমত আলীর বাড়িতে কেবল ধনদৌলতই নেই আরো অনেক কিছু আছে। আমাদের এলাকার জিনিস আমাদের এলাকায়ই থাকা উচিত।

মহেন্দর সিং আচানক এগিয়ে এলো। লোকদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো, আমার শ্রদ্ধেয় মুরব্বী ও প্রিয় ভাইয়েরা! আজ আপনারা অনেক বড় ফায়সালা করতে যাচ্ছেন। আমি আপনাদের এটা করেন এবং ওটা করবেন না একথা বলবো না। আপনারা যদি হামলা করার ফায়সালা করে থাকেন তাহলে আপনাদের বাধা দেবো না কিন্তু আমার কথা অবশ্যই শুনতে হবে।

রামচান্দ চরণ সিংকে চোখের ইশারা করলো এবং বললো, না, এখন আর কথা বলার সময় নেই। এমনিতেই আমাদের অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমরা ফিরে এসে তোমার কথা শুনবো। বলো, সতশ্রী আকাল!

কিছুক্ষণ পর্যন্ত 'সতশ্রী আকাল' শ্লোগান চারদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

মহেন্দর সিং হাত উঁচু করে বলতে লাগলো, ভাইয়েরা! তোমাদের গুরুগ্রন্থের কসম, আমার কথা শুনে যাও। আমি যদি কোনো ভুল বলে থাকি আমাকে যে কোনো শাস্তি দাও আমি মাথা পেতে নেবো। তিন মাস আমি মুসলমানদের দিয়ে তোমাদের বাড়িঘরের পাহারা দেবার ব্যবস্থা করেছি। আমি তোমাদের দুশমন নই। আর আমি যদি তোমাদের দুশমন হই তাহলে শেঠ রামচান্দ তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। ভাইসব! আমার কথাগুলি শোনো তারপর যদি তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকো তাহলে আমি মুসলমানদের ওপর হামলা করার ব্যাপারে সবার আগে থাকবো।

যারা উঠে দাঁড়িয়েছিল তারা বসে পড়লো আর যারা শোরগোল করছিল তারা ধীরে ধীরে খামুশ হয়ে গেলো। মহেন্দর সিং নিশ্চিন্তে বক্তৃতা শুরু করলো। সে বললো, গুরু গোবিন্দের ভক্তবৃন্দ! আজ পর্যন্ত তোমরা এ কথা একবার চিন্তা করোনি যে, মুসলমানরা পাকিস্তান পেয়ে গেছে হিন্দুরা হিন্দুস্তান পেয়ে গেছে কিন্তু তোমরা

কি পেয়েছো? তোমরা কখনো আমার কথায় কান দাওনি। কিন্তু সেদিন বেশি দূরে নয় যখন তোমরা আমার মতো চিন্তা করবে। হিন্দুরা আমাদের সাথে ওয়াদা করেছিল তারা হিন্দুস্তানকে বিভক্ত হতে দেবে না। কিন্তু তারা বিভক্তি মঞ্জুর করে নিয়েছে। কেবল হিন্দুস্তানের বিভক্তি নয়, তারা পাঞ্জাবকেও বিভক্ত করেছে। এর এক অংশ চলে গেছে মুসলমানের হাতে এবং অন্য অংশ হিন্দুর হাতে। আমাকে বলো, আমরা কি পেলাম? যদি হিন্দুস্তান অখণ্ড থাকতো তাহলে তাতেও লাভ হতো হিন্দুর। এ অবস্থায় শিখ ও মুসলমান উভয়ই হতো হিন্দুর গোলাম। মুসলমান বুদ্ধিমান ছিল, তারা নিজেদের অংশ কেড়ে নিয়েছে।

গুরুজীর দোহাই, তোমরা চিন্তা করো! পাঞ্জাবে মুসলমানদের অংশ মুসলমানরা নিয়ে গেছে। কিন্তু তোমাদের অংশ কোথায় গেলো? আমাকে জবাব দাও। খালসা হয়ে গেলে কেন? তোমাদের কাছে এ প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। শেঠ রামচান্দ এ প্রশ্নের জবাব জানেন। কিন্তু তিনি বলবেন না। কোনো হিন্দু তোমাদের এ কথার জবাব দেবে না। কারণ পাঞ্জাবে তোমাদের যে অংশ ছিল হিন্দুস্তানের হিন্দুরা তা দখল করে নিয়েছে। এখন তোমরা তাদের কাছে তোমাদের অংশ চাও এটা তারা চায় না। তাই তোমাদের দৃষ্টি যাতে সেদিকে আকৃষ্ট না হয় শেঠ রামচান্দ সেটিই চাচ্ছেন। তিনি তোমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন, প্রথমে তোমরা পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদের হত্যা করো এবং তারপর পাকিস্তান আক্রমণ করে আটকের দিকে এগিয়ে চলো। তাহলে তোমরা খালিস্তান পেয়ে যাবে। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছি পাঞ্জাব বিভক্তির পরে যে জেলাগুলি পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গেছে সেগুলি আমাদের, না হিন্দুদের?

'সেগুলি আমাদের।' কয়েকজন শিখ একযোগে বললো।

ভাইয়েরা, তোমরা ঠিক বলেছো। এগুলি আমাদের জেলা। এ হচ্ছে আমাদের খালিস্তান। এখানকার বাসিন্দারা আমাদের প্রজা। আমাদের প্রজাদের সাথে যেমন ব্যবহার করা ন্যায় সংগত তাদের সাথে আমরা ঠিক তেমনই ব্যবহার করবো। কিন্তু হিন্দু আমাদের মুসলমানদের হত্যা করার পরামর্শ দিচ্ছে কেন? এর কারণ হচ্ছে, আমরা মুসলমানদের সাথে লড়াই শুরু করে দেবো আর এই অবসরে হিন্দুরা নির্বিঘ্নে পূর্ব পাঞ্জাব হজম করে ফেলবে। ভাইসব! তোমরাই মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে চাইলে আমি তোমাদের বাধা দেবো না। কিন্তু তার আগে পাঞ্জাবের এ পূর্ব অংশ তোমাদের খালিস্তান এবং এর ওপর হুকুমত করার কোনো অধিকার হিন্দুর নেই এ স্বীকৃতি হিন্দুর থেকে আদায় করে কংগ্রেসের লীডারদের বলো, প্রথমে তারা খালিস্তানের ঘোষণা দিক তারপর মুসলমানদের সাথে আমরা বুঝাপড়া করবো। যদি মুসলমানরা শিখদেরকে পাকিস্তান থেকে মেরে ভাগিয়ে দেয় তাহলে আমরাও তাদেরকে মেরে খালিস্তান থেকে ভাগিয়ে দেবো। যদি তারা শিখদের সাথে ভালো ব্যবহার করে তাহলে আমরাও খালিস্তানে মুসলমানদের সাথে ভালো ব্যবহার করবো।

চরণ সিং বললো, ভাইসব! এ ব্যক্তি মুসলমানদের দলে ভিড়ে গেছে। এর কথা শুনবে না।

মহেন্দর বললো, সরদারজী। আমি মুসলমানদের দলে ভিড়ে যাইনি কিন্তু আমি হিন্দুদের ক্রীড়নকও হতে চাই না। হিন্দুরা প্রথম থেকে একথা ভাবছিল আমরা মুসলমানদের পাকিস্তানের মতো খালিস্তান না বানিয়ে ফেলি তাই বড়ই বুদ্ধিমত্তার সাথে তারা আমাদেরকে মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করে দিয়েছে এবং খালিস্তান থেকে আমাদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দিয়েছে। আমাদের নেতারা খালিস্তানের শ্লোগান দিলেন কিন্তু যখন সময় এলো তখন ভারত বিভক্তির বিরোধিতাকারীদের সাথে মিশে গেলো। ফলে খালিস্তান বানাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাবার পরিবর্তে আমরা এমন লোকদের সহযোগী হলাম যারা সমগ্র হিন্দুস্তানকে তাদের জায়গীর মনে করতো।

ভাইসব! আজ হিন্দুরা তোমাদের পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে আবার আগামীকাল তোমাদের পিঠ থাপড়ে বলবে যাও এগিয়ে যাও এবং পাকিস্তানের ওপর হামলা করো। আমরা যদি পাকিস্তানের কিছু এলাকা ছিনিয়েও নেই তারপরও তারা পূর্ব পাঞ্জাবের মতো সেগুলিকেও হিন্দুস্তানের অন্তরভুক্ত করে নেবে। আর আমরা নিহত হলেও তারা খুশি হবে কারণ তাহলে খালিস্তানের দাবীদারদের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে।

ওরা চায় পাকিস্তান আবার হিন্দুস্তানে শামিল হয়ে যাক। কিন্তু ওরা নিজেরা লড়াই না করে তোমাদেরকে কুরবানীর বকরা বানাতে চায়। আজো বাইরের অবস্থা দেখো, মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের অন্য নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান ও বিশ্ববাসীর কাছে নিজেদেরকে সাচ্চা প্রমাণ করার জন্য মুসলমানদের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন ব্যবহার ও আলাপ করছেন কিন্তু শিখদেরকে পর্দান্তরালে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন।

আমি স্বীকার করছি তোমরা পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলমানদেরকে বের করে দিতে সক্ষম হবে। তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে যাদেরকে গ্রন্থ সাহেব ও গো-মাতার গাত্র স্পর্শ করে তোমরা বন্ধুত্বের নিশ্চয়তা দিয়েছিলে। হিন্দুরা নিজেরা যে বন্দুক চালাতে পরে না তা রেখে দিয়েছে তোমাদের কাঁধে। কিন্তু তোমরা পাকিস্তানে বসবাসকারী শিখদের কথাও চিন্তা করেছো কি? যে সব মুসলমানকে তোমরা এখান থেকে বের করে দেবে তারা কি পাকিস্তানে পৌছে শিখদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে না?

একজন শিখ উঠে বললো, আমরা কোনো একজন মুসলমানকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে দেবো না এবং তারপর পাকিস্তানের শিখদের হেফাজতের জন্য আমরা সেখানে পৌছে যাবো।

শিখেরা হৈ চৈ ও চিৎকার করতে লাগলো, 'আমরা ওখানে পৌছে যাবো। ওখানে পৌছে যাবো। সতশ্রী অকাল। বাহবা, গুরুজীর খালসা! বাহবা, গুরুজীর জয়!'

মহেন্দর চিৎকার করে উঠলো, ভাইয়েরা আমার! আমি তোমাদের পথ রোধ করবো না। কিন্তু আমার কথা শেষ করতে দাও। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছি। এখানে কোনো মুসলমান নেই। শোনো, মাস্টার তারা সিং যখন অমৃতসরে দাংগা বাধিয়েছিলেন তখন আমরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করেছিলাম। অমৃতসরে আমরা ভালোভাবে প্রস্তুত ছিলাম। মাস্টার তারা সিংয়ের ধারণা ছিল তিনি একদিনে অমৃতসর জয় করে লাহোরে পৌছে যাবেন। কিন্তু তার ফল কি হলো? পাঞ্জাবে আমাদের যে প্রতাপ প্রতিপত্তি ছিল তাও খতম হয়ে গেলো। আজ হিন্দুরা আমাদের সান্ত্বনা দিচ্ছে, পুলিশ, ফউজ ও মিত্ররাজ্যগুলির সিপাহী আমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু এটা চিন্তার বিষয়, পূর্ব পাঞ্জাবে যদি আমরা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্য ছাড়া নিরস্ত্র মুসলমানদের হত্যা করতে না পারি তাহলে এরপর আমরা পাকিস্তানের ওপর হামলা করবো কেমন করে? যদি পাকিস্তানের ওপর হামলা করার জন্য হিন্দুস্তানের সেনাবাহিনী আমাদের সাথে সহযোগিতা করে তাহলে এটা একটা রীতিমত যুদ্ধে পরিণত হবে এবং সেটা হবে হিন্দু-পাক যুদ্ধ। হিন্দু এ যুদ্ধে সফল হলে তাদের অখণ্ড ভারত বানাবে কিন্তু এতে শিখদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়ে যাবে এবং এর পর খালিস্তান দাবী করার হিম্মত তোমাদের মধ্যে থাকবে না। অখণ্ড ভারতের পথে খালিস্তানকে শেষ কাঁটা বিবেচনা করে তারা একে দলিত মথিত করে দেবে। আর যদি হিন্দু একবার আন্দাজ করতে পারে যে, পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে তারা ভুল করেছে তাহলে সংগে সংগেই তারা সন্ধির প্রস্তাব দেবে এবং যুদ্ধের সমস্ত দায় দায়িত্ব শিখদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে।

ভাইয়েরা আমার! তোমরা কখনো আমার কথা স্মরণ করবে। যদি মুসলমানরা বিজয় লাভ করে তাহলেও আমরা মার খাবো। কারণ তারা আমাদের থেকে পূর্ব পাঞ্জাবের পূর্ণ প্রতিশোধ নেবে। আর যদি হিন্দুরা জয়লাভ করে তাহলেও তারা কখনো আমাদের খালিস্তান বানাতে দেবে না। আজ তাদের ফউজ ও পুলিশ মুসলমানদের হত্যা করার জন্য তোমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে কিন্তু কাল যখন তোমরা খালিস্তানের নাম উচ্চারণ করবে তখন এরাই তোমাদের হাতে হাতকড়ি পরাবার জন্য এগিয়ে আসবে। আজ নিজেদের স্বার্থের জন্য হিন্দুরা মাস্টার তারা সিংয়ের গলায় ফুলের মালা পরাচ্ছে কিন্তু আগামীকাল দেখবে এই হিন্দুরাই তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে। সে সময় বিদ্রোহ করার সাহস তোমাদের থাকবে না। তোমরা কেবল মুসলমানদের সাথে মিলেই খালিস্তান বানাতে পারতে। কিন্তু এই হিন্দুরা একদিকে তোমাদের খালিস্তানও দখল করে নিয়েছে অন্যদিকে তোমাদেরকে মুসলমানদের সাথে সংঘাতেও লিপ্ত করে দিয়েছে, এটাই তাদের কামিয়াবী।

ভাইসব! সাহসী বীর পুরুষরা কারোর উপকারের জবাব এভাবে দেয় না। আজ তোমরা যাদের ওপর হামলা করতে চাচ্ছো তারা দিনরাত আমাদের বাড়িঘর পাহারা দিয়েছে। আমাদের মা বোনদের সাথে তারা নিজেদের মা বোনদের মতো ব্যবহার করেছে। চৌধুরী রহমত আলীর পরিবার কোনো মুসলমানকে এই

এলাকায় উৎপাত করার সুযোগ দেয়নি। গুরুদাসপুরকে পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত করার কথা যেদিন ঘোষিত হয়েছিল সেদিন আমরা আশংকা করছিলাম মুসলমানরা তাদের ওয়াদা ভংগ করবে কিন্তু না, তারা নিজেদের ওয়াদা পালন করেছে। আজ এ জেলাটি আমরা পেয়েছি। আমাদের প্রমাণ করতে হবে শিখেরা সৎকাজের বদলে অসৎকাজ দেয় না। যদি তোমরা চাও তারা এখানে না থাকুক তাহলে তাদের এখান থেকে বের হয়ে যাবার সুযোগ দাও। এই বাগানেই শান্তি কমিটির সভা হতো, এখানেই সরদার চরণ সিং গ্রন্থ সাহেব এবং শেঠ রামচান্দ গোমাতার গায়ে স্পর্শ করে শপথ করেছিলেন। নিজেদের সেই শপথগুলি স্মরণ করুন। অথচ আজ তাদের ওপর হামলা করতে চাচ্ছেন। তাহলে কিছুদিন অপেক্ষা করুন। পাকিস্তানের মুসলমানরা পশ্চিম পাঞ্জাবে আমাদের শিখ ভাইদের সাথে কি ব্যবহার করে দেখুন।

চরণ সিং বললো, এক ব্যক্তির কারণে আমরা পন্থের ফায়সালা রদ করতে পারি না। আজ সমস্ত পাঞ্জাবে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। যদি আমরা বসে থাকি তাহলে পন্থকে মুখ দেখাবো কেমন করে। যদি আমরা দুশমনদের সুযোগ দেই তাহলে তারা নিজেদের ধনদৌলত সবকিছু বের করে নিয়ে চলে যাবে। আজ পর্যন্ত রহমত আলীর পরিবার কোনো শরাবীকে তাদের গ্রামের পথের মাটি মাড়াবার অনুমতি দেয়নি। কিন্তু আজ আমরা তার বউ বেটিদের হাতেই শরাব পান করবো।

মহেন্দর চিৎকার করে উঠলো, তার বউ বেটিদের নাম উচ্চারণ করবেন না। তারা হামেশা আমাদের মা-বোনদেরকে নিজেদের মা-বোন মনে করেছে। যে আগুনে একটা বাড়ি পুড়বে তা অন্য বাড়িগুলিকেও পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে। অন্যের বউ বেটির প্রতি সেই ব্যক্তিই কুদৃষ্টি দেয় যাদের নিজের বউবেটির ইজ্জত আবরুর পরোয়া নেই।

চরণ সিং ক্রোধে অগ্নি শর্মা হয়ে নিজের পিস্তল বের করলো এবং সোজা মহেন্দরের দিকে তাক করে বললো, আমরা এই গ্রামে নিজেদের ইজ্জত খোয়াতে আসিনি। যদি এই গ্রামের শিখেরা মুসলমান হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমাদের তাদের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আমরা চলে যাচ্ছি। যার হিম্মত থাকে আমাদের পথরোধ করে দেখুক। শিখ ভাইয়েরা! বলো, তোমরা পন্থের সাথে সহযোগিতা করবে, না মুসলমানদের সাথে?

মহেন্দরের গ্রামের একজন শিখ দাঁড়িয়ে বুলন্দ আওয়াজে বললো, সরদার চরণ সিং! আর দেখছেন কি? গুলী করে ওকে শেষ করে দিন। আমরা সবাই আপনার সাথে আছি। এই গ্রামের কোনো শিখ পন্থের ফায়সালার বিরোধী নেই। হ্যাঁ, আমাকে গুলী করে মেরে ফেলো। আমি তোমাদের ধ্বংস দেখতে পারছি না। মহেন্দর সিং একথা বলতে বলতে সামনের দিকে এগিয়ে এলো। তোমরা অন্যের জন্য যে গর্ত খুঁড়ছো একদিন নিজেরাই তার মধ্যে পড়বে। সেদিনের জন্য আমি বেঁচে থাকতে চাই না।

চরণ সিংয়ের পিস্তল মহেন্দর বুক স্পর্শ করছিল। লোকেরা চিৎকার করছিল, গুলী করুন সরদারজী, ওকে গুলী করুন। ও বেটা বুজদিল, গাদ্দার, পন্থের দুশমন।

অশ্বের পদধ্বনি শোনা গেলো। লোকেরা উঠে দাঁড়িয়ে শহরগামী পাকদণ্ডীর দিকে তাকাতে লাগলো। বন্দুক, রাইফেল ও পিস্তল সজ্জিত আটজন ঘোড়সওয়ার বাগানের কাছে এসে থেমে গেলো। বলবন্ত সিং ও থানা ইনচার্জকে দেখেই মহেন্দরের বুক থেকে চরণ সিং তার পিস্তল সরিয়ে নিল। থানা ইনচার্জ ছিল এই এলাকার শিখদের দলনেতা। সে নিজের ঘোড়া সামনের দিকে এগিয়ে এনে বললো, কি ব্যাপার, এখনো তোমরা এখানে বসে আছো? আমরা তো দুটো গ্রামে অপারেশান চালিয়ে একদম সাফ করে দিয়ে এলাম। অথচ তোমরা এখানে বসে ঝিমুচ্ছো?

চরণ সিং বললো, সরদারজী! ক্যাপ্টেন বলবন্ত সিংয়ের ভাই আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করছে। সে বলছে, আমরা যদি রহমত আলীর গ্রাম আক্রমণ করি তাহলে সে আমাদের সাথে লড়বে।

থানা ইনচার্জ বলবন্ত সিংয়ের দিকে তাকালো। বলবন্ত সিং লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো, তার শিরায় আমার পিতার রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে না। এমন বেহায়া আমার ভাই হতে পারে না। সে শুরু থেকেই মুসলমানদের সাথে রয়েছে।

মহেন্দর জবাব দিল, তোমার পরিবারের লোকদের বাঁচাবার জন্যই আমি মুসলমানদের সাথে ছিলাম।

বদমাশ, আমার সাথে তর্ক করছো! তুমি পিতাকে কলংকিত করছো। তুমি পন্থের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছো।

পন্থ যদি নিরপরাধদেরকে হত্যা করতে বলে তাহলে আমি তার বিরুদ্ধাচরণ করবো।

খামুশ, বলবন্ত সামনে অগ্রসর হয়ে সজোরে তার মুখে একটা থাপ্পড় মেরে বললো। মহেন্দর পড়ে যেতে যেতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

চরণ সিংয়ের ছেলে মোহন সিং এগিয়ে এসে বললো, সে মাস্টার তারা সিংয়ের প্রতি অশালীন উক্তি করেছে। আমার ভাই হলে আমি তাকে জীবিত ছাড়তাম না।

মহেন্দর এগিয়ে গিয়ে তার ভাইয়ের হাত ধরে মিনতি করে বললো, ভাই আমাকে মেরে ফেলো, তবুও এই পাপ কাজে অংশ নিয়ো না।

থানা ইনচার্জ ক্রোধে অগ্নি শর্মা হয়ে বললো, মুসলমান হত্যা করা যদি পাপ হয়ে থাকে তাহলে আমাদের গুরুও পাপী ছিলেন? শিখ ভাইয়েরা! তোমরা কি শুনছো? বলবন্ত সিং, তুমি বলতে এই এলাকার সবাই পুরোপুরি তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু এখন দেখছি তোমার নিজের বাড়িতেই গণ্ডগোল।

আমি এই গণ্ডগোলের এখনি সুরাহা করছি। একথা বলেই বলবন্ত পরপর কয়েকটা থাপ্পড় মারলো মহেন্দরের মুখে। মহেন্দর মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তখন তার কোমরে মারলো পূর্ণ শক্তিতে তিন চারটে লাথি।

আচানক একটি যুবতী এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলবন্তকে জাপটে ধরলো। এ ছিল তার বোন বসন্ত।

ভাই তোমার কি হলো? মহেন্দর কি দোষ করলো? তাকে মারছো কেন? সে চিৎকার করে বলছিল।

হারামজাদী, তুই এখানে এসেছিস কেন? চলে যা এখান থেকে, চলে যা। বলবন্ত তার ঘাড় ধরে ধাক্কা দিল এবং সে কয়েক কদম দূরে ছিটকে পড়লো।

মহেন্দর ওঠার চেষ্টা করছিল। বলবন্ত বন্দুকের বাঁ[illegible] কোমরে মারলো কয়েক ঘা। সে আবার মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। বসন্ত উঠে আবার বলবন্তকে জাপটে ধরলো এবং চিৎকার করতে থাকলো, লোকেরা! মহেন্দরকে বাঁচাও। আমার ভাই আজ অনেক বেশি শরাব পান করে ফেলেছে। তার হুশ নেই। তার হুশ নেই। সে কি করছে বুঝতে পারছে না। শরাব তাকে অন্ধ করে দিয়েছে।

বলবন্ত সিং তার চুল ধরে টেনে বাড়ির দিকে নিয়ে চললো। পথে সে বলছিল, হারামজাদী আমি জানি সেই টমিগান তুই লুকিয়ে রেখেছিস। বল আমার টমিগান কোথায়? নইলে তোর গায়ের চামড়া তুলে ফেলবো। তোকে জানে মেরে ফেলবো। বাড়ির সামনে এসে বলবন্ত তাকে মারছিল ভীষণভাবে। তার মা চিৎকার করতে করতে বাইরে বের হয়ে এলো। সে বলবন্তের হাত ধরে রাখার চেষ্টা করলো। কিন্তু বলবন্ত তাকে জোরে ধাক্কা দিল। সে কয়েক কদম দূরে ছিটকে পড়লো। বলবন্ত আবার তার বোনের চুল ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বলতে লাগলো বল আমার টমিগান কোথায়?

আলী আকবরের আহত হবার খবর শুনে শহরের বেশ কিছু লোক হাসপাতালে চলে এসেছিল। ফজ্জু একটি গাছের নিচে সেলিম ও মজিদের ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মজিদ হাসপাতালের একটি কামরা থেকে বেরিয়ে এলো। লোকেরা তার চারপাশে জমা হয়ে আলী আকবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। মজিদ জবাব দেবার পরিবর্তে বরং তাদেরকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। ফজ্জুর কাছে গিয়ে বললো, ফজ্জু তুমি চলে যাও এবং তাদেরকে বলো কাউকে আসতে হবে না, আমরা এখনি ওনাকে নিয়ে যাচ্ছি। আফজাল চাচাকে আলাদা করে ডেকে বুঝিয়ে বলবে, ডাক্তার সাহেব বলেছেন আর কোনো আশা নেই। কয়েক মিনিট পরেই সব শেষ হয়ে যাবে। আফজাল চাচাকে আরো বলবে, তিনি যেন সতর্ক থাকেন। পথে রামচান্দের গ্রামের পাশ দিয়ে আসার সময় আমরা শিখদের শ্লোগান শুনেছি। সকাল থেকে এ সময় পর্যন্ত এ এলাকার কয়েক জায়গায়

শিখদের আক্রমণের খবর শোনা গেছে। বাড়ির কোনো লোক যেন এদিকে না আসে। এখানে যদি কারো অবস্থান করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে আমি সেলিমকে এখানে বসিয়ে রেখে কিছুক্ষণের জন্য গ্রাম থেকে ঘুরে আসবো। তুমি চলে যাও।

হাসপাতালের কামরায় সেলিম তার বাপের বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তার দ্বিতীয় ইনজেকশান দেবার পর বললেন, সম্ভবত কিছুক্ষণের জন্য তার জ্ঞান ফিরে আসবে। হয়তো আপনি তখন তার সাথে কোনো কথা বলতে পারবেন। ইত্যবসরে আমি অন্য জখমীদের অবস্থা একটু পর্যবেক্ষণ করে আসি। কোনো আশা নেই, এ কথা অবশ্যই আমি বলতে চাই না। কারণ অনেক সময় আল্লাহর ইচ্ছায় অসম্ভব সম্ভব হয়ে যায়। আপনি দোয়া করুন। আমার পক্ষ থেকে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি।

ডাক্তার চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মজিদ কামরায় প্রবেশ করলো সে চুপচাপ সেলিমের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

প্রায় দশ মিনিট পর আলী আকবর জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খুলে তাকালো। সেলিম ও মজিদকে দেখার পর ক্ষীনকণ্ঠে বললো, বেটা! বাড়ি যাও। ওরা হামলা করবে। ওরা নিশ্চয়ই হামলা করবে, সেলিম বেটা! তোমার মা তোমার বিয়ের জন্য আমাকে একটি আংটি আনতে বলেছিল। সেটা আমার ছোট ব্যাগের মধ্যে আছে ডাক্তার শওকতের বাড়িও হিন্দুস্তানে চলে গেলো। এখন ওরা তোমাদের এখানে থাকতে দেবে না। কিন্তু তোমরা যে মুসলমানের সন্তান যাবার সময় শিখদেরকে এ কথা অবশ্যই জানিয়ে যেতে ভুলবে না। মজিদ খান্দানের ইজ্জত আবরু রক্ষা করার ব্যবস্থা করবে। এখন তোমরা যাও, আল্লাহর দোহাই চলে যাও। আমার জন্য চিন্তা করো না। তুফান আসার আগেই ঘরে পৌছে যাও। শিখ ও হিন্দুদের বন্ধুত্বের ওপর ভরসা করো না। তারা ততক্ষণ তোমাদের বন্ধু ছিল যতক্ষণ তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য ভয়ের কারণ ছিল। এখন পাকিস্তান ছাড়া মুসলমানদের আর কোনো ঠিকানা নেই। আমার বুকে সর্বপ্রথম গুলী কে মেরেছে জানো? সে ছিল আমার সহপাঠি। একজন শিখ। শিখ এভাবেই বন্ধুত্বের হক আদায় করে। তবে আমরা পাকিস্তান পেয়ে গেছি। এখন আর কেউ আমাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে পারবে না।

আলী আকবর এরপর মিনিট পনর মজিদের সাথে কথা বললো। সেলিম ভাবছিল হয়তো আল্লাহর তরফ থেকে অলৌকিক কিছু ঘটে গেছে। সে নার্সের দিকে তাকিয়ে বললো, সিস্টার ডাক্তার সাহেবকে ডাকো। মনে হচ্ছে এখন তার শরীর ভালো হয়ে উঠছে। সম্ভবত এখন অপারেশন করে গুলী বের করে নেয়া যেতে পারে।

কিন্তু রুগীর ব্যাপারে নার্সের মনে কোনো বিভ্রান্তি ছিল না। তার মতে এটা নিভন্ত প্রদীপের শেষ শিখা, দপ কর জ্বলে উঠে তারপর....... । তবুও সেলিমের পীড়াপীড়ির ফলে নার্স ডাক্তার সাহেবের খোঁজে চলে গেলো।

ডাক্তার এলে সেলিম ধরা গলায় বললো, ডাক্তার সাহেব! আব্বাজান এখনি আমাদের সাথে কথা বলছিলেন। তাঁর শরীর একদম ভালো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এইমাত্র আচানক তিনি খামুশ হয়ে গেছেন। ডাক্তার হার্টের ওঠানামা পর্যবেক্ষণ করার পর রুগীর চোখ খুলে দেখলেন এবং শোকার্ত কণ্ঠে বললেন তাঁর কথা বলা ছিল একটা অলৌকিক ঘটনা। ইনজেকশান দেবার পরও আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারিনি যে তিনি জ্ঞান ফিরে পাবেন এবং আপনাদের সাথে কথা বলতে পারবেন। আমি দুঃখিত।

সেলিম নিথর নিস্পন্দ পাথরের মূর্তির মতো নিজের বাপের লাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাত্র কয়েক মিনিট আগে সে একথা একবারও ভাবেনি যে, এভাবে কথা বলতে বলতে তিনি খামুশ হয় যাবেন একেবারে চিরকালের জন্য। মজিদ তার কাঁধে হাত রাখলো। সেলিম তার দিকে ফিরে তাকালো। এবং কিছু না বলে দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট চেপে ধরলো। মজিদের চোখ দিয়ে পানির ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল কিন্তু সেলিমের চোখ ছিল বিশুষ্ক।

শহরের কয়েকজন লোক লাশ বহন করে সেলিমদের গ্রামে পৌঁছে দেবার জন্য তৈরি হয়ে গেলো। কিন্তু তারা সবেমাত্র হাসপাতালের সীমানা পেরিয়ে কয়েক কদম এগিয়ে গিয়েছিল এমন সময় ফজ্জু অতি দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে জানালো, শিখেরা গ্রাম আক্রমণ করেছে।

মজিদ লাশ বহনকারী চারপাই একটি গাছের তলায় রেখে দিল এবং এক নওজোয়ানের হাত থেকে নিজের ঘোড়ার লাগাম নিয়ে বললো, সেলিম! তুমি এখানে থাকো, আমি যাই।

সেলিম অন্য যুবকের হাত থেকে নিজের ঘোড়ার লাগাম কেড়ে নিয়ে বললো, আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি।

কিন্তু তোমার হাতে কোনো অস্ত্র নেই।

আমাদের দুজনের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। সেলিম ঘোড়ার রেকাবে পা রাখতে রাখতে বললো! মজিদ একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বললো, হাজী সাহেব! এ লাশ আপনার কাছে আমানত রইলো। যদি সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের পক্ষ থেকে কোনো খবর না আসে তাহলে লাশ দাফন করে দেবেন।

বৃদ্ধ হাজী সাহেব অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, ঠিক আছে বেটা, তোমরা যাও।

মজিদ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে গেলে এক নওজোয়ান দৌড়ে এসে বললো, আপনি তো একেবারেই নিরস্ত্র, এই নিন।

মজিদ তার হাত থেকে উঠিয়ে নিল একটি খনজর। অন্য এক নওজোয়ান এগিয়ে এসে সেলিমকে থামিয়ে দিয়ে বললো এই নিন আমার কাছেও একটি জিনিস আছে। সে তার কোমর থেকে শালওয়ারের ভাঁজের মধ্যে লুকানো একটি রিভলবার বের করে সেলিমের হাতে দিল। কয়েক মাস আগে এ নওজোয়ানই সাইক্লোস্টাইল মেশিন আনার জন্য সেলিমের সাথে লাহোর গিয়েছিল। সে বললো, এতে গুলী ভরা

আছে। আমি আপনাকে আরো গুলী দিচ্ছি। শালওয়ারের ভাঁজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটি ছোট কাপড়ের থলি বের করে সেলিমের হাতে তুলে দিয়ে সে বললো, এতে চল্লিশটি গুলী আছে। আপনি আমার কথা ভাববেন না। আমার কাছে আরো একটি বাড়তি রিভলবার আছে।

সেলিম কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ঘোড়ার পিঠে গোড়ালী মারলো। কিছুদূর গিয়ে সেলিম বললো, মজিদ! তুমি রিভলবারটি নাও এবং খনজরটি আমাকে দাও।

এখন চলো। সামনের দিকে গিয়ে দেখা যাবে।

মজিদ, সেলিম ও ফজ্জু তুফানের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে চলছিল।

শিখ প্রতিবেশীদের ওপর ভরসা করার মতো ভুল করেছিল যে গুটি কয়েক মুসলমান তারা ছাড়া গ্রামের বাদ বাকি সবাই তাদের পরিবারের শিশু নারী বৃদ্ধ সবাইকে নিয়ে রহমত আলীর হাবেলীতে আশ্রয় নিয়েছিল। হামলাকারীরা 'সত শ্রী অকাল' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে আবাস গৃহগুলির পেছনের দিকে প্রায় একশ' গজ দূরে থেমে গিয়েছিল।

দলনায়ক বলবন্ত সিংকে বললো, এখন আপনিই এই ফউজের সরদার। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত এলাকা আমাকে চক্কর দিয়ে আসতে হবে। বেশি বারুদ নষ্ট করবেন না। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার কাছে আপনার রিপোর্ট পৌঁছে যেতে হবে।

চিন্তা করবেন না। সন্ধ্যা নাগাদ অনেক ভালো খবর পেয়ে যাবেন।

হ্যাঁ ভাই, এ বাড়ির মালে আমারও অংশ আছে।

আপনি সেকথা ভাববেন না। আমরা সবকিছুই আপনার সামনে এনে হাজির করবো। আপনি যে ভাবে চাইবেন সে ভাবেই বাঁটোয়ারা হবে।

আমি বলছিলাম খুবসুরাত মালের কথা।

সরদারজী, আমার কেবল একটিই চাই, বাকি সব আপনার।

দলনায়ক তার চারজন সশস্ত্র সাথিকে সংগে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

বলবন্ত তার দলকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে নানা প্রকার নির্দেশ দিল। আবাসগৃহগুলির সুউচ্চ দেয়ালের কারণে সেদিক থেকে আক্রমণ করা সহজসাধ্য ছিল না। বাম দিকে দেয়ালের সাথে ছিল দুটি বিস্তৃত আবাসগৃহ এবং তারপর ছিল বাইরের হাবেলীর গুদাম ও পশুশালা। এই দেয়ালের পাশে পাশে সমান্তরাল রেখায় একটি গলি পথ হাবেলীর ফটকে পৌঁছে গিয়েছিল। বলবন্ত সিং একটি গ্রুপকে গলি পথে এবং অন্য গ্রুপকে জলাভূমির পাশ দিয়ে চক্কর কেটে শিখদের মহল্লার ভেতর দিয়ে ফটকের দিকে হামলা করার হুকুম দিল।

প্রথম গ্রুপটি বালাখানার দিকের কোণের কয়েক গজ দূরে পৌঁছে গিয়েছিল এমন সময় গোলাপ সিং বল্লম হাতে গলির মধ্য থেকে বের হয়ে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

আমি তোমাদের যেতে দেবো না, সে জোরে চিৎকার দিল। সরে যাও। জনৈক শিখ চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে এসে তার দিকে রাইফেল তাক করলো।

সামনে যেতে হলে তোমাকে আমার লাশের ওপর দিয়ে যেতে হবে।

এটা আবার কে? বলবন্ত সিং এগিয়ে আসতে আসতে বললো। ওহো, গোলাপ সিং তুমি! বাপকা বেটা তো এমনি হবেই।

গোলাপ সিং তার কথার জবাব দেবার পরিবর্তে নিজের বল্লম তার দিকে সোজা করে ধরলো। বলবন্ত সিং দুতিন কদম পিছে হটে গিয়ে রাইফেল উঁচু করে বললো, তোমার এ দুঃসাহস!

মোহন সিংও পিস্তল তার দিকে তাক করেছিল। কিন্তু গ্রামের কয়েকজন শিখ মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। তারা বলবন্ত সিংকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, ইন্দর সিংয়ের নাতির গায়ে হাত উঠালে অনর্থ হয়ে যাবে। গ্রামের অনেক শিখ আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। এই বিতর্ক চলছিল ইতিমধ্যে লাঠিতে ভর দিয়ে গলি মুখে ইন্দর সিংয়ের উদয়। তার পেছনে ছিল গোলাপ সিংয়ের চাচা এবং গ্রামের আরো ক'জন শিখ। এরা সবাই বল্লম ও কৃপাণ সজ্জিত ছিল। ইন্দর সিং কাছাকাছি এসে বললো, গোলাপ সিং হটে যাও। এদের পথরোধ করো না।

গোলাপ সিং নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। হামলাকারীদের সাথে আগত তার গ্রামের কতিপয় শিখও অবাক হয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ী করছিল।

গোলাপ সিং দাদার দিকে তাকিয়ে বললো, বাবাজী! এরা এসেছে আমাদের গ্রামের ওপর হামলা করতে।

এটা শিখ ও মুসলমানের লড়াই। আজ পর্যন্ত আমাকে ধিক্কার দেয়া হতো, আমি নাকি রহমত আলীকে ডরাই। কিন্তু আজকের পরে আমাকে আর কেউ এ ধিক্কার দিতে পারবে না।

বাবা, আমরা গুরুগ্রন্থের ওপর হাত রেখে কসম খেয়েছিলাম। তাছাড়া আপনি রহমত আলীকে নিজের ভাই বানিয়ে নিয়েছেন।

আজ সে ভ্রাতৃবন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। আজ আমি একজন শিখ। একথা বলতে বলতে ইন্দর সিং দালানের ছাদের দিকে তাকিয়ে বুলন্দ আওয়াজে ডাকতে লাগলো, রহমত আলী! তোমার বাড়িতে বরযাত্রী এসেছে। গা-ঢাকা দিলে কেন? বাইরে এসো!

চৌধুরী রহমত আলী কয়েজন সাথি সংগীসহ ছাদের কার্নিশের আড়ালে বসেছিলেন। ইন্দর সিংয়ের আওয়াজ শুনে তখনই উঠে কার্নিশের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বালাখানার ছাদ থেকে আফজাল উচ্চস্বরে বললেন, আব্বাজান! বসে পড়েন। পিছনে হটে যান। ওদের হাতে বন্দুক আছে।

কিন্তু তিনি বেপরোয়াভাবে জবাব দিলেন, আমাকে কেউ গুলী করলে না। আমি কারোর ক্ষতি করিনি। ওদের সাথে কথা বলতে দাও।

কার্নিশ ছিল ছাদ থেকে দুহাত উঁচু। রহমত আলীর ছোট ভাই মাথা নিচু করে অগ্রসর হলো এবং কার্নিশের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে রহমত আলীর হাত ধরে টেনে বললো, বসে পড়েন ভাইজান!

রহমত আলী টান দিয়ে নিজের হাত মুক্ত করে নিয়ে নিচে সমবেত শিখদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা কি চাও? আমরা তোমাদের কি ক্ষতি করেছি। আমরা তোমাদের বাড়িঘর পাহারা দিয়েছি। তোমরা গ্রন্থ সাহেবের গা স্পর্শ করে কসম খেয়েছো। আমরা তোমাদের সাথে কখনো প্রতারণা করিনি। আমরা তোমাদের মা-বোনদেরকে..........।

তিনি বাক্য শেষ করতে পারলেন না। জনৈক শিখ নিচে থেকে বন্দুক চালিয়ে দিল। গুলী রহমত আলীর মস্তক বিদ্ধ করলো। তিনি কার্নিশের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন।। তার বুক ছিল কার্নিশের ওপর এবং হাত বাইরে ঝুলে পড়েছিল। তার ভাই তাকে উঠাবার চেষ্টা করলো। বলবন্ত সিং তার রাইফেল দিয়ে পরপর দুবার গুলী করলো। সে জখমী হয়ে পেছনে পড়ে গেলো। নিচে গোলাপ সিং বল্লম নিয়ে বলবন্তের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু মোহন সিং আচানক পিস্তলের গুলীতে তাকে ধরাশায়ী করলো। ইন্দর সিংয়ের হাত থেকে লাঠি ছিটকে পড়লো। জোরে চিৎকার দিয়ে নাতির লাশ জড়িয়ে ধরলো। বালাখানা থেকে আফজাল পরপর কয়েকবার ফায়ার করলো। তিনজন শিখ জখমী হয়ে পড়ে গেলো। শিখেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পিছে হটতে লাগলো। আফজাল নারায়ে তাকবীর বুলন্দ করলো। নিচে হাবেলীতে সমবেত মুসলমানদের মুহুর্মুহু আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হতে লাগলো।

শিখেরা পিস্তলের গুলীর সীমানার বাইরে সরে গিয়ে বালাখানা ও ছাদের ওপর বেদম গুলী বর্ষণ করতে লাগলো। রহমত আলীর শরীরের যে অর্ধাংশ কার্নিশের বাইরে ঝুলছিল সেটি গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে গেলো। তাঁর স্ত্রী সিঁড়িতে উঠে স্বামীর অবস্থা দেখে বেদিশা হয়ে দৌড়ে এগিয়ে গেলেন। কার্নিশের কাছে যেতেই একটি গুলী তার মাথায় এবং একটি বুকে বিদ্ধ হলো। তিনি পড়ে যেতে যেতে স্বামীর লাশ জড়িয়ে ধরলেন। বাড়ির এ অংশের হেফাজতের দায়িত্ব যার ওপর ছিল সে তাঁর আগমন তখনই টের পেলো যখন তিনি স্বামীর কাছে পৌঁছে গুলীবিদ্ধ হয়েছিলেন।

সেলিমের বোন যুবাইদা ছাদে উঠলো। কিন্তু বালাখানা থেকে আফজাল তাকে দেখতে পেলো। পূর্ণশক্তিতে চিৎকার করলো সে, যুবাইদা আর সামনে অগ্রসর হয়ো না, পিছনে হটে যাও! যুবাইদা দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল এমন সময় তার মা এগিয়ে এসে বাহু ধরে টান মারলো। আফজাল আবার চিৎকার করে বললো, ভাবী! কাউকে উপরে আসতে দেবেন না। মেয়েদের ও শিশুদের ভেতর দালানে বসিয়ে দিয়ে দরোজা বন্ধ করে দিন।

এক নওজোয়ান হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হয়ে রহমত আলী ও তার স্ত্রীর লাশ কার্নিশ থেকে নামিয়ে ফেললো এবং নিচে শুইয়ে দিল।

বলবন্ত সিং এর পরিকল্পনা অনুসারে শিখেরা দুদলে বিভক্ত হয়ে দুদিক দিয়ে অগ্রসর হলো। আখ ক্ষেত অতিক্রম করে যে দলটি অগ্রসর হচ্ছিল কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয়েই সেটি হাবেলীর ফটকের কাছে পৌঁছে গেলো। কিন্তু অন্য দলটি গলির মধ্যে প্রবেশ করতেই ছাদ থেকে ইঁট বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো এবং একই সাথে আফজাল বালাখানা থেকে গুলীবর্ষণ করতে লাগলো। পিস্তলের গুলীতে দুজন এবং ইঁটের আঘাতে পনের জন আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ফলে বাকিরা ভয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলো।

বলবন্ত সিং তাদেরকেও আখের ক্ষেত পার হয়ে জলাভূমির কিনারা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অন্যদিকে পৌঁছে যাবার হুকুম দিল।

গ্রামের দক্ষিণ দিকে আটদশটি আখের ক্ষেত একসাথে মিলে মিশে দাঁড়িয়েছিল। মজিদ সোজা গ্রামে না গিয়ে এই ক্ষেতগুলির মধ্যস্থল অতিক্রমকারী পগারের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

একটি ক্ষেতের প্রান্তে পৌঁছে মজিদ ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে লাগাম ধরে ক্ষেতের ভেতরে ঢুকে গেলো। সেলিম ও ফজ্জু তার অনুসরণ করলো। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা ক্ষেতের মাঝখানে একটি কুল গাছের নিচে পৌঁছে গেলো। ঘোড়া তিনটিকে গাছের সাথে বেঁধে রেখে তারা গ্রামের দিকে রওয়ানা দিল। গ্রাম থেকে রাইফেল ও বন্দুকের আওয়াজের সাথে সাথে আল্লাহু আকবর ও সত্শ্রী অকাল ধ্বনিও শোনা যাচ্ছিল। ক্ষেতের অন্য কিনারে পৌঁছে তারা একটি সরু পায়ে চলা পথ দিয়ে ছুটে চললো। গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে তারা পায়ে চলা পথ ছেড়ে দিয়ে দুটো আখক্ষেতের মাঝখানের আলের ওপর দিয়ে চলতে লাগলো। চল্লিশ কদমের মতো চলার পর মজিদ পেছন ফিরে সাথিদেরকে ইশারা করলো এবং পা টিপে টিপে এগুতে লাগলো। আরো দশ পনের কদম চলার পর থেমে গেলো এবং তার সাথিরাও তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো। এখান থেকে ক্ষেতের মাথায় ঝাউ ও কুলগাছের সারি দেখা যাচ্ছিল।

মজিদ পাঁচ ছয় কদম এগিয়ে গিয়েছিল এমন সময় কারোর আওয়াজ শুনলো, শেঠ রামচান্দ! আমার বারুদ সব নিয়ে নিয়েছে বলবন্ত সিং।

বলবন্তের নিজের থলি ভরা ছিল তা কি খতম হয়ে গেলো?

সে কয়েকজনকে নিয়ে মসজিদের ছাদে চড়েছে। সেখান থেকে খুব চমৎকার নিশানাবাজি করা যাবে। আর বেশীক্ষণ নয়। এখনই ফায়সালা হয়ে যাবে। আরে কুন্দন লাল, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? যাও, এদিকে কে আসবে?

বিপদ তো আছে সরদারজী!

এদিকে কে আসবে? ওদিকে তামাশা দেখবে চলো!

শেঠ রামচান্দ বললো, না সরদারজী! আপনার মতো বীর পুরুষরাই এদিকে আসতে পারে। আমরা হলাম পেঁয়াজী বেগুনী খানে ওয়ালা। এদিক থেকে আমরা কখনো দুএকটা ফায়ার করে দেবো। নিশানা ঠিকমত লাগুক আর না লাগুক, কমপক্ষে এতটুকু ফায়দা হবে, ওদের কিছু লোক এদিকটাও আটকাতে ব্যস্ত থাকবে। বলবন্ত সিংও আমাদের বলেছিল, তোমরা এখানে থাকো। আপনিও বসে পড়ুন সরদারজী! এই গুটিকয় মুসলমান, এরা আবার কতক্ষণ লড়বে? ভগবানের কৃপায় বিশ পঁচিশ জন মুসলমানের জন্য আপনার ছেলে একাই যথেষ্ট।

মজিদ তার সাথিদেরকে পেছনে পেছনে আসার ইংগিত করে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে বুকে হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে চললো। ক্ষেতের আলের ওপর গাছপালার মধ্যে ঝোপঝাড় গজিয়ে উঠেছিল। আলের মাথা থেকে আট দশ কদম দূরে শেঠ রামচান্দ, কুন্দন লাল ও চরণ সিং দাঁড়িয়েছিল। তিনজনের হাতে ছিল রাইফেল। রামচান্দ নিজের থলে থেকে কার্তুজ বের করে চরণ সিংকে দিচ্ছিল। মসজিদের দিক থেকে একের পর এক আট দশটা ফায়ার হলো। চরণ সিং বললো, দেখলে বলবন্ত সিং ফায়ারিং শুরু করে দিয়েছে।

রামচান্দ চললো, আরে ইয়ার, তার ভাই বড়ই বেহুদা আদমি প্রমাণিত হয়েছে।

আরে সে নিজেও তো সাহসী নয়। এ যা কিছু করছে কেবল লোক দেখাবার জন্য। আসলে তার নজর আছে রহমত আলীর নাতনীর দিকে।

কার দিকে? সেলিমের বোনের দিকে? আরে দোস্ত, সে মেয়েটি তোমার মোহনের ভাগে পড়া উচিত। আমার কৌশলা তার অত্যন্ত প্রশংসা করে।

আচ্ছা দেখা যাবে। আমি যাচ্ছি। কিন্তু তোমার কাছে দুটি রাইফেল ও একটি পিস্তল ফালতু পড়ে আছে। একটি রাইফেল আমাকে দাও। আমি অন্য কাউকে দিয়ে দেবো।

দেখো সরদারজী! আমি তোমাকে তিনটি রাইফেল এনে দিয়েছি। আমার কাছ থেকে এটা নিয়ো না। হয়তো আমিও কোনো একটা নিশানা লাগাবার সুযোগ পেয়ে যাবো।

মজিদ পিস্তল বের করে আলের মাথা থেকে লাফিয়ে পড়ে গর্জন করে উঠলো, হাতিয়ার ফেলে দাও! দুহাত উপরে উঠাও। খবরদার নড়বে না। আর এই সংগে সে চরণ সিংয়ের ওপর ফায়ার করে দিল। চরণ সিংয়ের মাথা গুলীবিদ্ধ হলো। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। তার মুখ থেকে একটি আওয়াজও বের হলো না। রামচান্দ ও কুন্দনলালের হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেলো। সেলিম ও ফজলু পাহলোয়ান দৌড়ে গিয়ে তিনটি রাইফেল কুড়িয়ে নিল। মজিদ পেছন দিকে হটে আসতে আসতে পিস্তল উঁচিয়ে বললো, তোমরা দুজন এদিকে এসো। জলদি করো।

রামচান্দ ও তার বেটা মজিদের পিস্তলের ইশরায় আল পার হয়ে আখ ক্ষেতের মাঝখানে পৌছে গেলো। সেলিম রামচান্দের পিস্তল ও বারুদের থলি উঠিয়ে নিল। কন্দু কুন্দন লালের গলা থেকে থলি নামিয়ে নিল।

রামচান্দ হাত জোড় করে বললো, সুবেদারজী! ভগবানের কসম, আমি তাদেরকে অনেক নিষেধ করেছি কিন্তু আমার কথা কে শোনে।

মজিদ বললো, একটু সামনের দিকে চলো আর বাজে কথা বন্ধ করো।

আমাদের প্রতি দয়া করুন মহারাজ! আমরা কিছুই করিনি।

আমি তোমাদের ছেড়ে দিতে পারি একটি শর্তে।

মহারাজ, যে কোনো শর্ত আমি মানতে রাজি।

আধা ঘন্টার মধ্যে আমরা আরো তিনটে রাইফেল চাই। প্রত্যেকটি রাইফেলের সাথে পাঁচশ' রাউণ্ড করে গুলীও চাই। তোমার ছেলে আমাদের কাছে থাকবে। যদি আধ ঘন্টার মধ্যে এ জিনিসগুলি আমরা না পাই তাহলে কুন্দনলালকে গুলী মেরে উড়িয়ে দেয়া হবে।

মহারাজ, আরো দুটো রাইফেল আমার কাছে আছে কিন্তু সেগুলি আছে আমার বাড়িতে। কার্তুজ আমি আপনাকে আরো বেশি দিতে পারি কিন্তু আপনারা আমার বেটাকে মেরে ফেলবেন না এর গ্যারান্টি কি?

তোমার ইচ্ছা। তুমি চাইলে আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারো। নয়তো তোমার সামনেই তোমার বেটাকে গুলী মেরে উড়িয়ে দিচ্ছি। একথা বলেই মজিদ কুন্দন লালের দিকে পিস্তল উঠালো।

মহারাজ! আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি। চৌধুরী রহমত আলীর নাতি মিথ্যা ওয়াদা করতে পারে না। কিন্তু আমি আধ ঘন্টার মধ্যে এতগুলি জিনিসপত্র নিয়ে কেমন করে এখানে ফিরে আসতে পারি? আমাকে একটু বেশি সময় দিন। আমি ঘোড়ায় চড়ে আসবো। কিন্তু আধ ঘন্টা তো আমার ওখানে পৌছে যেতেই লাগবে।

ঠিক আছে, তোমাকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় দেয়া হলো। তুমি ঘোড়ার পিঠে বেঁধে জিনিসপত্র আনো এবং এই ক্ষেতের অন্য দিকে ঝাউগাছের নিচে পৌছে আমার লোকের হাতে ঘোড়া ও মালপত্র বুঝিয়ে দাও। যদি তুমি কোনো রকম চালাকি করার চেষ্টা করো তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখো তোমার বেটাকে আর ফিরে পাবে না।

মহারাজ! মালপত্র ভরা ঘোড়া পেয়ে গেলে কুন্দন লালকে ছেড়ে দেবেন তো?

মজিদ ঝাঁঝালো স্বরে বললো, বদমাশ যাও আমার সময় নষ্ট করো না। কুন্দন লালকে আমরা তখনই ছাড়বো যখন আমরা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হবো যে, তুমি কোনো শয়তানী করোনি। এখন যাও ভাগো। আর বেশি কথা বললে এখনই দুজনকে গুলী মেরে উড়িয়ে দেবো।

রামচান্দ ঘোড়ায় চড়ে বের হয়ে পড়লো। কিন্তু আল পার হয়ে আর একবার পেছন ফিরে বললো, ঘড়িতে টাইমটা একবার দেখে নিন।

বেঈমান, জলদি করো।

শেঠ রামচান্দ জীবনে এই প্রথমবার পূর্ণ উর্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল। প্রতি পদক্ষেপে তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল, হায় ভগবান! এ কি হলো! আমার স্বদেশ ভারতের প্রয়োজন নেই, আমি রামরাজ চাই না, আমি চাই কেবল আমার ছেলে–হায় মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট–দুহাজার সাত'শ সেকেণ্ড–এক, দুই, তিন, চার .... সে গণনা করেই চলছিল।

ফজ্জুর পাগড়ী দিয়ে সেলিম কুন্দন লালের হাত বেঁধে ফেলেছিল। মজিদ ফজ্জুকে একদিকে নিয়ে গিয়ে বললো, ফজ্জু চাচা! তুমি একে কুল গাছের নিচে নিয়ে যাও। যদি সে তেরিমেরি করে তাহলে অতি সহজেই তার গলা দাবিয়ে দিতে পারবে। সেখানে নিয়ে তাকে গাছের সাথে ভালো করে বেঁধে রাখো। তার জামা ছিঁড়ে মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে উপর থেকে বেঁধে দেবে। তাহলে সে আর শোরগোল করতে পারবে না।

আপনি চিন্তা করবেন না। আমি এমন ভাবে বাঁধবো যে তার মায়ের দুধের কথা মনে পড়ে যাবে।

শাবাশ! তাহলে পৌনে এক ঘন্টা পরে তুমি ঝাউ গাছের পেছনে লুকিয়ে এর বাপের আসার ইন্তিজার করবে। তার সাথে কেউ নেই এ ব্যাপারে আগে নিশ্চিত হবে। তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে ঝাউগাছের দক্ষিণ দিকে পাঁচ কদম দূরে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে। মনে রেখো ঝাউগাছের দক্ষিণ দিকে পাঁচ কদম দূরে। তারপর রামচান্দকে তার ছেলের কাছে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, অবশ্যই তার তল্লাশী নেবে। তারপর তাকে বেঁধে রেখে তুমি সেখানে অপেক্ষা করবে। ঠিক আছে, এখন তাহলে তুমি ওকে নিয়ে যাও। সেলিমের কাছ থেকে খনজরটি নাও। হয়তো ওটা তোমার কাজে লাগতে পারে। আর ঘোড়াগুলির জিন ও লাগাম খুলে নিয়ে তাদেরকে খোলা ছেড়ে দাও। তারা পেট ভরে খেয়ে নিক।

সেলিম বললো, মজিদ! সময় চলে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, এটা ছোটখাট লড়াই নয়, একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ। তবে জানি না কবে এর ফায়সালা হবে এবং কোথায় হবে? এখন সবেমাত্র সূচনা। আমাদের জোশের চেয়ে বেশি হুঁশের দরকার।

রাইফেল নিয়ে আমাদের ভিতরে পৌছে যাওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে।

আচ্ছা আমি দেখছি। যদি এদিকে ছাদের ওপর কাউকে দেখা যায় তাহলে কমপক্ষে রাইফেলগুলি ভেতরে পৌছিয়ে দিতে পারি। একথা বলে মজিদ ফেন্সের এক প্রান্তে দাঁড়ানো জাম গাছটার ওপরের দিকে উঠতে লাগলো। আচানক সে একথা বলতে বলতে দ্রুত গাছ থেকে নামতে লাগলো–সেলিম ওরা হাবেলীর হাবেলীতে ঢুকে পড়েছে। এ দিকে আমাদের কোন হেফাজতের লোক নেই। বন্দুক ও রাইফেলের ট্যার...... ট্যার....... ট্যার এবং শিখ ও মুসলমানের শ্লোগান আর সেই সাথে শিশু ও নারীদের চিৎকার ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

সেলিম একটি রাইফেল ও কার্তুজের থলে উঠিয়ে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছিল এমন সময় মজিদ থামো থামো বলতে বলতে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লো মাটিতে এবং সেলিমের বাহু টেনে ধরে বললো, তুমি যদি মনে করো এক হাজার লোকের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলবে তাহলে তুমি পাগল হয়ে গেছো। আমাদের পথ একটাই। আমার সাথে এসো।

মজিদ ও সেলিম রাইফেল ও কার্তুজের থলে উঠিয়ে নিয়ে ক্ষেতের কিনারা দিয়ে এবং গাছের আড়ালে আড়ালে দৌড়াতে দৌড়াতে আমগাছের কাছে পৌছে গেলো। মজিদ দুটি রাইফেল একটি ঘন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে বললো, সেলিম তুমি আমগাছে চড়ো। আমি মসজিদের ছাদে ওঠার চেষ্টা করছি। মসজিদের পেছন দিকে সিঁড়ি লাগানো আছে। কেউ আমাকে দেখে যদি সিঁড়ির দিকে আসে তাহলে ফায়ার করে দেবে। অন্যথায় আমি হাতের ইশারা না করা পর্যন্ত ফায়ার করো না।

মসজিদের ছাদ থেকে ফায়ার শুরু না হওয়া পর্যন্ত মুষ্টিমেয় মুসলমানের লাঠি ও বল্লম কয়েকবার বাইরের প্রাচীর ও ফটক ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করার প্রচেষ্টারত হানাদারদের পিছপা করে দিল। একটি দল গলির দিকে সিঁড়ি লাগিয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আফজাল বালাখানা থেকে ফায়ার করে তাদেরকে ভাগিয়ে দিল। শিখরা প্রথমবার ফটক ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টা চালালো। এ সময় ভেতর থেকে প্রবল ইষ্টক বর্ষণে তারা হটতে বাধ্য হলো। এরপর যারা প্রাচীর টপকাবার চেষ্টা করছিল তাদেরকে রুখে দেয়া হলো লাঠি ও বল্লমের সাহায্যে। এ অবস্থা দেখে হানাদাররা পিছে হটে গিয়ে রাইফেল দিয়ে ফটকের গায়ে গুলী করতে লাগলো। ভেতর থেকে ফটক বন্ধ রাখার জন্য যারা শক্তি প্রয়োগ করছিল তাদের অনেকেই জখমী হয়ে একদিকে সরে গেলো। হামলাকারীদের একটি দল অগ্রসর হয়ে ফটকের গায়ে লাগাতার ধাক্কা মারতে লাগলো। ফলে লোহার মজবুত শেকল ভেঙে গেলো এবং ফটক খুলে গেলো। এখন শুরু হলো হাতাহাতি যুদ্ধ।

আফজাল তার পিস্তলের শেষ গুলী চালাবার পর তলোয়ার হাতে নিয়ে বাইরের হাবেলীতে পৌছে গিয়েছিল। আশেপাশের ছাদের ওপর যেসব নওজোয়ান পাহারা দিচ্ছিল তারাও নিচে লাফিয়ে পড়ে হানাদারদের ওপর আক্রমণ করলো। ছুরি, চাকু, বল্লম ও লাঠি যুদ্ধে শিখেরা বেশীক্ষণ টিকতে পারলো না। দশ মিনিটের লড়াইয়ে নিজেদের তিরিশটি লাশ ফেলে রেখে তারা পেছনে হটতে লাগলো এবং একেবারে পাঁচিলের বাইরে বের হয়ে তবে দম নিল। এরপর আর কেউ পাঁচিল বা ফটকের কাছে ঘেঁসতেই সাহস করলো না। মুসলমানরা ফটক আবার বন্ধ করে নিল এবং একটা গরুর গাড়ি ধাক্কা দিয়ে ফটকের সাথে দাঁড় করিয়ে দিল। কয়েকজন মুসলমান দুটো শিখের লাশ টেনে এনে গাড়ির চাকার সামনে রেখে দিল এবং

তাদের ইংগিতে অন্যেরা বাকি মৃত ও জখমী শিখদেরকে এনে গাড়ির ওপরে নিয়ে ভরে দিল। মুসলমানরা এখন দেয়ালের সাথে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় হামলার ইন্তিজার করছিল। কিন্তু শিখেরা পেছনে সরে গিয়ে কেবল নিশানাবাজী করতে থাকলো।

কয়েকজন যুবক আহত মুসলমানদেরকে উঠিয়ে দালানের মধ্যে নারী ও শিশুদের কাছে পৌছিয়ে দিল।

আচানক বন্দুক ও রাইফেলের ট্যার ট্যার বন্ধ হয়ে গেলো। শিখদের আওয়াজ শোনা গেলো। আফজাল বললো, ইসমাঈল তুমি বালাখানার ওপরে যাও। ওদিক থেকে কোনো হামলা হলে খবর দাও।

ইসমাঈল দৌড়ে বাড়ির আঙিনা ডিঙিয়ে নিচের ছাদ পার হয়ে বালাখানার সিঁড়িতে পা দিল। সে সবেমাত্র সিঁড়ির মাঝখানের ধাপে পা রেখেছিল এমন সময় রাইফেল ও বন্দুকের তিন চারটি ফায়ার হলো একসাথে। একটি গুলী তার কোমরে দ্বিতীয়টি হাতে এবং তৃতীয়টি পায়ে লাগলো। কিন্তু সে উঠে পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালো, আবার পড়ে গিয়ে আবার হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হেলে দুলে কম্পিত পায়ে উপরে উঠে গেলো এবং বালাখানার শেষ সিঁড়ির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। কয়েক সেকেণ্ড পরে বুকে ভর দিয়ে ঘসতে ঘসতে সে পৌছে গেলো ছাদে। ছাদের এক কোণে ১৪ আগস্টে উত্তোলিত পাকিস্তানের ঝাণ্ডা এখনো উড়ছিল পতপত করে।

বালাখানার মাথায় গুলী বৃষ্টি হচ্ছিল। ঝাণ্ডার বাঁশের গায়ে এসে লাগলো কয়েকটি গুলী। বাঁশ মাঝখান থেকে ভেঙে পড়লো ইসমাঈলের ওপর। তারা ঝাণ্ডাটি ধরে পেটের ওপর ভর দিয়ে ঘসতে ঘসতে ইসমাঈল অগ্রসর হলো। কার্নিশের কাছে পৌছে হাঁটু গেড়ে ওঠার চেষ্টা করলো সে তারপর একহাত দিয়ে কার্নিশ ধরে উঠে দাঁড়ালো এবং অন্য হাত দিয়ে ঝাণ্ডাটি বুকের সাথে চিপকে রাখলো। এমন সময় একটি গুলী তার বক্ষ ভেদ করলো এবং ঝাণ্ডাসহ মুখ থুবড়ে পড়লো সে। সাদা চাঁদ তারা খচিত সবুজ ঝাণ্ডা শহীদের তপ্ত তাজা খুনে লাল হয়ে উঠলো।

রাইফেল ও বন্দুক সজ্জিত গ্রুপটি মসজিদের ছাদে পৌছে যাবার ফলে পশুশালার হাবেলীর বিস্তৃত অংগন এবং বাসগৃহগুলির ছাদগুলি গুলীর সহজ লক্ষে পরিণত হয়েছিল। ইসমাঈলের পড়ে যাবার সাথে সাথেই বলবন্ত সিং ও তার সাথিরা হাবেলীর আঙিনায় সমবেত লোকদের ওপর গুলী বর্ষণ করা শুরু করলো। দুমিনিটের মধ্যে পনের জন জখমী হয়ে পড়ে গেলো। কয়েকজন দিশেহারা হয়ে পশুশালার কামরাগুলির মধ্যে ঢুকে পড়লো। বাদ বাকি লোকেরা আফজালের নির্দেশ

মতো দেয়ালের সাথে সেঁটে বসে পড়লো। বলবন্ত সিং নিচের লোকদেরকে হাত দিয়ে ইশরা করলো এবং তারা পুনর্বার হামলা করলো। এ হামলাটি অন্য হামলার তুলনায় অনেক বেশি সংগঠিত ও শক্তিশালী ছিল। বিশ পঁচিশ জন একযোগে এগিয়ে গিয়ে ফটকে ধাক্কা দিল। লোকেরা বাধা দেবার জন্য এগিয়ে যাবার আগেই গরুর গাড়ি লাশ সমেত উল্টে পড়লো। ফটকের দরোজা ফাঁক হয়ে গেলো। হামলাকারীদের একটি গ্রুপ শ্লোগান দিতে দিতে ভেতরে প্রবেশ করলো। গ্রামের শিখেরা আর একটি গ্রুপকে সিঁড়ির যোগান দিয়েছিল। তার সাহায্যে তারা গলির দিক থেকে বাসগৃহের ছাদে পৌঁছে গিয়েছিল। এই দলে তিন জনের হাতে ছিল বারো বোরের বন্দুক।

মুসলমানরা এখন জীবনের মোকাবিলায় মৃত্যুকে নিকটতর ভেবে লড়ছিল। একদিকে আঙিনায় কৃপাণ ও বল্লমধারীদের সাথে তাদের হাতাহাতি লড়তে হচ্ছিল আর অন্যদিকে মসজিদ ও বাড়ির ছাদ থেকে বন্দুক ও রাইফেল ধারীরা তাদেরকে লক্ষ করে গুলী ছুঁড়ছিল। বারো বোরের বন্দুকের ছররা গুলীতে মুসলমানদের সাথে সাথে কয়েকজন শিখও জখমী হলো। তাই তারা ফায়ার বন্ধ করে দিল। কিন্তু মসজিদ থেকে রাইফেলের ফায়ারিং যথারীতি চলছিল।

বলবন্ত সিং মসজিদের ছাদে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিচ্ছিল, শাবাশ, বীরের দল! এইতো কেল্লা ফতেহ হো গিয়া! কাউকে ছাড়বে না। মেয়েদেরকে বের করে নাও এবং বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দাও। শাবাশ! আচানক তার পিঠে গুলী লাগলো এবং জোরে চিৎকার দিয়ে সে ছাদ থেকে পনের ফুট নিচে ধুপ করে পড়ে গেলো। তার সাথিরা বসে বসে ফায়ার করছিল। তারা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো এবং ঝুঁকে পড়ে নিচে দেখতে লাগলো। তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছিল তাদের নেতার এভাবে পড়ে যাওয়ার কারণ কি? এমন সময় পেছন থেকে রাইফেল চালানোর আওয়াজ এলো এবং একের পর এক তাদের দুজন জখমী হয়ে নিচে পড়ে গেলো। বাকি তিনজন সাথে সাথেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো।

মোহন সিং তার সাথিদের জিজ্ঞেস করছিল এ গুলী এলো কোথা থেকে?

মজিদ কার্নিশের কাছে এসে মাথা বের করে দেখে নিয়ে আচানক ছাদে লাফিয়ে পড়লো। তার দুহাতে ছিল রিভলবার। কোনো সময় নষ্ট না করেই সে দশটি গুলী করলো। ছাদের ওপর যারা শায়িত ছিল তাদের কেউ উঠে বসার সুযোগ পেলো না। এরপর সে একটি রাইফেল তুলে নিয়ে হাবেলীতে হামলাকারীদের ওপর ফায়ার করতে লাগলো। তার প্রথম গুলী লাগলো পশুশালার ছাদে দাঁড়ানো দুজন রাইফেলধারী শিখের বুকে। একটি রাইফেলের ম্যাগজিন খালি হয়ে গেলো। সে দ্বিতীয় রাইফেল তুলে নিল। ইতিমধ্যে জখমীদের মধ্য থেকে একজন শিখ উঠার চেষ্টা করলো। মজিদ আচানক তার ওপর ফায়ার করে দিল। আর একজন শিখের দেহ নড়ে উঠছিল। মজিদ তার মাথায় মারলো বন্দুকের বাঁট সজোরে। সে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

তারপর সে একটি স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মতো হামলাকারীদের ওপর ফায়ার করে চলছিল। এতক্ষণে সেলিম গাছ থেকে নেমে তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সে আকে উঠেই বাঁশের সিঁড়ি ছাদের ওপর টেনে নিল এবং মজিদের পাশে বসে ফায়ার করতে লাগলো। বারুদের অভাব ছিল না। রামচান্দ ও কুন্দন লাল থেকে ছিনিয়ে নেয়া দুটি থলি ছাড়া শিখদের ছটি বারুদভরা থলিও তাদের কব্জায় এসে গিয়েছিল। শিখদের মধ্যে হৈ চৈ ও বিশৃংখলা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

মজিদ সেলিমকে বললো, সেলিম! তুমি কেবল দরোজা থেকে যারা বের হয়ে আসে তাদের ওপর ফায়ার করো। খেয়াল রাখো, হাবেলীতে তোমার গুলী যেন আমাদের কোনো লোকের গায়ে না লাগে। পনের মিনিটের মধ্যেই হাবেলীর ফটকের ভেতরে বাইরে দেড়'শ শিখ নিহত হলো। বাদ বাকি শত শত শিখ এদিক ওদিক ভাগতে শুরু করে দিল।

শিখদের একটি দল গলির মধ্যের সিঁড়ি দিয়ে বাসগৃহগুলির ছাদে পৌঁছে গিয়েছিল। এখন তারা আঙিনায় প্রবেশ করে যে দালানটিতে নারী, শিশু ও জখমীদের রাখা হয়েছিল তার দরোজা ভাঙার চেষ্টা করছিল।

পশুশালার হাবেলী থেকেও কিছু শিখ গুলী বর্ষণের মধ্যেও ফটকের পথে বাইরে আসার পরিবর্তে ভেতরের দিকে গেলো এবং বাসগৃহের হাবেলীর আঙিনায় প্রবেশ করলো। তারা দুই হাবেলীর মাঝখানে দেউড়ির দরোজা বন্ধ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু আফজাল যথাসময়ে নতুন বিপদ অনুধাবন করতে পারলো এবং দৌড়ে গিয়ে পূর্ণশক্তিতে একটি কপাট ভেতরের দিকে ঠেলে দিল। একজন শিখ ভেতর থেকে শেকল লাগাবার চেষ্টা করছিল। সে ছিটকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো কয়েক কদম দূরে। আফজাল দেউড়িতে প্রবেশ করে সোজা হবার আগেই চারদিক থেকে শিখেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। একটি বর্শা বিদ্ধ হলো তার রানে এবং একটি পিঠে। পিঠের বর্শার অগ্রভাগ তার মেরুদণ্ড ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়লো। আফজাল বাম হাতে পিঠের বর্শাটি টেনে ধরে ডান হাত দিয়ে আক্রমণকারীর বুকে নিজের বর্শা বিদ্ধ করলো। সে চিৎ হয়ে পড়ে গেলো এবং আফজাল কম্পিত পদক্ষেপে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ঘিরে ফেলো, পাকড়াও করো, মেরে ফেলো বলতে বলতে শিখেরা তার চারদিকে জমা হয়ে গেলো। আর সে এক হাত দিয়ে তাদের দূরে ঠেলে দেবার এবং অন্য হাত দিয়ে পিঠে বিদ্ধ বর্শাটি ধরে রাখার চেষ্টা করছিল। ততক্ষণে অন্য মুসলমানরাও সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। গোলাম হায়দর তলোয়ারের আঘাতে পরপর দুজনকে হত্যা করলো। বশীর কুড়ালের আঘাতে একজনকে একেবারে খতম করে ফেললো। বাকি শিখেরা দেউড়ি থেকে পালিয়ে বাইরের আঙিনায় সমবেত শিখদের সাথে মিশে গেলো।

শিখদের সংখ্যা এখানেও উপস্থিত মুসলমানদের তিনগুণেরও বেশি ছিল। এ আঙিনাটি মজিদ ও সেলিমের গুলীবর্ষণ থেকে নিরাপদ ছিল। মুসলমানদের মধ্যে

যারা লড়াই করে চলেছিল তাদের খুব কমই এখন এমন ছিল যারা কোনো রকম জখমী ছিল না। তবুও নারী ও শিশুদের হেফাজতের জন্য তারা প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছিল। আফজাল শেষবারের মতো হিম্মত করে একজন মৃত শিখের তরবারি উঠিয়ে নিয়ে দেউড়ি থেকে বের হলো এবং আঙিনায় একটি দেয়ালের সাথে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়ালো। দুজন শিখ পিছু হটতে হটতে তার কাছে এসে পড়লো এবং সে একের পর এক তাদের দুজনকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়ে দিল। এরপর তার হিম্মত নিঃশেষ হয়ে গেলো এবং সে জমিনে বসে পড়লো। শের সিংয়ের ভাই এগিয়ে এসে তার মাথায় কৃপাণের আঘাত হানলো এবং চিৎকার করে উঠলো, আমি আফজালকে মেরে ফেলেছি। আমি আফজালকে.....। বশির এগিয়ে এসে তার মাথায় কুড়াল মারলো। আফজালের পাশে পড়ে গিয়ে সে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলো।

আফজালের পতনের পর শিখদের হিম্মত বেড়ে গেলো। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে লড়তে লাগলো। আচানক মজিদ দুহাতে দুটো পিস্তল নিয়ে দেউড়ির পথে দৌড়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। দুই পিস্তল দিয়ে একের পর এক সে কয়েকটা ফায়ার করলো। হরি সিং দালানের দরোজায় পেট্রোল ছিটাচ্ছিল। একটি গুলী তার পিঠে বিদ্ধ হলো এবং সে সেখানেই ঢলে পড়লো। বাকি শিখেরা 'সুবেদার আ-গিয়া, সুবেদার আ-গিয়া' বলে এদিক ওদিক ভাগতে লাগলো। মজিদ আঙিনা পার হয়ে সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়ালো এবং বেছে বেছে শিখদেরকে গুলীবিদ্ধ করতে লাগলো। শিখেরা চরম হতাশার মধ্যে পরস্পর ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করতে করতে দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে দেউড়ী পার হয়ে পশুশালার হাবেলীতে এসে জড় হলো। এখান থেকে বাইরের ফটক পার হতে গিয়ে তাদের কয়েকজন সেলিমের গুলীর লক্ষ্যে পরিণত হলো। বাকি শিখেরা তাদের নিজের মহল্লার দিকে দৌড়াতে লাগলো। সেলিম ও মজিদ মসজিদের ছাদ কবজা করার পর প্রায় চারশ শিখ ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এখন তারা শিখদের গৃহের ছাদের ওপর উঠে নিজেদের অন্য সাথিদের ইন্তিজার করছিল। গ্রামের শিখ মহিলারা যার যার বাড়ির ছাদে উঠে বুক চাপড়ে চাপড়ে মুসলমানদেরকে গালি দিচ্ছিল।

এ সময় গ্রামের অন্যান্য অংশেও বেশ কিছু বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। কোনো কোনো মুসলমান পরিবার হামলার সময় নিজেদের শিখ প্রতিবেশীদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। আক্রমণকারীরা পিছপা হয়ে শিখদের মহল্লায় সমবেত হয়েছিল। গ্রামের কিছু কিছু শিখ তাদেরকে এই বলে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল যে, এসো, আমরা শিকার ঘিরে রেখেছি। ঘিরে রাখা শিকারের ওপর শক্তি পরীক্ষা করা কোনো কঠিন কাজ ছিল না।

চৌকিদার পীরান দিতা তার প্রতিবেশী আতর সিংয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। পীরান দিতার তিন ছেলেকে হত্যা করা হয়েছিল। আর তাকে ততক্ষণ জীবিত রাখা হয়েছিল যতক্ষণ তার মেয়ে চিৎকার ও অনুনয় বিনয় করতে এবং কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে মৃত্যুবরণ না করেছিল। তাকে কুলগাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল। সে চিৎকার করছিল, আল্লাহর দোহাই আমাকে মেরে ফেলো। আমি এ দৃশ্য দেখতে পারছি না। আমার চোখ দুটো বের করে নাও। দেখো, ওকে ছেড়ে দাও। ও এখন মরে গেছে।

মেহের দীন জেলা শহরের কারখানার একজন মজদুর ছিল। হামলার একদিন আগে সে তার মামুর ইন্তিকালের খবর শুনেছিল। সে গিয়েছিল তার ফাতেহাখানিতে। তার অনুপস্থিতিতে বেলা সিংয়ের স্ত্রী তার ছেলেমেয়েদেরকে নিজের গৃহে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছিল। বিকেলের দিকে পরাজিত বিক্ষুব্ধ শিখেরা গ্রামের পূর্ব দিকে আমবাগানে সমবেত হচ্ছিল। মেহের দীন ফিরে আসছিল। নিজের বাড়িতে যাবার জন্য সে আম বাগানের পথে প্রবেশ করলো। কিন্তু সেখানে শিখদের সমাবেশ দেখতে পেয়ে সাঁই আল্লারাখখার বাড়ির পথ ধরলো। আল্লারাখখার লাশ একটি আমগাছের ডালে লটকানো ছিল। তার ঘরের দরোজার সামনে দুজন অপরিচিত লোকের লাশ পড়েছিল। মেহের দীন আসার পথে দেখেছিল মুসলমানদের গ্রাম জ্বলছে। এখন বাগানে শিখদের সমাবেশ এবং এই লাশগুলি দেখার পর তার আর বুঝতে বাকি ছিল না যে, তার গ্রামেও শিখেরা হামলা চালিয়েছে। 'আমার স্ত্রী, আমার সন্তান, আমার মা' সে চিৎকার করে বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু তার আওয়াজ গলায় আটকে গেলো। সে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, আমি গরীব, আমি মজদুর, আমার কোনো দুশমন নেই। আমি কখনো কাউকে নারাজ করিনি। চাচা বেলা সিং নিশ্চয়ই লোকদেরকে জানিয়ে দিয়েছে 'এটা মেহের দীনের বাড়ি। সে তার মামুর ফাতেহাখানিতে গেছে। তার ছেলেমেয়েদের কিছুই বলো না। কয়েক দিন আগে সে জগত সিংকে বিশ টাকা ধার দিয়েছিল এবং এখনো তা শোধ করার জন্য তাগাদা করছে না।' কাজেই শিখদলকে নিশ্চয়ই মানা করে দিয়েছে সে। আর তাছাড়া চৌধুরী রহমত আলী, তার ভাই, ছেলে ও নাতিদের উপস্থিতিতে এ গ্রামের ওপর হামলা হতেই পারে না। তিনি কয়েক মাস থেকে এলাকার শিখদের হেফাজত করে আসছেন। কিন্তু এই সাঁই আল্লারাখখা এবং এই দুজন আগন্তুকের লাশ? এদেরকে নিশ্চয়ই ভুল করে মেরে ফেলেছে শিখেরা– তাছাড়া শরাবের নেশায় শিখেরা অনেক ভুল করে বসে।

শিখদের দালানে মেয়েরা চিৎকার করছিল। মেহের দীন মনে মনে বললো, তারা শিখ হামলাকারীদের বকুনি দিচ্ছে। তারা শিখদেরকে বলছে, এরা আমাদের গ্রামের মুসলমান মেয়ে, আমাদের বোন। তোমরা এখানে এসেছো কেন? তবুও এত বড় দলকে গালিগালাজ করা ভালো নয়। কখনো মানুষের গোস্বাও হয়। বিশেষ করে শিখেরা যখন শরাব পান করে জোটবদ্ধ হয়। তখন তারা কারোর ওপর ক্রোধ বর্ষণ

করলেই। সাঁই আল্লারাখখা এবং দুই আগন্তুক নিশ্চয়ই ওদেরকে গালাগালি করেছিল। এখন আবার কমবখত মেয়েগুলি ওদেরকে ভ্যাংচাচ্ছে। এসব খুব খারাপ কথা। গ্রামের শিখদের ওদের এই মর্মে বুঝানো উচিত, বোনেরা! তোমরা নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকো, আমাদের শিখ ভাইয়েরা তোমাদের কিছুই করবে না। তারপর বুদ্ধিমান লোকদের শিখদের কাছে এসে একথা বলা উচিত ছিল যে, সরদারজী! মেয়েদের বুদ্ধি শুদ্ধি একটু কম হয়। তাদের কথায় নারাজ হয়ো না। আমরা তোমাদের কাছে মাফ চাচ্ছি। ইন্দর সিং, বেলা সিং, লছমন সিং বাবা রহমত আলীও যদি তাদের সাথে যায় তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। বাবা রহমত আলী কয়েকবার শিখ ও মুসলমানদের সমবেত করে বক্তৃতা করেছেন। তাঁর কথা মানুষকে প্রভাবিত করে। আমি আমার স্ত্রীকে রেখে পালাতে পারি না। শিখদেরকে খালেসা জী! বা সরদারজী! বলে আহবান করলে তারা খুব খুশি হয়। আমি তাদেরকে সালাম করবো। বলবো, খালেসা জী, সালাম! সরদারজী, সালাম। আচানক তার মনে পড়লো শিখেরা 'ওয়াহগুরুজী কা খালেসা, ওয়াহ গুরুজী কী ফাতাহ' এবং 'সতশ্রী অকাল'ও বলে থাকে। এখন সে বড়ই পেরেশান হয়ে পড়েছিল। হায় যদি সে জানতো এ মুহূর্তে কোন বাক্যটি শিখদের কাছে বেশি পছন্দনীয়! এখন সে আল্লারাখখার বাড়ির পথ পরিহার করে বাগানের পথ ধরলো। তার পা কাঁপছিল। তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গিয়েছিল। তার জানা ছিল না সে কি বলবে। তবুও সে আগের বাক্যগুলি বারবার আওড়াচ্ছিল। হাঁটতে হাঁটতে থেমে যাচ্ছিল সে। তার হৃদস্পন্দন যেন বলছিল, 'মেহের দীন! পালাও।' কিন্তু মেহের দীন একটি সালামের বিনিময়ে নিজের স্ত্রী, সন্তান ও মায়ের জীবন ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছিল। তার অবস্থা এমন ব্যক্তির চাইতে কোনো অংশেই ভালো ছিল না যে অজগরের সামনে যাচ্ছিল তাকে ফুলের তোড়া উপহার দেয়ার জন্য তার চেতনা ও অনুভূতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যেখানে কাপুরুষতা ও সাহসিকতার মধ্যে পার্থক্যকারী সূক্ষ্মতম সীমারেখা মুছে গিয়েছিল।

একজন ঘোড়সওয়ারকে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে সতর্কতার সাথে একটি গাছের আড়ালে লুকালো সে। সওয়ার ঘোড়া থামিয়ে বললো, 'দলনায়ক সূর্যাস্তের আগে এখানে পৌঁছে যাবেন। ফউজের ডোগরা সিপাহীদেরকে তিনি জীপে চড়িয়ে এখানে আনবেন, তিনি বলে দিয়েছেন পথে কোথাও খানাখন্দক থাকলে তা যেন ভরাট করে দেয়া হয়।'

একজন শিখ প্রশ্ন করলো, কতজন সিপাহী আসবে?

আমি জানি না। তবে দলনায়ক আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি মুসলমানদের সমস্ত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে ছাই করে দেবেন।

তুমি কি শেঠ রামচান্দের কোনো খবর জানো?

হ্যাঁ, আমি তার বাড়িতে গিয়েছিলাম। বাড়ি থেকে ২টি রাইফেল এবং একবাক্স বারুদ নিয়ে তিনি এদিকে এসেছেন। তবে এখনো পৌঁছেননি!

শিখেরা অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো।
সওয়ার আবার বললো, অবাক কথা, তিনি এখান থেকে খালি হাতে গিয়েছেন এবং তারপর বারুদ ও দুটি রাইফেল নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ফিরে এসেছেন।
একজন শিখ বললো, তার ছেলেও লা পাত্তা হয়ে গেছে। তারা দুজন মনে হয় কোথাও ভেগে গেছে।
মেহের দীন গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে মনকে প্রবোধ দিচ্ছিল এই বলে, 'এখনো লড়াই শুরু হয়নি। এখনো লড়াই রোধ করা যেতে পারে। তারা এসে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিলে তারপর আর আগুন নিভানো সম্ভব হবে না। এখনো শিখরা ক্রুদ্ধ হয়নি। সম্ভবত এখনো তারা শরাব পান করেনি। এখনো কাকুতি মিনতি করে তাদের বুঝানো যেতে পারে। হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সে। সামনে এগিয়ে গেলো এবং দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে চিৎকার দিল ঃ 'ওয়াহ গুরুজী!..., সরদারজী কা খালসা!......... না জনাব.............অকালজী কী জয়........ না না জনাব সরদারজী সালাম!'
এর জবাবে শিখেরা চারদিক থেকে 'ধরো' 'পাকড়ো', 'মারো' বলে দৌড়ে আসতে লাগলো আর মেহের দীন কাঁপতে কাঁপতে পেছন দিকে সরে যেতে লাগলো। সে চিৎকার করে বলছিল, 'আমি বেকসুর, নিরপরাধ, আমি কাউকে গালি দেইনি। আমি একজন মজদুর। আমি কারোর কোনো ক্ষতি করিনি। আমার প্রতি রহম করো। আমি তো সালাম দিতে এসেছিলাম!
যখন শিখদের বল্লম ও কৃপাণের ব্যাপারে তার আর কোনো সন্দেহ রইলো না তখন অনন্যোপায় হয়ে সে লাফিয়ে পড়লো পাশের হাওড়ে। শিখেরা কূলে দাঁড়িয়ে তাকে গালিগালাজ করছিল এবং সে কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে অনুনয় বিনয় করছিল। শিখ দলে তার মজদুর সাথিরাও ছিল। সে বলছিল, করতার সিং! মনশা সিং! হরবনস সিং! আমি মেহের দীন। আমি তোমাদের মতই একজন মজদুর। আমি তোমাদের মতই গরীব। কারখানায় যখন হরতাল হয়েছিল, আমরা পরস্পরের সহযোগী ছিলাম। আমার মামা মারা গিয়েছিল। সেখান থেকে সোজা এখানে আসছি। তোমাদের দেখে মনে করলাম সালাম দিয়ে যাই। দেখো, দোস্ত! গালাগালি করো না। মা-বোন সবার সমান।
আরে এ তো মেহের দীন, বেলা সিং এগিয়ে আসতে আসতে বললো।
মেহের দীন অন্ধকারে একটা আলোর রেখা যেন দেখতে পেলো। সে চিৎকার করে উঠলো, হ্যাঁ, সরদারজী! ওদেরকে বুঝাও। আমি কারোর ক্ষতি করিনি। আমি তোমার প্রতিবেশী।
বেলা সিং বললো, উপরে উঠে এসো শুয়োর কা বাচ্চা! একটা মাটির ঢেলা তুলে নিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করলো মেহের দীনের মাথা লক্ষ্য করে। কয়েক হাত পেছনে হটে গিয়ে আরো পানিতে চলে গেলো সে। কয়েকজন শিখ জুতা খুলে হাওড়ের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মেহের দীন হাওড়ের মাঝখানে বুক সমান পানিতে

দাড়িয়ে চিৎকার করছিল, বেলা সিং, জগত সিং তোমরা আমার প্রতিবেশী। ছুটির দিনে আমি তোমাদের ক্ষেতে হাল চালাতাম। আমাকে বাঁচাও। ওদেরকে থামাও। আমার মা বৃদ্ধা। আমি সাত সন্তানের পেটে আহার যোগাই। তারা ভুখা মারা যাবে। আমার যুবতী মেয়েদের বিয়ে দেবার ব্যবস্থাও আমাকে করতে হবে। তাদের মা অসুস্থ থাকে।

জগত সিং জবাব দিল, তোমার মা তোমার বাপের কাছে চলে গেছে। তোমার বিবিকে আমরা অন্য জগতে পৌছিয়ে দিয়েছি। এখন আর তোমাকে কারোর জন্য কামাই করে আনতে হবে না। আমরা তোমার মেয়েদের বিয়েও করিয়ে দিয়েছি। এখন সোজা পানি থেকে উঠে এসো।

ভগতরাম ও তার ছেলে রামলালও কিনারায় দাঁড়িয়েছিল। রামলাল বলছিল, বদমাশ উপরে উঠে এসো। এই হাওড়ে আমাদের গাভীগুলি পানি পান করে। তোমার লাশ কে ওখান থেকে বের করে আনবে?

মেহের দীন এখন খামুশ হয়ে গিয়েছিল। তার মানসিক দ্বন্দ্ব এখন এখানে এসে থেমে গিয়েছিল যে, এটা কি সম্ভব? ওরা আমার বৃদ্ধ মাকে হত্যা করেছে, এটা কি সম্ভবপর হতে পারে? আমার বিবি ও বাচ্চাদেরকে হত্যা করেছে এবং আমার মেয়েদের সাথে............?

হাওড়ে ঝাঁপিয়ে পড়া পাঁচজন শিখ তার কাছে পৌছে গিয়েছিল। তাদের দুজন ছিল তার সহকর্মী। তাদের কৃপাণ ও চেহারা তার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। এখন তার মনে আর কোনো বিভ্রান্তি ছিল না। এখন তার আর কারোর ভয়ও ছিল না। সে শেষ বারের মতো চিৎকার করে উঠলো, 'এসো আমাকে মেরে ফেলো। আমি মৃত্যুকে ডরাইনা।'

একজন শিখ এগিয়ে গিয়ে তার মাথায় কৃপাণ মেরে দিল। কিনারায় দাঁড়ানো দর্শকরা হৈ হৈ করতে করতে আওয়াজ বুলন্দ করলো, 'বলো সৎশ্রী অকাল। পানির মধ্যে খাবি খাওয়া লাশের ওপর একের পর এক পাঁচজন শিখ তাদের কৃপাণের ধার পরীক্ষা করে চললো।

চৌধুরী রমজান তার প্রতিবেশী লছমন সিং ছাড়া আর কারোর ওপর ভরসা করতে পারছিল না। হামলা হবার কিছুক্ষণ আগে ইসমাঈল এসে তাকে বলে গিয়েছিল, এখনই সপরিবারে আমাদের হাবেলীতে চলে এসো। কিন্তু সে লছমন সিংয়ের সাথে পরামর্শ করলো। লছমন সিং বললো, আমাদের গ্রামের দিকে নজর উঠিয়ে দেখার দুসাহস কে করবে! এরপরও যদি তুমি ভয় পেয়ে থাকো, তাহলে বিবী, মেয়ে ও ছেলের বৌকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। যে তাদের কাছে আসার চেষ্টা করবে তাদেরকে আমার লাশ মাড়িয়ে আসতে হবে।

রমজানের ছেলে জালাল গ্রামের বাইরে গিয়েছিল পশু চরাতে। রমজান তার স্ত্রী মেয়ে, ও ছেলের বৌকে লছমনের বাড়িতে পৌছিয়ে দিয়ে নিজে চললো ছেলের খোঁজে। গ্রামের বাইরে আসতেই সে শিখ আক্রমণকারী দলকে গ্রাম অভিমুখে আসতে দেখলো। পিছন ফিরে এক ছুটে লছমন সিং-এর হাবেলীতে প্রবেশ করে চিৎকার করে বললো সে, লছমন সিং আক্রমণকারী দল এসে গেছে। তুমি জালো জালাল পশুপাল নিয়ে কোনদিকে গেছে? তোমার ছেলেও তার সাথে ছিল। বালা লছমন সিং তুমি জানো?

লছমন সিংয়ের নিরবতায় রমজান বললো, লছমন! আমি নালার দিকে যাচ্ছি, তুমি অন্যদিকে যাও। ভাবীকে মেয়েদেরকে ভিতরে লুকিয়ে রাখতে বলো। জলদি করো।

লছমন সিং এগিয়ে এসে দরোজা বন্ধ করে দিয়ে বললো, এ দল অন্যদিকে যাচ্ছে। তুমি ভেতরে এসে বসো।

গুলী চালানোর আওয়াজ এলো। রমজান বললো, দেখো ওরা হামলা শুরু করে দিয়েছে। সে এগিয়ে গিয়ে দরোজার শিকল খোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু লছমন সিং তার হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে গেলো। রমজান বলছিল, আরে ভাই আমাকে ছেড়ে দাও। আমার জালাল বাইরে আছে। আমি তাকে নিয়ে আসছি। দেখো গুলী চলছে। যদি সে মারা পড়ে তাহলে আমার বেঁচে থেকে কি লাভ। ভাই, তুমি যদি আমার জন্য আশংকা বোধ করো তাহলে নিজে বাইরে গিয়ে জালালকে নিয়ে এসো।

লছমন সিং তাকে দালানের দরোজার কাছে টেনে এনে জোরে ভেতরের দিকে ধাক্কা দিল। দহলিজের দেয়ালের গায়ে ঠুক গেলো রমজানের পা এবং মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো সে ঘরের ভেতর। কৃপাণ সজ্জিত পাঁচ জন শিখ সেখানে বসে মদপান করছিল এবং রমজানের স্ত্রী ও মেয়ে একটি দেয়ালের গায়ে ঠেসে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিল। রমজানের ছেলের বউ তার এক বছরের বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে কাঁদছিল। তবুও রমজান এখনো বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল। সে উঠে বসতে বসতে বললো, লছমন সিং, তোমার দিলটা বড় শক্ত। যদি জালালের মতো তোমার কোনো ছেলে বাইরে থাকতো এবং তোমাকে কেউ বাইরে যেতে বাধা দিতো তাহলে তুমি তার সাথে ঝগড়া করতে। ভাই আমাকে বাইরে যেতে দাও, আল্লাহর দোহাই।

গ্রামের একজন শিখ বললো, চৌধুরী এদিকে আয়। তোর এখানে দরকার।

রমজান বললো, তোমরা এখানে কি করছো? গ্রামের ওপর হামলা হয়েছে। শোনো, রহমত আলীর হবেলীর দিকে গুলী চলছে। যাও, ওদেরকে থামাও। আজ পর্যন্ত বাইরের কোনো বদমাশ এই গ্রামে প্রবেশ করতে পারেনি। আজ তোমাদের বউ বেটিরা বদমাশদের গালি গালাজ শুনছে আর তোমরা এখানে বসে শরাব পান করছো। এ সময় পুরুষরা ঘরে বসে থাকে না। এটা গ্রামের ইজ্জতের ব্যাপার। লছমন সিং, এদের বাইরে বের করে দাও।

জনৈক শিখ এগিয়ে এসে রমজানের দাড়ি টেনে ধরলো এবং দ্বিতীয় জন হো হো করে হেসে উঠলো।

লছমন সিং বললো, ভাই যা কিছু করার জলদি করো।

এক শিখ বললো, বল, তোকে গলা টিপে মরবো, না জবাই করবো?

রমজানের স্ত্রী চিৎকার করলো, ওকে ছেড়ে দাও! ওকে ছেড়ে দাও! লছমন সিং তোমার আল্লাহর দোহাই, তুমি ওকে ভাই বানিয়েছিলে।

অন্য একজন শিখ বললো, মার ডালো এই বুড়িকে! এই ধরনের মস্করা করা ভালো নয়।

একজন শিখ কৃপাণ উঁচু করে বললো, তোর সাথে যে মস্করা করে তার বউয়ের স্যান করেংগা ত্যান করেংগা। কিন্তু লছমন সিং এগিয়ে এসে তার হাত ধরে ফেললো এবং বললো, আরে ভাই এখানে নয়, একে বাইরে নিয়ে যাও।

রমজানের স্ত্রী চিৎকার করতে করতে এগিয়ে এলো। কিন্তু লছমন সিং তাকে মেরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। কয়েক কদম দূরে গিয়ে সে আছড়ে পড়লো। তিনজন শিখ রমজানকে ধরে টেনে হিঁচড়ে হাবেলীর আঙিনায় নিয়ে গেলো এবং বাকি দুজন ওখানে রয়ে গেলো। রমজানের মেয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে লছমনের স্ত্রীর বাহু আঁকড়ে ধরে বললো, চাচী তুমি আমাকে মেয়ে বানিয়েছিলে, আমার আব্বাকে বাঁচাও। রমজানের ছেলের বউ বললো, মাসী, আমাদের কোনো ভুল হয়ে থাকলে মাফ করে দাও। তুমি বলতে, ইলম দীন তোমার নাতি। এর জন্মের পর তুমি গুড় বিতরণ করেছিলে। আমাদের বাঁচাও মাসি।

লছমন সিংয়ের স্ত্রী তবুও তো একজন নারী। সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, আমার কথা কে শোনে? এখন তোমরা দুজন অমৃত পান করো এবং ভাবী তুমিও পান করো।

মেয়েরা সন্ত্রস্তভাবে আবার দেয়ালের গা ঘেঁসে দাঁড়ালো।

একজন শিখ বললো, তুমি চিন্তা করো না, আমি ওদেরকে অমৃত পান করাচ্ছি।

বাইরে হাবেলীর আঙিনায় রমজান চিৎকার করছিল, লছমন সিং! আমি কি করেছি? তোমার দৃষ্টি আজ বদলে গেলো কেন? আমি সেই রমজানই আছি। তুমি আমার প্রত্যেক কথায় হাসতে। লছমন সিং মনে আছে, একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে তুমি বলেছিলে, রমজান যদি মরে যায় তাহলে সমস্ত গ্রামটাই সুনসান হয়ে যাবে। আল্লাহর দোহাই, আমাকে বলো আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি। যদি আমার গ্রামে থাকা তুমি পছন্দ না করে থাকো তাহলে আমি অন্যত্র চলে যাবো। আমার গরু মোষ সব তুমি নিয়ে নাও। সাওন সিং, সুবা সিং, বলো আমি তো তোমাদের কোনোই ক্ষতি করিনি। তোমরা আমার প্রত্যেক কথায় হাসতে, আজ হাসছো না কেন? আজ তোমাদের কি হয়ে গেলো! আমার বউ বাচ্চাদের ছেড়ে দাও। লছমন সিং, ভাই লছমন সিং, না, না, আল্লাহর দোহাই.............

একজন শিখ কৃপাণ চালালো। রমজানের মাথা ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেলো। রমজানের মেয়ে চিৎকার করতে করতে বাইরে বের হয়ে এলো।

একজন শিখ এগিয়ে গিয়ে তার বাহু ধরে টেনে আনলো। রমজানের ছেলের বউও বাইরে বের হবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু দুজন শিখ তার পথরোধ করলো। এমন সময় বাইর থেকে কেউ হাবেলীর দরোজায় ধাক্কা দিয়ে বললো, বাপু! দরোজা খোলো।

লছমন সিং এগিয়ে গিয়ে শিকল খুলে দিল। তার ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে ভেতরে ঢুকলো। সে বললো, বাপু! জালাল আমার হাত থেকে ছুটে পালিয়ে গেছে। সে আমার কৃপাণ ছিনিয়ে নিয়েছে।

একথা শুনে অন্য শিখেরা হা হা করে হেসে উঠলো। লছমন সিং রাগত স্বরে বললো, জালাল তোর কৃপাণ ছিনিয়ে নিয়েছে? বেহায়া ডুবে মর!

ছেলে বললো, বাপু! আমি কৃপাণ মারলে সে নালায় লাফিয়ে পড়ে। আমি তার পিছু নিই। এ সময় আমার প্যান্টের বেল্ট খুলে যায়। তা ঠিক করতে গেলে সে আমার কৃপাণটা নিয়ে পালিয়ে যায়।

একজন শিখ হাসতে হাসতে বললো, এতক্ষণ সে পাকিস্তান পৌঁছে গেছে।

না, সে এদিকেই এসেছে। হয়তো তাদের বাড়িতে লুকিয়ে আছে। আচ্ছা, আমি দেখে আসছি।

লছমন সিং বললো, ভগত সিং, ওর সাথে যাও।

আর একজন শিখ বললো, আমি ওদের সাথে যাচ্ছি।

লছমন সিংয়ের ছেলের সাথে প্রাচীর টপকে দুজন শিখ রমজানের বাড়িতে প্রবেশ করলো। কিছুক্ষণ পরে তারা ফিরে এলো।

লছমন সিং বললো, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে আর এদিকে আসবে না। এখন তোমরা আমার সাথে ফায়সালা করে নাও।

একজন শিখ বললো, আমাদের ফায়সালা হয়ে গেছে। জালালের স্ত্রীর জন্য আমরা তোমাকে দুইশত এবং বোনের জন্য তিনশত টাকা দিচ্ছি। আর এই বুড়ির জন্য সাওন সিং থেকে পনর বিশ টাকা নিয়ে নাও।

লছমন সিং বললো, ব্যস তাহলে এখন দ্রুত টাকা বের করো। নয়তো দলনায়ক এসে গেলে নিলামে উঠবে এবং তখন এদের দাম বেড়ে যাবে। আর তখন আমির কিছু পাবো না।

লছমন সিংয়ের ছেলে বললো, বাপু! জালালের বোনকে আমি নিজের কাছে রাখবো।

জালাল তাদের গৃহ ও লছমন সিংয়ের হাবেলীর মাঝখানের দেয়ালের সাথে লাগানো দেবদারু গাছের ঘন ডালপাতার মধ্যে লুকিয়ে বসেছিল। তার হাতে ছিল লছমন সিংয়ের ছেলের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া কৃপাণটি। নিজের বাপের লাশ দেখার এবং শিখদের কথাবার্তা শোনার পর কয়েকবার তার গাছ থেকে হাবেলীতে লাফিয়ে পড়ে ওদের থেকে প্রতিশোধ নেবার কথা মনে হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকবার সে হিম্মতহারা হয়ে পিছিয়ে গেছে।

লছমন সিং তার প্রতিবেশীর গৃহের আবরুর মূল্য পেয়ে গিয়েছিল এবং এখন সে নোটগুলি গুণে নিচ্ছিল।

আঙিনা থেকে একজন শিখ তার সাথিদের আওয়াজ দিল, আরে ভাই তোমরা ভেতরে কি করছো? ওদেরকে নিয়ে এসো। জলদি করো।

রমজানের বিবি বাইরে বের হয়েই দৌড়ে তার স্বামীর লাশের ওপর আছড়ে পড়লো।

একজন শিখ জালালের স্ত্রীর হাত থেকে তার বাচ্চাটা ছিনিয়ে নিয়ে উপরের দিকে ছুঁড়ে মারলো এবং অন্য একজন শিখ বাচ্চা লক্ষ্য করে বাতাসে কৃপাণ ছুঁড়ে দিল। ফলে জমিনে পড়ার আগে তার একটি ঠ্যাং কেটে গেলো। তার মা চিৎকার করতে করতে দৌড়ে এগিয়ে এলে একজন শিখ তার মাথার চুল ধরলো। বাচ্চাটাকে আবার শূন্যে নিক্ষেপ করা হলো এবং এবার কৃপাণের অগ্রভাগে তাকে গেঁথে ফেলার প্রাকটিস করা হলো।

জালাল চিৎকার করে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লো এবং একটা গুলী খাওয়া বাঘের মতো শিখদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার স্ত্রীর চুল টেনে ধরেছিল যে শিখটি সে হলো তার প্রথম শিকার। দ্বিতীয় আঘাত হানলো সে শাওন সিংয়ের ওপর। সে তার মাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তাকে এক আঘাতে খতম করে দিল। জালালের স্ত্রী মৃত শিখটির কৃপাণ তুলে নিয়ে লছমন সিংয়ের ওপর আক্রমণ করলো। লছমন সিং ভয় পেয়ে পিছে হটলো। একটি খুঁটির সাথে পা আটকে গিয়ে সে চিত হয়ে পড়ে গেলো। জালালের স্ত্রীর কৃপাণ তার উরু ভেদ করলো। সে দ্বিতীয় আঘাত করতে চাচ্ছিল এমন সময় পিছন থেকে একজন শিখ তার মাথায় কৃপাণ মারলো। তার মাথার খুলি দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। ততক্ষণে জালাল আর একজন শিখকে নিহত করেছিল। আর অন্যেরা তার একের পর এক হামলায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। লছমন সিংয়ের ছেলে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছিল। সে জালালের পেছনে এসে পূর্ণ শক্তিতে আক্রমণ করলো। তার কৃপাণ জালালের কাঁধে ছ'ইঞ্চি দেবে গেলো। সে পড়ে গেলো এবং শিখেরা তার ওপর শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার শরীরের এক একটি অংশ কয়েক খণ্ড করে কাটা হচ্ছিল। তার বোন তখনো দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। এবার সে আচানক একজন মৃত শিখের কৃপাণ উঠিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলো। শিখেরা নিশ্চিন্তে জালালের লাশকে বিকৃত করে চলছিল। লছমন সিং চিৎকার করলো। পিছে দেখো......... হুশিয়ার। তার ছেলে ভীত হয়ে পিছন ফিরলো। কিন্তু সে কোনো প্রকার বাধা দেবার আগেই জালালের বোনের কৃপাণ তার একটি বাহু কেটে ফেললো। মেয়েটি দ্বিতীয় আঘাত করতে চাইলো কিন্তু একজন শিখ তার বাহু ধরে টান দিয়ে তাকে নিচে ফেলে দিল। সে তার পোশাক ছিঁড়ছিল। হিংস্র পশুর মতো দাঁত দিয়ে তাকে কামড়াচ্ছিল। তার মা তাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। লছমন সিং উঠে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে

এগিয়ে গেলো এবং কৃপাণ মেরে জালালের মায়ের মাথা গর্দান থেকে আলাদা করে দিল।

জালালের বোন জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। জনৈক শিখ তার সাথিকে বললো, চলো করতার সিং এবার ওকে নিয়ে চলো। এর জন্য অনেক চড়া দাম দিতে হলো।

হামলাকারীরা পিছু হটার পর সেলিমদের বাড়িতে একটা সাময়িক নিরবতা নেমে এলো। এতক্ষণের লড়াইর হাংগামা থেকে এটা ছিল অনেক বেশি ভয়ানক ও বেদনাদায়ক। নারী ও শিশুরা দালানের বাইরে এসে নির্বাক স্থবিরের মতো শহীদদের লাশ দেখছিল। তাদের বুকের মধ্যে কিয়ামতের ঝড় বয়ে চলছিল কিন্তু মুখে কোনো ভাষা ছিল না। কথা বলার সাহসই ছিল না কারোর। মুখ দিয়ে একটু শব্দও করছিল না কেউ। তাদের সবার চেহারায় একটা ফরিয়াদ ফুটে উঠেছিল, তাকে দেখা যেতে পারে কেবল, শোনা যেতে পারে না। কাঁপা কাঁপা হাতে তারা আহতদের ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধছিল। পুরুষদের মধ্যে কেউ 'এখন কি হবে' এ প্রশ্ন করার হিম্মত রাখতো না। সবাই অনুভব করছিল সয়লাবের দ্বিতীয় স্রোত প্রথম স্রোতের চাইতে অনেক বেশি বেগবান ও ধ্বংসকর হবে। মৃত্যু সবার সামনে জীবনের তুলনায় অনেক বেশি নিকটতর ছিল।

দুশমনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্র মজিদ কয়েকজনের মধ্যে বন্টন করে দিল। সেলিম বশীরকে সংগে নিয়ে ক্ষেতের দিকে ছুটলো। সেখান থেকে লুকানো রাইফেল ও বারুদ উঠিয়ে আনলো। ফজ্জু পাহলোয়ানের কর্তব্য পরায়ণতার কারণে সে দেবদারু গাছের তলা থেকে আরো দুটি রাইফেল ও বারুদ ভর্তি বাক্সও তুলে আনলো।

সেলিম ও মজিদ ছাড়া আরো তিনজন বন্দুক চালানো জানতো। তারা বাকি লোকদেরকে আগামীর লড়াইর জন্য প্রস্তুত করছিল।

সেলিম এক নওজোয়ানকে বুঝাচ্ছিল! দেখো বন্দুক এভাবে ধরো, ঘোড়াটি এভাবে টানো, গুলী এভাবে ভরো, ট্রিগার এভাবে দাবাও, এভাবে নিশানা নাও। দেখো তোমার হাত নড়ছে। হাত নড়লে চলবে না। বন্দুক কাঁধের সাথে দাবিয়ে রাখো।

সেলিমের মা সামনে এসে তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে কম্পিত স্বরে বললেন, সেলিম! ইউসুফের কোনো খবর নেই।

মার শোকার্ত চেহারা সেলিমের কাছে অসহনীয় ছিল। সে জিজ্ঞেস করলো, ইউসুফ কি বাড়িতে নেই?

হামলার কিছু আগে ইউসুফ বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু ফিরে আসেনি।

আম্মীজান! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। একথা বলতে বলতে সেলিম আবার তার সাথিদের দিকে দৃষ্টি দিল। তোমরা কি দেখছো? ম্যাগজিনে গুলী ভর্তি করে আমাকে দেখাও।

মা কয়েক মিনিট সেলিমকে দেখতে থাকলেন। কিন্তু সে দ্বিতীয়বার তার দিকে তাকালো না। সে এখন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নির্দেশ দিচ্ছিল। পিপাসায় তার ঠোঁট শুকিয়ে যাচ্ছিল। মা নীরবে অশ্রু মুছে ফেলে ভেতরের হাবেলীতে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার বাইরে এলেন। এবার তার একহাতে ছিল পানিভর্তি জগ এবং অন্য হাতে একটি গ্লাস। 'নাও, বেটা! তোমার পিপাসা লেগেছে।' গ্লাস ভর্তি করে ছেলের দিকে বাড়াতে বাড়াতে তিনি বললেন। সেলিম চুপটি করে গ্লাস ঠোঁটে লাগিয়ে পানি পান করলো। তারপর মা মজিদকেও পানি পান করালেন। তারপর তারা দুজন আবার তাদের কাজে লেগে গেলো। মা কিছু বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু বলার হিম্মত ছিল না। সেলিমের চেহারা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল তার ভাইয়ের জন্য সে কম পেরেশান নয়। আচানক সে মায়ের দিকে ফিরে বললো। আম্মি আপনি চলে যান। যদি আল্লাহ তার জীবন মঞ্জুর করে থাকেন তাহলে কেউ তার পায়ের নখেও আঁচড় কাটতে পারবে না।

মা চরম হতাশার মধ্যে ধীরে ধীরে কদম বাড়িয়ে দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করছিলেন এমন সময় মজিদ ডেকে বললো, চাচীজান! ইউসুফ এসে গেছে।

মা ফিরে দেখলেন। ইতিমধ্যে ইউসুফ হাবেলীর দেয়াল টপকে লাফিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছিল। তার সাথে ছিল কাকু ঈসায়ী। মা নিরবে ইউসুফের ইন্তিজার করতে লাগলেন। কিন্তু সে মায়ের কাছে না এসে দৌড়ে সেলিমের কাছে গেলো। সে হাঁপাচ্ছিল এবং তার জামা ঘামে ভিজে গিয়েছিল। মা কয়েক কদম এগিয়ে এলেন। কিন্তু ইউসুফ তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে জমিনে পড়ে থাকা একটি রাইফেল তুলে নিল। সেলিম প্রশ্ন করলো, তুমি কোথায় ছিলে?

ইউসুফ জবাব দেবার পরিবর্তে পাশে তাকিয়ে কাকুকে দেখলো। কাকু এগিয়ে এসে বললো, আপনাদের হাবেলীতে যখন শিখ হানাদাররা হামলা করেছিল তখন ইউসুফ বাবা আলী মুহাম্মদের বাগানে বসে কিতাব পড়ছিল। আমি সেখানে ঘাস কাটছিলাম। বন্দুকের আওয়াজ শুনতেই ইউসুফ গ্রামের দিকে দৌড় দিতে চাইলো। কিন্তু আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। আমরা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে লুকিয়ে গ্রামের কাছাকাছি পৌছলাম। তখন লড়াই চলছিল এবং হাবেলীতে পৌছার সমস্ত পথ বন্ধ ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও ইউসুফ এখানে পৌছুতে চাচ্ছিল। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, চলো পুলিশের কাছে যাই, আমরা শহরের পথে দৌড়ালাম। কিন্তু পথে দেখি ফউজ ও পুলিশের শিখ সিপাইরা মুসলমানদেরকে গুলী করছে। এদৃশ্য দেখে আমরা আবার উলটা গ্রামের দিকে দৌড় দিলাম। পথে শিখদের দল ছিল। তাই আমরা চক্কর কেটে ফসলের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে এলাম। আমরা বেলা সিংদের বাগানের পাশে আখের ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে তাদের কথা শুনে এসেছি। সন্ধ্যা নাগাদ

তাদের সাহায্যার্থে আরো কয়েকটা দল পৌঁছে যাবে। তখন তারা পুনরায় হামলা করবে।

সেলিম মজিদের দিকে তাকিয়ে বললো, মজিদ! আমরা যদি ওদের [illegible] দিতে পারি তাহলে সম্ভবত আমরা কিছু সময় পেয়ে যাবো।

মজিদ একটুখানি ভেবে নিয়ে বললো, তুমি পাঁচজন লোক নিয়ে এখানে থাকো। আমি বাকি লোকদেরকে নিয়ে যাচ্ছি। ফটক বন্ধ রাখার জন্য কয়েকটা মজবুত খোঁটা তুলে নিয়ে দরোজার সামনে গেঁড়ে দাও।

পাঁচটা বেজে গিয়েছিল এবং গ্রামের বাইরে বাগানে সমবেত শিখেরা অধৈর্য হয়ে শহর থেকে আগমনকারী সাহায্য দলের অপেক্ষা করছিল। ছটা বেজে গেলে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, এখন কি করা হবে?

একটি দলের নেতা বললো, আমাদের শহরের দিকে যাওয়া উচিত। যদি দলনায়ককে পথে পাওয়া যায় তাহলে তাকে সংগে করে নিয়ে আমরা ফিরে আসবো। অন্যথায় শহরে গিয়ে তাকে নিয়ে আসতে হবে। হয়তো বাউন্ডারী ফোর্সের মুসলমান সিপাইরা আজ রাতে এ এলাকায় পৌঁছে যাবে এবং দলনায়ক আজ রাতে আর এই গ্রাম আক্রমণ করতে পারবে না।

অন্য এক দলনেতা উঠে বললো, এমন অবস্থায় আমাদের শহরের দিকে যাওয়া হবে আরো বেশি বিপদজনক। আমার মতে গ্রামের চারদিকে আমাদের ঘেরাও করা উচিত, যাতে রাতের বেলা এরা পালিয়ে যাবার চেষ্টা না করতে পারে। এই সাথে আর একজনকে দলনায়কের কাছে পাঠিয়ে দেয়া দরকার।

তৃতীয় একজন শিখ দাঁড়িয়ে বললো, ওরা আমাদের কাছ থেকে কিছু বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছে। আমার ভয় হচ্ছে, তারা যদি বন্দুক নিয়ে বাইরে এসে যায় তাহলে আমরা যদি এখানেই বসে থাকি তাহলে আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে মুসলমানরা দলবদ্ধ হয়ে আমাদের গ্রাম আক্রমণ করতে পারে। তাই আমরা চলে যাচ্ছি। দলনায়ক সেনা বাহিনী নিয়ে পৌঁছে গেলে আমরাও চলে আসবো।

সেলিমদের গ্রামের একজন শিখ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সরদারজী! আপনাদের আক্রমণ করবে, এ সাহস কি মুসলমানদের আছে? এখন যদি আপনারা এখান থেকে চলে যান তাহলে আমাদের গ্রামের মুসলমানদের সাহস অনেক বেড়ে যাবে। তারা এক রাতের মধ্যে আশপাশের সমস্ত গ্রামের মুসলমানদের এখানে জমায়েত করে ফেলবে।

অন্য এক গ্রামের নেতা বললো, আরে ভাই! তোমরা নিজেদের বিপদটাই দেখছো। তোমরা চাও আমরা এখানে বসে তোমাদের গ্রামের হেফাজত করি আর

নিজেদের গ্রাম অন্যদের জন্য ছেড়ে দিই। তোমরা আমাদের ধোকা দিয়েছো। তোমরা বলতে, এরা মোকাবিলা করবে না। তোমরা বলতে, তোমাদের যদি পঞ্চাশজন লোক এবং চারটি বন্দুক দেয়া হয় তাহলে তোমরা দশ মিনিটে এদের খতম করে দেবে। তবুও আমরা তোমাদের জন্য সমস্ত শিখদেরকে একত্র করলাম। কিন্তু যখন লড়াই শুরু হলো তোমরা আমাদের এগিয়ে দিয়ে নিজেরা পিছনে চলে গেলে। তোমরা বাইরের লোকদের হত্যা করিয়েছো এবং নিজেদের শরীরে একটা আঁচড় লাগতে দাওনি।

এ কথায় সেলিমের গ্রামের এক নওজোয়ান শিখ ক্ষেপে গেলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আচ্ছা সরদারজী! তাহলে তুমি এখন আমাদের বুজদিল বলে ধিক্কার দিচ্ছো। আমরা তো প্রথমেই হাতজোড় করে তোমাদের বলে দিয়েছিলাম, আমাদের গ্রামকে আমাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। গোলাপ সিংও তোমাদের বুঝিয়েছিল কিন্তু তোমরা তাকে হত্যা করেছো। আর এখন আমাদের কাপুরুষতার ধিক্কার দিচ্ছো। অথচ তোমরা নিজেরাই বুজদিল এবং পালাবার সময় নিজেদের বন্দুকও ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছো।

অন্য গ্রামের শিখরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং গালাগালি করতে করতে হাতাহাতিও শুরু হয়ে গেলো।

একজন শিখ ঘোড়া ছুটিয়ে এলো এবং তাকে দেখে শিখদের জোশ কিছুক্ষণের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। সে বললো, দলনায়ক বলেছেন, তিনি আগামীকাল সকালে পঞ্চাশজন লোক নিয়ে এখানে আসবেন। আজ রাতে তিনি অন্য গ্রাম আক্রমণ করছেন।

তিনি বন্দুক পাঠালেন না কেন?

আমি রাইফেল চেয়েছিলাম। জবাবে তিনি আমাকে গুলী করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন, আমি তোমাদের হাতিয়ারও দেবো আবার সেগুলি রক্ষা করার জন্য সিপাহীও দেবো, এটা হতে পারে না। তিনি হাত বোমা দিয়েছেন এবং বলেছেন, যদি তোমরা বেনিয়ার বাচ্চা না হয়ে থাকো তাহলে এই বোমা কটা ওদের হাবেলীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট হবে। রাতের বেলা তোমরা এ বোমা নিক্ষেপ করার সুযোগ পাবে। আর যদি তোমাদের এ সাহস না থাকে তাহলে খৃষ্টানদেরকে বাধ্য করো। তারা রাতের বেলা সহজেই ওদের হাবেলীর কাছাকাছি গিয়ে বোমা ফেলে আসতে পারবে।

একজন শিখ বললো, এ গ্রামের লোকেরা খৃষ্টানদেরকে কাজে লাগাতে পারে।

অন্য একজন শিখ বললো, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়বে না।

তাদেরকে বাধ্য করা যেতে পারে।

কিন্তু তারা তো বোমা নিক্ষেপ করা জানে না।

আমি তাদেরকে শিখিয়ে দেবো। ফউজের একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিখ বললো। দাও বোমা দাও।

সওয়ার তার গলা থেকে বোমাভর্তি থলে বের করছিল এমন সময় পার্শ্ববর্তী ক্ষেত থেকে বন্দুকের গুলী বর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। হতচকিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় শিখেরা শোরগোল ও চিৎকার করতে করতে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। প্রথম গুলীটা লাগলো দলনায়কের পাঠানো দূতের গায়ে। তার ঘোড়া দিশেহারা হয়ে এক লাফ দিল এবং সে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলো। এক মুহূর্তে ময়দান খালি হয়ে গেলো। মজিদ দৌড়ে ক্ষেতের ভেতর থেকে বের হয়ে এলো এবং বোমাভর্তি থলেটি উঠিয়ে নিল। তার সাথিরাও ক্ষেত থেকে বের হয়ে এলো এবং এদিক ওদিক পলায়নপর শিখদেরকে গুলী করতে লাগলো।

ময়দানে যখন একজন শিখও দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল না তখন বশীর বললো, আল্লাহর কসম মজিদ আমার একটি নিশানাও ব্যর্থ হয়নি।

ইউসুফ বললো, ভাইজান! দেখলেন তো, আপনি বলছিলেন আমি রাইফেল চালাতে পারবো না, আমি সেই মোটা শিখটিকে ফেলে দিয়েছি।

মজিদের আব্বার আশি বছরের চাচা মোহাম্মদ আলী বললো, আফসোস! হামলা হবার পূর্বে যদি আমরা এ বন্দুকগুলি পেতাম।

মজিদ বললো, বাবা! তকদীরে আমাদের জন্য লেখা হয়ে গেছে বিজয় অথবা ইজ্জতের মৃত্যু। এখন ওরা ইঁদুর বিড়ালের মতো আমাদের মারতে পারবে না। এই দেখুন আমার হাতে বোমাভর্তি থলে। এটা কুদরাতের ইনাম।

বৃহত্তর শিখ দলের এ অবস্থা দেখে গ্রামের শিখ ও হিন্দুরা বালবাচ্চা নিয়ে দলে দলে গ্রাম ত্যাগ করতে লাগলো। কেউ কেউ তাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করলো। কিন্তু মজিদ ধমক দিয়ে তাদের সরিয়ে নিল।

মজিদ ও তার সাথিরা আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে হাবেলীর দিকে ফিরে যাচ্ছিল। হাবেলীতে সমবেত লোকেরাও তাদের জবাবে আল্লাহু আকবর শ্লোগান দিচ্ছিল। আচানক আশপাশের ক্ষেতগুলি থেকেও শ্লোগানের জবাব আসতে থাকলো।

মজিদ তার সাথিদেরকে বললো, তোমরা এখনি হবেলীর মধ্যে প্রবেশ করো। সম্ভবত শিখেরা প্রতারণা করে আমাদের ওপর আক্রমণ করতে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে হাবেলীতে সমবেত লোকেরা দালানের ছাদে উঠে গেলো এবং শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় ক্ষেতের দিকে দেখতে লাগলো। শ্লোগানের আওয়াজ ধীরে ধীরে কাছে আসতে লাগলো।

ক্ষেতের মধ্য থেকে একজনকে বের হয়ে আসতে দেখে মজিদ চিৎকার করে উঠলো, কে?

'মজিদ আমি।' লোকটি বলে উঠলো।

কে? দাউদ?

হ্যাঁ, আমি।

দাউদের পেছন থেকে পনর বিশজনের একটি দল বের হলো। মজিদ বললো, এখন ফটক খোলা কঠিন হবে। তার চেয়ে বরং তোমরা প্রাচীর টপকে চলে এসো। তোমাদের সাথে আরো মুসলমানও আছে?

হ্যাঁ অনেক লোক আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদের হাবেলীতে আর তিল ধারনের জায়গা থাকবে না। লোকেরা অনেক দূর পর্যন্ত ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

সবাইকে ডেকে আনো। আমি বাইরে দেয়ালের সাথে সিঁড়ি লাগিয়ে দিচ্ছি।

দাউদের সাথিরা ক্ষেতের মধ্যে লুকানো লোকদেরকে আওয়াজ দিল। ধারে কাছে লুকানো লোকেরা তাদের পয়গাম অন্যদের কাছে পৌছিয়ে দিয়ে ক্ষেতের বাইরে বের হয়ে আসতে লাগলো। আধ ঘন্টার মধ্যে হাবেলীতে তিন'শ পুরুষ, নারী ও বাচ্চা সমবেত হয়ে গেলো। কেউ বলছিল আমার সমস্ত পরিবার খতম হয়ে গেছে। কেউ বলছিল, আমার খান্দানে আমি ছাড়া আর রয়ে গেছে মাত্র এক বৃদ্ধ ও একটি কচি শিশু।

'শিখেরা আমাদের গ্রামের এতজন মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।'

'আমাদের গ্রামে এতজন মেয়ে কূয়ায় লাফিয়ে পড়েছে।'

'আমার দুধের বাচ্চাটাকে শূন্যে নিক্ষেপ করে বর্শার আঘাতে হত্যা করেছে।'

'ওমুক গ্রামে শিখ সৈন্যরা সমস্ত পুরুষকে মেরে ফেলেছে এবং জোয়ান মেয়েদেরকে লাঞ্ছিত করেছে।'

'এখন কি হবে? এখন আমরা কি করবো? কোথায় যাবো?'

'পাকিস্তান অনেক দূরে।'

'শুনেছি বেলুচ রেজিমেন্ট অমৃতসরে হাজার হাজার মুসলমানের জান বাঁচিয়েছে। তাদের এদিক পাঠানো হয়নি কেন?'

'সেলিম মিয়া! ওরা আমার স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। মাথায় আঘাত পেয়ে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমাকে মৃত মনে করে তারা ফেলে রেখে গিয়েছিল। তারা আমার মায়ের সাথে.....................'

মোটকথা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, শিশু ও বৃদ্ধের পৃথক পৃথক কাহিনী ছিল। অনেকের মুখে রা ছিল না, খামুশ একেবারে খামুশ, চোখে অশ্রুধারা, এদিক ওদিক দেখছিল এবং কাঁদতে কাঁদতে খামুশ হয়ে যাচ্ছিল।

একজন হাবেলীতে প্রবেশ করেই বললো, দুনিয়ায় এখন আর আমার কেউ নেই। আমার পাঁচ ছেলে ছিল, তিন মেয়ে ছিল, আর তিন নাতি ছিল। এখন আমি একা। এ ছিল খয়ের দীন কাহার।

মজিদের বাপ গোলাম হায়দর এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বললো, খয়ের দীন! সবর করো।

খয়ের দীন গোলাম হায়দরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো হা হুতাশ করে। তার দেখাদেখি অন্য মেয়েরা ও শিশুরা যারা এতক্ষণ নিজেদেরকে সামলে রেখেছিল তারাও আওয়াজ করে কাঁদতে শুরু করে দিল।

রাতের বেলা মজিদ ও দাউদ মসজিদ ও দালানের ছাদে মাটির বস্তা দিয়ে মোর্চা বানাতে শুরু করে দিল। সেলিম হাবেলীর এক কোণে শহীদের লাশ দাফন করছিল। কাকু কবর তৈরি করার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য গ্রাম থেকে কয়েকজন ঈসায়ীকে ডেকে নিয়ে এসেছিল। চল্লিশটি লাশের জন্য আলাদা আলাদা কবর বানানো কঠিন কাজ ছিল। বাইর থেকে আসা পুরুষদের অর্ধেকের বেশি ছিল জখমী এবং বাকি সবাই ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে অর্ধমৃত হয়ে পড়ে ছিল। এজন্য তাদের প্রতি দ্রুত দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন ছিল। চাচা গোলাম হায়দরের পরামর্শে সেলিম একটি লম্বা খন্দক খনন করলো এবং সমস্ত লাশকে এক কাতারে শায়িত করে মাটি চাপা দিল।

আফজল ও ইসমাঈলকে সবার শেষে দাফন করা হলো। ইসমাঈলের লাশ যখন মাটি দেয়া হচ্ছিল, কাকু ঈসায়ী বললো, আজ আমাদের গ্রামের মৃত্যু হলো। আজকের পরে এ পল্লীর লোকেরা হাসি ভুলে যাবে। মিয়া সেলিম! চৌধুরী রমজানের লাশ এখনো লছমন সিংয়ের গৃহে পড়ে আছে। আমি দেখে এসেছি। ইসমাঈল বলতো, আমাদের কবর পাশাপাশি হবে। আমি তাকে নিয়ে আসছি। তাকে এখানেই দাফন করে দাও।

সেলিমের দুচোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। সে শোকার্ত স্বরে বললো, যাও, তাদের সবার লাশ এখানে নিয়ে এসো।

রমজানকে ইসমাঈলের পাশে দাফন করা হলো। সেলিম বালাখানা থেকে ঝাণ্ডা ঝাণ্ডাটি এনে ইসমাঈলের পাশে গেঁড়ে দিল।

ঘরে মেয়েরা ক্ষুধার্ত ক্রন্দনরত শিশুদের জন্য কিছু খাবার তৈরি করে এনেছিল। মজিদ মোর্চা বানাবার পর নিচে নামলো এবং লোকদের সম্বোধন করে বললো, দেখুন ভাইয়েরা আমি জানি আপনাদের কারোর খাবারে রুচি নেই তবুও জোর করে হলেও দুচার লোকমা খেয়ে নিন। আল্লাহ মালুম, সকালে খাবার সময় পাওয়া যাবে কি না। আর তাছাড়া খালি পেটে আমরা বেশীক্ষণ লড়তেও পারবো না।

মজিদের ইশারায় কয়েকজন লোক জমিনে চাটাই বিছিয়ে দিল। লবণ মাখানো গরম গরম ভাতের প্লেট পরিবেশন করা হলো। কিছুটা ইতস্তত করার পর কয়েকজন বসে পড়লো তারপর তাদের দেখাদেখি অন্যেরাও একের পর এক খেতে বসে গেলো।

বাইর থেকে কেউ ফটকে ধাক্কা দিয়ে বললো ফটক খোলো!

মজিদ এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কে?

আমি ফজ্জু।

ফজ্জু, ওদেরকে রেখে তোমার চলে আসা ঠিক হয়নি। আমি তোমার কাছে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম।

সুবেদার! আমি ওদেরকে সংগে করে নিয়ে এসেছি। আমি পিপাসায় বড়ই কাতর হয়ে পড়েছি।

আরে ভাই ওদের দিকে নজর রাখো যেন পালিয়ে না যায়।

জী, আপনি ভাববেন না। ওরা পালিয়ে যেতে পারবে না, ভালো করে বেঁধে রেখেছি।

এখন আর গেট খোলা যাবে না। থামো আমি আসছি একথা বলে মজিদ দেয়াল টপকে বাইরে চলে এলো।

রামচন্দ ও কুন্দন লাল অন্যদের তুলনায় যথেষ্ট স্থূলদেহী ছিল। তবুও মজিদ ও ফজ্জু ধরাধরি করে তাদেরকে বাঁধা অবস্থায় পাঁচিলের ভেতরে নামিয়ে দিল। সেলিম টর্চের আলো ফেললো। লোকেরা তাদেরকে চিনতে পেরে চারদিকে জমা হয়ে গেলো। তাদের ব্যাপারে মজিদ এখনো কাউকে কিছু বলেনি তাই অবাক হয়ে তাদেরকে দেখতে লাগলো।

'এ সেই রামচান্দ, এ সেই রামচান্দ' বলতে বলতে তার গ্রামের এক যুবক দৌড়ে এস রামচান্দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার একই মুষ্টাঘাতে রামচান্দ পড়ে গেলো। যুবকটির আর একজন সাথি কুন্দন লালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেলিম ও মজিদ বহুকষ্টে তাদের হাত থেকে দুজনকে ছাড়িয়ে নিল। রামচান্দের ওপর হামলাকারী যুবক তার সাথির তুলনায় অনেক বেশি উত্তেজিত ছিল। মজিদ তার বাহু ধরে তাকে আটকে রেখেছিল এবং সে চিৎকার করছিল, 'সুবেদার জী, আপনি জানেন না এ হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় দুশমন। আপনাদের গ্রামের ওপর আক্রমণকারী শিখদেরকে এই ব্যক্তিই জমায়েত করেছিল। এই ব্যক্তিই তাদের হাতে বন্দুক তুলে দিয়েছিল। গণজমায়েতের সামনে আমি একেই দেখেছিলাম বক্তৃতা করতে। সে বলছিল একটা মুসলমানকে জীবিত ছেড়ে দেয়া যাবে না। সে শয়তানী ছল চাতুরী না করলে মহেন্দর শিখদেরকে নিরস্ত্র করতে পারতো। একে জীবিত রাখা মহাপাপ।'

অনেক বৃদ্ধ গোলাম হায়দরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, চৌধুরীজী! আমিও এ শয়তানের বক্তৃতা শুনেছিলাম। সে বলছিল, রহমত আলীর বাড়ি থেকে যুবতী মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে এসো। কিন্তু আল্লাহর কি অপার কর্মকুশলতা! আজ তার নিজের বাড়ি থেকে শিখেরা তার মেয়ে ও বৌদেরকে তুলে নিয়ে গেছে। তারপর সে রামচান্দের দিকে ফিরে বললো, শেঠজী! আজ আমরা তোমার বাড়িতে দেখলাম খালিস্তানের মেলা বসেছে। সালসাজীর সৈনিকরা তোমার কৌশিলা ও সরলাকে নিয়ে গেছে। তোমার

স্ত্রীকে মেরে আধমরা করে রেখে দিয়ে গেছে। রামচান্দ! তুমি ওদের বলছে, মুসলমানদের এখানে থাকতে দিয়ো না। আমরা জানি আমরা আর এখানে থাকতে পারবো না কিন্তু তোমরাও এখানে থাকবে না। যেসব কুত্তাকে তোমরা আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছো তারা তোমাদেরকেও কামড়াবে।

রামচান্দের ভীতি এখন অস্থিরতায় পরিণত হয়েছিল। সে চিৎকার করে উঠলো, মিথ্যা বলছো। আমরা জানি আমরা তোমাদের কবজায় আছি এবং তোমরা আমাদের জিন্দা ছাড়বে না কিন্তু শিখরা এমন দুঃসাহস করতে পারে না।

বৃদ্ধটি ক্রোধে গর্জে উঠলো, বদমাশ! প্রতিবেশীর ঘরে যে আগুন লাগানো হয় তা নিজের ঘরও জ্বালিয়ে দেয়। বিশ্বাস না হলে গ্রামের অন্যদের জিজ্ঞেস করো।

আর একজন বলে উঠলো, চৌধুরীজী! শিখেরা যদি রামচান্দের বাড়ি ঘর লুটপাট না করতো এবং তার ঘরের মালপত্র ও বৌঝি নিয়ে টানাটানি না করতো তাহলে আমরা পালিয়ে আসার সুযোগ পেতাম না। তারা পালকিতে করে তার বৌঝি সহ ভারা ভরে যৌতুকও নিয়ে গেছে।

রামচান্দ কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে নীরব থাকার পর চিৎকার করে উঠলো, আমি আমার কর্মফল ভোগ করেছি। মিয়া সেলিম! এ পর্যন্ত আমি যা কিছু করেছি তাতে আমার কথায় তোমাদের আর বিশ্বাস না থাকার কথা, তা আমি জানি কিন্তু তারপরও আমি বলছি, তোমরা যদি আমাকে মুক্তি দাও তাহলে আমি শিখদের থেকে বদলা নিতে পারি। হিন্দুস্তানে কংগ্রেসের হুকুমত। তারা শিখদের এ অপকর্ম বরদাশত করবে না। আমি পূর্ব পাঞ্জাবের হিন্দু গভর্ণর ও মন্ত্রীদের কাছে যাবো। আমি তাদের বুঝাবো। তোমরা আস্তিনের মধ্যে সাপ পালন করছো। আমি সরদার প্যাটেল ও নেহরুর কাছে যাবো। তোমরা দেখবে এই কুত্তাদের পিঠ চাপড়াবার পরিবর্তে তাদের সামনে আমি বিষের পেয়ালা রেখে দেবো।

সেলিম নিশ্চিন্তে জবাব দিল, শেঠ রামচান্দজী, এটা আর এমন কি কথা! গোশত খাদক কুত্তারা কখনো মালিকের হাত থেকে তার খাদ্যটিও ছিনিয়ে নেয়। তোমাদের মন্ত্রী, গভর্ণর এবং তোমাদের প্যাটেল ও নেহরুজী পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলমানদের খতম করতে চায় এবং এ কাজের দায়িত্ব দিয়েছে শিখদেরকে। এ কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিখদের সমস্ত কুকর্ম তারা বরদাশত করে যাবে। তোমার সরলা ও কৌশল্যাকে তারা নিজেদের খিদমতের ইনাম মনে করেই নিয়ে গেছে।

মজিদ বললো, সময় নষ্ট করো না। ইউসুফ, তুমি ওদের খানাপানি দাও। আমরা ওয়াদা করেছিলাম ওদেরকে হত্যা করবো না কিন্তু মুসলমানদেরকে এক

গর্তে দুবার দংশানো যায় না। এদেরকে মুক্তি দিলে এরা দ্বিতীয়বার আর এমন কাজ করবে না একথা আমি বিশ্বাস করি না। কাজেই এদের পায়ে ঘোড়ার শিকল পরিয়ে ঘোড়াশালায় বন্দী করে রাখো।

বাইর থেকে আগমনকারীদের মধ্যে সাতজন ছিল সাবেক সেনাবাহিনীর সদস্য। মজিদের কথায় অনভিজ্ঞ ও আনাড়ী বন্দুকধারীরা তাদের বন্দুকগুলি সৈন্যদের হাতে তুলে দিল। একজন প্রৌঢ় এগিয়ে এলো। তার গা ছিল উদোম, পরনে ছিল কেবলমাত্র একটি তহবন্দ। 'আমাকেও একটি বন্দুক দাও' বলে সে হাত বাড়িয়ে দিল।

মজিদের ইতস্তত ভাব দেখে সে বলে উঠলো, চিন্তা নেই আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত জমাদার।

মজিদ এবার পেরেশান হয়ে তাকে দেখতে লাগলো, একজন লোক এগিয়ে এসে বললো, ইনি আমাদের গ্রামের। গ্রাম যখন আক্রান্ত হয় ইনি বাইরে নহরে গোসল করছিলেন। ফজ্জু পাহলোয়ান এগিয়ে এলো, 'আরে এতো আমাদের জমাদার ইনায়েত আলী।'

সেলিম ও মজিদ মসজিদের ছাদের মোর্চায় নেতৃত্ব দিচ্ছিল। গোলাম হায়দর ও অন্য যুবকরা বাসগৃহের ছাদগুলি পাহারা দিচ্ছিল। দাউদ কয়েকজন সহযোগীসহ হাবেলীর বাইরে টহল দিয়ে ফিরছিল। একটি ক্ষুদ্র দল নিয়ে গ্রামের মধ্যে এক চক্কর দেবার পর বশির এসে খবর দিল, শিখদের সমস্ত বাড়ি খালি হয়ে গেছে। কিন্তু ইন্দর সিংয়ের বাড়ির ভেতর থেকে কোনো মহিলার কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ। সম্ভবত ইন্দর সিংয়ের ছেলে ভেতরে আত্মগোপন করে আছে। সে আজ শিখদের হামলাকারী দলের সাথে ছিল। অন্যদিকে আফজালের জানী দোস্ত শের সিংয়ের কোথাও কোনো পাত্তায় পাওয়া যায়নি।

দাউদ সাথিদেরকে বললো, তোমরা এখানে থাকো। আমি এখনি আসছি বলে বশিরকে সাথে নিয়ে গ্রামের ভেতরে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা ইন্দর সিংয়ের বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। আঙিনা থেকে কোনো মহিলার কান্নার আওয়াজ আসছিল। দাউদ লাফিয়ে দেয়ালে উঠে অন্ধকার আঙিনায় তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করলো। একজন লোক চারপাইয়ে শায়িত এবং তার পাশে জমিনে বসে একটি মেয়ে কাঁদছে।

দাউদ বশিরের কাছ থেকে টর্চ ও রাইফেল চেয়ে নিয়ে বললো। আমি যাচ্ছি, না ডাকা পর্যন্ত তুমি এখানেই থাকবে।

টর্চের আলোয় দাউদ দেখলো সেখানে একটি যুবতী মেয়ে এবং একজন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউ নেই। মেয়েটি আচানক ঘাড় তুলে ভীত কণ্ঠে বললো, কে?

জবাবে দাউদ তার মুখে টর্চের আলো ফেললো। মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু চারপাইয়ে শায়িত বৃদ্ধ ছিল অনড় ও নিশ্চুপ। দাউদ পাঁচিলে দাঁড়িয়ে ছাদের ওপর আলো ফেললো। সেখানে কেউ নেই। তারপর বশিরকে চলে আসার ইশারা করলো এবং নিজে নিচে লাফিয়ে পড়লো।

কে তুমি? মেয়েটি ভীত হয়ে পেছনে হটতে লাগলো।

শোরগোল করো না। এখানে কেউ তোমার আওয়াজ শুনতে পাবে না। চারপাইয়ের কাছাকাছি গিয়ে শায়িত ব্যক্তিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো সে। নিসাড় পড়ে থাকা বৃদ্ধটি বড় বড় চোখ করে দেখতে লাগলো তাকে। আঙিনার এক কোণ থেকে মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠলো, ওঁকে কিছুই বলো না। উনি এমনিতেই মরো আছেন।

দাউদ এবার বললো, আচ্ছা এ হচ্ছে ইন্দর সিং। এ তো আজ রহমত আলীকে তার বন্ধুত্বের হক আদায় করে দিয়েছে। সে বলেছিল, রহমত আলী, তোমার বাড়িতে আজ বরযাত্রা এসেছে, কনে সাজাও।

আর কোনো কথা না বলেই রাইফেলটি বশিরের হাতে দিয়ে সে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলো। মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে গোশালার মাচানের ওপর চড়ে বসলো এবং সেখান থেকে দেয়াল টপকে বাইরে যাবার ফন্দি করলো। কিন্তু দাউদ দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেললো। টেনে নামিয়ে নিল নিচে। দাউদের লৌহ কঠিন হাতে বন্দী হয়ে মেয়েটি এবার জোরে চেঁচাতে লাগলো। দাউদ তাকে টেনে হিঁচড়ে ইন্দর সিংয়ের সামনে নিয়ে গেলো। ইন্দর সিংকে বলল ইন্দর সিং, তুই কেবল অন্যের ঘরে আগুন লাগাতে শিখেছিস, নিজের ঘর জ্বলতে দেখিসনি।

মেয়েটি বলছিল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের দুশমন নই। আমি গোলাপ সিংয়ের বোন। আমার বাপ শের সিং। আমার বাপ মুসলমানদের বন্ধু।

আমরা তোমাদের বন্ধুত্ব দেখেছি। দাউদ ধাক্কা দিয়ে মেয়েটিকে জমিনে ফেলে দিল এবং পকেট থেকে চাকু বের করলো।

বশির রাইফেল জমিনে ছুঁড়ে ফেলে দাউদকে জাপটে ধরলো। 'আমাকে ছেড়ে দাও' দাউদ চিৎকার করলো। '...... তুমি জানো না, এরা আমার মা, বাপ, বউ ও বোনদের সাথে কি ব্যবহার করেছে! আমার বাড়িতে হামলা করেছে আমার সেই প্রতিবেশীরা যাদের বাড়ি আমি পাহারা দিয়েছি বিগত দেড় মাস ধরে। তাদের জন্য আমার ছুটির দিনের রাতগুলি আমি বিনিদ্র কাটিয়েছি। আজ আমার বাপ ছিল মৃত্যু শয্যায় এবং আমি শহরে গিয়েছিলাম তার জন্য ওষুধ কিনতে। এ সময় এরা হানাদার বাহিনী নিয়ে গ্রাম আক্রমণ করে বসলো। তারা আমার বাপকে হত্যা করলো। আমার মা ও তিনটি সন্তানকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দিল।

আবরু রক্ষার খাতিরে আমার বোনেরা কুঁয়ায় ঝাঁপ দিল। আমার স্ত্রীকে টেনে নিয়ে গেলো। মসজিদে এবং সেখানে ....।' 'আমাকে ছেড়ে দাও' 'আমাকে ছেড়ে দাও!' 'আমাকে ছেড়ে দাও!' জোশের মাথায় দাউদ বশিরের হাত মুচড়ে দিল এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে একদিকে ফেলে দিল। ততক্ষণে মেয়েটি দরোজার কাছে পৌঁছে গিয়ে শিকল খোলার চেষ্টা করলো। তার কম্পিত হাত শিকল খুলতে সক্ষম হলো না। দাউদ গিয়ে আবার তাকে ধরে ফেললো। এবার সে পূর্ণশক্তিকে চিৎকার করছিল এবং বলছিল আমাকে সেলিমদের বাড়িতে নিয়ে চলো। আমি তাকে ধর্মভাই ডেকেছিলাম। সে আমাকে বোন বলে ডাকতো। চাচা আফজাল আমাকে বেটি বলে ডাকতো।

দাউদ এক হাতে তার ঘাড় চেপে ধরে অন্য হাতে চাকু বুলন্দ করলো। মেয়েটি আচানক খামুশ হয়ে গেলো। তারপর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাকুর দিকে তাকিয়ে বললো, এতেই যদি তোমার কলিজা ঠাণ্ডা হয় তাহলে আমাকে মেরেই ফেলো—দেখছো কি, জলদি করো!

দাউদ কিছুটা প্রভাবিত হয়ে বললো, আমার স্ত্রীর সাথে তারা যা করেছে আমি তোমার সাথে তা করতে পারি না। মরার সময় তোমার তেমন কষ্ট হবে না।

মেয়েটি নিরবে তার দিকে তাকিয়েছিল। চাকুর ডগাটি তার বুকে ঠেকিয়ে দিল দাউদ। কিন্তু তার হাত কাঁপছিল। তার কপাল থেকে ঘাম পড়ছিল দরদর করে। মেয়েটি বললো, তোমার কোনো বোন হলে তার সাথে এমন আচরণ করতে না।

হঠাৎ দাউদের হাত কেঁপে উঠলো। চাকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পিছু হটে এলো সে। টর্চের আলোয় বশির দেখলো তার চোখ অশ্রুসিক্ত।

বাইর থেকে কেউ গেটে ধাক্কা দিতে লাগলো। 'দাউদ বশির' গেট খোলো।'

কে, সেলিম?

হ্যাঁ, দরোজা খোলো। কি হচ্ছে এখানে?

বশির দরোজা খুলে দিল। কয়েকজন লোক নিয়ে সেলিম ভেতরে ঢুকলো। মেয়েটি দ্রুত সেলিমের বাহু আঁকড়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললো, ভাই, অন্যকে না পাঠিয়ে নিজে এসে আমার গলা দাবিয়ে দিতে।

কে? রূপা? তাহলে তুমিই চিৎকার করছিলে?

মেয়েটির নিরবতা ভেঙে দাউদ বলে উঠলো, আমি ওকে হত্যা করতে এসেছিলাম। আমি আমার বাপ, মা বোন ও স্ত্রী সন্তানদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছিলাম। কিন্তু আমার হিম্মত হলো না। কারোর প্রতি রহম করবো না বলে আমি কসম খেয়েছিলাম। আমি এই বুড়াকে গলা টিপে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার হাত উঠলো না। এই মেয়ে থেকে নিজের স্ত্রী ও মায়ের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার কানে কেউ বলছিল, 'দাউদ, কি করছো? সেও তো একজনের বোন। সেলিম আমি একজন কাপুরুষ!'

সেলিম তার কাঁধে হাত রেখে বললো, না তুমি কাপুরুষ নও দাউদ! চিৎকার শুনে আমি বাইরে এসেছিলাম। শুনলাম তুমি এদিকে এসেছো। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না তুমি কোনো মেয়ের গায়ে হাত উঠাবে। এটা মুসলমানের জন্য শোভনীয় নয়। তারপর একটুখানি দম নিয়ে বললো, যারা উপকারের এই প্রতিদান দিয়েছে মানবতার সেই দুশমনদের থেকে আমরা বদলা নেবো এবং সেই জাতিকে আমরা কোনোদিন মাফ করবো না। কিন্তু আমাদের এই তলোয়ার পুরুষদের তলোয়ারের মোকাবিলা করবে। অক্ষম, বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের ওপর এর শক্তি পরীক্ষা করা হবে না। এই জুলুম নির্যাতনের জবাব একদিন দেয়া হবে পানিপথের ময়দানে। এখন সম্ভবত সে সময় আসেনি।

সেলিম অগ্রসর হয়ে টর্চের আলোয় ইন্দর সিংকে দেখলে। তার চোখ দুটি খোলা ছিল। ঠোঁট সম্ভবত নড়ছিল। কিন্তু কোনো আওয়াজ ছিল না। 'সে প্যারালাইসিস আক্রান্ত,' সেলিম বললো।

সেলিম রূপার দিকে ফিরে বললো, গ্রামের সমস্ত শিখ চলে গেছে। আমি সকাল পর্যন্ত তোমার হেফাজতের জিম্মেদারী নিতে পারি। কিন্তু তারপর জানিনা আল্লাহ মালুম কি হয়। দূর দূরান্ত থেকে মুসলমানরা আমাদের গ্রামে আসছে। তাদের হাতে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। তোমার এখানে থাকা উচিত নয়।

ভাইয়া, আমার চাচা দাদাকে এ অবস্থায় রেখে পালিয়ে গেছে। কিন্তু আমি তাদের সাথে যেতে পারিনি। তারা আমাকে টানাটানি করছিল তাদের সাথে নেবার জন্য। কিন্তু আমার ভাইয়ের লাশ এখানে পড়েছিল এবং দাদার এ অবস্থা। ওদিকে পিতাজীর কোনো খবর নেই। শুনেছি শরাব পান করে তিনি কোথাও পড়ে আছেন বেহুশ হয়ে। চাচা আফজালের সাথে থাকলে তিনি শরাবপান করতেন না। চাচাদের সাথে বাইরে বের হয়েই আমি আখের ক্ষেতে আত্মগোপন করেছিলাম। তারা চলে গেলে আমি বের হয়ে এখানে চলে এসেছি।

তোমার মা কোথায়?

তিনি তো আগেই বাপের বাড়ি চলে গেছেন।

রূপা, তোমার ভাই আমাদের জন্য মারা গেছে। তার লাশ আমি এখানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করছি।

না, না, আমি তার লাশ দেখতে পারবো না। আমাকে আপনাদের বাড়িতে নিয়ে চলুন।

কিন্তু তোমার দাদা?

মেয়েটি খামুশ হয়ে গেলো।

দেখো রূপা, গোলাপ সিংয়ের বোনের জন্য আমাদের বাড়ির দরোজা কখনো বন্ধ হতে পারে না। কিন্তু তুমি সেখানে এক মিনিটও থাকতে পারবে না। তুমি সেই শিশুদের দিকে তাকাতে পারবে না যারা তোমার কওমের লোকদের হাতে মাতৃ-পিতৃহারা হয়েছে। বিধবা ও জখমীদের আহাজারী তুমি বরদাশত করতে পারবে না।

তাছাড়া আমাদের হাবেলী এখন আর নিরাপদও নয়। আমরা হয়তো প্রভাত সূর্য দেখতে পাবো কিন্তু আগামী রাতের সিতারা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হবে না। তুমি এখানেই থাকো। আমাদের লোকেরা গলিতে পাহারা দিতে থাকবে।

রূপা কাঁদতে কাঁদতে বললো, আমি এখানে বসে ভাবছিলাম চাচা আফজাল আসবেন এবং আমাকে বলবেন, রূপা বেটি একাকী এখানে বসে থাকতে তোমার ভয় লাগছে না? চলো আমাদের বাড়িতে চলো। তুমি নিজেই ওখানে এলে না কেন?

সেলিম অশ্রু সম্বরণ করে বললো, চাচা আফজাল এখন আর তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না।

রূপা নির্বাক দৃষ্টিতে সেলিমের দিকে তাকিয়ে রইলো। সেলিম তার সাথিদের দিকে দৃষ্টি ফেরালো এবং বললো, চলো দাউদ!

তারা বাইরে বের হচ্ছিল। আচানক রূপা সেলিমের বাহু আঁকড়ে ধরে বললো, সেলিম ভাইয়া আমাকে বলে যাও চাচা আফজালের কি হয়েছে?

তিনি শহীদ হয়ে গেছেন।

সেলিমের বাহু ছেড়ে দিয়ে রূপা এক কদম পিছে হটে গেলো। সেলিম বাইরে যেতে যেতে বললো, রূপা দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ করে নাও।

সূর্যোদয় পর্যন্ত সেলিমদের গ্রামে শরণার্থীদের আরো তিনটি কাফেলা পৌঁছে গেলো। শরণার্থীদের সংখ্যা এ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল সাতশ'তে। শেষ কাফেলার সাথে আগত কয়েকজন বললো, আমাদের পেছনে দু'হাজার লোকের একটি বড় কাফেলা আসছে। দুপুর পর্যন্ত তারা এখানে পৌঁছে যাবে।

সকাল আটটায় শিখেরা হামলা করলো। আকালী সেনার নামে যারা হামলা করলো তাদের প্রথম সারিতে ছিল শিখ, ডোগরা, গুর্খা ও মারাঠা সিপাহী দল। মুসলমানদের খুনে আজাদ হিন্দুস্তানের ইতিহাস রঞ্জিত করার দায়িত্ব এই ভাড়াটে সিপাহীদের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল পুলিশও। রাইফেল ও স্টেনগান সজ্জিত এই সিপাহীদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ। তাদের সাথে ছিল দুহাজার সশস্ত্র শিখদের একটি বিশাল হানাদার দল। এই দলের পনের বিশ জনের হাতে ছিল বন্দুক, দেশী-বিদেশী রাইফেল ও পিস্তল এবং বাকি সবাই বর্শা, নেজা ও কৃপাণ সজ্জিত ছিল। পঞ্চাশ জন ছিল ঘোড়সওয়ার। সেনাবাহিনীর সিপাহীদের কাছে ছিল দুটি ফউজী ট্রাক। গ্রামের মধ্যে এ দুটি আসা সম্ভবপর ছিল না বলে সড়কের ওপরই রেখে দেয়া হয়েছিল। দুতিনটি মিলিটারী জীপ সড়ক থেকে নামিয়ে গ্রামের দুতিন ফার্লংয়ের মধ্যে রাখা হয়েছিল।

পূর্ব পাঞ্জাবের গ্রামগুলিতে আকালী সেনাদের হামলার একটি বিচিত্র পদ্ধতি ছিল। প্রথমে সৈন্য ও পুলিশ মুসলমানদের ঘরের দরোজা খুলে তাদের থানা তল্লাশী করতো। তারপর তাদের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া হতো, তার মধ্যে তারা গ্রামখালি করে দেবে। লোকেরা গ্রাম থেকে বের হলে বাইরে শিখের দল তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। কোথাও বাধা দেয়া হলে সেনাদল ও পুলিশ আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহকারে তার জবাব দিতো।

বড় বড় গ্রাম ও ছোট শহরগুলিতে সেনাদল কারফিউ জারী করতো। সৈন্যরা গলি ও বাজারে টহল দিতো। কোনো মুসলমান যেন ঘরের বাইরে উঁকি মেরে না দেখে এদিকে তারা নজর রাখতো। তারপর শিখরা দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করতো। প্রত্যেকটি ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতো অথবা মুসলমানদের হত্যা করতো। যারা পালাবার চেষ্টা করতো সৈন্যরা তাদের গুলীবিদ্ধ করতো এবং যারা ঘরের বাইরে আসতো না তারা পুড়ে ছাই হতো।

ছোট ছোট জনপদে প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা কম থাকতো। তাই সৈন্যদের সহায়তা ছাড়াই শিখরা দলবল নিয়ে সেখানে আক্রমণ চালাতো। রাতের বেলা একটি দল গ্রামে প্রবেশ করে কেরোসিন ছিটিয়ে ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিতো। লোকেরা চিৎকার ও শোরগোল করতে করতে বাইরে বের হয়ে আসতো। আশেপাশে লুকানো সশস্ত্র শিখেরা তাদের ওপর হামলা করে হত্যাযজ্ঞ সম্পন্ন করতো।

সেলিমদের গ্রাম আক্রমণকারী সৈন্যদল আশপাশের বিভিন্ন ছোট বড় গ্রাম আক্রমণ করে কোথাও তেমন বিশেষ কোনো প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়নি। ফলে নিজেরা কোনো প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে নিরস্ত্র ও নিরপরাধ মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলে এসেছে। কিন্তু এবার তিক্ত ও কঠিন সত্যের মোকাবিলা করতে হচ্ছিল তাদের। মাস্টার তারা সিং ও সরদার প্যাটেলের এই বীরপুংগবদের সামনে যুদ্ধ করার পরিবর্তে হত্যাযজ্ঞের পরিকল্পনাই ছিল বেশী। কিন্তু এখন তাদের গুলীর জবাবে গুলীর মোকাবিলা করতে হচ্ছিল।

লড়াই শুরু হবার আগে একজন ঘোড়সওয়ারের আবির্ভাব হলো বাড়ির পেছন দিকে। দু'শ গজ দূরে সে ঘোড়া থামালো এবং হাত উঁচু করে ধীর লয়ে এগিয়ে এলো। নিচের ছাদে মাটির বস্তার মোর্চা বানিয়ে যারা বসেছিল তারা তার দিকে বন্দুকের নল তাক করে বালাখানা থেকে মজিদের ইশারার অপেক্ষা করছিল।

থানা ইনচার্জ ছিল ঘোড়সওয়ার। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ঘোষণার পর সে এই এলাকার আকালী সেনাদের দলনেতার দায়িত্ব পালন করছিল। নিকটে এসে সে বুলন্দ আওয়াজে বললো, আমি সুবেদার মজিদের সাথে কথা বলতে এসেছি।

কার্নিশের পেছন থেকে মুখ বাড়িয়ে মজিদ বললো, আর সামনে এগুবে না। ওখান থেকেই কথা বলো।

থানা কর্মকর্তা ঘোড়া থামিয়ে বললো, দেখো আমার হাত খালি। তোমরা চাইলে সার্চ করে দেখতে পারো।

ঠিক আছে, বলো কি বলতে চাও।

তোমাদের নিরাপদে পাকিস্তানে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য আমি সেনাবাহিনী সাথে করে নিয়ে এসেছি। তোমরা নিজেদেরকে সৈন্যদের হাওয়ালা করে দাও। তোমরা প্রাণে বেঁচে যাবে। অন্যথায় তোমরা দেখবে আকালী সেনাদলের দুহাজার লোক কয়েক মিনিটের মধ্যে তোমাদের শেষ করে দেবে।

মজিদ নিশ্চিন্তে বললো, তুমি সেনাবাহিনী নিয়ে চলে যাও। আমরা আকালী দলের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত আছি।

থানা ইনচার্জ বললো, আমি জানতাম তুমি বড়ই জেদী। তবে যদি তোমরা শিখ দলের মোকাবিলা করো তাহলে সম্ভবত সেনাদল তোমাদের ওপর হামলা করে দেবে। তুমি নিশ্চয়ই জানো, তোমরা বেশীক্ষণ সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করতে পারবে না।

আমি জানি সেনাবাহিনী শিখ দলের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে এসেছে।

সুবেদার, এ কথা সত্য নয়। সেনাদল আমি এনেছি এ জন্য যে, তোমার খান্দান ইতিপূর্বে এ এলাকার শিখদের হেফাজত করেছে। তোমাদের লোকেরা তাদের সদুদ্দেশ্যের প্রমাণ দেবার জন্য আমাদের হাতে তাদের বন্দুকগুলিও সোপর্দ করে দিয়েছে। আফসোস, গতকাল অনেক দেরিতে আমি খবর পেয়েছিলাম। নয়তো শিখদের হামলা অবশ্যই রুখতাম।

তুমি গতকাল রামচন্দের গ্রামে ঐ হামলা রুখতেই তো গিয়েছিলে?

এবার থানা ইনচার্জ পেরেশান হয়ে মজিদের দিকে দেখতে লাগলো। তারপর নিজের বেঈমানির সামাল দিতে গিয়ে বললো, তবুও বলবো তুমি কতক্ষণ সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করবে? বাউণ্ডারী ফোর্সের কোনো মুসলমান সিপাহী এ এলাকায় নেই।

আমরা তাদের জন্য অপেক্ষা করবো।

সুবেদার, আমি মনে করতাম তুমি একজন সিপাহী কাজেই অনর্থক নিজের লোকদের জীবন নাশ করবে না। সেনাদল কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোমাদের খতম করে দেবে। এরপর শিশু ও নারীদের পরিণতি হবে খুবই খারাপ। সেনাদলের ক্যাপ্টেন তোমাকে 'ওয়ার্ড অফ অনার' দিতে প্রস্তুত। তুমি চাইলে আমি নিজেই গ্রন্থ সাহেব স্পর্শ করে তোমাদের হেফাজতের জিম্মাদারী নিতে প্রস্তুত আছি।

মজিদ এবার কিছুটা কঠোর কণ্ঠে বললো, হয় তুমি একজন মস্তবড় আহাম্মক অথবা আমাকে আহাম্মক মনে করো। যাও, তোমার কর্ণেল সাহেবকে বলো, আমরা পিঠে গুলীবিদ্ধ হওয়ার চাইতে বুকে গুলীবিদ্ধ হওয়ার ফায়সালা করেছি। আর তাকে

এ কথাও বলো, আমাদের হাতের ভাঙা তলোয়ার সমগ্র শিখ জাতির ওয়ার্ড অব অনারের চাইতে অনেক বেশি মূল্যবান আমাদের কাছে।

থানা ইনচার্জ লাগাম ঘুরিয়ে নিয়ে ঘোড়ার পেটে গোড়ালী ঠুকলো। দাউদ তার দিকে রাইফেল তাক করলো। কিন্তু মজিদ তার হাত ধরে ফেললো। 'না, দাউদ। সে দূত হিসাবে আমাদের কাছে এসেছিল।

থানা ইনচার্জের ফিরে যাবার সাথে সাথেই হানাদারদের মধ্যে নড়াচড়া শুরু হলো। আটদশ মিনিট পর বাড়ি ঘরের ওপর বৃষ্টির মতন গুলীবর্ষণ শুরু হলো গেলো। বারুদের কমতির কারণে মজিদ সাথিদেরকে বলে দিয়েছিল শত্রুপক্ষের কেউ রেঞ্জের মধ্যে এলেই কেবল গুলী করতে হবে, তার আগে ফায়ার করা যাবে না। কাজেই প্রায় এক ঘন্টা পর্যন্ত তারা হামলাকারীদের গুলীবর্ষণের কোনো জবাব দিল না।

সেলিম মসজিদের মোর্চার নেতৃত্ব দিচ্ছিল। আচানক পাশের ইক্ষু ক্ষেতের পাতাগুলি নড়ছে বলে তার মনে হলো। নিজের সাথিদের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করার পর সে বাইরের হাবেলীতে পশুশালার ছাদে একটি ঢিল নিক্ষেপ করলো। সেখান থেকে কয়েকজন লোক তার দিকে তাকালো। তাদেরকে হাতের সাহায্যে ক্ষেতের দিকে ইশারা করে দেখালো। তারা সামনের ছাদে এ খবর পৌছিয়ে দিল। বালাখানার ছাদ থেকে মজিদ আন্দাজ করলো আখের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে হামলাকারীদের একটি বিশাল বাহিনী এগিয়ে আসছে। দাউদকে বিশেষ কিছু নির্দেশনা দেবার পর সে উপরের ছাদ থেকে নিচের ছাদে চলে এলো। গুলীবৃষ্টির মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ক্ষেতের সবচেয়ে নিকটবর্তী ছাদের কোণে পৌছে গেলো। সেলিম মসজিদের ছাদ থেকে তার প্রতি নজর রাখছিল। মজিদ তার থলে থেকে হাত বোমা বের করে তাকে দেখালো এবং ক্ষেতের দিকে ইশারা করলো। এর জবাবে সেলিমও তাকে হাত বোমা দেখালো।

ক্ষেতের মধ্যে এখন পাতা নড়ার সাথে সাথে হালকা সড়সড় আওয়াজও শোনা যাচ্ছিল। আচানক পনর বিশ জনের একটি দল ক্ষেতের উঁচু আইল পার হয়ে 'সত শ্রী আকাল' ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে আসতে লাগলো।

'ফায়ার' মজিদ বুলন্দ আওয়াজে হুকুম দিল।

দশজন ক্ষেতের বাইরে আসতেই খতম হয়ে গেলো। তিনজন সামনে এগিয়ে হাতবোমা নিক্ষেপ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তারাও মুহূর্তে ঢলে পড়লো। একজন বোমা নিক্ষেপ করতে করতে বুকে গুলী খেয়ে উলটে পড়লো এবং বোমা তার হাত থেকে ছুটে গিয়ে সেখানেই ফেটে গেলো। এর সাথে সাথেই আড়াই তিনশ জনের একটি দল উঁচু আইলের আড়াল থেকে বের হয়ে এলো। মজিদ একের পর এক করে দুটি হাত বোমা ছুঁড়লো। ফলে তারা দশ পনরটি লাশ ফেলে চেঁচামেচি ও শোরগোল করতে করতে আবার ক্ষেতের

মধ্যে ঢুকে পড়লো। মজিদের হুকুমে ছাদের মোর্চা থেকে ক্ষেতের মধ্যে বেধড়ক গুলী চালানো শুরু হলো। সেখান থেকে আহতদের চিৎকার ভেসে আসতে লাগলো। আখের পাতার ও আখ ভাঙার সড়সড় ও ফটফট আওয়াজে মনে হচ্ছিল যেন আখ ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে পড়েছে বন্য শূকরের এক বিরাট পাল এবং মানুষের দাবড়ানি খেয়ে তারা বিদিশা হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে।

মসজিদের দিকে দশ গজ দূরে সেলিম কয়েকজনকে জমা হতে দেখেছিল। ছাদ থেকে ফায়ার শুরু হবার পর আরো একদল লোক সেদিকে এসে গেলো। বুকে ক্রলিং করে পাঁচজন লোক ক্ষেতের বাইরে বের হলো এবং আচানক উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের হাবেলীর দিকে দৌড়ে আসতে লাগলো। সেলিমের সাথিরা মসজিদের ছাদ থেকে তাদের ওপর গুলী বর্ষণ করতে লাগলো। দুজন সেখানেই পড়ে গেলো। কিন্তু তৃতীয় জন পড়ে যেতে যেতে হাবেলীর মধ্যে হাতবোমা নিক্ষেপ করতে সক্ষম হলো। বাকি দুজন দেয়ালের কাছাকাছি এসে বোমা নিক্ষেপ করলো। একটি বোমা পশুশালার কামরার ছাদে পড়লো এবং অন্যটি পড়লো হাবেলীর আঙিনায়। মসজিদের ছাদ থেকে একের পর এক ফায়ারিংয়ে এই বোমা নিক্ষেপকারী দুজন শিখ সেখানে নিহত হলো। ক্ষেতের মধ্যে সমবেত হামলাকারীরা আর সামনের দিকে এগুবার সাহস করলো না। সেখান থেকে কেউ মসজিদের দিকে তাক করে বোমা নিক্ষেপ করলো। কিন্তু তা মাত্র কয়েকগজ দূরে এসে ক্ষেতের মধ্যেই ফেটে গেলো।

সেলিম একাদিক্রমে দুটি বোমা ক্ষেতের মধ্যে নিক্ষেপ করলো এবং সাথে সাথেই আহতদের চিৎকার ভাগদৌড়ের আওয়াজ শোনা গেলো!

যে সৈন্যদলটি হামলাকারীদের সাহায্য করছিল তারা প্রায় এক ফার্লং দূরে মোর্চা বানিয়ে বেধড়ক ফায়ারিং করে চলছিল। হাবেলীর মধ্যে অবস্থানকারীদের ওপর এর তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। তবে কিছু জোশিলা নওজোয়ান হাবেলী থেকে বের হয়ে ক্ষেতের মধ্যে আত্মগোপনকারী দুশমনদের ওপর আক্রমণ চালাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তারা প্রচণ্ড গোলাগুলীর মধ্যে বাইরে বের হবার সাহস করলো না।

মজিদ ও তার সাথিরা সৈন্যদলের ফায়ারিং এর জবাব দেবার পরিবর্তে বরং ক্ষেতের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছিল। ক্ষেতের মধ্যে যেখানেই পাতা নড়ছিল সেখানেই তারা ফায়ার করছিল। ক্ষেতের মধ্যে আত্মগোপনকারী একজন শিখ চিৎকার করে তার সাথিদের বলছিল, জ্ঞান সিং, করতার সিং, বুড্ডা সিং এখান থেকে ভাগো। এখানে গ্রামের লোকেরা নয় বরং বেলুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা লুকিয়ে লড়াই করছে। দেখছো না আমাদের সৈন্য ও পুলিশ নিজেরা পিছনে রয়েছে আর আমাদের সামনে ঠেলে দিয়েছে মরার জন্য।

তার একথা বলার সাথে সাথেই ক্ষেতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 'বেলুচ রেজিমেন্ট, বেলুচ রেজিমেন্ট' ধ্বনি উঠলো। এ ধ্বনি আশেপাশের তামাম ক্ষেতের মধ্যে আত্মগোপনকারী শিখদের কাছে পৌছুতে বেশীক্ষণ লাগলো না। ফলে একজন অন্যজনকে বলছিল, ভাগো এখান থেকে, জলদি ভাগো? বেলুচ রেজিমেন্ট এসে গেছে।

বেলুচ রেজিমেন্টের নাম কামান, বোমা ও গোলাগুলীর চাইতেও অনেক বেশি প্রভাবশালী প্রমাণিত হলো।[৪]

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষেতগুলিতে আহতদের কাতরানী ছাড়া আর কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না।

আচানক কাকু ঈসায়ী দৌড়ে এলো। ফটকের কাছাকাছি এসে বুলন্দ আওয়াজে বললো, শিখদের মহল্লার গলি থেকে একটি দল এদিকে আসছে। হাবেলীর ভেতরের লোকেরা মুহূর্তের মধ্যে খবরটা মজিদের কাছে পৌছে দিল। পাঁচজন সশস্ত্র লোক সাথে নিয়ে সে বাইরে বের হলো এবং গলির মোড়ে শিখদের একটি খালি বাড়ির ছাদে উঠলো। আগে থেকে দুজন বন্দুকধারী সেখানে পাহারা দিচ্ছিল। মজিদ নিজের থলে থেকে হাত বোমা বের করলো। নিজের সাথিদের হাতেও একটি করে বোমা দিল। গলির সামনের মোড়ে বাড়ির ছাদের কার্নিশের আড়ালে তাদের তৈরি থাকার হুকুম দিয়ে বললো, আমার বলার আগে কেউ বোমা নিক্ষেপ করবে না। আমরা চাই ওরা সামনের দিকে বের হয়ে যাক। আমাদের কাছে বোমা আছে অনেক কম। কাজেই রাইফেল যেখানে কাজ করতে পারবে সেখানে বোমা ব্যবহার করবে না।

৪.পাকিস্তানের অংশের বৃহত্তর সেনাদল যখন দেশের বাইরে অবস্থান করছিল তখন বাউন্ডারী ফোর্সে বেশিরভাগ বেলুচ রেজিমেন্টই মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছিল। পূর্বপাঞ্জাবে যখন নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার তুফান জোরেশোরে প্রবাহিত হচ্ছিল তখন সম্ভবত মহান আল্লাহ এই মুষ্টিমেয় সেনাদের বুকে সমগ্র জাতির প্রতি মমত্ব ও দায়িত্বানুভূতি ভরে দিয়েছিল। যার ফলে এই সিপাহীরা রাজপথে ও বাজারে পড়ে থাকা মুমূর্ষু আহত মুসলমানদের উঠাতো, শহরে পল্লীতে মুসলমানদেরকে আকালী সেনা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের হাত থেকে রক্ষা করতো এবং হিন্দুস্তানী ফউজ ও পুলিশের ঘেরাও থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতো। তারা শরনার্থীদের শিবির ও গাড়িগুলি পাহারা দিতো। তাদের কাফেলাকে হেফাজত করে বর্ডার পর্যন্ত পৌছিয়ে দিতো। তারা নিজেদের ক্ষুধা, পিপাসা, ঘুম ও ক্লান্তির পরোয়া করেনি। নিজেদের স্বল্প সংখ্যার কারণে তারা কোথাও ভীত হয়নি। তাদের দেখতেই শিখদের হামলাবাজ দলগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতো। কোথাও তাদের পাঁচজনের অস্তিত্ব টের পেলে তারা সিং ও প্যাটেলের বীর পুংগরা পালাবার পথ খুঁজে পেতো না। কিন্তু হিন্দুস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন একজন শিখ। বাউণ্ডারি ফোর্স গঠন করার ক্ষেত্রে এই স্বল্প সংখ্যক মুসলিম সৈন্যদেররকেও এমন পর্যায়ে রাখা হয়েছিল যাতে তারা মাউন্ট ব্যাটেন র‍্যাডক্লিফ প্যাটেল ও তারা সিংয়ের নরহত্যার পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে। এসব কিছু সত্ত্বেও বেলুচ রেজিমেন্টের সিপাহীরা ঠাণ্ডা মাথায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে কঠিন সময় জাতির বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের দ্রুততার একটি বড় কারণ এটাও ছিল যে, তিনি পাকিস্তান তার অংশের অস্ত্রশস্ত্র ও ফউজ লাভ করার আগেই হিন্দুস্তানের তথাকথিত শান্তিপ্রিয় সরকারের পতাকাকে মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত করতে চাচ্ছিলেন।

এ নির্দেশ দেবার পর মজিদ সেখানে সকাল থেকে পাহারারত দুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, তোমাদের কেউ দেখে ফেলেনি তো?

একজন বললো, কিছুক্ষণ আগে বেলা সিংয়ের ছাদের ওপর উঠে একজন লোক চেঁচিয়ে বলছিল, এদিকে কেউ নেই। তখন আমরা কার্নিশের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম।

সে যদি তোমাদের না দেখে থাকে তাহলে এ গলির পথে আসবে নিশ্চয়ই।

মিনিট পাঁচেক পরে মজিদের কানে এলো গলি পথে কিছু লোকের পায়ের আওয়াজ। সে মাথা উঠিয়ে অন্য মোড়ের ছাদে শায়িত লোকেদের দিকে দেখলো। তাদের মধ্য থেকে একজন হাতের ইশারা করলো। মজিদ তার ইশরার জবাব দেবার পর আবার মাথা নিচু করলো এবং নিকটে শায়িত লোকদেরকে বললো, হুশিয়ার হয়ে যাও, ইনশাআল্লাহ আমরা ওদের সবগুলিকেই শেষ করবো। মনে হচ্ছে, ওদের সাথে সেনাবাহিনীর সিপাই নেই। অন্যথায় ওরা ছাদ দখল করার আগে গলিতে প্রবেশ করতো না।

পায়ের আওয়াজ কাছে এসে গিয়েছিল। প্রায় দুশয়ের মতো শিখ চুপিসারে এগিয়ে যেতে যেতে দুটি মোড় পার হয়ে গেলো। আচানক পিছন থেকে দৌড়ে আসা একটা গ্রুপ থেকে একজন চেঁচিয়ে বললো, আর আগে বাড়বে না। ওখানে বেলুচ রেজিমেন্ট অবস্থান নিয়েছে।

'বেলুচ রেজিমেন্ট' 'বেলুচ রেজিমেন্ট', গলির এ মাথা থেকে ওমাথায় পৌছে গেলো আওয়াজ। এক মুহূর্তের মধ্যে শিখ দল থমকে দাঁড়ালো। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

মজিদ তার সাথিদের প্রতি ইশারা করলো। এক নওজোয়ান গলির পেছনের দিকে দুটো হাত বোমা নিক্ষেপ করলো। বাকি লোকেরা রাইফেলের ফায়ারিং শুরু করলো। দলের যারা পেছনে ছিল তারা 'বেলুচ রেজিমেন্ট' ধ্বনি তুলে ঠেলাঠেলি করে এগিয়ে আসতে চাইলো। সামনের দিকের সবাই মনে করলো পেছন দিক থেকে বেলুচ রেজিমেন্টের হামলা হয়েছে। তাই তারা জোরে সামনের দিকে দৌড় দিল। ওদিকে মজিদের সাথিরা ছাদের ওপর থেকে লাগাতার নিচে ফায়ারিং করছিল। দ্বিতীয় মোড়ে পৌছার আগেই দলের একেবারে সামনের দিকে মজিদ একটি হাতবোমা নিক্ষেপ করলো এবং সাথে সাথে ফায়ারিংও শুরু করলো তার সাথের দুজন লোক। গলির বাইরে বের হয়ে শিখেরা বটগাছের নিচে খোলা জায়গায় সমবেত হবার সাথে সাথে সেলিম মসজিদের ছাদ থেকে হাতবোমা ছুঁড়লো। তার সাথিরা ফায়ার করলো এবং এই সাথে বর্শা ও তলোয়ারধারী মুসলমানরা দেয়াল টপকে শিখদের ওপর হামলা করলো। মুহূর্তেই লাশের স্তূপ জমে উঠলো। কয়েকজন শিখ হাবেলীর উত্তর দিক থেকে গলি পথে পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বালাখানা থেকে একটি হাতবোমা ছোঁড়া হলো। অন্য লোকেরা নিচের ছাদ থেকে ইঁট পাথরের টুকরো ছুঁড়তে লাগলো। প্রায় পঞ্চাশজন শিখ বিদিশা হয়ে গিয়ে

হাওড়ের পানিতে লাফ দিল। তাদের মধ্য থেকে গুটি কয়েকজনই গুলীর নিশানা থেকে আত্মরক্ষা করে অপর পারে পৌঁছতে সক্ষম হলো।

অন্যদিকে মিলিটারী ও পুলিশ তাদের নিজেদের মোর্চা ত্যাগ করে আক্রান্ত সেনাদলের ভাঙন রোধ করার এবং তাদেরকে পুনর্বার ময়দানে জংগে ফিরিয়ে আনার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। থানা ইনচার্জ তাদেরকে গ্রন্থের মর্যাদার দোহাই দিচ্ছিল। ফউজ তাদেরকে ভীরু ও কাপুরুষ বলে ভর্ৎসনা করছিল। বহু কষ্টে গ্রাম থেকে এক মাইল দূরে তাদেরকে একত্র করা হলো। শিখ ক্যাপ্টেন ও থানা ইনচার্জ গ্রন্থ সাহেবের ওপর হাত রেখে এই মর্মে কসম খেতেও রাজী ছিল যে, এ এলাকায় বেলুচ রেজিমেন্টের একজন সিপাহীও আসেনি। কিন্তু শিখেরা তাদের কথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না। একটি দলের নেতা বললো, সেনাবাহিনীর কাপুরুষতার কারণে আমরা বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। এ বিতর্ক চলছিল এমন সময় গলি পথে হামলাকারী দুশ শিখ বাহিনীর মাত্র কয়েকজন, যারা কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, ফিরে এসে তাদের সাথে যোগ দিল।

তাদের একজনের দুভাই মারা পড়েছিল। সে এ বিতর্কে অংশ নিয়ে বললো, ক্যাপ্টেন সাহেব! আপনি বলছেন ওদের হাবেলীতে বেলুচ রেজিমেন্টের কোনো সিপাহী নেই। কিন্তু আমি বলছি শিখদের সমস্ত বাড়ি তারা দখল করে নিয়েছে, সেখানে আমরা কয়েক'শ লাশ রেখে মাত্র এই হাতে গোনা কয়েকজন ফিরে আসতে পেরেছি। তার সাথিরা তার কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিল। ফলে উপস্থিত শিখেরা সবাই থানা ইনচার্জ ও ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে হৈ হৈ করে উঠলো।

একজন বললো, তোমরা আমাদের মারার ব্যবস্থা করছো। যদি সেখানে বেলুচ রেজিমেন্ট না থাকে তাহলে তোমরা সেদিকে অগ্রসর হচ্ছো না কেন? আমাদের শত শত লোক মারা পড়েছে অথচ তোমরা এখনো কেবল তাদের গৃহের দেয়াল লক্ষ্য করেই গুলী ছুঁড়ে চলেছো!

ক্যাপ্টেন ক্রোধোন্মত্ত হয়ে বললো, আমি গুরু গ্রন্থের কসম খেয়ে বলছি, মাত্র দুঘন্টার মধ্যে আমি এ গ্রামটি মাটিতে মিশিয়ে দেবো। একটু ধৈর্য ধরো। আমার লোকদেরকে মর্টার মেশিনগান আনার জন্য পাঠাচ্ছি।

দুপুরের দিকে শিখেরা গুলীর রেঞ্জের বাইরে দূরে দূরে গাছের ছায়ায় সমবেত হচ্ছিল। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সিপাহীরা নিজেদের মোর্চায় বসে মাঝে মধ্যে দুচারটে গুলী বর্ষণ করে চলছিল। মজিদ বালাখানার ছাদ থেকে একটি জীপ ফেরত যেতে দেখে পেরেশান হয়ে উঠলো। তার সাথিরা এদকি ওদিক পড়ে থাকা মৃত ও আহত শত্রুদের তিনটি স্টেনগান, চারটি রাইফেল ও আটটি হাতবোমা হাসিল করতে পেরে যথেষ্ট উৎফুল্ল ছিল।

নিকেল পাঁচটায় সেলিম মসজিদের ছাদ থেকে নেমে এসে বললো, মজিদ! একটি জীপ ফেরত চলে গেছে।

হাঁ, আমিও দেখেছি। এখন সে আরো অনেক কিছু সাথে করে নিয়ে ফিরে আসবে। অতপর আমাদের যুদ্ধ আর শিখদের সাথে নয় বরং হিন্দুস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে হবে। যদি তারা আমাদের হাবেলীকে স্ট্যালিন গ্রাড মনে করে ট্যাংক ও জংগী বিমান আনার ব্যবস্থা করে থাকে তাহলেও আমি অবাক হবো না।

সেলিম বললো, যদি মুসলমান সৈন্যদের কোনো দল এদিকে এসে যেতো!

দাউদ বললো, যদি এর কোনো সম্ভাবনা থাকতো তাহলে এরা এতো নিশ্চিন্তে বসে বসে ফায়ার করতো না। এখন আমরা কতক্ষণ লড়তে পারবো?

মজিদ নিশ্চিন্তে জবাব দিল, যতক্ষণ বিজয় অর্জিত না হচ্ছে।

দাউদ তার ঠোঁটে বিষাদময় হাসির রেখা টেনে মজিদের দিকে তাকিয়ে রইলো।

মজিদ আবার বললো, আমি সত্য বলছি দাউদ। আমি শেষ বিজয়ের জন্য লড়াই করছি। বলতে পারি না এ বিজয় কবে হবে, কোথায় হবে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, যে ঝাণ্ডাটি আমরা চাচা ইসমাঈলের কবরের ওপর গেঁড়ে দিয়েছি সেটি আর অবনত হবে না। দাউদ, তোমার মনে আছে একবার স্কুলে তোমার সাথে আমার লড়াই হয়েছিল? আমি ছিলাম কমজোর। কিন্তু মার খাবার পরও আমি পিছু হটিনি। শেষ পর্যন্ত আমার জিদ তোমাকে পেরেশান করে দিয়েছিল।

দাউদ বললো, হায়! আমার কওমও যদি এ ধরনের জিদী প্রমাণিত হয়।

সেলিম বললো, কওমকে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অবশ্যই জিদী হতে হবে।

মজিদ প্রশ্ন করলো, সেলিম! আমাদের লোকেরা খুব বেশি পেরেশান হয়ে পড়েনি তো?

পেরেশান তো অবশ্যই। তারা বারবার জিজ্ঞেস করছে এখন কি হবে?

ওদেরকে বলে দাও, এখন লড়াই হবে।

সেলিম বললো, কেউ কেউ বলছে, সম্ভবত বাটালায় মুসলমান সিপাহীদের কোনো দল থাকতে পারে, সেখানে পৌঁছে তাদেরকে খবর দেবার চেষ্টা করা উচিত।

বাটালার আশেপাশে মুসলমানদের বহু গ্রাম রয়েছে। আমরা এখানে যে তুফানের মোকাবিলা করছি সেখানেও সেই একই ধরনের তুফান তার ধ্বংসকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। যদি সেখানে মুসলমান সিপাহী থেকেও থাকে তাহলে তারা আমাদের চাইতেও বেশি নিরস্ত্র ও অসহায় মুসলমানদের বাদ দিয়ে আমাদের সাহায্যের জন্য আসবে না। তুমি নিজে ঘাবড়ে যাওনি তো সেলিম?

সেলিমের চেহারা রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো। তার কপালের রগ ফুলে উঠলো। এক মুহূর্ত থেমে বললো, না, মজিদ না, আমি ঘাবড়াইনি। আমাদের রগে একই দাদার রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলাম, আমরা দুশমনকে আরো বেশি ধ্বংসের সুযোগ না দিয়ে আগে বেড়ে তাদের ওপর আক্রমণ করছি না

কেন? এখন লোকদের উদ্যম, হিম্মত ও মনোবল তুংগে আছে। যদি আমরা হামলা করে সেনাবাহিনীর সিপাহীদেরকে ময়দান থেকে ভাগিয়ে দিতে পারি তাহলে শিখ দল পুনর্বার এদিকে ফিরেও তাকাবে না। আমাকে আনুমতি দাও, আমি কয়েকজনকে নিয়ে উত্তরের ইক্ষুক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে তাদের মোর্চার ওপর আক্রমণ করি। তুমি ফায়ার করে তাদেরকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করে রাখো।

মজিদ মুচকি হেসে তার কাঁধে হাত রেখে বললো, সেলিম! অনেক সময় মোর্চার মধ্যে বসে লড়াই করা বাইরে বের হয়ে হামলা করার চাইতে অনেক বেশি বেশ সাপেক্ষ হয়ে থাকে। আমি জানি আমার ভাই বুকে গুলী খেতে পারে। কিন্তু আজ বাহাদুরীর পরিবর্তে সবরের পরীক্ষা হচ্ছে। আজ জোশের পরিবর্তে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার প্রয়োজন। মনে করো, গতকাল আমরা এখানে পৌছার সাথে সাথেই যদি সেনাবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম তাহলে ফল কি দাঁড়াতো? সেলিম আমাদের কাছে বন্দুক চালনায় পারদর্শী লোকের সংখ্যা অনেক কম। বারুদের পরিমাণও অনেক কম। আমাদের একটি গুলীও ব্যর্থ হোক তা আমি চাই না। আমাদের প্রথম এবং শেষ লক্ষ্য সর্বাধিক সময় পর্যন্ত এই মোর্চার হেফাজত করা।

দাউদ বললো, কিন্তু সত্যি সত্যিই সেনাদল যদি মর্টার অথবা আর্মড কার নিয়ে আসে?

আমরা লড়বো। আমরা ভাঙা পড়ন্ত দেয়ালের পেছন বসে লড়বো। আমরা পতনশীল ছাদের ওপর শুয়ে শুয়ে ফায়ার করতে থাকবো।

কিন্তু এর ফল কি হবে?

দাউদ, তুমি এখনো জানো না এর ফল কি হবে? দেখো আমাদেরই কারণে আড়াই হাজার সশস্ত্র শিখ হামলাকারীর দল এবং চল্লিশ পঞ্চাশ জন মিলিটারীর একটি বাহিনী ওখানে আটকে আছে। যদি আমরা তাদেরকে না রুখতাম তাহলে সকাল থেকে এ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের কত শত জনপদ ধ্বংস করতো এবং কত হাজার মুসলমান নরনারীকে হত্যা করতো। আমরা ওদেরকে এখানে রুখে দিয়ে এই এলাকার হাজার হাজার মুসলমানকে পাকিস্তানের দিকে এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো বিপাশা নদীর এপার থেকেও মুসলমানদের কাফেলা আসছে। আমরা যদি এদেরকে আরো কয়েক ঘন্টা রুখে দিতে পারি তাহলে এ কাফেলা গুলি ইরাবতীর কিনারে পৌছে যাবে।

সেলিম বললো, মজিদ! সুযোগ পেলে রাতের বেলা শিখদের কোনো গ্রামে জবাবী হামলা করা কি আমাদের জন্য ভালো হবে না?

এখন তুমি একজন সিপাহীর মতো কথা বলছো। আমরা অবশ্যই হামলা করবো। আকাশে মেঘের আনাগোনা হচ্ছে। আল্লাহ করুন যেন রাতের বেলা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে।

নিচের ছাদ থেকে বশির আওয়াজ দিল, মজিদ! সড়কের ওপর দুটো জীপ আসছে।

মজিদ, দাউদ ও সেলিম হাঁটুতে ভর দিয়ে কার্নিশের ওপর থেকে নিচের দিকে উঁকি দিতে লাগলো। জীপগুলি সড়ক থেকে নেমে গ্রামের দিকে আসছিল।

মজিদ বললো, সেলিম! তোমরা সবাই যার যার মোর্চায় চলে যাও।

জীপগুলি ভুট্টাক্ষেতের পাশে থামলো। সিপাহীরা গাড়ি থেকে নেমেই মর্টারের সাহায্যে গোলাবর্ষণ শুরু করে দিল। শিখ হামলাকারী দলের লোকেরা যারা এতক্ষণ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল এখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। মোর্চায় বসে থাকা সিপাহীদের মধ্য থেকে পনর জন বাইরে বের হয়ে এসে শিখ হামলাকারী দলগুলির সাথে মিশে গেলো।

এক ঘন্টার অবিরাম গোলা বর্ষণের ফলে তারা উভয় হাবেলীর কয়েকটি কামরা একেবারে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছিল। কোনো কোনো দেয়াল ও ছাদে বড় বড় গর্ত হয়ে গিয়েছিল। নারী ও শিশু ভর্তি দুটি কামরার ছাদ উড়ে গিয়েছিল। পুরুষরা জখমীদের বাইরে বের করে নিয়ে আসছিল।

মজিদ ঘড়ি দেখে বললো, দাউদ এখন ছটা বেজেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে হামলা করে আমরা ওদের মর্টার ছিনিয়ে নিতে পারি। ঐ ভুট্টা ক্ষেতটির আশপাশ যদি খালি না থাকাতো তাহলে আমি এখনি একটা চেষ্টা করে দেখতাম।

দাউদ জবাব দিল, সন্ধ্যা পর্যন্ত সম্ভবত এই বাড়িগুলির আর কোনোটির দেয়াল অক্ষত থাকবে না।

হাবেলীর আঙিনায় পরপর কয়েকটি বোমা পড়ার পর লোকদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলো। 'এখান থেকে সরে যাও,' 'এখান থেকে সরে যাও।' কিছু লোক কামরাগুলির দরোজা খুলে দিয়ে মেয়েদের ও শিশুদের ডাক দিতে লাগলো। এক জায়গায় দেয়ালে গর্ত হয়ে গেলো। চিৎকার করতে করতে একদল লোক বাইরে বের হয়ে এলো। মসজিদের ছাদ থেকে সেলিম চিৎকার করে বললো, এদিকে এসো না, পেছনের দিকে সরে যাও। লোকেরা তার আওয়াজ শুনলো না। কিন্তু শিখদের একটি গৃহের ছাদ থেকে গুলী বৃষ্টি তাদেরকে পেছনের দিকে হটে যেতে বাধ্য করলো।

মজিদ বালাখানার ছাদ থেকে নেমে নিচের ছাদে এসে চিৎকার করে বলছিল, শুয়ে পড়ো, আল্লাহর দোহাই জমিনে শুয়ে পড়ো।

দক্ষিণ দিকে পশুশালার একটি কামরা পড়ে যাবার ফলে আখের ক্ষেতের দিকে বের হবার একটি রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। হাবেলীর মধ্যে আরো কয়েকটা বোমা পড়ার পর লোকেরা দিশেহারা হয়ে সেই পথে বাইরে বের হতে লাগলো। সেনাবাহিনীর লোকেরা তাদের মোর্চা থেকে একসাথে অজস্র গুলী বর্ষণ করলো। ফলে বেশ কিছু নারী ও শিশু নিহত হলো।

সেলিম চেঁচালো, 'পিছনে হটো, পিছনে হটো'।

মজিদ নিচে নেমে এসে দৌড়ে হাবেলীর মধ্যে প্রবেশ করলো। তার জামার বাহু আস্তিন রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠেছিল। আতংকে চিৎকার করতে করতে মেয়েরা ও শিশুরা এবং মারাত্মকভাবে আহত লোকেরা তার চার দিকে জমা হয়ে গেলো।

মজিদ হাত উঁচু করে বললো, দেখো, তোমরা খামখা জান দিচ্ছো। আল্লাহর ওয়াস্তে আশেপাশের দেয়ালের পাশে শুয়ে পড়ো।

লোকেরা তার হুকুম তামিল করলো। একটি ছোট মেয়ে মজিদের পায়ের কাছে শুয়ে পড়লো। মজিদ তাকে উঠিয়ে পশুর জাবনা খাওয়ার পাত্রের মধ্যে শুইয়ে দিল। তারপর লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, যদি এভাবে বাইরে বের হয়ে কারোর প্রাণ বাঁচাবার সুযোগ থাকতো তাহলে আমি তোমাদের মানা করতাম না। দুশমনরা চারদিক থেকে গ্রাম ঘিরে রেখেছে। আমাদের রাতের অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কয়েকজন বন্দুক চালনাকারী জখমী হয়ে গেছে। তোমাদের মধ্য থেকে যে বন্দুক চালাতে পারে সে আমার সাথে এসো। বাদবাকি যারা আছে কেউ নিজের জায়গা থেকে নড়বে না।

সন্ধ্যা সাতটা বেজে গিয়েছিল। ধ্বসে যাওয়া ছাদে উঠে এবং ভাঙা প্রাচীরের আড়াল নিয়ে মুসলমানরা দুশমনের ওপর গুলী বর্ষণ করে চলছিল। শিখেরা একথা মনে করে হামলা করেছিল যে, বিধ্বস্ত গৃহগুলির মধ্যে এদের প্রতিরক্ষা শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে এবং আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা মুসলমানদেরকে নেস্তনাবুদ করে দেবে। কিন্তু মুসলমানরা আর একবার তাদের ঈমানের উষ্ণতার প্রমাণ পেশ করলো। তাদের জবাবী আক্রমণের তীব্রতায় দুশমন পিছপাও হতে বাধ্য হলো।

বোমার আঘাতে ইউসুফ মারাত্মকভাবে জখমী হলো। ঘরের মেয়েরা তাকে উঠিয়ে দালানের মধ্যে নিয়ে গেলো। দালানের ছাদের এক কোণে বিরাট গর্ত। সাঁঝের আঁধার যতই ঘনিয়ে আসছিল ততই হামলাকারীদের ঘেরাও সংকীর্ণ হতে চলছিল।

মসজিদের একটি দেয়াল ভেঙে পড়েছিল। এই সংগে ছাদের কয়েকটি কড়িবরগাও নিচে নেমে এসেছিল। ছাদের অন্য কোণে মজিদ ও তার সাথিরা এখনো মোর্চা অটুট রেখেছিল।

মজিদ তার কয়েকজন সাথিকে নিয়ে হামলার প্রস্তুতি করার পর বাকিদেরকে জরুরী নির্দেশনা দিচ্ছিল। আচানক সেলিম আওয়াজ দিল, মজিদ! দেখো সড়কের দিক থেকে একটা ছোট ট্যাংক আসছে।

কিছুক্ষণের জন্য মজিদের মুখ থেকে আর কোনো শব্দ বের হলো না। পরে অস্পষ্ট স্বরে বললো, না ট্যাংক হতে পারে না। দাঁড়াও আমি দেখছি।

দাউদ বললো, না, আমি দেখছি। বলেই সে চড়ে উঠলো একটা উঁচু গাছে। 'সম্ভবত একটা ব্রেন ক্যারিয়ার' সে চেঁচিয়ে বললো।

আর আমরা রাতের আঁধারের অপেক্ষা করতে পারি না, মজিদ তার সাথিদের দিকে তাকিয়ে বললো।

উপর থেকে দাউদ চেঁচিয়ে উঠলো, সেনাবাহিনীর সিপাহীরা ব্রেন ক্যারিয়ারের দিকে দৌড়াচ্ছে। ওটাকে ঢাল বানিয়ে তারা এখানে পৌছে যাবে।

দাউদ, জলদি নিচে নেমে এসো।

দাউদ ও সেনাবাহিনীর অন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সিপাহীদের সাথে কিছুক্ষণ পরামর্শ করার পর মজিদ বললো, আমি কেবল চারজনকে আমার সাথে নিয়ে যেতে চাই। স্টেনগানটি আমাকে দাও। আমরা ব্রেন ক্যারিয়ারকে বাধা দেবার চেষ্টা করবো। তোমরা সবাই এখানে থাকো। আর মনে রেখো বীরের মৃত্যু কাপুরুষের মৃত্যুর চেয়ে ভালো। শিখদের এটা হবে শেষ আক্রমণ। যদি আমরা তাদের পিছু হটিয়ে দিতে পারি তাহলে আজ রাতের অন্ধকারে এখান থেকে কিছু লোকের জীবিত বের হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। যতক্ষণ আমি ফিরে না আসবো, আমার জায়গায় দায়িত্ব পালন করবে জমাদার ইনায়েত আলী।

সারা দিনের লড়াইয়ে ইনায়েত আলী প্রমাণ করেছিল, সে হুকুম মেনে চলতে এবং হুকুম দিতে জানে।

একটি ট্যাংক আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছিল। পনর ষোল জনের একটি পদাতিক বাহিনী তার পেছনে পেছনে আসছিল। যখনই গাড়ি ক্ষেতের এক কোণে পৌছুলো, মজিদ দ্রুত দৌড়ে বাইরে বের হয়ে এলো। দুজন সৈন্য ফায়ার করলো। একটি গুলী তার রানে এবং অন্যটি বাহুতে বিদ্ধ হলো। কিন্তু ততক্ষণে গাড়ির কাছে পৌছে সে বোমা ছুঁড়ে দিয়ে জমিনে শুয়ে পড়েছিল। ট্যাংকের ওপর বোমাটি পড়লো। ট্যাংকের পেছনে আগত পদাতিক সৈন্যরা মজিদের প্রতি দৃষ্টি দেবার আগেই ক্ষেতের উঁচু আইলের পেছনে শায়িত দাউদ ও তার সাথিরা স্টেনগানের সাহায্যে তাদের ওপর গুলী বৃষ্টি শুরু করে দিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সাত আটজন সৈন্য মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। মজিদ শুয়ে শুয়ে দ্বিতীয় বোমা নিক্ষেপ করলো। তাতে সৈন্যদের আরো তিনজন নিহত হলো। বাকি সৈন্যরা পালিয়ে পানির খাদে শায়িত হলো। ট্যাংকটা বিদিশা হয়ে এদিক ওদিক ভাগছিল। মোর্চার মধ্য থেকে বের হয়ে কয়েকজন লোক ট্যাংকের পেছনে ধাওয়া করলো। দু'শ গজের মতো এগিয়ে যাওয়ার পর ট্যাংক ঘন ঝাউগাছের ঝোপের মধ্যে আটকে

গেলো। পানির খাদে আটক সিপাহীরা মজিদকে তাক করে গুলীবর্ষণ করছিল। ক্ষেতের দশ কদম দূরে মজিদের শক্তি নিশেষ হয়ে যাচ্ছিল। সে জমিনের ওপর মাথা রেখে দিল।

দাউদ তার সাথিদের বললো, মজিদ জখমী হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি। তোমরা ঐ সৈন্যদের ওপর গুলী বর্ষণ করতে থাকো। দাউদ বুকে হেঁটে মজিদের কাছে পৌঁছে গেলো। মজিদ চেঁচিয়ে উঠলো, দাউদ তুমি যাও, সময় নষ্ট করো না। কিন্তু দাউদ তার বাহু তুলে ধরে তার বগলে নিজের মাথা গলিয়ে দিল এবং দ্বিতীয় হাত দিয়ে তার কোমর আঁকড়ে ধরে তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। কয়েকটি গুলী মজিদের চুল স্পর্শ করে গেলো। একটি গুলী দাউদের বাহু ছুঁয়ে চলে গেলো। যখন সে ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করলো। অমনি শিখেরা শোরগোল করে উঠলো 'দেখো ঐ সুবেদার যেন পালাতে না পারে, তার পিছু নাও।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই আশেপাশের শিখ দলগুলি থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো 'সুবেদার ক্ষেতের মধ্যে রয়েছে, দেখো যেন পালিয়ে যেতে না পারে।'

মজিদকে নিজের কোমরের ওপর উঠিয়ে দাউদ নিজের সাথিদের বললো, তোমরা এখান থেকে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর পাঁচ মিনিট পর্যন্ত ফায়ার করতে থাকো।

চারদিক থেকে লোকদের আওয়াজ দাউদের কানে আসছিল। কিন্তু মজিদকে শায়িত করার জন্য কোনো নিরাপদ জায়গা সে পাচ্ছিল না। একটি আখের ক্ষেত থেকে বের হয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আখের ক্ষেতে পৌঁছে গেলো। মজিদ বলছিল, 'দাউদ! আল্লাহর দোহাই, আমাকে ছেড়ে দাও, তুমি চলে যাও।' কিন্তু সে থামলো না। রেহেটের কাছে পৌঁছে দেখলো পেয়ারা বাগানের আশেপাশে যথেষ্ট নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। দাউদ থেমে গেলো। কোমর থেকে নামিয়ে মজিদকে সেখানে শায়িত করলো। পাগড়ীর একটা অংশ ছিঁড়ে বাহু ও রানে পট্টি বেঁধে দিল।

আচানক মজিদ চেঁচিয়ে উঠলো, শোনো আহম্মক, ওরা মেশিনগান চালাচ্ছে। হায় আফসোস, যদি আমরা ট্যাংকটা কবজা করতে পারতাম!

দাউদ উঠে দাঁড়ালো। স্টেনগানটি নিয়ে গ্রামের দিকে দৌড়ালো।

মজিদ ও দাউদের বাইরে বের হতেই লোকেরা আন্দাজ করলো, পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ইনায়েত আলী অর্ধবিধ্বস্ত ছাদের ওপর থেকে ট্যাংকের ওপর দাউদ ও মজিদের হামলার ফলাফল দেখছিল। যখন ট্যাংক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঝাউ গাছের ঘন ঝোঁপের মধ্যে আটকে গিয়েছিল তখন সে মহা উল্লাসে সাবাশ সাবাশ বলতে বলতে নিচে নেমে এসেছিল এবং ভীত সন্ত্রস্ত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিল, দুশমনের সবচেয়ে বড় অস্ত্র অকেজো হয়ে গেছে। এখন তোমরা জবাবী হামলার জন্য প্রস্তুত হও।

অন্যদিকে মজিদ ও তার সাথিরা শ্লোগান দিচ্ছিল। কিছুক্ষণের জন্য দুশমনের মর্টারও খামুশ হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা মনে করছিল সবচেয়ে বড় বিপদটা কেটে গেছে। কিন্তু দশ মিনিট পর আবার গোলা বর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। আচানক সেলিম আওয়াজ দিল, হুশিয়ার! হুশিয়ার! ট্যাংকটি আবার আসছে।

ইনায়েত আলী পুনর্বার দৌড়ে ছাদে চড়লো। ট্যাংকটিকে আবার আসতে দেখে এক মুহূর্তের জন্য সে হতভম্ব হয়ে গেলো। ট্যাংকের পেছনে বিপুল সংখ্যক শিখ শ্লোগান দিতে দিতে আসছিল। ইনায়েত আলী পেছন ফিরে আশপাশের দেয়াল ও ছাদ থেকে উঁকি দিয়ে যারা দেখছিল তাদেরকে দেখলো এবং বুলন্দ আওয়াজে বললো, যে কোন মূল্যে আমাদের এর পথরোধ করতে হবে। সিড়িপথ দিয়ে নিচে নামার পরিবর্তে সে ছাদ থেকে নিচে আবর্জনা স্তূপের ওপর লাফিয়ে পড়লো। কিন্তু তখনই সেখানে একটি বোমা পড়লো এবং মুহূর্তের মধ্যে চতুর্দিকে ঘোষণা হয়ে গেলো। 'জমাদার শহীদ হয়ে গেছে।' লোকদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলো।

হতবিধ্বস্ত ভগ্নোদ্যম মুসলমানদের শেষ দৃশ্য দেখার পর সূর্য অস্তপাটে মুখ লুকিয়েছিল। সন্ধ্যার আলো আঁধারির ওপর রাতের ঘন অন্ধকার প্রাধান্য বিস্তার করছিল। ট্যাংক তার মেশিনগান থেকে অগ্নিগোলা উদগীরণ করতে করতে এগিয়ে আসছিল। 'পন্থ কি জয়', 'খালিস্তান কি জয়', 'ওয়াহগুরুজী কি ফাতাহ'–শ্লোগান উচ্চকিত হচ্ছিল। হামলার বিউগল বেজে উঠলো এবং বন্যতা ও বর্বরতার সয়লাব চতুর্দিক গ্রাস করলো।

এশিয়ার জাতিদের নেতৃত্বের দাবীদার সালতানাতের পৃষ্ঠপোশকতায় যুদ্ধরত সেনাদল শেষ পর্যন্ত তার প্রতিপক্ষের ওপর বিজয় লাভ করলো। শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের গলায় শিখদের কৃপাণ চালনার পথ নিষ্কণ্টক হয়ে গেলো। হিন্দুস্তানী সেনাদলের বীরপুরুষরা নিরস্ত্রদের বুকে নিশানাবাজী করার ক্ষেত্রে সফলকাম হলো। হাবেলীর ভেতরে প্রবেশকারী হানাদাররা এদিক ওদিক যারা পালিয়ে যাচ্ছিল তাদের ব্যাপকভাবে হত্যা করছিল। গ্রামের সমস্ত গলিপথ বন্ধ দেখে পলায়নকারীরা আখের ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে পড়তে লাগলো। কিন্তু মেশিন গানের গুলী থেকে অতি অল্প সংখ্যক লোকই আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল।

মসজিদের ছাদ থেকে সেলিম ও তার দুজন সাথি লাগাতার ফায়ারিং করে চলছিল। ফলে ফটকের দিক থেকে কেউ ভেতরে ঢোকার সাহস করছিল না। কিন্তু সেলিমের থলিতে আর মাত্র কয়েকটি গুলী রয়ে গিয়েছিল। সে ম্যাগজিনে শেষ রাউণ্ড গুলী ভরে নেবার পর নিজের সাথিদের দিকে তাকিয়ে বললো, আমার কাছে এখন মাত্র একটি হাতবোমা আছে, আমি ট্যাংকের ওপর হামলা করতে যাচ্ছি। ওটাকে অকেজো না করা পর্যন্ত শিখদের ময়দান থেকে ভাগানো যাবে না।

সেলিমের একজন সাথি বললো, প্রাণ বিসর্জন দেয়া ছাড়া তোমার আর কোনো লাভ হবে না।

এখন আর আমার প্রাণের কি দামই বা আছে!

কিন্তু তুমি কিভাবে নামবে শিখরা চারদিক থেকে আমাদের তাক করে আছে। একমাত্র আখক্ষেতের উঁচু আইলের পাশ দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারো। কিন্তু মেশিনগানের ফায়ারিং থেকে আত্মরক্ষা করে তুমি ক্ষেতে পৌঁছুতে পারবে না।

হাওড়ের কিনারা দিয়ে নলখাগড়ার আড়াল নিয়ে আমি সেখানে পৌঁছে যাবো। তোমাদের কারোর পাগড়ি আমার মাথায় পরিয়ে দাও।

সাথিদের মধ্য থেকে একজন তার পাগড়ী শিখদের মতো করে সেলিমের মাথায় পরিয়ে দিল। দ্বিতীয় সাথি বললো, নামবে কিভাবে? দেখার সাথে সাথেই ওরা গুলী করে দেবে। এ প্রশ্নের জবাব দেবার পরিবর্তে সেলিম কনুই ও বুকে ভর দিয়ে মাটির বস্তার মোর্চার বাইরে বের হয়ে এলো এবং ছাদের অপর কোণে সৃষ্ট বিরাট ফাটলের কাছে পৌঁছে গেলো। 'করিম বখ্‌শ, আমি এখান থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ছি। তুমি আমার রাইফেলটি পাগড়ীর সাথে বেঁধে নিচে লটকে দাও।'

না সেলিম, তুমি ভেতরে গিয়ে দরোজার পথে বের হতে গেলে কূয়ার পাড়ের পেছনে লুকিয়ে থাকা শত্রু তোমার ওপর হামলা করবে।

সেলিম কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় তার পায়ের পাশে এসে পড়লো কোনো একটা জিনিস। 'বোমা' তার সাথি চেঁচিয়ে উঠলো। কিন্তু তার চেঁচাবার আগেই জিনিসটি মাটি ছোঁয়ার মহূর্তেই সেলিম সেটি লুফে নিয়ে ছাদের নিচে ছুঁড়ে দিল। বোমাটি জমিনে পড়েই ফেটে গেলো। এরপর এক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর সেলিম আচানক একটি কড়িবরগা ধরে ভিতরে ঝুলে পড়লো। উপর থেকে একজন তার রাইফেল পাগড়ীতে বেঁধে নিচে লটকে দিল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চললো সে। এরি মধ্যে ছাদে একটি বিস্ফোরণ হলো। কোনো ভারী জিনিস আঘাত করলো তার মাথায়। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলো সে একদিকে।

হাবেলীর মধ্যে তখনো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাবার মতো দুসাহসিক মর্দে মুমিন কম ছিল না। এতক্ষণ তারা ভাঙা দেয়ালের আড়াল থেকে বন্দুক চালাচ্ছিল। কিছু লোক ভেঙে পড়া ছাদ ও দেয়ালের ওপর শায়িত হয়ে ইট ছুঁড়ছিল। গোলাম হায়দর বুলন্দ আওয়াজে বললো, মুসলমান ভাইয়েরা! এসো আমরা দেখিয়ে দেই বাহাদুর কিভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। এই সাথে উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে দিতে বাইরে বের হয়ে এলো। তার সাথে পঞ্চাশ ষাটজনের একটি দলও বের হয়ে এলো। তাদের বেশির ভাগের হাতে ছিল শিখদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া কৃপাণ ও বর্শা। বাইরে বের হয়েই তারা দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের উদ্দীপিত আক্রমণে শিখদের কোমর ভেঙে গেলো। কিন্তু এটা ছিল নিভন্ত প্রদীপের শেষ শিখা। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে শিখদের আর একটি দল পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে ভেঙে পড়া দেয়ালগুলি পার হয়ে হাবেলীর ভেতরে প্রবেশ করলো। তাদের একটি দল নারী ও শিশু ভর্তি একটি কামরায় পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে দিল।

বাইরে বের হয়ে যারা লড়াই করছিল ভেতরে আগুন দেখে পেছন ফিরে তারা বাসগৃহের দিকে দৌড়াতে লাগলো।

তারা চিৎকার করছিল, আমার মা, আমার স্ত্রী, আমার বোন, আমার ছেলে, আমার মেয়ে! এর জবাবে তারা দেখছিল আগুনের দাউদাউ শিখা। শুনছিল আগুনের শিখার ভেতর থেকে আর্ত চিৎকার ও ক্রন্দন ধ্বনি।

হামলাকারীরা কিছুক্ষণের মধ্যে মা, বোন, স্ত্রী সন্তান ও জখমীদের জন্য হাহুতাশকারীদেরকে চিরকালের জন্য খামুশ করে দিল। কিন্তু আগুন তার লেলিহান শিখা বিস্তার করেই চলছিল। দীর্ঘক্ষণ ধরে এ আগুন জ্বলতে থাকলো। তার মধ্য থেকে উত্থিত আর্ত চিৎকার শোনা যেতে থাকলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত। আর তার জবাবে শোনা যেতে থাকলো হামলাকারীদের উৎকট হাস্যধ্বনি। তারা উচ্চস্বরে শ্লোগান দিয়ে চলছিল পন্থ কি জয়! খালিস্তান কি জয়!

আকাশে মেঘের আড়াল থেকে কোথাও তারকারা উঁকি দিচ্ছিল। তারা পরস্পর কানাকানি করছিল, 'পন্থ কি জয়' নয়, 'প্যাটেল কি জয়'। 'আর খালিস্তান কি জয়' বলো না বরং বলো, 'মাউন্ট ব্যাটেন কি জয়,' 'র‍্যাডক্লিফ কি জয়।'

সেলিম জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খুললো। মসজিদের আঙিনায় শায়িত ছিল সে। অন্ধকারে কয়েকজন লোক তার ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখছিল। একজন তার চেহারায় টর্চের আলো ফেললো এবং সে আচানক উঠে বসলো।

তোমরা কারা? সে তার জখমী মাথা দুহাতে চেপে ধরলো।

জবাবে একটি মেয়ে কাঁদতে লাগলো চিৎকার করে। এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ঘটনা সেলিমের মাথার মধ্যে কিলবিল করে উঠলো। তার পাশে বসা লোকটির হাত থেকে টর্চ ছিনিয়ে নিয়ে লাফিয়ে উঠলো সে এবং চারদিকে সমবেত লোকদের একবার দেখে নিল টর্চের আলোয়।

হাবেলী ও তার আশে পাশে মুসলমানদের সমস্ত ঘর বাড়ি জ্বলছিল। এক মুহূর্তের জন্য সেলিম দাঁড়িয়ে রইলো নিরব নিস্তব্ধ তারপর দৌড়ে মসজিদের আঙিনার বাইরে চলে এলো। হাবেলীতে সমবেত লোকেরা তার পিছু নিল। 'সেলিম থামো', 'থামো'।

বাইরের হবেলীর আঙিনায় পৌঁছে আগুনের লেলিহান শিখার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো সে কিছুক্ষণ। ভেতরের হাবেলী বিশাল অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছিল। নারী, শিশু ও জখমীদের দিয়ে ঠাসা কামরা ও দালানগুলি জ্বলে ভস্মীভূত হচ্ছিল। বাইরের হাবেলীর আগুন শস্যাগুদাম ও পশুশালাগুলি জ্বালাবার পর বারান্দার তৃণাচ্ছাদিত চালে পৌঁছে গিয়েছিল। হাবেলীর মধ্যে ঝুঁকে পড়া বটগাছের ডালপালাগুলিও জ্বলে

গিয়েছিল। অন্যদিকে জ্বালানী কাঠ ও পশুখাদ্যের গুদামের আগুন আকাশ ধোঁয়া হয়ে ওপরে উঠছিল। সমস্ত আঙিনায় ছিল লাশের স্তূপ। কিন্তু এগুলি লাশ ছিল না, ছিল গোশতের টুকরা। হানাদাররা বিজয় লাভের পর বিজিতদের ওপর এভাবে তাদের কৃপাণের ধার পরীক্ষা করেছিল। কল্লা, হাত, পা, রান সব কেটে আলাদা করে দেয়া হয়েছিল। চরম আক্রোশ ও চরম ক্রোধের প্রকাশ ঘটেছিল। দেউড়ির সামনে নারী ও শিশুদের লাশের স্তূপ জমে উঠেছিল। এরা দালানে আগুন লাগার পর বিভিন্ন কামরা থেকে বের হয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করেছিল।

সেলিম সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়েছিল। তার চারদিকে সমবেত লোকদের মধ্য থেকে একজন তার কাঁধে হাত রাখলো। সেদিকে কোনো প্রকার দৃকপাত না করে সে তাকিয়ে রইলো আগুনের লকলকে শিখাগুলির দিকে। কিছুক্ষণ পরে পাশের লোকটি তাকে আস্তে করে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'সেলিম!' 'সেলিম!'

মহেন্দর সিং কথা বলছিল। আচানক সেলিম যেন জ্ঞান ফিরে পেলো। মহেন্দরের দুবাহু ধরে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে বললো, 'মহেন্দর! ওরা কোথায়? ওরা সব কোথায় গেছে? আমার খান্দানের মেয়েরা, আমার বোনেরা, আমার চাচীরা, আমার মা, ওদের সবার কি হলো? বলো বলো, তোমার আল্লাহর দোহাই বলো।' সে মহেন্দরকে ঝাঁকুনি দিয়ে চলছিল। কিন্তু মহেন্দরের কাছে বিগলিত ধারায় ঝরে পড়া অশ্রু ও চাপা কান্না ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

কাকু ঈসায়ী এগিয়ে এসে বললো, ওরা সবাই অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। সেলিম! তোমাদের খান্দানের কোনো নারী ও শিশু বাইরে বের হয়নি। যখন ওরা বাড়িঘরের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল আমি বড় গাছটিতে চড়ে পাতার আড়ালে লুকিয়ে সব দেখছিলাম। কামরা থেকে বের হয়ে যেসব মেয়ে ও শিশুরা এদিক ওদিক ভাগছিল তাদেরকে ওরা বেধড়ক হত্যা করছিল অথবা আবার আগুনের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিল। খুব কম সংখ্যকই ক্ষেতের মধ্যে ঢুকতে পেরেছিল। তোমার খান্দানের কেউ বাইরে বের হয়ে আসেনি।

মহেন্দর বললো, আমি শিখ দলের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেছি। শিখ দল প্রধানের ইচ্ছা ছিল,......... তোমাদের খান্দান .... তোমাদের খান্দানের মেয়েদের জীবিত পাকড়াও করা হবে। তারা দরোজা খোলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। তারা দরোজা ভাঙছিল এমন সময় ঘুলঘুলি দিয়ে কেউ ভেতর থেকে ফায়ার করে। ফলে হামলাকারীদের কয়েকজন জখমী হয়। কয়েকটি ছররা গুলী দলনায়কের মুখে আঘাত করে। ছাদের ফাটল ভেদ করে দুজন লোক ভেতরে লাফিয়ে পড়ে। তাদেরকে সম্ভবত মেয়েরা হত্যা করে। এরপর সেখানে ব্যাপকভাবে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়।

সেলিম অন্য লোকদের দিকে তাকালো। সেখানে ছিল গ্রামের আটদশ জন ঈসায়ী এবং অন্য গ্রামের তিনজন মুসলমান। তাদের মধ্যে সেই সিপাহীটিও ছিল যে ট্যাংকের ওপর হামলা করার উদ্দেশ্যে মজিদ ও দাউদের সংগে গিয়েছিল। সবার

থেকে আলাদা হয়ে আর একজন যুবক আগুনের শিখার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়েছিল।

কে? বশির? চিনতে পেরে সেলিম জোরে আওয়াজ দিল।

বশির ঘাড় ওপরে ওঠালো কিন্তু নিজের জায়গা থেকে এক চুল নড়লো না।

বশির! বশির! সেলিম অগ্রসর হলো, আল্লাহর দোহাই আমাকে বলো ওরা সবাই কি............? সেলিমের কণ্ঠধ্বনি মাঝপথে নিস্তেজ হয়ে পড়লো।

বশিরের চোখ দিয়ে অশ্রুর দরিয়া বয়ে চললো। সেলিমকে জড়িয়ে ধরলো সে। কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'সেলিম! এসো এ আগুনে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি। এ আগুনের বুকে ছাড়া আর কোথাও আমাদের ঠাঁই নেই। বাকি সারা জীবন জ্বলে পুড়ে দগ্ধীভূত হবার চাইতে এ আগুনের বুকে আমাদের ভস্মীভূত হয়ে যাওয়াই ভালো। দেখো এখন আর সেখানে কোনো ফরিয়াদ, চিৎকার, আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। সেলিম আমি মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম কিন্তু এখন জীবনকে ভয় পাচ্ছি।

বশির, আল্লাহর দোহাই আমার প্রশ্নের জবাব দাও। আমি কেবল এতটুকু জানতে চাই ওরা কাউকে ধরে নিয়ে গেছে কিনা?

না, মহেন্দর যা বলেছে সব সত্যি। ওরা দরোজা ভাঙছিল কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের ইজ্জত আব্রু রক্ষা করেছেন। ইউসুফ জখমী হয়ে তাদের কাছে চলে গিয়েছিল; ঘুলঘুলি থেকে সেই ফায়ার করেছিল। ফলে দুশমনরা ক্রোধোন্মত্ত হয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। ওরা বুলন্দ আওয়াজে কালেমা পড়ছিল।

কিছুক্ষণ পর সে আবার জিজ্ঞেস করলো, আমাদের লোকদের মধ্যে আর কেউ বাঁচেনি?

শিখেরা দলবল নিয়ে ফিরে যাবার সাথে সাথেই আমি মসজিদের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তোমাকে খুঁজতে থাকি। হতে পারে আমার মতো আর কেউ হয়তো বেঁচে গিয়েছে।

কাকু বললো, দাউদ ফটকের কাছে দেয়ালের ইঁটের নিচে চাপা পড়ে কাতরাচ্ছিল, আমি গাছ থেকে নেমে সবার আগে তাকে বের করি। সে বললো, সুবেদার জখমী ছিল। তাকে আমি পেয়ারা বাগানে রেখে এসেছিলাম। সে তার অবস্থা দেখার জন্য সেখানে গিয়েছে।

সেলিম বললো, মসজিদের ছাদে আমার সাথে আরো দুজন ছিল। আমি যখন নেমে আসছিলাম সম্ভবত উপরে বোমা পড়েছিল। তোমরা কি তাদেরকে দেখেছো?

কাকু বললো, তাদের লাশ জঞ্জালের স্তূপের ওপর পড়ে ছিল। শিখদলের লোকেরা সে দৃশ্য দেখে ফিরে চলে গেছে। আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি তুমি এর নিচে চাপা পড়ে আছো। ভেবেছিলাম আগেই তুমি কোথাও বের হয়ে গেছো। কিন্তু মহেন্দর টর্চের আলোয় তোমার বন্দুকের বেয়নেট দেখে ফেলেছিল।

সেলিম বললো, আমার বন্দুক কোথায়?

সেখানেই পড়ে আছে।

যে যুবতী মেয়েটি সেখান থেকে কয়েক কদম দূরে ডুকরে কাঁদছিল, বন্দুকের নাম শুনতেই সে সামনে এগিয়ে এসে অনুরোধের ভংগীতে সেলিমের দিকে তাকিয়ে বললো, ভাইজান, আল্লাহর দোহাই এবার নিজের জান বাঁচাও। এখান থেকে পালিয়ে যাও। মজিদকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও।

এ ছিল শের সিংয়ের মেয়ে এবং গোলাপ সিংয়ের বোন রূপা। সেলিম বললো, রূপা তুমি তোমার বাড়িতে চলে যাও।

কিন্তু রূপা তার হাত ধরে বলতে লাগলো ভাইজান, তুমি একা কিছুই করতে পারবে না। তুমি কজনকে মারবে? কজনের সাথে লড়বে? আল্লাহর দোহাই এবার পাকিস্তান চলে যাও। রাতের আঁধারে তোমরা চলে যেতে পারবে।

সেলিম চিৎকার করলো, রূপা চলে যাও।

এক মুহূর্তের জন্য সেলিমের ক্রোধমাখা স্বরে রূপা একটু ভড়কে গেলো তারপর আবার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার আলোয় সেলিমের চোখে চোখ রেখে বললো, সেলিম! আমার আবেদন এক বোনের আবেদন। একে পায়ে ঠেলে দিয়ো না। যদি তুমিও মরে যাও তাহলে এ খান্দানের নাম নিশানাই মিটে যাবে।

আর সেলিম স্বগতোক্তির মতো বলে চলছিল, আমার কোনো খান্দান নেই। কোনো গ্রাম নেই। কোনো ঘর নেই। এখন আমি কারোর ভাই নই। এখন আমি শুধুমাত্র প্রতিশোধ।

মহেন্দর বললো, যদি একজন মানুষের রক্ত এই জাতির পাপ ধুয়ে ফেলতে সক্ষম হয় তাহলে আমি তোমাকে বলছি সেলিম আমার গর্দান পেতে দিচ্ছি। নির্দ্বিধায় ছুরি চালিয়ে দাও। আমি বলিদান দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এক জাতির পাপের বোঝা এক জাতিই উঠাতে পারে। আমার ব্যাপারে ভুল ধারণা করো না। আমি ঐ নেকড়েদের প্রতি রহম করার জন্য তোমাদের কাছে দরখাস্ত করছি না। যদি তুমি একা বা তোমরা এই কজন বন্দুকের সাহায্যে গুলী করে ওদেরকে খতম করতে পারতে তাহলে আমি তোমাদের বাধা দেবার পরিবর্তে সামনের দিকে ঠেলে দিতাম। কিন্তু তুমি জানো এই তুফানকে তুমি একাকী রুখতে পারবে না। সেলিম! তোমরা এখনই এখান থেকে বের হয়ে যাও। এ রাতটি পার হয়ে গেলে হয়তো তোমরা আর কোনো সুযোগ নাও পেতে পারো। মজিদ আহত হয়ে পড়ে আছে। কমপক্ষে তাকে বাঁচাতে পারো। মজিদের জন্য আমি নিজের ঘোড়া তোমাদের দিতে পারি। তোমরা হিম্মত করলে প্রভাত হবার আগেই ইরাবতী অতিক্রম করতে পারবে।

গ্রামের একজন ঈসায়ী বললো, তোমাদের তিনটি ঘোড়া সারাদিন এদিক ওদিক ছোটাছুটি করেছে। অন্য একটি ঘোড়াও তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে।

আরেকজন বললো, আমি এখনই ওদেরকে দেখেছি। মসজিদের পাশে জানালার গুলির নিচে সেগুলি দাঁড়িয়েছিল।

সেলিম মহেন্দরের কথার কোনো জবাব দিল না। আর একবার অগ্নিশিখার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলো। আচানক তার মনে ভেসে উঠলো আর একটি হাবেলীর

চিত্র। সেখানে বসবাসকারীদের সবার চেহারা একের পর এক সে যেন তার চোখের সামনে দেখতে পেলো। এখন সেখানে কি হচ্ছে? সে মনে মনে প্রশ্ন করলো। ইসমত ও রাহাত কি অবস্থায় আছে? ওরা পাকিস্তানের অনেক কাছে। ওরা নদী পার হয়ে পাকিস্তান চলে গিয়ে থাকবে। কিন্তু যদি ওরা ওখানে থাকে তবে তো? কিন্তু শিখেরা যদি সেখানেও হামলা করে দিয়ে থাকে তাহলে–? চরম হতাশার মধ্যে সেলিম জীবনের যে প্রান্তদেশ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল তাকে আবার আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছিল। নিকশ অন্ধকার, আঁধি ও ভয়ংকর তুফানের মধ্যে সে নতুন মশাল জ্বালাচ্ছিল। একবার ডুবে যাবার পর পানির উপরিভাগে এসে হাতপা নাড়ছিল সে। 'ইসমত' 'ইসমত' 'ইসমত' তর হৃদস্পন্দন থেকে উচ্চকিত হচ্ছিল এবং ইসমত যেন অগ্নিশিখার মধ্যে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল, 'আমাকে বাঁচাও!' 'আমাকে বাঁচাও!'

এক ঈসায়ী যুবক দৌড়ে এসে বললো, শের সিং পাগল হয়ে গেছে। শিখদের মহল্লায় আগুন লাগাবার পর সে এখন আমাদের মহল্লায় এসে গেছে। সে বলছে, আমি এ গ্রামের সমস্ত ঘর জ্বালিয়ে দেবো। তোমরা এ গ্রাম থেকে বের হয়ে যাও। এ গ্রামে আর কেউ থাকবে না। গ্রামের শিখেরা ফিরে এসে কেবল আফজালের ঘরের ছাই দেখবে না।

সেলিম বললো, মহেন্দর! সেদিন দূরে নয় যেদিন এই ছাইভস্মের স্তূপ থেকে বিদ্যুৎ শিখার জন্ম হবে। একথা বলে সেলিম পোড়া ঘরের এক কোণ থেকে এক মুঠো ছাই উঠিয়ে রুমালে বেঁধে নিল। 'এটা আমার জাতির পুঁজি। আমি একে সাথে করে নিয়ে যাবো। এই ছাই থেকে নতুন মোর্চা ও নতুন কেল্লা তৈরি হবে। এই ছাই থেকে নতুন জাতির জন্ম হবে।

ঈসায়ীদের মহল্লায় নারী-পুরুষ-শিশুদের হই চই শোনা যাচ্ছিল। আর সবকিছু ছাপিয়ে উঠছিল শের সিংয়ের আওয়াজ 'আমাকে ছেড়ে দাও! সরে যাও বদমাশের দল! তোমরা একদিকে বসে বসে কেবল তামাশা দেখেছো। এখন এ গ্রামে আর কেউ থাকবে না।' রূপা কাঁদতে কাঁদতে বাইরে বের হয়ে গেলো।

সেলিম বশির ও অন্য লোকদের দিকে তাকিয়ে বললো, ঘোড়াগুলি যদি এখানে থাকে তাহলে তাদেরকে ধরে আনো এবং আধ ঘন্টার মধ্যে যে পরিমাণ বারুদ সংগ্রহ করতে পারো এখানে জমা করো। মসজিদ থেকে আমার রাইফেলটাও নিয়ে এসো। আমি এখনি আসছি।

একজন বললো, আমি ক্ষেতের মধ্যে এক জখমী শিখের কাছ থেকে একটি টমিগান এবং গুলীভরা থলে ছিনিয়ে নিয়ে হাওড়ের কিনারে গোবরের গাদির মধ্যে লুকিয়ে রেখে এসেছিলাম।

আর একজন লোক যে ট্যাংকের ওপর হামলা করার জন্য মজিদের সহযোগী হয়েছিল সে বললো, ক্ষেতের মধ্যে দুজন শিখ আমাদের পিছু নিয়েছিল। তাদের একজন জখমী হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় জনকে আমি হত্যা করেছিলাম। তার কাছে স্টেনগান ছিল।

সেলিম হুকুম দিল, সেগুলি সব এখানে নিয়ে এসো।

বশির বললো, সম্ভবত এই ক্ষেতগুলির মধ্যে আরো অনেক কিছু পেতে পারি। কিন্তু ফালতু হাতিয়ার নিয়ে আমরা কি করবো?

সেলিম বললো, পথে আমরা অতিরিক্ত হাতিয়ার ব্যবহারকারী পেয়ে যাবে। যাও, আমি এখনি আসছি। দাউদ মজিদকে নিয়ে এলে তাদেরকেও তৈরি হতে বলো। একথা বলেই সেলিম দৌড়ে ঈসায়ী পাড়ায় প্রবেশ করলো।

ঈসায়ীরা শের সিংকে একটি চারপাইয়ে শায়িত করে মজবুত দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। সেলিম লোকদেরকে এদিক ওদিক সরিয়ে দিয়ে সামনে গেলো। শের সিং চিৎকার করে লোকদেরকে গালাগালি করছিল এবং রূপা তার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।

সেলিমকে দেখে কাকু ঈসায়ী বললো, আমরা একান্ত বাধ্য হয়ে ওকে বেঁধে রেখেছি। মশাল হাতে নিয়ে সে প্রত্যেকটি ঘরে আগুন লাগাচ্ছিল। একজনকে ঘুষি মেরে ছাদ থেকে ফেলেও দিয়েছে। বহু কষ্টে তার হাত থেকে আমরা মশাল ছিনিয়ে নিতে পেরেছি।

শের সিং চিৎকার করছিল, আমি সবাইকে মেরে ফেলবো। এখন এ গ্রামে আর কেউ বাস করবে না।

রূপা বলছিল, বাপু দেখো সেলিম এসেছে। বাপু মাথা ঠিক করে সামনে চেয়ে দেখো।

সে চেঁচিয়ে উঠলো, রূপা কি বাচ্চী, খামুশ রহো! যদি তুই আর একবার একথা বলেছিস তাহলে গলা টিপে তোকে খতম করে দেবো। আমি জানি সেলিম পাকিস্তানে চলে গেছে। সেখান থেকে ফউজ নিয়ে আসবে সে।

রূপা সেলিমের দিকে তাকিয়ে বললো, সেলিম ওঁকে বুঝাও। ওঁর সাথে কথা বলো।

সেলিম মাথা ঝুঁকিয়ে শের সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, গ্রামের ঈসায়ীরা আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি। বরং তারা আমাদের সাহায্য করেছে। এই গরীবদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়ো না চাচা।

রূপা সেলিমের হাত থেকে টর্চ নিয়ে তার মুখের ওপর আলো ফেলে বললো, বাপু দেখো এ সেলিম ভাইয়া। একে চিনতে পারছো না?

আমাকে বেকুব বানাচ্ছো? এ সেলিম হতে যাবে কেন? আমি একবার বলে দিয়েছি, সেলিম পাকিস্তানে গেছে। সে ফউজ নিয়ে আসবে। আফজাল ও গোলাপ সিংয়ের খুনের বদলা নেবে।

সেলিম কাকুকে বললো, কাকু আমি বেশীক্ষণ এখানে থাকতে পারবো না। তোমরা শের সিংয়ের প্রতি খেয়াল রেখো। সম্ভবত শরাবের সাথে তাকে কোনো বিষাক্ত কিছু খাইয়ে দেয়া হয়েছে। তারপর রূপার হাত থেকে টর্চ নিয়ে বললো, রূপা, তাঁর জ্ঞান ফিরে এলে বলো আমি অবশ্যই কোনোদিন আসবো।

কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে আবার সে দাঁড়ালো। ততক্ষণে ক্রন্দনরত নারী পুরুষ তার চারপাশে জমা হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তোমাদের সদাচার আমরা ভুলবো না কোনো দিন। যদি তোমাদের দ্বারা সম্ভব হয় তাহলে আমাদের লাশগুলো মাটি দেবার ব্যবস্থা কোরো।

রাত দুটায় সেলিম ও তার সাথিরা গ্রাম থেকে রওনা হবার জন্য তৈরি হলো। গুলী খেয়ে একটি ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙে গিয়েছিল। তার চলার ক্ষমতা ছিল না। অন্য একটির পিছনের রান সামান্য জখমী হয়েছিল। বাকি দুটি ঘোড়া অক্ষত ছিল। তার একটি ছিল সেলিমের এবং অন্যটি ফজ্জু পাহলোয়ান রামচন্দের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। ঘোড়ার নাংগা পিঠে বসার মতো অবস্থা মজিদের ছিল না। তাই দুজনকে সাথে নিয়ে আখের ক্ষেত থেকে পড়ে থাকা জিনিসগুলি উঠিয়ে আনলো সেলিম। মহেন্দর তার গ্রাম থেকে ঘোড়া আনতে গিয়েছিল কিন্তু সেলিমের সাথিরা তার ইন্তিজার করা সংগত মনে করলো না। দাউদ বললো, সেলিম! মজিদকে একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার করিয়ে দাও এবং বাকি দুটির পিঠে তুমি ও বশির আরো দুজনকে নিয়ে সওয়ার হয়ে যাও। আমি ও মোখতার তোমাদের সাথে পায়দল যাবো। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে তোমরা পায়দল চলবে।

সেলিম মজিদকে বললো মজিদ! যদি তুমি খুব বেশি কষ্ট অনুভব করে থাকো তাহলে তোমাকে আমার সাথে ঘোড়ায় বসিয়ে নিচ্ছি।

মজিদ অন্য কোনো জগতে বিচরণ করছিল। এখনো সে কারোর সাথে একটি কথাও বলেনি। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আগুনের উত্তুংগ শিখাগুলির দিকে। তার জীবনের সমস্ত সম্পদ ভস্মীভূত হচ্ছিল। সেলিমের প্রশ্নে সে হঠাৎ আঁতকে উঠলো। 'না, এখনো তোমাদের সাহায্য ছাড়াই আমি ঘোড়ার পিঠে বসতে পারবো।'

তারা ঘোড়ার পিঠে উঠছিল এমন সময় মহেন্দরও তার ঘোড়া নিয়ে পৌঁছে গেলো। সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তার লাগাম সোপর্দ করলো সেলিমের হাতে। 'এবার দ্রুত এখান থেকে বের হয়ে পড়ো' সে বললো।

সেলিম বললো, মজিদ! তুমি ও মোখতার এ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে যাও।

গ্রামের ঈসায়ীরা আবার তাদের চারদিকে সমবেত হলো। তাদের রওনা হবার সময় কাকু এসে সেলিমের ঘোড়ার লাগাম ধরে বললো, তোমার চলে যাওয়ার পর এখান থেকে মানবতার পাট চুকে যাবে। আমরা যদি এখানে থাকি তাহলে আমৃত্যু তোমার পথ চেয়ে থাকবো এবং তারপর আমাদের সন্তানরা তোমার পথের দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ জমিন দীর্ঘকাল তোমার মতো সুসন্তানের জন্য আক্ষেপ করতে থাকবে।

সেলিম জবাব দিল, কাকু! আমরা অবশ্যই আসবো। যদি আমরা না আসতে পারি তাহলে আমাদের আগামী বংশধরদের মধ্য থেকে কেউ অবশ্যই এখানে আসবে। তাদের জন্য এই গৃহের ছাইভস্ম পবিত্রতম বিবেচিত হবে।

সেলিমের ঘোড়ার লাগাম ধরে মহেন্দর সাথে সাথে চললো, সেলিম বললো, মহেন্দর তুমি চলে যাও। তুমি রূপাকে সান্ত্বনা দিয়ো। শের সিংয়ের মাথা ঠিক হয়ে গেলে তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাবে।

মহেন্দর বললো, আমি কিছুদূর তোমাদের সাথে যেতে চাই। কিছু জরুরী কথা আছে।

কাকু মজিদের ঘোড়ার লাগাম ধরে অঝোর ধারায় কেঁদে চলছিল। মজিদ চেঁচিয়ে উঠলো, কাকু তোমার খোদার দোহাই এখন যাও। অশ্রু দিয়ে এ আগুন নিভানো যাবে না। তারপর সে কিছুটা কোমল স্বরে বললো, মহেন্দর তুমিও যাও। কোনোদিন ফিরে এসে আমরা তোমাদের শোকরিয়া আদায় করবো।

মহেন্দর দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে বললো, আমাকে শরমিন্দা করো না। তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারিনি। যখন আমি তোমাদের গ্রামে পৌছেছিলাম আমার মনে হয়েছিল আমাকে দেখামাত্রই তোমরা গুলী করবে। হায়! যদি তোমরা এমনটি করতে। সে মৃত্যু আমার জন্য আজকের জীবনের চাইতে কম কষ্টদায়ক হতো।

সেলিম বললো, এ এলাকার শিখদের মধ্যে তিন জনই ছিল যথার্থ মানুষ। একজন ছিল গোলাপ সিং, যাকে তারা মেরে ফেলেছে। দ্বিতীয় জন ছিল শেরসিং, যে আজ উন্মাদ হয়ে গেছে। আর তৃতীয় জন তুমি নিজে মহেন্দর। কাজেই তোমার এ এলাকার মানুষের অনেক প্রয়োজন।

মহেন্দর বললো, আমি যদি গোলাপ সিং-এর মতো মারা না যাই, তাহলে শের সিংয়ের মতো পাগল হয়ে যাবো।

মজিদ আর সময় ক্ষেপণ করতে চাচ্ছিল না। নিজের ঘোড়া এগিয়ে দিয়ে বললো, আর সময় নষ্ট করা যাবে না। রাত তিনটে বেজে গেছে। কিন্তু আচানক কিছু দূরে পায়ে চলা পথের ওপর সে যেন কাউকে দেখতে পেল। ঘোড়া থামিয়ে স্টেনগান সোজা করে সে বললো, কে? দাঁড়াও।

মহেন্দর এগিয়ে গিয়ে বললো, মজিদ সে আমার বোন বসন্ত। তোমাদের জন্য সে পথে বসে আছে।

'আমি মহেন্দরের বোন।' মেয়েটির ভীত কম্পিত আওয়াজ শোনা গেলো।

মজিদ কিছুটা তিক্তস্বরে বললো, মহেন্দর! আমরা জানি তোমার বোন তোমার থেকে আলাদা হবে না কিন্তু তাকে এখানে আনার কি দরকার ছিল?

মহেন্দর তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বললো, এক মিনিট থামো মজিদ! গতকাল সকালে হামলা শুরু হবার আগে বসন্ত বলবন্তের একটি টমিগান চুরি করে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। তার সাথে বারুদের থলেও আছে। এজন্য বলবন্ত আমাদের সবাইকে বেদম মার মেরেছে। কিন্তু বসন্ত এরপরও তাকে এ

জিনিসগুলির পাত্তা জানায়নি। কিছুক্ষণ আগে আমিও এ জিনিসগুলির কথা জানতাম না। ঘোড়া আনতে গিয়ে তার কাছে একথা শুনলাম।

ততক্ষণে মেয়েটি কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। সেলিম ঘোড়া আগে বাড়িয়ে তার মুখের ওপর আলো ফেললো। বসন্তের চেহারায় আঘাতের চিহ্নগুলি ফুলে উঠেছিল। সেলিম কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু তার মুখে কথা সরলো না।

মজিদ বললো, সেলিম আলো ফেলো না।

সেলিম টর্চ বুজিয়ে দিল। বসন্ত টমিগান ও গুলীর থলে তার সামনে রেখে দিল। মহেন্দর মজিদকে সম্বোধন করে বললো, মজিদ এ জিনিসগুলি আমি আনতে পারতাম কিন্তু বসন্ত আমার ওপর ভরসা করতে পারেনি। কিছুক্ষণ পরে সেলিম ও তার সাথিরা রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

মহেন্দর ও বসন্ত তাদের ঘোড়ার পদধ্বনি শুনছিল। বসন্ত নিরব নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর কাঁদতে কাঁদতে মহেন্দরকে জড়িয়ে ধরলো। ভাইয়া ভাইয়া তুমি কি বিশ্বাস করো ওরা জীবিত পাকিস্তানে পৌছে যাবে?

আমি বিশ্বাস করি, ওরা কোনোদিন আবার ফিরে আসবে। পাপের আগুন থেকে ইনসাফের আগুন জ্বলে উঠবে এবং জুলুম খতম না হওয়া পর্যন্ত তা জ্বলতে থাকবে।

পশ্চিম আকাশে বিজলী চমকাচ্ছিল। বাতাসের গতি প্রবল হচ্ছিল। আগুন ধীরে ধীরে সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঈসায়ী পাড়া থেকেও এখন চিৎকার ও হাহাকার ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। বসন্ত তার ভাইয়ের হাত ধরে গ্রামের দিকে ইশারা করে বলছিল, মহেন্দর! এ আগুন নিভবে না। যে আগুন যুবাইদা, সুগরা, আয়েশা, তাহেরা ও আনওয়ারীকে পুড়িয়ে মেরেছে তা কোনোদিন নিভতে পারে না।

পথে তাদের সাথে শামিল হতে থাকলো পাকিস্তানে আশ্রয়প্রার্থী বিভিন্ন ছোট ছোট কাফেলা। এক কাফেলায় এমন কতিপয় পুরুষ, নারী ও শিশু ছিল যারা সেলিমদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং শেষ আক্রমণের সময় এদিক ওদিক পালিয়ে জান বাঁচিয়েছিল। কিন্তু তাদের সাথে সেলিমদের খান্দানের কেউ ছিল না। ছিল কেবল মাত্র তাদের গ্রামের একজন ভিস্তিওয়ালা ও তার বোন। তারা দুজন ছিল আহত এবং অতি কষ্টে কাফেলার গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল। সেলিম নিজের ঘোড়া তাদেরকে দিল। তার দেখাদেখি তার অন্য সাথিরাও নিজেদের ঘোড়া থেকে নেমে জখমীদেরকে তার ওপর বসিয়ে দিল এবং নিজেরা পায়ে হেঁটে চলতে লাগলো। মজিদ একটি আহত শিশুকে নিজের পিছনে বসিয়ে নিল।

এক কাফেলায় সেলিম পেয়ে গেলো কয়েকজন নিরস্ত্র সিপাহিকে। বাউণ্ডারী কমিশনের ঘোষণার পরপরই তাদেরকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। চারটি বাড়তি রাইফেল সেলিম তাদের মধ্যে বন্টন করে দিল।

মজিদ নিস্তেজ হয়ে ঘোড়ার জিনের ওপর কখনো এদিকে কখনো ওদিকে ঝুঁকে পড়ছিল। সেলিম একজনকে বললো, তুমি ঐ ঘোড়ার লাগাম ধরে চলো এবং মজিদকে বললো, তোমার টমিগানটা আমাকে দিয়ে দাও।

মজিদ চমকে উঠে সেলিমের দিকে তাকালো এবং সোজা হয়ে বললো, 'আমি ঠিক আছি'। 'আমাকে একটু পানি দাও।'

ব্যস একটু সবর করো। একদম সামনেই একটা খাল পেয়ে যাচ্ছি আমরা।

মজিদ সাথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, হুশিয়ার হয়ে যাও, সম্ভবত পুলের ওপর কোনো বিপদ থাকতে পারে।

পথে খালের কাছে মুসলমানদের একটি গ্রাম জ্বলছিল। সড়ক ও আশপাশের ক্ষেতে লাশ ছড়িয়েছিল। এক আহত ব্যক্তি যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে বললো, আর সামনে যেয়ো না, ওরা পুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

সেলিম তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ওদের সাথে কি সেনাবাহিনীর লোকজনও আছে?

হ্যাঁ, ওরা লোকদের তল্লাশী নিতে থাকে আর তখন খালপাড়ের পেছন থেকে লুকিয়ে থাকা শিখদল হৈ হৈ করে হামলা শুরু করে দেয়।

কাফেলার মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ছিল। কিছুলোক তিন চার মাইল নিচের দিকে গিয়ে পরবর্তী পুল পার হতে চাচ্ছিল। কিন্তু সেলিম তাদের থামিয়ে দিয়ে বললো, তোমরা কি পাগল হয়ে গেলে? ওরা খালের প্রত্যেকটা পুল ঘেরাও করে আছে। তোমরা এভাবে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। দল ছুট হয়ে বিশৃংখলভাবে পালাতে থাকলে সবাই মারা পড়বে। আমরা এই পুলের উপর দিয়ে যাবো এবং ওরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। যদি তোমাদের কথা না ভাবতাম তাহলে এতক্ষণ আমরা ইরাবতীর ওপারে পৌঁছে যেতাম। অবশ্য আমরা তোমাদের আমাদের সাথে চলতে বাধ্য করছি না। কিন্তু মনে রেখো যারা পেছনে থেকে যাবে তাদের দিকে আমরা ফিরেও তাকাবো না। আত্মহত্যার পথ যারা বেছে নেবে তাদেরকে আমরা বাঁচাতে পারবো না।

সেলিম আরো কয়েকটি কথা বললো। হতাশ বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় লোকদের মধ্যে নতুন প্রেরণা জেগে উঠলো।

মজিদের এখন আর পিপাসা ও ব্যথার অনুভূতি ছিল না। নিজের ঘোড়া থেকে আহত শিশুটিকে নামিয়ে দিয়ে এখন সে কাফেলার এমাথা থেকে ওমাথায় নির্দেশ দিয়ে ছুটাছুটি করছিল। সশস্ত্র সাথিদেরকে কয়েকটি কথা বুঝিয়ে দেবার পর এখন সে কাফেলাকে অগ্রসর হবার ইশারা করলো। পুলের তিনশগজ দূরত্বে পৌঁছার পর সাথিদেরকে জখমীদের ঘোড়াগুলি নিয়ে একদিকে আলাদা হয়ে যাবার এবং রাস্তা বিপদমুক্ত হবার জন্য অপেক্ষা করতে বললো।

যখন তারা পুলের ওপর পৌঁছুলো, আট দশজন সশস্ত্র ডোগরা সৈন্য তাদের পথরোধ করলো। তাদের একজন এগিয়ে এসে বললো, থামো আমরা তোমাদের

তল্লাশী নেবো। তল্লাশী নেবার পর তোমাদের পাকিস্তান পৌছিয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। ভয় পেয়ো না। আমরা শিখ নই। তোমরা দেখতে পারো। এই বলে পেছনে তার সাথিদের ওপর টর্চের আলো ফেললো এবং তারপর বললো এবার তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছো তো? আমরা মেয়েদের তল্লাশী নেবো না। ওরা মা-বোনের জাত। ওদের আমরা সম্মান করি। মেয়েরা একদিকে হয়ে যাও। আমরা কেবল পুরুষদের তল্লাশী নেবো। জলদি করো। ভয়ের কোনো কারণ নেই। সরকার তোমাদের হেফাজতের জন্যই আমাদের পাঠিয়েছে।

মজিদ দাঁড়িয়েছিল কয়েক কদম দূরে একটি গাছের আড়ালে। সেলিম দ্রুত তার কাছে পৌছুলো। 'মজিদ আমরা ওদেরকে এক মিনিটে খতম করে দিতে পারি।'

এখন নয়। লোকদের বলো আগে মেয়েদের একদিকে আলাদা করে দিক। থামো। তোমার বন্দুক ও গুলীর থলে ওখানেই রাখো এবং তারপর এগিয়ে গিয়ে নিশ্চিন্তে কথা বলো।

সেলিম রাইফেল ও থলে গাছের আড়ালে রেখে দিল। তারপর লোকদের এদিক ওদিক সরিয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে বললো, দেখো ভাইয়েরা! ভয় পেয়ো না, ক্যাপ্টেন সাহেবের হুকুম পালন করো।

ডোগরা সিপাহী বললো, আমি ক্যাপ্টেন নই। আমি জমাদার। তুমি ভালো লোক মনে হচ্ছে। এরা খুব ভয় পেয়ে গেছে। এদেরকে বোঝাও।

সেলিম কাফেলার লোকদের দিকে তাকিয়ে বললো, দেখো তোমরা ভুল করছো। আমার সাথে ওয়াদা করেছিলে আমার কথা মানবে। যদি তোমরা ভুলে গিয়ে থাকো তাহলে জেনে রাখো তোমাদের কোনো ভয় নেই। আর মেয়েরা নিশ্চিন্তে ডান দিকে বসে পড়ো।

অন্য সশস্ত্র লোকেরাও কাফেলার মধ্যে ঢুকে পড়ে লোকদেরকে বোঝাচ্ছিল। পুরুষরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নারী ও শিশুদেরকে আলাদা করে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরুষ ও মেয়েরা দুটি আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে সড়কের কিনারে বসে পড়লো। পুল ও তাদের সামনে থাকলো খালি রাস্তা। ডোগরা সিপাহীরা নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়েছিল।

ডোগরা জমাদার তার স্বর কিছুটা পরিবর্তন করে এবার বললো, তোমাদের কারোর কাছে যদি কোনো অস্ত্র থাকে তাহলে নিজেই তা এনে আমাদের হাতে জমা দাও। নয়তো তল্লাশীর পর কারোর কাছে কোনো অস্ত্র পাওয়া গেলে আমরা তাকে গুলী করে উড়িয়ে দেবো।

জমাদারের ইংগিতে বাকি ডোগরা সৈন্যরা রাস্তা থেকে নেমে গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তাদের মুখ পুলের দিকে এবং পিঠ ছিল গাছের পেছনে লুকানো লোকদের দিকে। জমাদার যেভাবে পজিশন নিয়েছিল তার ফলে খুব কম সংখ্যক লোকেরই তাদের গুলী থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে রাস্তা বা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পালাবার সম্ভাবনা ছিল।

এবার সে পুলের অপর পারে লুকানো শিখদলকে টর্চের সাহায্যে সিগনাল দিল।

তারপর পুরুষদের বললো, মনে হচ্ছে তোমাদের কাছে কিছুই নেই। কাজেই এখানে পুরুষরা পুল অতিক্রম করে যাবে তারপর আমরা মেয়েদের অতিক্রম করার সুযোগ দেবো।

কিন্তু কাফেলার পুরুষরা একজনও নড়লো না। জমাদার কিছুটা অবাক হয়ে বললো, তোমরা আমার হুকুম শুনতে পাওনি? তোমাদের পুল পার হবার জন্য আমি দুমিনিট সময় দিচ্ছি।.......... তোমাদের সেই লোক কোথায় যে আমাকে কাপ্তেন বলছিল?

জমাদারের ইশারায় লোকদের ভয় দেখাবার জন্য তার সাথিরা তাদের রাইফেল সোজা করলো। আচানক গাছের পেছন থেকে মজিদের আওয়াজ এলো, 'শুয়ে পড়ো।' আর সাথে সাথেই স্টেনগান ও টমিগানের ট্যার ট্যার আওয়াজ শোনা গেলো। এক মুহূর্তেই ডোগরা সৈন্যকজন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

পুলের অন্য কিনারে লুকানো শিখদল মনে করলো তাদের সৈন্যরা দুশমনদের ওপর গুলী চালাচ্ছে। তারা 'সতশ্রী আকাল' শ্লোগান দিয়ে গুপ্তস্থান থেকে বের হয়ে দৌড়ে এলো সামনের দিকে। যখন তারা পুলের অর্ধেক অংশ পার হলো তখন দাউদ, সেলিম ও অন্য লোকেরা গুলী করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে এলো। শিখেরা পরস্পর ধাক্কা দিতে এবং ঠেলে ফেলে দিতে দিতে পেছন ফিরে ভাগতে লাগলো। কেউ খালে লাফিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলটিতে লাশের স্তূপ জমে উঠলো। মজিদ ঘোড়া ছুটিয়ে লাশের ওপর দিয়ে লাফিয়ে টমিগান চালাতে চালাতে এগিয়ে গেলো এবং বাকি লোকেরা ফায়ার করতে করতে পুল ছাড়িয়ে বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেলো।

খালের নিচে পথের ওপর শিখদের পাঁচটা ছ্যাকড়া গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। তাতে লুটের মালপত্র ছাড়াও রশি দিয়ে বাঁধা বেশ কয়েকজন মহিলা ও যুবতী মেয়েও ছিল। গাড়িগুলি থেকে একটু দূরে গাছের সাথে দশ বারোটা ঘোড়াও বাঁধা ছিল। মেয়েদেরকে বন্ধনমুক্ত করে তাদের সাথে জখমী ও শিশুদেরকে বসিয়ে দেয়া হলো। কাফেলার আরো আট জন লোক ডোগরা সিপাহীদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া রাইফেলে নিজেদেরকে সজ্জিত করেছিল।

মেয়েদেরকে যখন বন্ধন মুক্ত করা হচ্ছিল তখন একটি মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেলিমকে বললো, আপনারা অনেক দেরিতে এসেছেন। হায়! যদি আপনারা তখন আসতেন যখন আমাদের গ্রামের ওপর হামলা হয়েছিল।

গ্রামের কথা শুনেই সেলিমের চোখের সামনে জেগে উঠলো আগুনের লেলিহান শিখা। সে জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের গ্রাম এখান থেকে কতদূর?

কেন, পুলের অদূরে সড়কের কিনারে আপনারা আগুনের শিখা দেখেন নি? ওটাই আমাদের গ্রাম।

তোমার সাথে আর কেউ? সেলিমের প্রশ্ন গলায় আটকে গেলো।

আমার বাপ ছিল, চার ভাই ও দুই চাচা ছিল। এখন কেউ নেই। আমার তিন বোন আগুনে পুড়ে গেছে। আমি ও আমার মা কূয়ার দিকে দৌড় দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা আমাদের ধরে ফেলে। এখন আপনারা এসেছেন। কিন্তু কি লাভ! মেয়েটা ডুকরে কেঁদে উঠলো।

এক প্রৌঢ় মহিলা বললো, আবেদা বেটি সবর করো!

ঘোড়ায় টানা ছ্যাকড়া গাড়িগুলি কাফেলার আগে আগে চলছিল। আর সশস্ত্র লোকেরা কাফেলার ডাইনে বাঁয়ে পথের কিনারা ধরে তাদের হেফাজত করে চলছিল। প্রভাতের চিহ্ন ফুটে উঠছিল। মজিদ বারবার নির্দেশ দিচ্ছিল কাফেলার গতি বৃদ্ধি করার। সে ঘোড়া ছুটিয়ে কখনো কাফেলার সামনে ও কখনো পেছনে চলছিল। কাফেলার এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত সবাই জানতে পেরেছিল কে তাদের রাহবর।

তারা জিজ্ঞেস করছিল, সুবেদার! নদী আর কতদূর? আমরা কখন সেখানে পৌছুবো? সামনে আর কোনো বিপদ নেই তো? সে ঘোড়া থামিয়ে কাউকে কোমল ও কাউকে ধমকের সুরে জবাব দিয়ে এগিয়ে যেতো।

ছটার সময় সে হিম্মত হারিয়ে ফেললো। আচানক মাথা নুইয়ে হাতের ওপর রাখলো এবং হাত থেকে টমিগান পড়ে গেলো। ঘোড়া থেমে গেলো। লোকদের চিৎকারে সেলিম ও দাউদ দৌড়ে এলো। তাকে ঘোড়া থেকে নামালো এবং মেয়েদের মাঝখানে একটি ছ্যাকড়া গাড়িতে শুইয়ে দিল। সেলিম দেখলো জ্বরে তার সারা শরীর পুড়ে যাচ্ছে।

মজিদের যখন জ্ঞান ফিরে এলো, আবেদা তার জখমগুলোর ওপর পট্টি বাঁধছিল। তার জায়গায় সেলিম ঘোড়ায় চড়ে কাফেলা পরিচালনা করছিল। তার হাতে বন্দুকের পরিবর্তে ছিল টমিগান।

সেলিম ছ্যাকড়ার কাছে এসে মজিদের দিকে তাকালো। আবেদা বললো, এখন জ্ঞান ফিরে এসেছে।

মেয়েটির মা বললো বেটা! এ তোমার ভাই?

জি হ্যাঁ।

এক মহিলা বললো, এ সবার ভাই।

মজিদ মাথা তুলে সেলিমকে দেখলো। নিজের চেহারায় একটি বেদনার্ত হাসির রেখা ফুটিয়ে বললো, একজন কবিকে একজন সিপাহীতে পরিণত করার জন্য বিরাট বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল।

পথে কাফেলার লোকদের সংখ্যা বাড়তে থাকলো। সকাল আটটা পর্যন্ত তাদের সংখ্যা তিন হাজারে পৌছে গেলো। সড়কের ওপর বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের লাশ

বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছিল। ডেরা বাবা নানক পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে শিখদের আরো চারটি দল তাদের ওপর হামলা চালালো। কিন্তু নিরস্ত্রদের পরিবর্তে এখন তাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে সশস্ত্র লোকদের। এটা ছিল তাদের প্রত্যাশার বাইরে। কাফেলার লোকদেরকে নিরস্ত্র মনে করে তারা আসতো আঁধির মতো। 'পন্থ জী জয়,' 'খালিস্তান কি জয়' ও 'সতশ্রী আকাল' শ্লোগান চতুরদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতো। যখন তারা নিকটে এসে যেতো, আচানক ট্যার ট্যার করে গুলী চলতো এবং সাথে সাথে 'আল্লাহু আকবর' 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হতো। হামলাকারীরা চিৎকার করতে করতে এবং ওদের সাথে 'ফউজ আছে', 'ওদের সাথে মুসলমানদের ফউজ আছে', 'ওদের সাথে বেলুচ রেজিমেন্ট আছে, পালাও, পালাও' বলতে বলতে প্রাণপণে দৌড়াতে থাকতো।

পথে সবচেয়ে বিপদজনক জায়গা ছিল ডেরা বাবা নানক। সেখানে ছিল গুরুদ্বার, থানা ও আকাল সেনার কেন্দ্র। হিন্দু সাব ইন্সপেক্টর ছিল হামলাকারীদের নেতা। কিন্তু কাফেলার আগমনের পূর্বে তাকে এ খবর দেয়া হয়েছিল যে, নিরস্ত্র লোকদের হেফাজতের জন্য সেনাবাহিনী এসেছে। কাজেই কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই কাফেলা শহর অতিক্রম করে গেলো।

কাফেলা যখন থানা অতিক্রম করছিল, দারোগা একটি শিখ বাহিনী নিয়ে থানার দরোজা বন্ধ করে লোহার গরাদের পেছনে দাঁড়িয়ে তাদের চলে যাওয়া দেখছিল। কাফেলা চলে যাওয়ার পর দারোগা ক্রুদ্ধ হয়ে জনৈক শিখের দাড়ি টেনে ধরে বললো, 'বদমাশ, ওদের সাথে সেনাবাহিনী কোথায়?'

জি, আমি ঝুট বলছি না। বচন সিংকে জিজ্ঞেস করুন। ওরা আমাদের ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েছে। আমাদের ছ্যাকড়া গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। ওরাই খালের পারে আমাদের যাট সত্তর জনকে হত্যা করেছে। ডোগরা সেনাদলকে ওরা এক মিনিটেই খতম করে দিয়েছিল। সম্ভবত ওদের পেছনে সেনাবাহিনী আছে।

আর একজন শিখ বললো, কিরণের পুলের কাছে আমরা ওদের ওপর হামলা করেছিলাম। ওদের সাথে যেসব সিপাহী আছে তারা সামরিক পোশাক পরেনি। যদি আপনি তল্লাশি নিতেন তাহলে ওদের অর্ধেকেরও বেশি লোককে সশস্ত্র পেতেন।

তৃতীয়জন বললো, আমি আপনার জন্য অনেক বড় তোহফা এনেছিলাম। আমার ছ্যাকড়ায় আজিম খানের মেয়ে ছিল। এখন সে আমার ছ্যাকড়া গাড়িটি এবং মূল্যবান ঘোড়াও নিজের সাথে নিয়ে যাচ্ছে।

দারোগা বললো, ঠিক আছে, এখন তোমরা সোজা ইরাবতীর পুলের দিকে চলে যাও। সেখানেই ওদের তল্লাশী নাও।

কিন্তু সরদারজী ঐ মেয়ে বিশেষ করে আজিমখানের মেয়েটি তো বড়ই সুন্দরী।

ডেরা বাবা নানক পার হয়ে পাকা সড়ক ধরে নদীর পুল পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা লাশে ভরে উঠেছিল। কাফেলা সড়কের ওপর পৌছার সাথে সাথেই সড়কের কিনারে একটি অপক্ক ক্ষেতের মধ্যে আত্মগোপনকারী দুজন মুসলমান সিপাহী দৌড়ে এলো।

তারা হাতের ইশারায় কাফেলাকে থামিয়ে দিল। সেলিম ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের কাছে পৌঁছে গেলে তারা বললো, ডোগরা রেজিমেন্ট পুল দখল করে বসে আছে কাজেই আপনারা আর আগে যাবেন না।

সেলিম পেছন ফিরে দাউদের দিকে তাকালো এবং তারপর সামনে এগিয়ে বললো, আমরা অবশ্যই যাবো। সামনে বিপদ থাকলে তার মোকাবিলা করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

কিন্তু তোমরা এইসব শিশু ও নারীদেরকে মেশিনগানের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারো না। তাদের কাছে আর্মড কার আছে। এদিকে দেখো। একথা বলে সিপাহী পথের ওপর ছড়িয়ে থাকা লাশগুলির প্রতি ইংগিত করলো। বিগত চব্বিশ ঘন্টায় তারা প্রায় পাঁচ হাজার মুসলমানকে শহীদ করেছে।

সেলিম বললো, কিন্তু আপনারা বাউণ্ডারী ফোর্সের হেড কোয়ার্টারে খবর দেননি?

আমরা খবর দিয়েছি। কিন্তু সেখানে বেশির ভাগ অফিসার হচ্ছে হিন্দু ও শিখ। তারা আমাদের একদিকে পাঠিয়ে দেয় এবং অন্যদিকে হামলা করিয়ে দেয়। সামান্য যে কজন মুসলমান অফিসার আছে তাদেরকে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা কিছুই করতে পারে না। আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে আমাদের রেজিমেন্টের সিপাহীরা বাটালা থেকে একটি বিরাট কাফেলা নিয়ে আসছে। তখন আপনি দেখবেন এই ডোগরাদের অন্য কোনো জায়গায় হামলা করার জন্য পাঠানো হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রেজিমেন্ট পুলের হেফাজতে নিয়ুক্ত থাকবে ততক্ষণ ওরা চেষ্টা করবে মুসলমান কাফেলাগুলি এমন সব সড়কের ওপর দিয়ে যাক যেখানে মুসলমান সিপাহী নেই। এখন আপনাদের জন্য একটিই পথ। কয়েক মাইল দূরে নদীর পাদদেশে হাজার হাজার মুসলমান জমায়েত হয়েছে। আপনারাও সেখানে চলে যান। সেখানে নৌকাও পাবেন।

ডেরা বাবা নানক পুল থেকে আট মাইল দূরে নিচের দিকে নদীর কিনারে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত প্রায় বিশ হাজার লোক শিবির স্থাপন করে অবস্থান করছিল। প্রতিক্ষণে নতুন কাফেলার আগমনে তাদের সংখ্যা আরো বেড়ে যাচ্ছিল।

দুপুরের দিকে এ কাফেলাটিও সেখানে পৌঁছে গেলো। এদের সাথে কতিপয় সশস্ত্র লোক দেখে তাদের হতাশ চেহারাগুলিতে যেন নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হলো। এতক্ষণ যারা একজন অন্যজনের থেকে নারীদের সতীত্ব হরণ এবং ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া ও যৌবন দীপ্ত পুরুষদের রক্তে হোলি খেলার কাহিনী শুনে আসছিল। এখন তারা এই কাফেলার নারী ও পুরুষদের মুখে শুনছিল কিভাবে ওমুক জায়গায়

এই বাহাদুর জোয়ানরা সেনাদলের মোকাবিলা করেছে এবং ওমুক ওমুক জায়গায় কিভাবে শিখ হামলাকারী দলকে মেরে ময়দান থেকে হটিয়ে দিয়েছে। মজিদ ও সেলিমের খান্দানের কাহিনী কাফেলার প্রত্যেকটি নারী, শিশু ও পুরুষ যার যার জানা মতে নতুনভাবে বর্ণনা করছিল।

নিকটবর্তী জনবসতিগুলির লোকেরা নিজেদের মালমাত্তা, গৃহপালিত পশু এবং খাদ্যদ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে ছ্যাকড়া গাড়িতে ভরে নদীর কিনারে নিয়ে এসেছিল। তারা অত্যন্ত উদারচিত্তে সবার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করছিল।

সেলিম ও তার সাথিরা ক্ষুধা, পিপাসা ও ক্লান্তিতে একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রান্নাকরা খাদ্য তৈরি হয়ে গেলো। এক মহিলা মজিদের জন্য তার মোষের দুধ নিয়ে এলো। সেলিমের পীড়াপীড়িতে সে তা থেকে কিছুটা পান করলো। একজন তার আসবাবপত্র ভর্তি ছ্যাকড়া গাড়ি থেকে একটি লেপ নামিয়ে এনে গাছের নিচে বিছিয়ে দিল এবং মজিদকে সেখানে শায়িত করা হলো। আবেদা ও তার মা তার কাছাকাছি বসে তার পরিচর্যা করতে লাগলো।

নৌকা ও মাঝিদের ব্যাপারটা সেলিমের প্রত্যাশা বিরোধী মনে হচ্ছিল। নদীর অপর পারে নৌকাগুলি দাঁড় করানো ছিল কিন্তু মাঝি-মাল্লারা দূরে বাবলা গাছের নিচে বসে হুক্কা খাচ্ছিল। লোকেরা সেলিমকে বললো, ওপার থেকে কিছু লোক মাঝিদের এজেন্ট হয়ে এপারে আসে। কেউ যদি তাদেরকে পাঁচশ বা হাজার টাকা দেয় তাহলে রাতের বেলা তার সন্তানদিসহ নৌকায় বসিয়ে নদী পার করিয়ে দেয়।

সেলিম বললো, এখন কি তাদের কোনো এজেন্ট এখানে আছে?

না তারা সন্ধ্যায় আসে। তারা মনে করে তারা যদি বেশি লোককে পার করা শুরু করে তাহলে তাদের দর পড়ে যাবে।

জনৈক শ্বেত শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বললো, আমার কাছে দুশ টাকা নগদ এবং চারশ টাকার গহনা আছে। সবগুলি তাদের সামনে রেখেছিলাম। কিন্তু তারা বললো, তোমার পরিবারের এগারোজনকে পার করাবার জন্য আরো পাঁচশ টাকা লাগবে।

সেলিম বললো, কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এ সময় মুসলমানদের মধ্যে এমন লোকও আছে।

বৃদ্ধ বললো, ওদের ইসলামের সাথে কি সম্পর্ক? আমাদের জন্য ওরা শিখদের চাইতেও ভয়ংকর মনে হচ্ছে।

সেলিম বললো, বাবা! এটা আমাদের দোষ। আমরা তাদেরকে সামাজিক ও জাতীয় জীবনের দায়িত্বের সাথে পরিচিতই করিনি। আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

এক যুবক বললো, আসলে এ ব্যাপারে মাঝিরাই পুরোপুরি দোষী একথা ঠিক নয়। ওপারের গ্রামের এক চৌধুরী সাহেব আছেন তিনি নিজের হিস্যা উসুল করেন। মাঝিরা তার মর্জির বিরুদ্ধে যেতে পারে না। আমরা তাকে অনেক বুঝেয়েছি। কিন্তু

সে অনেক বড় ব্যক্তি। আর গুণ্ডাদের একটি দল সব সময় তার সাথে আছে। যদি আপনি তাকে বোঝাতে পারেন তাহলে মাঝিরাও ঠিক হয়ে যাবে।

সেলিম জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোথায় থাকো।

আমি ওপার থেকেই এসেছি। আমিও একজন মাঝি। পয়সা না নিয়েই লোকদের নদী পার করাচ্ছিলাম। আমি তিন ক্ষেপ দিয়েছিলাম কিন্তু চারবারের বার যখন নৌকা নিয়ে এলাম হঠাৎ দেড় দুশ লোক আমার নৌকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি অনেক কাকুতি মিনতি করলাম। হাতজোড় করলাম। কিন্তু তারা কোনো কথা শুনলো না। ফলে আমার নৌকা ডুবে গেলো। নৌকার জন্য আমার দুঃখ নেই। আমার দুঃখ আমার ভাইদের বিপদে আমি কিছুই করতে পারলাম না।

তুমি অনেক কিছু করতে পারো। আমার সাথে এসো।

বেলা আড়াইটায় সেলিম, দাউদ ও ফকির দীন নামের এই মাঝি তিনজন সাঁতরে নদী পার হলো। মাঝিরা প্রথমেই সাফ জবাব দিয়ে দিল। তারপর কিছুটা তিরিক্ষী মেজাজে সেলিমের সাথে কথা বলতে লাগলো। কিন্তু প্রায় পনর মিনিট বক্তৃতার পর সেলিম তাদের কয়েকজনের চোখ অশ্রুসিক্ত দেখতে পাচ্ছিল। শ্রোতাদের দিলে তার বক্তৃতা তীরের মতো বিদ্ধ হচ্ছিল এবং হৃদয়কে কেটে ফালা ফালা করছিল। আবেগ ও উত্তেজনায় নিজেকে সংযত করতে না পেরে এক নওজোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এই কামাইয়ের ওপর আল্লাহর লানত। তারপর সামনে গিয়ে নৌকার রশি খুলে সেলিমের কথারই পুনরাবৃত্তি করলো সে ঃ কওমের ইজ্জত বরবাদ হচ্ছে আর আমরা জাহান্নামের আগুন দিয়ে পেট ভরছি।

এক বৃদ্ধ মাঝি তার হুক্কা নদীর বুকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, বাবুজী! মুসলমানের পয়সা আমাদের জন্য শূয়োরের গোশত। সাদেক ওঠো! নয়তো আমি তোমার হুক্কাও ভেঙে ফেলবো।

কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচটি নৌকা নদীতে ভাসলো।

একজন হাট্টাকাট্টা কৃষ্ণকায় মাঝি কিছুটা পেরেশান হয়ে কখনো নিজের সাথিদের এবং কখনো সেলিমের দিকে তাকাচ্ছিল। ততক্ষণে একজন সাদাপোশাক ধারী বড় বড় গোঁফওয়ালা সেখানে এসে হাজির। 'এসব কি হচ্ছে?' সে হুংকার দিল। 'দিনের বেলা নদীতে নৌকা ভাসাতে তোদের কে বললো?'

কৃষ্ণকায় মাঝিটি উঠে বললো, চৌধুরীজী! এ বাবু তো আমাদের ওপর থানার দারোগার চাইতেও বেশি রবরবা দেখাচ্ছে।

চৌধুরী সেলিমের দিকে তাকিয়ে বললো, এরা কারোর নওকর নয়। সারাদিন এরা নৌকা বাইবে না। ওদিক থেকে যদি শিখেরা হামলা করে দেয়

তাহলে এদের জানের নিরাপত্তা দেবে কে? তারপর কিনারার দিকে এগিয়ে এসে চিৎকার দিল, ও হারামজাদারা! নৌকা ফিরিয়ে আন।

'হারামজাদা ওরা নয় তুই' এই বলে সেলিম তার টমিগানের মুখটি তার ভুঁড়ির সাথে লাগিয়ে দিল। চৌধুরীর পাঁচজন সাথি তার কয়েক কদম পেছনে আসছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা ভাগতে শুরু করেছিল। কিন্তু দাউদ পিস্তল দেখিয়ে তাদেরকে থামিয়ে দিল। চৌধুরী এখন ভীষণভাবে কাঁপছিল। তার কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছিল দরদর করে।

সেলিম বললো, তোর মতো কওমের দুশমনের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। কিন্তু হায়, আমার কাছে যদি ফালতু বারুদ থাকতো। আমি জানি তুই কেবল ডাণ্ডার ভাষা বুঝিস। কিন্তু তবুও তোকে একবার সুযোগ দিচ্ছি। যদি দ্বিতীয়বার এখানে দেখি তাহলে আর জীবিত রাখবো না। এই গুণ্ডাদল তোকে কোনো প্রকার সাহায্য করতে পারবে না। আর একথাও মনে রাখিস, এদের থেকে যে পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নিয়েছিস তার পাই পাই হিসাব দিতে হবে। যা ভাগ এখান থেকে!

চৌধুরী ও তার সাথিরা একবার পেছন ফিরে দেখবারও প্রয়োজনবোধ করেনি। দাউদ বাতাসে একটি ফায়ার করলো। তাদের গতি আরো দ্রুত হলো।

কৃষ্ণকায় মাঝিটি চুপিচুপি উঠে কিনারার দিকে এগুলো এবং নিজের নৌকার কাছে পৌঁছে বলতে লাগলো, এসো বাবুজী!

নৌকাগুলো তখনো বেশ দূরেই ছিল। অনেক লোক তাদের মাল সামনের গাঁঠরী ও ছেলেপুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। অনেকে নদীতে হাঁটু ও কোমর পানিতে নেমে এলো। সেলিম ও দাউদ নৌকা থেকে নেমে লোকদেরকে ঠেলে কিনারার দিকে ফেরত আনলো। তাদের অন্য সাথিদের মধ্য থেকে পুলিশের লোকেরা যথেষ্ট কাজে লাগলো। তারা লোকদেরকে এদিক ওদিক ঠেলে দিয়ে নদীর কিনারে বেশ কিছু জায়গা খালি করলো।

সেলিম কিনারায় উঠে তাদের বোঝালো। 'দেখো, যতক্ষণ তোমরা আমাকে নিশ্চয়তা দেবে না যে, তোমরা সবর অবলম্বন করেছো ততক্ষণ এ নৌকাগুলি এগিয়ে আসবে না। তোমাদের আতংক ও উত্তেজনার ফলে একটি নৌকা ইতিমধ্যে ডুবে গেছে। তোমরা এভাবে হুড়োহুড়ি করতে থাকলে একজনও ওপারে পৌঁছতে পারবে না। তোমরা জানো সবাই একসাথে নৌকায় উঠতে পারবে না। সবার আগে আমরা নারী, শিশু ও জখমীদেরকে ওপারে পৌঁছাতে চাই। এরপর অন্যদের পালা শুরু হবে। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, নৌকা এখন চলতে থাকবে। আর বন্ধ হবে না। কিন্তু এ ধরনের বিশৃংখলার ফলে মাঝিদের কাজ কঠিন হয়ে পড়বে। আমি তোমাদের এ ব্যাপারেও নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এ নদী পার করার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি এ পারেই

থাকবো। আর আমার সাথিদের কেউ তোমাদের ছেড়ে আগে চলে যাবে না আমি একথাও বিশ্বাস করি। আমরা জীবিত থাকা পর্যন্ত শিখদেরকে এদিকে ঘেঁসতে দেবো না।

পাঁচটার সময় মজিদ চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল। সেলিম কাছে গিয়ে নিরবে দাঁড়িয়ে রইলো। আবেদা চোখ তুলে বললো, ওকে জলদি পার করার ব্যবস্থা করুন। কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে।

সেলিম কোনো জবাব দেবার পরিবের্তে ঝুঁকে পড়ে মজিদের নাড়ি দেখেতে লাগলো। মজিদ চোখ খুললো। সেলিম বললো, নৌকাগুলো নারী ও শিশুদের ক্ষেপ নিয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবে।

মজিদ বললো, সেলিম তুমি যাও। আমি এখানেই থাকবো। আমার চিন্তা করো না।

সেলিম অস্থির হয়ে বলো, মজিদ তুমি কি মনে করো তোমাকে রেখে আমি চলে যেতে পারি?

মজিদ স্নেহমাখা স্বরে বললো, আরে ভাই, রাগ করছো কেন? আমি তোমার পাকিস্তান চলে যাবার কথা বলছি না। আমি বলতে চাচ্ছিলাম, তুমি ডাক্তার শওকতের পরিবারের খবর নাও। আমি মনে করেছিলাম কাফেলাকে এখানে পৌঁছে দিয়েই আমরা তাদের গ্রামে যাবো। কিন্তু হায়, আমার যদি সামান্য শক্তিও থাকতো! এখন তুমিই যাও। আমি জানি তোমার মন প্রাণ সেখানে পড়ে আছে। তুমি কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাদেরকে নিয়ে এখানে চলে আসতে পারবে।

সেলিম বললো, মজিদ তুমি দাউদ ও বশিরকে তোমার সাথে নিয়ে যাও। দাউদ তোমাকে ওপারে কোনো ডাক্তারের চেম্বারে রেখে এপারে ফিরে আসবে। যখন তুমি সফর করতে সক্ষম হবে, আমিনা বোনদের বাড়িতে চলে যেয়ো। আমি তোমার জন্য ওপারে ঘোড়াও পৌঁছিয়ে দিচ্ছি।

এরপর সেলিম আবেদা ও তার মাকে বললো, আপনারাও তৈরি হয়ে যান।

আবেদার মা বললো, বেটা নারোয়ালে আমাদের আত্মীয় আছে। আমরা তোমার ভাইকে সেখানে নিয়ে যাবো। পুরোপুরি সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত সে আমাদের সাথে থাকবে। যদি নারোয়ালে ভালো ডাক্তার না পাই তাহলে শিয়ালকোটে আমার ভাই আছে, সেখানে ওকে নিয়ে যাবো। তুমি মনে করো আমি তার মা।

সেলিম মজিদের দিকে তাকালো। মজিদ বললো, আর সময় নষ্ট করো না সেলিম! এ আগুন থেকে যে বাঁচতে পারে তাকে বাঁচাও। আমি জানি তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাইবে না। আমি এদের সাথে যেতে প্রস্তুত। তবে আমাদের সাথে কেবল বশিরই যথেষ্ট। দাউদের এখানে প্রয়োজন। এখানে প্রত্যেকটি মানুষের জীবন আমার জীবনের চাইতে মূল্যবান।

একঘন্টা পরে সেলিম ও দাউদ নদীর ঘাটে মজিদ, বশির, আবেদা ও তার মাকে বিদায় জানাচ্ছিল।

মজিদ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার এবং বশির তার লাগাম ধরে ছিল। রুখসাতের সময় মজিদ তার বুশশার্টের পকেট থেকে পিস্তল বের করে সেলিমের হাতে দিয়ে বললো, এটাও কাছে রাখো। আর দেখো, বারুদ খতম হয়ে গেলে হাতিয়ার ফেলে দিয়ো না। পাকিস্তানেও এর প্রয়োজন আছে।

ক্যাম্পের হাজার হাজার লোককে কোনো প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় না রেখে চলে যাওয়াকে সেলিম সংগত মনে করলো না। সে দাউদ ছাড়া আর মাত্র তিনজনের কাছে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছিল যারা গ্রাম থেকে তার সাথে এসেছিল। তারা তার সাথে যেতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। বাকি সশস্ত্র লোকদেরকে ক্যাম্পের এক পাশে সমবেত করে সে জানালো, আমরা বাইরে যাচ্ছি, কয়েকঘন্টার মধ্যে এসে যাবো। আমার অনুপস্থিতিতে এই সমস্ত লোকের হেফাজতের দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে। আমি যদি আসতে না পারি তাহলে তোমরা জীবন দিয়ে হলেও এদের হেফাজত করবে এবং এদেরকে ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাবে না। এ বিষয়ে আমি তোমাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিতে চাই। আর ক্যাম্পে এমন লোকদের তালাশ করো যারা নৌকা চালাতে জানে। মাঝিরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে তারা ওদের জায়গায় বসে নৌকা চালাবে। আমাদের কাছে সামান্য বারুদ আছে। কাজেই সতর্কতার সাথে তা ব্যবহার করতে হবে।

পুলিশের একজন কনস্টেবল বললো, আমরা বেগাইরাত হবো না। যখন আমাদের হাতে অস্ত্র ছিল না তখনো আমরা এই অসহায় নারী-শিশুদের পরিত্যাগ করে পালাইনি আর এখনতো আমাদের হাতে এসেছে রাইফেল। আমাদের হাত কেটে আলাদা না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা লড়ে যেতে থাকবো। কিন্তু আপনার এখানে থাকা জরুরী ছিল। আপনার জায়গায় অন্য কেউ চলে গেলে হয় না?

না।

তাহলে আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে নিন।

না, বেশি লোকের সেখানে প্রয়োজন নেই।

আর একজন প্রশ্ন করলো, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

এখান থেকে দশ বারো মাইল দূরে একটি গ্রামে......... এবং সেখানে .... সেখানে......... সেলিমের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। সে দিগন্ত রেখার দিকে তাকিয়ে রইলো। দৃষ্টির শেষ সীমানায় আকাশ দিগন্তে অগ্নিশিখা ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী জেগে উঠছিল। সেলিম আচানক একদিকে দৌড়ালো এবং একটি ছাপড়ার সাথে বাঁধা ঘোড়ার রশি খুলে তার পিঠে চড়ে বসলো।

'সেলিম দাঁড়াও দাঁড়াও' বলতে বলতে দাউদ দৌড়ে গিয়ে তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো। তুমি একাকী যেতে পারো না।

জলদি এসো দাউদ!

এক মিনিটের মধ্যেই দাউদ ও তার বাকি তিনজন সহযোগী ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে গেলো। তাদের পথে পড়লো বিরাণ পল্লী, জ্বলন্ত ঘর-বাড়ি, নারী-পুরুষ শিশুদের লাশ। কোথাও লাশ ঘিরে শকুনিরা দল বেঁধে বসেছিল নিশব্দ নিস্পন্দ। ভারতের নেকড়েরা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি শিকার মেরে রেখেছিল। সম্ভবত তারা পরস্পর বলাবলি করছিল, আমরা চেংগীজ ও হালাকুর দাওয়াতও খেয়েছি কিন্তু অহিংসা পরম ধর্মের দস্তরখানে যে প্রাচুর্য দেখছি তা এর আগে আর কখনো দেখিনি। চেংগীজ ও হালাকু আতিথ্য ধর্মের নিয়মনীতি জানতো না। তারা কখনো আমাদের সামনে ফেলে দিতো লৌহবর্ম পরিহিত মানুষের লাশ। তাদের লৌহ পোশাকের করণে আমাদের কাজ অনেক কঠিন হয়ে যেতো। কিন্তু আমাদের বর্তমান মেজবান লাশের গায়ের কাপড় ও ছিঁড়ে নিয়েছে আবার তাদেরকে কেটে খণ্ড খণ্ড করেও দিয়েছে, যাতে আমাদের কোনো প্রকার কষ্ট না হয়। আর তাছাড়া সে জামানায় শক্ত সমর্থ আঁটসাট শরীরের অধিকারী পরুষদের হত্যা করা হতো। কিন্তু ভারত মাতার দস্তরখানে নারী ও শিশুদের গোশতের প্রাচুর্য। সেটা ছিল অন্ধকার যুগ কিন্তু জামানা পাল্টে গেছে। এখন ভারত পুত্ররা শকুনিদের মেজাজ জানে– বলো, 'ভারত মাতা কি জয়!'

পথে এমন লোকদের দল পাওয়া গেলো যারা নদীর দিকে আসছিল। সেলিম ঘোড়া থামিয়ে তাদের কাছে ডাক্তার শওকতের গ্রামের অবস্থা জিজ্ঞেস করতো। কিন্তু কারোর কোনো হুঁশ ছিল না। সাধারণভাবে এ ধরনের জবাব সে পাচ্ছিল ঃ

আমার বাপ অন্ধ। আমি তাকে অমুক জায়গায় ছেড়ে এসেছি।

আমার এতগুলি সন্তান ছিল। একটি কিরণে ডুবে মরেছে এবং বাকিগুলি ওপারে পড়ে আছে।

আমি আমার খান্দানের লাশ দাফন করতে পারিনি।

আমার বাড়ির কোনো লোকের খবর আমি জানি না।

তুমি পথে আমার বোনকে দ্যাখোনি? তার দোপাট্টা এই রংয়ের ছিল। তার চেহারা ছিল এমনটি।

সামনের দিকে যেয়ো না। সামনের দিকে যেয়ো না।

এক গ্রামের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তারা নারী ও শিশুদের চিৎকার ধ্বনি শুনতে পেলো। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। সেলিম ঘোড়া থামালো। এক সহযোগী বললো, এখন প্রত্যেক গ্রামেই এই একই ঘটনা। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আমরা সবাইকে বাঁচাতে পারবো না। প্রথমে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে তাদের খবর নেয়া উচিত।

'না আমরা এদেরকে ছেড়ে যেতে পারি না।' একথা বলে সেলিম ঘোড়ার মুখ গ্রামের দিকে ফিরিয়ে নিল।

গ্রামের লোকেরা কয়েকটা ঘরের ছাদে একত্র হয়ে হামলাকারীদের ওপর ইঁটের টুকরো নিক্ষেপ করছিল। শিখদের বিরাট দল চারদিক থেকে তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছিল। দুজন শিখ কিছু দূরে বসে বন্দুকের ফায়ার করে চলছিল। দাউদ তাদের

পেছনে গিয়ে টমিগান দিয়ে ফায়ার করলো। একজন মাটিতে পড়ে গেলো এবং অন্যজন পালিয়ে একটি বাড়ির পেছনে আত্মগোপন করলো। সেলিম ও অন্য লোকেরা ঘোড়া ছুটিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো এবং শিখ দলের ওপর গুলী বর্ষণ করতে লাগলো। শিখেরা পালিয়ে গেলো। লাঠি ও কুঠার সজ্জিত কয়েকজন মুসলমান তাদেরকে পিছু হটতে দেখে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি উচ্চারণ করলো এবং ছাদ থেকে লাফিয়ে জমিনে পড়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। বাকি নারী ও পুরুষরা তাদের সাহায্যকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য ঘরবাড়ি থেকে বাইরে বের হয়ে এলো। কিন্তু সেলিম ও তার সাথিরা এক মুহূর্ত না থেমেই ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামের বাইরে বের হয়ে গেলো। লোকেরা অবাক হয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছিল, এরা কারা ছিল? এরা থামলো কেন?

এক শ্বেত শ্মশ্রুধারী তাদেরকে বোঝাচ্ছিল, এরা ছিল রহমতের ফেরেশতা। এরা পাকিস্তানের সিপাহী।

এ গ্রামের পরে প্রায় দেড় মাইল দূরত্ব অতিক্রম করার পর এক চৌরাস্তার মোড়ে সেলিম তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো এবং নিজের সাথিদের থামার ইশারা করলো। সে বললো, আমার মনে হয় এ রাস্তাটা পাকা সড়ক থেকে নেমে এসেছে। এখন আমাদের ডান দিকে মোড় নিতে হবে।

দাউদ বললো, রাত নেমে আসছে। এখন আমাদের পথের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

কিছুদূর যাওয়ার পর মোটরগাড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

দাউদ বললো, আমরা সড়কের একদম কাছাকাছি এসে গেছি।

সেলিম বললো, তোমরা এখানে থামো। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে সড়কের ওপর মাইল পোস্ট দেখে আসছি। এ থেকে আমি আন্দাজ করতে পারবো।

সেলিম ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়েছিল এমন সময় তার এক সাথি চেঁচিয়ে উঠলো, থামো, কোনো সওয়ার এদিকে আসছে।

পায়ে চলা পথের ওপর দ্রুতগামী অশ্বের পদধ্বনি শুনে সেলিম ও তার সাথিরা কোনো অপ্রত্যাশিত বিপদের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি হয়ে গেলো। সন্ধ্যার আবছা আঁধারের মধ্যে তারা দেখলো একজন অশ্বারোহী। সাথিদেরকে সেদিকে বন্দুকের নল তাক করতে দেখে সেলিম বললো, থামো, সম্ভবত সে একজন মুসলমান। একজন শিখ এভাবে পাঁচজন মুসলমানের মোকাবিলা করতে পারে না।

কিছুক্ষণ পরে ঘোড়ার নাংগা পিঠে তারা দেখছিল একজন বিশ বাইশ বছরের নওজোয়ানকে। তার পা ও মাথা ছিল নাংগা। তার একহাতে ছিল ঘোড়ার লাগাম এবং অন্য হাতে বর্শা। কাছাকাছি এসে সে ঘোড়া থামিয়ে দিল। কোনো ভূমিকা ছাড়াই সে বলতে শুরু করলো, আপনারা আমাদের গ্রামকে বাঁচিয়েছেন। আমরা আপনাদের ইহসানের বদলা দিতে পারবো না।

সেলিম বললো, আমরা কর্তব্য পালন করেছি, তোমাদের ওপর কোনো ইহসান করিনি।

আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি বন্দুক কোথায় পাওয়া যায়? গ্রামের একজন জখমী শিখের বন্দুক আমরা পেয়েছি। আরো পাঁচ ছয়টি পেয়ে গেলে আমরা শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত শিখদের মোকাবিলা করতে পারবো। কোথাও থেকে যদি বন্দুক কিনতে পাওয়া যায় তাহলে আমরা আমাদের মেয়েদের গহনাপত্র বিক্রি করে হলেও তার দাম দিতে রাজি আছি।

আফসোস, যদি আমরা কয়েকমাস আগেও এ ধরনের কথা চিন্তা করতে পারতাম!

নওজোয়ান দ্বিধান্বিত স্বরে বললো, আমাদের সাথে এ ধরনের প্রতারণা করা হবে তেমন কোনো কথা আমাদের জানা ছিল না। আমাদের এলাকার নেতা র‍্যাডক্লিফ ঘোষণার একদিন আগেও বলে বেড়াচ্ছিলেন, আমাদের তহশীল পাকিস্তানে পড়বে। এখানে হিন্দু ও শিখদের সম্মিলিত সংখ্যার চাইতে আমরা দ্বিগুণেরও অধিক। কিন্তু এখন ওসব কথায় কিছু হবে না। আমাদের এখন বন্দুক দরকার এবং এর মূল্য দিতেও রাজি। আমাদের ইসলামী গাইরাত ওই বর্বরদের মোকাবিলায় আমাদের পালাবার অনুমতি দেয় না। আপনারা মাত্র কয়েকটা ফায়ার করলেন আর দেখলেন তো তারা কেমন সুড়সুড় করে ভেগে গেলো। আল্লাহর দোহাই আমাকে বলুন কোথায় বন্দুক পাওয়া যাবে? আর এই নিন আমার স্ত্রীর, বোনদের ও মায়ের অলংকার। আর যদি আপনারা কোথাও থেকে পাঁচটি রাইফেলের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে আমি গ্রামের সব মেয়েদের অলংকার এনে দেবো।

নওজোয়ান নিজের পকেট থেকে একটি পুঁটলী বের করে সেলিমের দিকে বাড়িয়ে দিল। সেলিম বললো, আমার ভাই, তুমি ভুল করছো। আমরা কওমের ইজ্জতের সওদাকারীদের অন্তরভুক্ত নই। বন্দুকের কোনো বাজারের খবর আমরা জানি না। এখন বন্দুক লাভ করতে কেবলমাত্র হিম্মত ও সাহসের দরকার। আমরা এ বন্দুক ও অস্ত্রগুলি শিখ ও হিন্দুস্তানী সিপাহীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। বর্তমানে আমি তোমাকে একটি পিস্তল দিতে পারি। এটি ধরো। এতে গুলী ভরা আছে। এর বাড়তি আর কোনো গুলী বর্তমানে আমার কাছে নেই। তবে যদি তুমি এটি যথাযথ ব্যবহার করতে পারো তাহলে এর পাঁচটি গুলীর বিনিময়ে তোমরা পাঁচটি রাইফেল পেতে পারবে। এবার তুমি যাও। আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

আপনি কোথায় যাবেন?

তুমি কি ডাঃ শওকতকে চেনো?

তাঁকে জানে না এমন কেউ আছে নাকি এ তল্লাটে?

তাঁর গ্রামে যাবার পথ কি এটাই?

না, সে রাস্তা আগে গিয়ে পাবেন। তবে ভাববার দরকার নেই। আপনারা আমার পেছনে আসুন।

মানে, তুমি আমাদের সাথে যাবে?

নওজোয়ান মুচকি হেসে বললো, আমি বন্দুক হাসিল করার চাইতে বরং আপনাদের সাথে সহযোগিতা করার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী। আসলে এজন্যই আমি আপনাদের পিছু নিয়েছি।

নওজোয়ান কিছুদূর যাবার পর সেলিমের দিকে ফিরে বললো, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?

আমরা গুরুদাসপুর জিলা থেকে এসেছি।

আমি আপনাকে কোথাও দেখেছি। হ্যাঁ, ইলেকশানের দিনগুলিতে।

হ্যাঁ, সে সময় আমি এ এলাকা সফর করেছি।

আপনার নাম সেলিম, তাই না?

হ্যাঁ।

আমার নাম আমির আলী। আপনার মনে নেই, আমি দুদিন আপনার সাথে ছিলাম। ডাক্তার সাহেব কি আপনার আত্মীয়?

হ্যাঁ। এখন গ্রাম আর কতদূর? সেলিম কথার মোড় ঘোরাতে চাচ্ছিল।

এখান থেকে এক ক্রোশ।

সেলিমের হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুততর হলো। কল্পনায় গ্রামের বিভিন্ন দৃশ্য তার চোখে ভেসে উঠতে থাকলো। কখনো সে দেখছিল ইসমতের চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু। কখনো শুনছিল তার হৃদয় বিদারক চিৎকার। কখনো সে কল্পনা করছিল তারা সবাই খোলা আঙিনায় তার চারদিকে জমা হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করছিল নানান সব প্রশ্ন। কখনো সে আবর্জনার স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে তাদের আওয়াজ দিচ্ছিল।

'থামুন' আমির আলী আচানক ঘোড়া থামিয়ে বললো।

সেলিম চমকে উঠে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো। আমির আলী নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখতে দেখতে বললো, এদিকে দেখুন।

সেলিম বেশ কয়েক কদম এগিয়ে গিয়েছিল। আবার ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তার কাছে এসে জমিনের ওপর একটি লাশ দেখলো। থলে থেকে টর্চ বের করে তার ওপর আলো ফেললো। দাউদ ঘোড়া থেকে নেমে মনোযোগ সহকারে লাশ পরীক্ষা করে বললো, এ লাশ আজকের নয়। এ থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।

আমির আলী বললো, ওদিকে দেখুন। ওই হচ্ছে গ্রাম। ওই উঁচু গাছটা ডাক্তার শওকতের বাড়ির নিশানা।

সেলিম নিশ্চিন্ত হয়ে বললো, গ্রাম সংরক্ষিত। ওখানে আগুন নেই। চলো, জলদি করো।

আমির আলী বললো, এবার ঘোড়ার গতি শ্লথ করুন। হয়তো দুশমনরা গ্রামের বাইরে হামলা করার প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে।

কয়েক কদম চলার পর তারা আরো লাশ দেখতে পেলো। আমির আলী ঘোড়া থামিয়ে শোকাহত কণ্ঠে বললো, আমার বন্ধু! গ্রামের ওপর আগেই হামলা হয়ে সবকিছু চুকেবুকে গেছে।

সেলিম চিৎকার করলো, না, না, তবুও সে অনুভব করছিল তার সাথির কথার প্রতিবাদ করার পরিবর্তে সে মনে হয় নিজের মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

সামনে কিছুদূর চলার পর তারা গ্রামের বাইরে ডাক্তার শওকতের বাড়ির চার দেয়াল দেখতে পেলো। তার সাথেই দেখলো চারপাশের ক্ষেতের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লাশ।

আমির আলী কবরস্তানের কাছে কুলগাছের ঝোপের নিচে ঘোড়া থামিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়ে বললো, ঘোড়া এখানে বেঁধে রেখে আমরা সামনের দিকে পায়ে হেঁটে যাবো। একজন ঘোড়ার কাছে থাকবে।

সেলিম বললো, তুমি ঘোড়ার কাছে থাকো।

আমির আলী বললো, আমি আপনার হুকুম অমান্য করার সাহস করি না তবে আপনার সাথে আমার যাওয়া উচিত। আপনি ভাববেন না আমি বন্দুক চালাতে জানি না!

সেলিম তার এক সাথিকে ঘোড়ার কাছে রেখে বললো, তুমি এখানে থাকো। তোমার রাইফেলটা আমির আলীকে দাও এবং আমির আলীর পিস্তলটা তুমি নাও।

ডাক্তার শওকতের বাড়ির বাইরেও কয়েকটি লাশ পড়ে ছিল। আঙিনায় ফটকের দরোজা খোলা ছিল। কিন্তু সেলিমের সামনে এগিয়ে যাবার হিম্মত হলো না। তার হাত কাঁপছিল। পা ছিল টলটলায়মান। কয়েক মুহূর্ত ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো সে। ফটক পার হয়ে আঙিনার মধ্যেও লাশ দেখা যাচ্ছিল। সেলিমের চোখের সামনে জীবনের রাজপথের শেষ মশালটি নিভে গিয়েছিল। তার আকাশের তারকাদের আবর্তন থেমে গিয়েছিল। চারদিকে ছড়ানো লাশের নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতা তার জন্য আগুনের শিখা, তলোয়ারের ঝলসানি ও রাইফেলের ট্যার ট্যার ধ্বনির চাইতেও ভয়ংকর মনে হচ্ছিল। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু হৃদয়তন্ত্রী থেকে অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছিল ঃ ইসমত! ইসমত! ইসমত নামের মধ্যে এখনো জীবনের উষ্ণতা সঞ্চারিত ছিল। সেলিমের হৃদস্পন্দন দ্রুততর হচ্ছিল, তার ঠোঁট নড়ছিল, 'ইসমত! 'ইসমত!' আচানক বুলন্দ আওয়াজে চিৎকার করে উঠলো সে। দৌড়ে প্রবেশ করলো আঙিনায়। কয়েকটি কুকুর লাশ নিয়ে টানাটানি করছিল, দৌড়ে আঙিনার বাইরে পালিয়ে গেলো। সেলিম থলে থেকে টর্চ বের করলো এবং ঝুঁকে ঝুঁকে বারান্দায় ছড়ানো লাশগুলির ওপর আলো ফেলে দেখতে লাগলো

মুসলমানদের সাথে কোথাও শিখদের লাশও পড়েছিল। সেলিমের টর্চের আলো ঘুরতে ঘুরতে আচানক একটি লাশের ওপর থেমে গেলো। আমজাদের লাশ বারান্দার একটি থামের পাশে পড়েছিল। শাহরগ এমনভাবে কাটা ছিল যেন মনে হয় তাকে শায়িত করে জবাই করা হয়েছে। তার দুই গাল কান পর্যন্ত চিরে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু তার চওড়া কপাল সুন্দর নাক ও চোখ দুটি এখনো যেন বলছিল, আমাকে মনোযোগ দিয়ে দেখো, আমি আমজাদ। আমি ইসমত ও রাহাতের ভাই। আমি সেই নিষ্পাপ হাসি যাকে জীবনের ঠোঁট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

বারান্দার সামনে কামরার দরোজার একটি কপাট ভাঙা পড়েছিল। দহলিজের বাইরে ও ভেতরে কয়েকটা লাশ ছড়িয়ে পড়েছিল। নারী ও শিশুদের লাশ। সেলিম কাঁপা কাঁপা হাতে তাদের ওপর আলো ফেলছিল। বেশির ভাগ নারী ছিল বয়োবৃদ্ধা। সেলিম টর্চ নিভিয়ে দিল। তার মুখ থেকে গভীর বেদনার্ত স্বর ধ্বনিত হলো, ইসমত! রাহাত! জবাবে একটি বাড়ির ছাদ থেকে কুকুরের কান্নার করুণ সুর ধ্বনিত হলো।

দাউদ বললো, চলো ভেতরে দেখি!

সেলিম নিথর নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলো। দাউদ তার হাত থেকে টর্চ নিয়ে তার বাহু ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে গেলো। কামরার মধ্যে সেইসব মেয়ের লাশ ছিল যাদেরকে সেলিম এখনো দেখেনি। তার সামনের দিকে বৈঠকখানার দরোজাও ভাঙা ছিল। মস্তিষ্কের যে অংশে ব্যথার অনুভূতি জাগে সেলিমের মস্তিষ্কের সে অংশটি অবশ হয়ে গিয়েছিল। এখন আর কোনো জিনিসই তার জন্য ভয়ংকর ছিল না। আচানক সে দাউদের হাত থেকে টর্চ নিয়ে বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করলো। সেখানে কেউ ছিল না। মেঝের কার্পেটের ওপর ছোপ ছোপ রক্তের দাগ ছিল। পাশের কামরার দরোজাও ভাঙা ছিল এবং দহলিজের সামনে শিখদের দুটি লাশ পড়েছিল। এক কোণে ছিল আর একটি লাশ। এক নজরেই সেলিম তাকে চিনে ফেললো। দ্বিতীয়বার সেদিকে নজর উঠাবার হিম্মত আর তার ছিল না। বিবস্ত্রতা, অসহায়তা ও মজলুমিয়াতের এ চিত্র তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে বলছিল, আমার দিকে তাকাবে না! আমার কাছে এসো না! দুনিয়ার সমস্ত আলো নিভিয়ে দাও! সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজিকে বলো তারা যেন চিরকালের জন্য মুখ লুকিয়ে নেয়, যাতে কেউ আমাকে এ অবস্থায় দেখতে না পায়।

সেলিম দাউদকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে দিল। বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে থাকা বাকি সবাইকে বললো, তোমরা এখানেই থাকো।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর লাশের দিকে পিঠ করে টর্চ জ্বালালো সে। কামরার একটি দেয়ালের সাথে বসানো একটি কাঠের সিন্দুক খোলা পড়েছিল। তবে সেটি একেবারেই খালি ছিল। কয়েকটি কাপড় এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কিন্তু তার মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস সে দেখতে পেলো না। সিন্দুকের সাথে পালংকের ওপর একটি পুরাতন চাদর বিছানো ছিল। সেলিম চাদর উঠিয়ে টর্চ

নিভিয়ে অন্ধকারে সতর্কতার সাথে পা ফেলতে ফেলতে পেছন দিকে ফিরলো। হঠাৎ তার পায়ে কিছু ঠেকলো। সে নিচু হয়ে হাত দিয়ে হাতড়াতে লাগলো। লাশের বাহু ও মাথার চুল স্পর্শ করার পর সে চাদরটি তার ওপর বিছিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ নিরব নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকলো সে। তারপর বাইরে বের হবার উদ্দেশ্যে আবার টর্চ জ্বালালো। কিন্তু আচানক তার মনে হলো, না এ হয়তো অন্য কেউ। হয়তো আমি চিনতে ভুল করেছি। সে ঝুঁকে পড়ে চাদরের এক প্রান্ত উঠিয়ে টর্চের আলো ফেললো চেহারার ওপর। ইসমত ও রাহাতের মা এতে সন্দেহ নেই। চুলগুলি বিক্ষিপ্ত ছিল এবং চেহারা মারাত্মকভাবে খামচানো। আমজাদের মতো তার চোখ দুটোও খোলা ছিল। তার বিস্ফারিত নেত্র দুটি কওমের নওজোয়ানদের বলছিল ঃ

'আমি তোমাদের গাইরাত–আত্মমর্যদা। তোমরা আমার সতীত্বের কসম খেতে পারো। আমি সেই বোন যে দামেশকের শাহী দরবারে কম্পন সৃষ্টি করেছিল। আমি মুহাম্মদ বিন কাসেমের তলোয়ার কোশমুক্ত করেছিলাম। আমার কারণে সিন্ধু বিজয় হয়েছিল। আমি সেই মা যে মাহমুদ গজনীকে দুধপান করিয়েছিল। সোমনাথের বুত ধ্বংসকারী মুজাহিদকে আমি ঘুম পাড়ানিয়া গান শুনাতাম। আমি কওমের এমন বেটি যার শিরায় তাইমুরের খুন প্রবাহিত। আমার জন্য লালকেল্লা নির্মাণ করা হয়েছিল। হে কওম! দেখো আমি কে? এই দেশের সরজমিনে আমি শত শত বছর তোমার বিজয়ের গান গেয়েছি।'

সেলিম আবার তার চেহারা চাদর আবৃত করলো এবং কামরার বাইরে বের হয়ে এলো। আর একবার সে সমস্ত কামরাগুলিতে চক্কর দিল। প্রত্যেকটি লাশকে মনোযোগ সহকারে দেখলো। কৃপাণের আঘাতে অনেকগুলি এমনভাবে বিকৃত ও ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে যে তাদের আসল চেহারা আন্দাজ করাও কঠিন হয়ে পড়ছিল। তবুও সেলিমের মন সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, এগুলির মধ্যে ইসমত ও রাহাত নেই। সেখানে জোয়ান মেয়ের লাশ খুব কমই ছিল। বাড়ির সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর আবার সে আঙিনায় বের হয়ে এসে লাশগুলি দেখতে লাগলো। তার সাথিরা নিরবে তার সাথে সাথে ঘুরতে লাগলো। দাউদ তার কাঁধে হাত রেখে বললো, সেলিম! মনে হচ্ছে তোমাদের বাড়ির মতো এ বাড়িটিও এ গ্রামের মুসলমানদের আখেরি কেল্লা ছিল। ঐ কামরায়.......... তোমার........!

না, ওটা ছিল তার মায়ের লাশ। সেলিম অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললো।

তাহলে চলো সেলিম!

দাঁড়াও। আমি একটু ছাদের ওপরটা দেখি। সেলিম সিঁড়ির দিকে এগুলো এবং তার সাথিরাও তার সংগে চললো। ছাদে মুসলমানদের সাথে শিখদেরও তিনটি লাশ পড়েছিল। ইসমত ও রাহাত সেখানেও ছিল না। সেলিম তার শেষ নির্ভরতাটাও হারিয়ে ফেলেছিল। আচানক সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'জমিন ও আসমানের মালিক, আমাকে হিম্মত দাও আমি যেন হিসাবের দিনের ইন্তিজার করতে পারি।'

এ কথা বলেই সে জমিনের ওপর সিজদায় আনত হলো।

এতদিন চোখের যে সঞ্চিত অশ্রুরাশিকে সে কোনো মানুষের সামনে প্রবাহিত করতে রাজি ছিল না আজ তা বাঁধ ভাঙা বন্যার ন্যায় দুকুল ছাপিয়ে প্রবাহিত হতে লাগলো। তার দোয়ার শব্দাবলীতে ও কান্নায় প্রভাবিত হয়ে দাউদ, আমির আলী ও অন্য সাথিরাও সিজদায় আনত হলো।

আচানক গ্রামের একদিকে শোরগোল শুনে সেলিম উঠে দাঁড়ালো। তার সাথিরাও সিজদা থেকে মাথা তুলে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগলো। শরাব পান করে মাতালরা চিৎকার দিচ্ছিল আর হৈ হৈ করছিল।

আমির আলী বললো, গ্রামের বাইরে মানসিংয়ের হাবেলীতে এ হৈ-হল্লা হচ্ছে। তবে তোমরা একটু থামো, আমি খবর আনছি।

না, আমরা সবাই যাবো। সেলিমের বুকে নতুন করে দুরু দুরু কম্পন শুরু হয়েছিল। আমির আলী তাদের আগে আগে দৌড়াচ্ছিল। গ্রামের ওপর দিয়ে একটা চক্কর কেটে সে অন্য প্রান্তে পৌছে গেলো। এখন চিৎকার-আর্তনাদের সাথে সাথে অট্টহাসির আওয়াজ আসছিল। ঘাসক্ষেতের দিকে হাবেলীর দেয়াল সংলগ্ন আম ও ঝাউ গাছের সারি। আমির আলী হাতের ইশারায় তার পিছনের সবাইকে থামতে বললো এবং নিজে একটি গাছে চড়লো। মুহূর্তকাল চারদেয়ালের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে নিচে নেমে পড়লো। সাথিদের বললো, লোকদের সংখ্যা তিরিশ চল্লিশের বেশি হবে না। তবে বাইরে থেকে আরো লোক ভেতরে প্রবেশ করছে। সামনে দেয়ালের সাথে লাগোয়া একটি একচালা আছে। আমরা তার চালে উঠে ফায়ার করতে পারি।

হাবেলীর মধ্যে শিখেরা তাদের বিগত বারো ঘন্টার বিজয় উৎসব অনুষ্ঠান করছিল। তিরিশ চল্লিশজন শিখ জমিনে বসে শরাব পান করছিল। আটদশ জন শিখ শরাব পান করে মাতলামি ও হৈ হুল্লা করছিল। তাদের কেউ নাচছিল এবং কেউ অশ্লীল গান গেয়ে অন্যদের থেকে বাহবা কুড়াচ্ছিল। দেয়ালে খুঁটির সাথে দুটি লণ্ঠন ঝুলছিল। নাচনেওয়ালারা তাদের দুই সাথিকে ধরে আলোর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। লোকেরা তাদেরকে দেখে অট্টহাসি দিচ্ছিল। মানসিংয়ের ঘরের মেয়েরা এসব দেখে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। এ দুজন শিখ ছিল একেবারে দিগম্বর। কোমরে জড়ানো নেংটি থেকেও মুক্ত হয়ে গিয়েছিল তারা।

এক মহিলা চেঁচিয়ে উঠলো, এদেরকে ওদের সামনে নিয়ে যাও।

এই ক্ষুদ্র দলটির বাকি মাতালরা তাদের দুজনকে ঠেলে একদিকে নিয়ে গেলো। সেখানে আবছা আলোয় কয়েকটি মেয়ে জড়সড় হয়ে বসেছিল। এক ব্যক্তি লণ্ঠন নামিয়ে তাদের কাছে নিয়ে গেলো।

এক মহিলার আওয়াজ এলো, জ্ঞান সিং, তুমহারা দুলহিনের শরম লাগতাছে। তাকে শরাব পিলাও!

হ্যাঁ, ভাই শরাব লাও!

আর একজন বললো, হ্যাঁ, সবাইকে শরাব পিলাও। অন্য শিখেরা তাকে সমর্থন দিচ্ছিল।

একজন একটি মেয়েকে বাহু ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনলো এবং বললো, জ্ঞান সিং ইধার এক গ্লাস দাও!

দুজন লোক লাফিয়ে উঠে চিৎকারকারী মেয়েটির বাহু ও মাথার চুল আঁকড়ে ধরলো। এবং একজন তাকে জবরদস্তি শরাব পান করাবার কোশেশ করতে লাগলো।

মেয়েটি বলছিল, কুত্তা ও শূয়োরের দল, আমাকে মেরে ফেল! মেরে ফেল!

থামো, সে এভাবে পান করবে না! একজন শিখ এগিয়ে গিয়ে তার কাপড় চোপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো।

দরোজার পাশে পড়ে থাকা কোনো একজন চেঁচাতে লাগলো, জালেমরা! আল্লাহর ভয় কর! মান সিং! মান সিং! আল্লাহ সবকিছু দেখছে।

আরে এ কুত্তার জান তো দেখছি বড়ই শক্ত। এর আবার জ্ঞান ফিরে এসেছে। মানসিং একথা বলতে বলতে এগিয়ে এলো এবং দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা লোকটিকে পা দিয়ে ঠোকর দিতে দিতে বললো, ডাক্তার! তুমি পরের মেয়েদের হালত দেখে কষ্ট পাচ্ছো। এখন তোমার মেয়েদের পালা শুরু হবে। তোমার বিবির অবস্থা দেখেও তুমি চিল্লাচ্ছিলে। এবার তোমার মেয়েদের খালিস্তান হবে। এখনো যদি বলে দাও তুমি অলংকার গুলি কোথায় রেখেছো তাহলে আমি তোমার মেয়েদের জীবন বাঁচাতে পারি।

আমি সবকিছু তোমার হাওয়ালা করে দিয়েছিলাম।

বদমায়েশ, ওগুলি ছিল তোমার বিবির অলংকার! আমি মেয়েদের আলংকারের কথা জিজ্ঞেস করছি। তাদের বিয়ের জন্যে তুমি আলংকার বানিয়েছিলে তা কোথায়?

তা আমি অমৃতসর থেকে অনিনি।

বহুত আচ্ছা ডক্তার। আমি তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তুমি ও আমার একটা কথা মেনে নাও। আমি এখনো পর্যন্ত তোমার মেয়েদের হেফাজত করে এসেছি। যদি তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে তাদের সাথে তা করতে না চাও তাহলে তাদের বলো তারা যেন 'অমৃত' পান করে। আমি তোমার জামাই হতে রাজি আছি। বড় মেয়েটি হবে আমার ঘরের রানী। ছোট মেয়েটিকে দারওয়াল সিং নিজের ঘরে নিয়ে যেতে প্রস্তুত আছে। তুমিও অমৃত পান করে নাও ডাক্তার। আমাদের গ্রামে একজন ডাক্তারের প্রয়োজন।

ডাক্তার চিৎকার করলো, তুম কুত্তা হ্যায়, তুম শুয়োর হ্যায়।

একজন লাঠি উঠালো। কিন্তু মান সিং তার হাত ধরে ফেললো। তাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে বললো নেহী, আভী নেহী, জ্ঞান সিং! পিছনের কুঠরী থেকে ডাক্তারের লাড়কীদের লে আও।

একজন ভেতরে ঢুকলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যে দুটি মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে নিয়ে এলো।

মান সিং বললো, জ্ঞানী জী, অমৃতের পেয়ালা লে আও।

জ্ঞানী বললো, সরদার জী! ওরা দুবার অমৃতের পেয়ালা ফেলে দিয়েছে, এবার নিশ্চিন্ত হতে হবে।

নিয়ে এসো জ্ঞানীজী! এটা ওদের জন্য শেষ সুযোগ। এবার যদি ওরা অমৃত ফেলে দেয় তাহলে আমাদের কাছে শরাব আরো আছে। ডাক্তার এখনো সময় আছে। ওদেরকে বোঝাও!

ডাক্তার মেয়েদের প্রতি নজর দেবার পরিবর্তে আসমানের দিকে নজর উঠিয়ে বললো, পরওয়ার দিগার! এখন আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি সম্মানজনক মৃত্যু।

মেয়েরা 'আব্বাজান!' 'আব্বাজান!' বলে তাঁর দিকে এগিয়ে এলো। কিন্তু মান সিং তাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলো থামো, এখনো যদি অমৃত পান করো তাহলে তোমাদের বাপের জান বাঁচতে পারে।

ডাক্তার ব্যাকুল হয়ে নিজের দোয়ার পুনরাবৃত্তি করছিল। মান সিং জ্ঞানীর হাত থেকে কাটোরা নিয়ে একটি মেয়ের দিকে এগিয়ে গেলো এবং বললো, নাও, পান করো। আমি তোমাকে শেষ বারের মতো বলছি। তুমি পান করবে না? থামো! মাখখন সিং! ওহে মাখখন সিং! একটু এদের সামনে এসো।

একজন নাংগা উলংগ শরাব পানে বদ্ধ মাতাল শিখ এগিয়ে এলো। মেয়েরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দেয়ালের সাথে সেঁটে গেলো।

মান সিংয়ের ইশারায় সে একটি মেয়ের মাথার চুল ধরে ফেললো এবং তার পোশাক ছিঁড়তে লাগলো। অন্য মেয়েটি তাকে দানবটির হাত থেকে ছাড়াবার জন্য এগিয়ে গেলো। কিন্তু মান সিং তাকে ধাক্কা দিয়ে একদিকে ফেলে দিল। মেয়েটি চিৎকার করছিল। ডাক্তারের ব্যাকুল দোয়ার আওয়াজ বুলন্দ হচ্ছিল। একদিকে মুসলমান মেয়েরা কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া মাগছিল। এমন সময় আচানক রাইফেলের ট্যার ট্যার আওয়াজ হলো এবং সাথে সাথেই মাখখন সিং, মান সিং, জ্ঞান সিং এবং তাদের আশেপাশে আরো কয়েকজন শিখ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

'ঐ এসে গেছে, 'মুসলমান ফউজ এসে গেছে' একথা বলতে বলতে চিৎকার ও শোর গোল করতে করতে শিখেরা বাইরের দরোজার দিকে দৌড়ালো। ফটক ভেতর থেকে বন্ধ ছিল! গুলীবৃষ্টির মধ্যে তারা শিকল খুলে বুঝতে পারলো বাইর থেকেও কেউ শিকল লাগিয়ে দিয়েছে।

সেলিম একচালার চাল থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে হাবেলীর মধ্যে প্রবেশ করলো এবং বুলন্দ আওয়াজে বললো, ফায়ার বন্ধ করো। বন্দুকগুলি আচানক নিরব হয়ে গেলো।

কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে সেলিম বললো, ফউজ এ হাবেলীর চারদিকে ঘিরে ফেলেছে। কাজেই পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। তোমরা একদিক হয়ে যাও। আমরা এ বাড়ির তল্লাশী নেবো। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ এসে যাবে। তোমাদেরকে আমরা তাদের হাতে সোপর্দ করে দেবো। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ যদি হাতটিও নাড়ে তাহলে তাকে শুট করে দেয়া হবে।

শিখেরা আচানক হামলায় যতটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল পুলিশের আগমন বার্তা শুনে আবার ততটাই নিশ্চিন্ত হলো। এলাকার থানা ইনচার্জ তাদের দলনায়কের ডানহাত ছিল। এক কোণ থেকে পাঁচ ছয়জন লোক দেয়াল টপকাবার চেষ্টা করলো। সেলিম টমিগানের ফায়ার করলো। তারা সবাই একসাথে ওখানে খতম হয়ে গেলো। বাকি লোকদের ওপর টর্চের আলো ফেলে সেলিম বললো, আর কেউ ভাগতে চায়? শিখেরা জবাব দেবার পরিবর্তে সবাই গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে লাইনবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

সেলিম বুলন্দ আওয়াজে বললো, জমাদার দাউদ! দুজন জোয়ানকে সাথে নিয়ে ভেতরে এসো। সুবেদার আমির আলী। তুমি ওখানেই ডিউটি করো। যদি ওখানে কোনো লোক দেখতে পাও তাহলে সংগে সংগেই তাকে গুলী মেরে উড়িয়ে দাও। পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকবো।

দাউদ দুজনকে সাথে নিয়ে চালা থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে ভেতরে চলে এলো এবং ফউজি আদবে স্যালুট করার পর সেলিমের সামনে এসে খাড়া হয়ে গেলো।

সেলিম বললো, জমাদার! তুমি এদের প্রতি নজর রাখো।

এক শিখ বললো, সরকার! আমরা বেকসুর। আমাদের কোনো দোষ নেই। এসব লঙ্কাপনা মান সিংয়ের কীর্তি।

এসব কথা পুলিশদের কাছে বলবে। মান সিং কে?

মান সিং ওদিকে পড়ে আছে।

তার ঘরের আর কেউ আছে?

এই যে তার ছেলে সরকার! আমরা বেকসুর হুজুর!

কে মান সিংয়ের ছেলে? এদিকে এসো। জলদি করো। ভয় পেয়ো না।

একটি ষোল বছরের যুবক, যার শরাবের নেশা টুটে গিয়েছেল, কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এলো। সেলিম তার চেহারায় টর্চ মেরে বললো, চলো, আমাকে ঘরগুলি দেখাও।

ছেলেটি আগে আগে চলছিল। দরদালানের দরোজার কাছে যেতেই এক মহিলা হাত জোড় করে সেলিমের সামনে খাড়া হয়ে গেলো। 'পরমাত্মার দোহাই, আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে সবকিছু দিতে প্রস্তুত। আমার কাছে যে পরিমাণ সোনা দানা আছে সব নিয়ে নাও।' সে বলতে লাগলো।

সেলিম বললো, তুমি বন্দুকগুলি কোথায় রেখেছো?

সেগুলি ভিতরে আছে সিন্দুকের মধ্যে। ভগবানের দোহাই, খোদার দোহাই, আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও।

সেলিম গর্জে উঠলো, ভিতরে চলো।

দালান পার হয়ে কুঠরির মধ্যে ঠকঠক্ আওয়াজ আসছিল। সেলিম আচানক টর্চ নিভিয়ে দিল এবং পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলো। কুঠরির দরোজার সামনে পৌছেই পুনর্বার টর্চ জ্বালালো। দুজন লোক সিন্দুক ভাঙার চেষ্টা করছিল। একজন কৃপাণ উঠালো। সেলিমের টমিগানের কয়েকটি গুলী সাথ সাথেই বের হয়ে গিয়েছিল। এক মুহূর্ত পরে সেলিম দালানের বাইরে উঁকি দিয়ে বললো, 'দাউদ, আমি ঠিক আছি। তুমি ওদের প্রতি নজর রাখো।'

মান সিংয়ের ছেলে অন্য কুঠরিতে ঢুকে ভেতর থেকে দরোজা বন্ধ করে নিল। সেলিম ফিরে এসে দরোজায় ধাক্কা দিল। ছেলের মা আর্তচিৎকার করতে করতে তার জামা টেনে ধরলো। 'গুরু মহারাজের কসম! ঐ কুঠরিতে কিছুই নেই। আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও আমি তোমাকে বন্দুক বের করে দিচ্ছি। সেলিম কিছু চিন্তা করে বাইর থেকে দরোজায় শিকল তুলে দিল। তারপর মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে দ্বিতীয় কুঠরিতে নিয়ে যেতে যেতে বললো, জলদি করো।

মহিলা দ্বিতীয় কুঠরির দরোজার কাছে পৌছে দেয়াল হাতড়াতে লাগলো। সেলিম তার দিকে টর্চ মেরে বললো, কি করছো?

সিন্দুকের চাবি তালাশ করছি। এই পেয়ে গেছি, আলমিরাতে হাত দিয়ে বললো সে।

ইসমত ও রাহাত সেলিমের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেছিল। কিন্তু যখন সে কয়েক হাত দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মিলিটারী অফিসারের ভাষায় ও ভংগিমায় কথা বলছিল তখন তারা মনে করছিল এ ব্যক্তি অন্য কেউ হবে। তারপর যখন জমাদার ও সুবেদারকে নির্দেশ দিতে থাকলো তখন রাহাত হতাশ কণ্ঠে বললো, আপা আমি মনে করেছিলাম সেলিম ভাই।

'এ-সে ছাড়া আর কেউ নয়, সে ছাড়া আর কেউ নয় রাহাত!'- ইসমত রাহাতকে বোঝাবার চাইতে বরং নিজের মনকেই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিল বেশি করে।

তারপর যখন নিকটে এসে মান সিংয়ের বিবির সাথে কথা বলছিল এবং দেয়ালের গায়ে লটকানো লণ্ঠনের আবছা আলো তার চেহারায় পড়লো, রাহাত তার ছিন্ন পোশাক এদিক থেকে ওদিক থেকে টেনে টুনে গায়ে জড়াতে জড়াতে ইসমতের পেছনে লুকালো। ইসমতের হৃদয়ের স্পন্দন নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ঠোঁট চেপে নিজের কণ্ঠকে সংযত করার চেষ্টা করছিল সে। দুই হাত ছড়িয়ে সে তার দিকে এগিয়ে যেতে চাচ্ছিল। সে বলতে চাচ্ছিল, সেলিম! সেলিম! আমার দিকে তাকাও। তুমি আমাকে চেনো না? কিন্তু তার পা নড়লো না। তার কথা গলায়

আটকে গেলো। এখন সে নিজের মনকে প্রশ্ন করছিল সে কি আমাকে দেখেনি? আমাকে চিনতে পারেনি? তারপর মাটিতে পড়ে থাকা একজন শিখের কৃপাণ তুলে নিয়ে সে তার বাপের রশির বাঁধন কাটতে লাগলো। হাতের রশিগুলি কাটার পর পায়ের রশি কাটছিল এমন সময় ভেতর থেকে টমিগানের আওয়াজ শোনা গেলো। ইসমতের হাত থেকে কৃপাণ খসে পড়লো। রাহাত ভীত হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো। কয়েক মুহূর্ত পরে সেলিম যখন দরোজায় মুখ বাড়িয়ে দাউদকে আওয়াজ দিল তখন তার ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো। রাহাত তার হাত থেকে পড়ে যাওয়া কৃপাণ তুলে নিয়ে দ্রুত ডাক্তারের পায়ের রশি কেটে ফেললো। রশির বাঁধন মুক্ত হবার পর ডাক্তার দুহাতে মাথা টিপে ধরে বসে পড়লো। রাহাত জড়সড় হয়ে নিজেক লুকাতে অন্য মেয়েদের কাছে চলে গেলো। একজন নিজের ওড়না খুলে তার গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিল এবং সেটি নিয়ে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত জড়িয়ে সে বসে পড়লো। কয়েক মিনিট পরে ইসমত দেয়াল থেকে লণ্ঠন নামিয়ে নিয়ে ভেতরে চলে গেলো।

ইতিমধ্যে সেলিম মান সিংয়ের স্ত্রীর হাত দিয়ে সিন্দুক খুলিয়ে দুটি রাইফেল, একটি স্টেনগান, একটি টমিগান, দুটি বন্দুক, একটি পিস্তল, দুটি নতুন টর্চ লাইট এবং প্রায় বিশ সেরের মতো বারুদ বের করে নিয়েছিল। এক কোণে শিখদের লাশ পড়েছিল সেখানে পেট্রোলের পনের বিশটি টিন ছিল। বাকি সমস্ত কুঠরি লুণ্ঠিত দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। মান সিংয়ের বিবি বলছিল, খোদার দোহাই এসব নিয়ে যাও। আমার ছেলেকে কিছু বলো না।

তুমি এখনো সমস্ত বন্দুক আমাদের হাতে সোপর্দ করোনি।

গুরু মহারাজের কসম, আমি ঝুট বলিনি। বাকি সমস্ত হাতিয়ার তিনি লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র এই কটিই লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

সেলিম কাপড়ে ঠাসা একটি সুটকেস খালি করে বললো, এ বারুদগুলি এতে ভরে দাও। জলদি করো।

মহিলাটি বিনা প্রশ্নে তার হুকুম তামিল করছিল। সেলিম টর্চের আলোয় কুঠরির মালপত্র পর্যবেক্ষণ করছিল। মহিলাটি সুটকেস থেকে যে সমস্ত সিল্ক ও সার্টিনের নতুন সুটগুলি বের করে বাইরে ফেলে দিচ্ছিল তার মধ্যে থেকে একটি ফটো বের হয়ে পড়লো সেলিম ঝুঁকে পড়ে সেটি তুলে নিয়ে দেখতে লাগলো। সেটি ছিল আমজাদ, আরশাদ, ইসমত ও রাহাতের ছোটবেলার গ্রুপ ফটো। সে বারুদের জন্য অন্য একটি সুটকেস খালি করালো এবং সিল্ক ও সার্টিনের কাপড়গুলি আবার আগের সুটকেসে পুরলো।

এমন সময় ইসমত লণ্ঠন হাতে দরোজার কাছে পৌঁছুলো। সেলিম টর্চ নিভিয়ে টমিগান সোজা করে বললো, কে?

ইসমত কাঁদতে কাদতে বললো, আমি ইসমত।

সেলিম টমিগান নামিয়ে নিল এবং ইসমত দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

সেলিম কাপড়ের সুটকেসটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, মনে হয় এগুলি রাহাত ও অন্যান্য মেয়েদের দরকার হতে পারে। এটা আপনি নিয়ে যান।

ইসমত সুটকেস নিয়ে সেলিমের দিকে দেখলো এবং ভারাক্রান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনার বাড়ির লোকেরা কোথায়?

সেলিম কোনো জবাব দেবার পরিবর্তে বারুদভর্তি সুটকেসটি উঠিয়ে দহলিজের বাইরে রেখে দিল এবং বললো আপনি প্রথমে আপনার সুটকেসটি রেখে আসুন এবং তারপর এটি নিয়ে যাবেন।

আমি কিন্তু আপনার খান্দানের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ইসমত, খবরাখবর নেবার সময় এটা নয়। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার হিম্মতই আর ইসমতের হলো না। সে একের পর এক দুটো সুটকেস উঠিয়ে বাইরে নিয়ে গেলো। দ্বিতীয়বার ডাক্তার ও কতিপয় মহিলা তার সাথে ছিল। ডাক্তার অস্ত্রগুলি উঠিয়ে বাইরে আনলো।

বাইরে বের হয়ে সেলিম ডাক্তার শওকতকে বললো, ডাক্তার সাহেব, আপনি মেয়েদের নিয়ে একদিকে সরে যান। ডাক্তার নিচু স্বরে বললো, তুমি সতর্ক থেকো। এদের কারোর কাছে পিস্তল থাকতে পারে।

আপনি ভাববেন না। একথা বলে সেলিম একদিকে সরে এসে শিখদের দিকে ফিরলো। তোমাদের মেয়েদের বলো, তারা নিশ্চিন্তে একদিকে বসে পড়ুক। পুলিশ অনেক বিলম্ব করছে। সম্ভবত তারা সকালে আসবে। কাজেই ভেতরে গিয়ে বসো।

শিখেরা ইতস্তত করতে করতে পরস্পরের প্রতি তাকাতে লাগলো। সেলিম বললো, জমাদার দাউদ, তুমি এদেরকে ভেতরে বন্ধ করে দরোজার ওপর দুজনকে পাহারায় নিযুক্ত করো। হাবেলীর চারদিকে আটজন পাহারা দেবে। আমি বাড়ির ভেতর থেকে অস্ত্র বের করে নিয়েছি। কাজেই এদেরকে পাঠিয়ে দিলে কোনো বিপদের আশংকা নেই।

শিখেরা এখন নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। দাউদ গর্জে উঠলো, বদমায়েশরা, জলদি করো। নয়তো আমরা একজনকেও জীবিত রাখবো না।

কয়েকজন দরোজার দিকে এগুলো এবং আট দশ কদম গিয়ে পেছনে নিজের সাথিদের দিকে তাকালো। সেলিম বললো, জমাদার এরা এভাবে যাবে না। আমি এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত গুণছি। এরপর তুমি গুলী চালিয়ে দেবে।

সেলিম গণনা শুরু করলো, এক-দুই-তিন-মান সিংয়ের স্ত্রী উচ্চ স্বরে বললো, ভাইয়েরা! ভয় পেয়ো না। ওনারা হরদীপকে কিছুই বলেননি। ওনারা বাওয়া সিং ও হরনাম সিংকে হত্যা করেছেন। তারা কুঠরীর মধ্যে আমাদের সিন্দুক ভাঙছিল। অন্য মেয়েরাও নিজেদের পিতা, স্বামী ও ভাইদেরকে ভেতরে যাবার তাগিদ দিতে লাগলো।

সেলিম বারো পর্যন্ত গোণার পর আট দশ জন শিখ ভেতরে ঢুকে গেলো। তার পঁচিশ গণনার মধ্যেই সবাই ভেতরে পৌঁছে গেলো। দালানের দুটি দরোজা ছিল।

দাউদ একটি দরোজার দিকে এগিয়ে গেলো। স্টেনগান দেখিয়ে সে শিখদেরকে পেছনে হটিয়ে দিল। তার এক সাথি দ্রুত দরোজা বন্ধ করে বাইর থেকে শিকল তুলে দিল। দুই দরোজার মাঝখানে একটি লোহার রড বসানো জানালা ছিল। কয়েকজন শিখ ঐ জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে উঁকি দিচ্ছিল। আমির আলী দোচালার চাল থেকে নেমে সামনে এসে জানালা দিয়ে যে শিখটি উঁকি দিচ্ছিল তাকে বেয়নেট চার্জ করলো। সে পড়ে গেলো এবং বাকিরা চিৎকার করতে করতে জানালা বন্ধ করে দিল।

সেলিম ও তার সাথিরা যখন জানালা ও দরোজায় পেট্রোল ছিটাচ্ছিল, মান সিংয়ের স্ত্রী ডুকরে কাঁদছিল। তোমার আল্লাহর দোহাই আমার হরদীপকে বের করে দাও। সে সেলিমের হাত টেনে ধরলো। একটি মুসলমান মেয়ে দৌড়ে এসে মানসিংয়ের স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে পেছনে সরিয়ে দিল এবং বললো, এই কুত্তীর বেটা আমজাদের লাশ টুকরো টুকরো করেছে এবং এর স্বামী আম্মীজানকে......। সে ছিল রাহাত।

দাউদ মান সিংয়ের স্ত্রীর মুখে স্টেনগানের নল ঢুকিয়ে দিল। কিন্তু সেলিম চিৎকার করে বললো, না দাউদ! ওকে ছেড়ে দাও। যুদ্ধে আমরা অন্যের নীতির পায়রবি করবো না।

সেলিম জ্বলন্ত লণ্ঠন উঠিয়ে দরোজায় ছুঁড়ে মারলো। আচানক দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো এবং দেখতে দেখতে তার লেলিহান শিখা চতুরদিক বেস্টন করে নিল।

শিখ নারী ও শিশুরা চিৎকার করে কাঁদছিল। সেলিম এগিয়ে এসে বললো, যে জমিনে তোমাদের কওম আগুনের বীজ বপন করেছে সে জমিন আর তোমাদের জন্য ফুল উৎপাদন করবে না।

কেউ ভেতর থেকে জানালা খুলে ফেললো। এবং পিস্তল চালাতে লাগলো। একটি গুলী সেলিমের বাহু ছুঁয়ে বেরিয়ে গেলো। আর একটি মান সিংয়ের স্ত্রীর বুকে বিঁধলো। সেলিম ও দাউদ একই সাথে স্টেনগান ও টমিগানের ফায়ার করলো এবং অগ্নিশিখার পেছনে কয়েকটি শিখের লাশ পড়লো।

ইসমত এগিয়ে এসে সেলিমের বাহু ধরে বললো, আপনি ঠিক আছেন তো?

আমি ঠিক আছি ইসমত! আমি ঠিক আছি।

দালানের একটি দেয়ালের সাথে একটি ঘুঁটের স্তূপ ছিল। সেলিম তাতেও পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিল। উঠানে কয়েকটি মদের বোতল পড়ে ছিল। আমির আলী সেগুলি তুলে তুলে জ্বলন্ত জানালার ওপর নিক্ষেপ করছিল। আগুনের আলোয় পুরো আঙিনা ঝলসে যাচ্ছিল। একদিকে বাঁধা চারটি ঘোড়া আতংকগ্রস্ত হয়ে আগুনের দিকে তাকাচ্ছিল। সেলিম বললো, চলো দাউদ! এই ঘোড়া কয়টি নিয়ে নাও। আর আমির আলী এ সমস্ত হাতিয়ার তোমার। শুধুমাত্র বারুদের অর্ধেক আমরা নেবো।

ফকীর দীন বললো, ওকে জাগাবে না। এখানেই ঘুমাতে দাও। সকালের দিকে আমার সংগে আবার নিয়ে আসবো। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে।

ঠিক আছে। ডাক্তার সাহেব, আপনি নৌকায় সওয়ার হয়ে যান। একথা বলে দাউদ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নদীর কূলে বসে পড়লো। দুতিন বার আড়ামোড়া ভাঙার পর জমিনের ওপর পা ছড়িয়ে দিল।

মেয়েরা নৌকায় উঠে বসলো। ইসমত নৌকায় পা রাখতে গিয়ে তার আব্বাকে বললো, আপনি ঐ লোকটাকে জিজ্ঞেস করুন।

ডাক্তার শওকত দাউদের কাছে এসে বললেন, আপনি যদি সেলিমের খান্দানের লোকদের সম্পর্কে কিছু জানেন তাহলে আমাকে বলুন।

দাউদ এ প্রশ্নের জবাব দেবার পরিবর্তে মাথা ঝুঁকিয়ে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে বললো, যদি হামলা হয় তাহলে আমাকে জাগাবে।

একটুখানি অপেক্ষা করে ডাক্তার আবার বললেন, দেখুন আমি সেলিমের পরিবারের লোকদের সম্পর্কে জানতে চাই।

সেখানে কেবল সেলিমের পরিবার নয় অনেক পরিবার ছিল। হামলা হলে আমাকে জাগিয়ে দিয়ো। দাউদ বিড়বিড় করতে করতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। সেলিমের অন্যান্য সাথিরা নদীর কিনারে পৌঁছুতে পৌঁছুতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পুলিশের সিপাহী বললো, কোনো ভালো খবর হলে সেলিম নিজেই আপনাদের জানিয়ে দিতেন।

তুমি কিছু জানো?

সিপাহী জবাব দিল, এটা কোনো শুনবার এবং শুনাবার কথা নয়। ওরা নিজেদের পেছনে রেখে এসেছে শুধুমাত্র ছাই-ভস্ম।

মাঝি পেছন থেকে ডেকেই চলছিল। ডাক্তার আর কোনো কথা না বলে ধীর পদক্ষেপে নৌকায় উঠে বসলেন।

রাহাত তার বাপের হাত ধরে বললো, আব্বাজান কি বললো ওরা?

কিছুই নয়। ডাক্তার বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দিলেন।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে টুপটাপ বৃষ্টি ঝরছিল। সেলিম পাশ ফিরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। তার মাথায় হাত রেখে কেউ জোরে জোরে ডাকতে লাগলো, 'সেলিম! সেলিম!'

সেলিম তার হাত ধরে একদিকে হটিয়ে দিল। জড়িত স্বরে বললো, মজিদ! আমাকে বিরক্ত করো না! আমি এইমাত্র শুয়েছি। চাচীজান! ওকে মানা করুন।

সেলিম এখন দশটা বাজে।

উহঁ! দশটা বাজে! তুমি সব সময় আমাকে বিরক্ত করো। একথা বলতে বলতে সেলিম আবার পাশ ফিরে চোখ খুললো। সে নদীর কিনারে বালির ওপর পড়েছিল। ডাক্তার শওকত, ইসমত ও রাহাত তাকে ঘিরে বসে আছে।

আমি কোথায়? সে হতচকিত হয়ে উঠে বসতে বসতে বললো। হয়তো আমি খোয়াব দেখছিলাম। হয়তো আমি নৌকা নিতে এসেছিলাম। এরপর হয়তো আমি–নৌকার ওপরই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কিছুক্ষণ চোখ কচলাবার পর এদিক ওদিক দেখলো সে। মাঝিরা অন্য কিনারা থেকে নৌকা ভরে ভরে লোক আনছিল। নদীর কিনারে তার ঘোড়াটি চরে বেড়াচ্ছিল।

ডাক্তার বললেন, সেলিম বেটা! তুমি নৌকার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আমাদের এপারে পৌঁছে দেবার পর মাঝিরা তোমাকে তুলে নিয়ে এখানে শুইয়ে দিয়ে যায়।

আমাদের সাথে যে মেয়েরা ছিল ওরা.......?

তারা একটি কাফেলার সাথে রওয়ানা হয়ে গেছে।

আপনারা যাননি কেন?

তুমি খুব বেশি পরিশ্রান্ত ছিলে। সকাল আটটায় আমি তোমাকে জাগাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু গভীর নিদ্রামগ্ন ছিলে। সেই মেয়েরা সামনের গ্রামে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা গিয়ে তাদের সাথে মিলবো। তুমি উঠে পড়ো।

ডাক্তার সাহেব, আপনি আমার ঘোড়া নিয়ে যান।

ভাইজান, আপনি আমাদের সংগে যাবেন না?

না রাহাত, আমি ওদেরকে রেখে চলে যেতে পারি না।

আমিও যেতে চাই না সেলিম! আমি এদের জন্য সওয়ারির ব্যবস্থা করে দিয়ে ফিরে আসবো।

এ জায়গা আপনার জন্য নয় ডাক্তার সাহেব! এতক্ষণে লাহোর ও অন্যান্য শহরে হাজার হাজার জখমী পৌঁছে গেছে। আপনার জন্য সেখানে অনেক কাজ। এখানে আমাদের বন্দুকের প্রয়োজন। এখানে লোকদের নদী পার করাবার জন্য আমাদের বেশি বেশি নৌকা দরকার। পশ্চিম পাঞ্জাবের নেতা ও মন্ত্রীদের সাথে সাক্ষাত করে যদি আপনি এ ব্যাপারে কোনো বন্দোবস্ত করতে পারেন তাহলে অনেক বড় কাজ হবে। হিন্দুস্তানী সেনাদল ও শিখদের বাহিনী আজ নয়তো কাল হামলা করবেই, এতে সন্দেহ নেই। আমরা যদি দুটো মেশিন গান এবং একদল সিপাহী পেয়ে যেতাম তাহলে, এই ক্যাম্পটির হেফাজত করতে পারতাম। নেতাদের একথাও বলুন, রাভীর পুলের ওপর সেনাবাহিনী মোতায়েন করা দরকার। পাকিস্তানের সীমান্তে ডোগরা ও শিখ সিপাহীদের দ্বারা মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা হচ্ছে।

আমি চেষ্টা করবো। তবে আমার বিশ্বাস পশ্চিম পাঞ্জাবের নেতারা এখন বক্তৃতা বিবৃতি নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। এখন পর্যন্ত আল্লাহ জানেন পূর্ব পাঞ্জাব থেকে কি পরিমাণ শরনার্থী সেখানে পৌঁছে গেছে। তাদের জন্যও যদি সুব্যবস্থা করতে পারতো তাহলেও একটা বড় কাজ হতো।

আপনি। সেনাবাহিনীর মুসলমান অফিসারদের সাথেও সাক্ষাত করুন। তাদেরকে বলুন, বাউণ্ডারী ফোর্সের হিন্দু ও শিখ সৈন্যরা আকাল সেনা ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের অগ্রসেনার কাজ করে যাচ্ছে।

ডাক্তার বললেন, বাউণ্ডারী ফোর্স গঠনকালে এদিকে পুরোপুরি নজর রাখা হয়েছিল যাতে মুসলমান সিপাহীদল মাউন্ট ব্যাটেন, র‍্যাডক্লিফ, প্যাটেল ও তারা সিংয়ের প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। কয়েকদিনের মধ্যে সম্ভবত বেলুচ রেজিমেন্টকেও পূর্ব পাঞ্জাব থেকে অন্যত্র পাঠানো হবে।

ডাক্তার সাহেব, এ তুফান পূর্ব পাঞ্জাবের পর এখন কাশ্মীরের দিকে ধাবিত হবে। প্যাটেল ও তারা সিংয়ের নেকড়েদের জন্য কাশ্মীরের পথ পরিষ্কার করে দেয়া ছাড়া পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের ব্যাপক গণহত্যার দ্বিতীয় আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

ইসমত ডাক্তারের হাত টেনে ধরে নিজের দিকে আকৃষ্ট করলো। তিনি একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, সেলিম! আমি জানি তোমার জবাব দিতে কষ্ট হবে কিন্তু জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারছি না। তুমি নিজের গ্রাম থেকে কবে রওনা হয়েছো এবং খান্দানের অন্য লোকজন কোথায়?

সেলিম এক মুহূর্তের জন্য নিরবে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রইলো। ডাক্তার আবার বললেন, তুমি ইসমত ও রাহাতের প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেছিলে। আর আমিও অন্যদের সামনে জিজ্ঞেস করার সাহস করিনি। তুমি ইসমতের মায়ের লাশ দেখে এসেছো। শিখরা সবকিছুই করতে পারে। সেলিম, যা কিছু হয়েছে আমাকে বলো।

আপনি এক ব্যক্তির বিবরণ জানতে চাচ্ছেন। এখন আমি আর এক ব্যক্তি নই। এক কওম। আমাকে কওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। আজ কওমের বিবরণের শিরোনাম হচ্ছে খুনের দরিয়া। আর এটি আমার বিবরণও। ডাক্তার সাহেব। যদি আমার কাছে কোনো জবাব থাকতো তাহলে আমি খামুশ থাকছি কেন?

সেলিমের চোখে অশ্রু বিন্দু ফুটে উঠছিল। সে মুখ ফিরিয়ে জামার আস্তিনে চেহারা ঢেকে ফেললো।

ডাক্তার সেলিমকে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, অশ্রু ঝরতে দাও বেটা! মন হালকা হয়ে যাবে।

আমার মনে কেবল আগুন। আমি একটা জ্বলন্ত চিতা। বলতে বলতে সেলিম ডাক্তার থেকে আলাদা হয়ে একদিকে বসে পড়লো।

ইসমত কাঁদতে কাঁদতে বললো, আপনার আল্লাহর দোহাই আমাদের বলুন তারা কোথায়? কেমন আছে? আপনার দাদী, আপনার মা, জুবাইদা এবং খান্দানের অন্য মেয়েরা। আপনার আব্বাজান, আপনার চাচা, চাচীরা, দাদাজান এবং ইউসুফ......?

সেলিম নিরবে তার দিকে তাকিয়েছিল। ইসমত ডুকরে কাঁদছিল। সেলিম নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করলো। ছাইয়ের ছোট পুঁটলিটি নিয়ে ইসমতের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'আমি নিজের সাথে তাদের একটি নিশানী নিয়ে এসেছি। এই ছাইয়ের মধ্যে তারা জীবন্ত ঘুমিয়ে আছে। এটা তোমার কাছে রেখে দাও।'

তারা তিনজন হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। শেষে ডাক্তার বললো, তাদের একজনও বেঁচে নেই?

আমি ও মজিদ ছাড়া আর কেউ নেই।

তোমার আব্বাজান......?

তিনি ছুটি নিয়ে চলে আসছিলেন। ট্যাক্সি থেকে নামতেই তাকে শহীদ করে দেয়া হয়।

মজিদ কোথায়?

সে জখমী ছিল। গতকালই আমি তাকে আমাদের গ্রামের একজনের সাথে নারোয়াল পাঠিয়ে দিয়েছি।

ইসমত কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, আমিনা সম্ভবত তার শ্বশুর বাড়িতে আছে।

হ্যাঁ, সে সেখানেই আছে।

তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে সেলিম সংক্ষেপে নিজের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো।

এগারোটায় সে তাদেরকে বিদায় জানালো। সেলিম ডাক্তারকে নিজের ঘোড়া দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তিনি বললেন, না, তোমার এর আমার চেয়ে বেশি প্রয়োজন। আমি নারোয়াল পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারবো। সেখানে আমার এক বন্ধুর ট্যাক্সি আছে। তিনি আমাদের লাহোরে রেখে আসবেন।

বিদায়ের সময় ডাক্তার বললেন, বেটা! এ সময় আমি তোমাকে কোনো নসিহত করতে পারি না। তবে তুমি নিজের প্রতি নজর রেখো। তুমি জাতিকে যতোটা ভালোবাসো জাতিরও তোমার জীবনের প্রয়োজন রয়েছে ঠিক ততোটাই। আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ।

রাহাত কাঁদতে কাঁদতে সেলিমকে জড়িয়ে ধরলো। 'ভাইজান! ওয়াদা করুন আপনি জলদি ফিরবেন।'

সেলিম তার মাথায় হাত রেখে বললো, রাহাত আমার কাজ অনেক দীর্ঘ।

ইসমত বেদানার্ত দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকিয়েছিল। তার বাকরুদ্ধ ছিল, চোখের অশ্রুও শুকিয়ে গিয়েছিল। সে এমন এক বিশ্বের মুখোমুখি বসেছিল যেখানে লাভ ও ক্ষতির অনুভূতি হয়। সেলিমের কণ্ঠ এখনো তার কানে বাজছিল ঃ এখন আমি আর এক ব্যক্তি নই, এক কওম।

ডাক্তার অনুচ্চস্বরে বললো, চলো ইসমত।

বাপের সাথে কয়েক কদম হাঁটার পর ইসমত পেছন ফিরে তাকালো। সেলিম ও তার দৃষ্টির মধ্যে অশ্রুর পর্দা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিল।

আচানক সেলিমের মনে কোনো চিন্তার উদয় হলো। সে দ্রুত পকেটে হাত ঢোকালো। হাতে একটা আংটি বের হয়ে এলো। 'থামুন!' তারা থেমে গেলো। সেলিম ইসমতের দিকে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। 'এটা নাও। এ আংটি আব্বাজান তোমার জন্য তৈরি করে এনেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে এটি আমাকে দিয়ে যান।'

ইসমত বাপের দিকে তাকালো। তার ইংগিত পেয়ে কম্পিত হাতে আংটিটি নিল।

সেলিম দ্বিতীয় হাতটি ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে ধরলো। 'ডাক্তার সাহেব এখানে কয়েকটা পুরাতন নোট আছে। সম্ভবত পথে আপনাদের দরকার হতে পারে।

না বেটা, এগুলি তোমার সাথে রাখো। পথে আমি সবকিছু পেয়ে যাবো।

আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ বলে সেলিম পেছন ফিরলো। ইসমত কিছুক্ষণ পর্যন্ত নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো। মাঝি এক নৌকা থেকে সওয়ারী নামিয়ে নৌকা ফিরছিল এমন সময় সেলিম তাকে হাতের ইশারায় থামালো এবং ঘোড়ার লাগাম ধরে নৌকায় সওয়ার হয়ে গেলো।

ডাক্তার বললেন, চলো বেটি!

ইসমত কাঁদতে কাঁদতে বাপকে জড়িয়ে ধরলো। ডাক্তার তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, বেটি! হিম্মত করো। সে একজন মুজাহিদ।

পূর্ব পাঞ্জাবে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার সয়লাব ছড়িয়ে পড়ছিল। মুসলমানরা এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবার জন্য তৈরি ছিল না। হিন্দু ফ্যাসিবাদের ক্রমবিকাশ এবং বিভাগ পূর্ব রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ ও আকাল সেনার তৎপরতার প্রেক্ষিতে একথা বলা অসত্য হবে না যে, মুসলিম জনতার মতো তাদের নেতৃবর্গ ও সচেতন গোষ্ঠীও কোনো প্রকার বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শেষ সময় পর্যন্তও তারা দুনিয়ার সামনে নিজেদেরকে শান্তিপ্রিয় আপোশমুখী প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে যখন এ দলগুলি সংগঠিত ও অস্ত্রসজ্জিত হচ্ছিল জাতির নেতৃবর্গের সমস্ত কর্মতৎপরতা তখন লোক দেখানো বক্তৃতা বিবৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শেষ সময় পর্যন্ত তারা নিজেদেরকে এভাবে প্রতারিত করে চলছিল যে, দেশ বিভাগের নীতি মেনে নেবার পর হিন্দুস্তান সরকার মুসলিম সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে নিজের দায়িত্ব অনুভব করবে। এটা একটা আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই

ছিল না। তারপর যখন তারা দেখলো, মাউন্ট ব্যাটেন নিজেই নেহরু প্যাটেলের নৌকায় সওয়ার হয়ে গেছে তখন এ আত্মপ্রতারণা তাদের জন্য একটি অক্ষমতা হয়ে দাঁড়ালো। ১৫ আগস্টের পরে শত্রুর তলোয়ার নতুন ভংগিমায় কোশমুক্ত হলো। পাঞ্জাবের নেতারা দেখলো, যে হাত প্রতিরক্ষা করতে পারে তাতে কোনো অস্ত্র নেই। পাকিস্তানের ফউজ আছে দেশের বাইরে। পাকিস্তানের অস্ত্র হিন্দুস্তানে পড়ে আছে। মাউন্ট ব্যাটেনের হিন্দু তোষন নীতি এবং র‍্যাডক্লিফের বিশ্বাসঘাতকতা বর্বরতার সয়লাবের সামনে কোনো একটা বাঁধও অক্ষত রাখেনি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে তখনো অর্ধেকের বেশি অমুসলিম সৈন্য ছিল।

১৫ আগস্টের পূর্বে পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলিম জনসাধারণ শিখ জনতা ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের পরিকল্পিত হামলার মোকাবিলা করছিল। কোনো কোনো এলাকায় অমুসলিম ফউজ ও পুলিশের পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়নি। অমৃতসরে ফউজ ও পুলিশের সম্মিলিত পরিকল্পিত হামলা মুসলমানদের মধ্যে হাতাশা ছড়িয়ে দিয়েছিল। তবুও যে সব যুবক বিগত ছয় মাস থেকে আকাল সেনা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ এবং জনতার ছদ্মবেশে শিখ সেনাদের আক্রমনের সাহসী মোকাবিলা করে আসছিল তারা শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করার ফায়সালা করেছিল। কিন্তু ১৫ আগস্টের পর পূর্ব পাঞ্জাব সরকার, অমুসলিম ফউজ ও জনতা এক কাতারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একজন অমুসলিম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে কর্মকর্তা থেকে নিয়ে সেবক সংঘ ও আকাল সেনার একজন সাধারণ স্বেচ্ছাসেবক পর্যন্ত সবারই একই প্রোগ্রাম ছিল। আর তা ছিল ব্যাপক মুসলিম নিধন।

ইতিপূর্বে পূর্বপাঞ্জাবের যে মুসলিম নেতারা বিবৃতি ও গলাবাজীর প্রতিযোগিতা চালাচ্ছিল তারা নিজেদের পরিবারবর্গ সহ পশ্চিম পাঞ্জাবে পৌঁছে গিয়েছিল। মুসলিম জনতার লুণ্ঠিত, বিপর্যস্ত ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত সর্বশান্ত কাফেলার কোনো খবরই তারা রাখতেন না। মুসলিম জনতার অবস্থা ছিল ঠিক সেই ভেড়ার পালের মতো যাদেরকে চারদিক থেকে আচানক নেকড়েরা ঘেরাও করে ফেলেছিল।

শহর ও পল্লীর যে সমস্ত মুসলমান সেনাবাহিনী ও পুলিশের গুলী থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতো তাদের সড়ক, পাকদণ্ডী, নদী ও খালের পুলের ওপর শিখ ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের সশস্ত্র দলের মুখোমুখি হতে হচ্ছিল। মুসলমানদের প্রত্যেক জনবসতির প্রভাবশালী লোকদের বিশেষ করে পাকিস্তান সমর্থকদের বাছাই করে হত্যা করা হচ্ছিল।

আশ্রয় প্রার্থীদের গাড়ি পাকিস্তান পৌঁছে যেতো লাশের স্তূপ নিয়ে। পূর্ব পাঞ্জাব রেলওয়ের অমুসলিম কর্মচারীরা হামলাকারীদের আগাম খবর দিয়ে দিতো মুসলিম শরণার্থীদের কোন গাড়ি কোন সময় আসছে। আর তারা গাড়ি আক্রমণ করার জন্য পথের যে কোনো স্টেশনে সমবেত হয়ে যেতো। পুরুষদের হত্যা করতো এবং মেয়েদের ছিনিয়ে নিয়ে যেতো। কোনো স্টেশনে হামলাকারীদের আসতে দেরী হলে স্টেশনের কর্মচারীরা গাড়ি থামিয়ে রাখতো। যেসব ডোগরা, শিখ ও হিন্দু সিপাহী

গাড়ির হেফাজতে নিযুক্ত থাকতো তারাও হত্যাকারীদের সাথে শামিল হয়ে যেতো। একমাত্র মুসলমান সিপাহীদের হেফাজতে পরিচালিত গাড়িই শরণার্থীদের নিয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছুতে পারতো।

দূর দূরান্তের পল্লীগুলির ঘটনা ছিল আরো ভয়াবহ ও বিষাদময়। একটি পল্লীতে হামলা হলে লোকেরা অন্য পল্লী নিরাপদ মনে করে সেদিকে রওনা হয়ে যেতো। পথে সেই পল্লীর লোকেরা বলতো সেখানেও হামলা হয়েছে তখন তারা তাদের সাথে অন্য এক পল্লীর উদ্দেশ্যে চলতো। এভাবে তারা কখনো উত্তরে, কখনো দক্ষিণে আবার কখনো পূবে ও পশ্চিমে চলতো। এরপরও তাদের অনেকেই জানতো না পাকিস্তান কোন দিকে এবং কোন পথে যেতে হবে। তারা অসংখ্য ছোট ছোট কারবালার মধ্যে আটকে পড়ে গিয়েছিল। চারদিকে আগুন ও খুনের দরিয়া দেখে হতবিহ্বল লোকদের ছোট ছোট দলগুলি এক জায়গায় সমবেত হয়ে যেতো। তারপর একটা কাফেলায় পরিণত হয়ে নিকটতম শহরের দিকে এগিয়ে চলতো। পথে পদে পদে তাদের ওপর হামলা হতো। অসংখ্য লাশ পেছনে রেখে তারা শহরে প্রবেশ করতো। সেখানে মুসলমানদের মহল্লায় স্তূপীকৃত লাশ ও পুড়িয়ে দেয়া ঘরবাড়ির ছাই ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়তো না। তাদের স্বাগত জানাবার জন্য সেখানে আকাল সেনাদের কৃপাণ এবং সেনাবাহিনী ও পুলিশের সংগীন আগে থেকেই তৈরি থাকতো।

জালিন্ধর, হোশিয়ারপুর, ফিরোজপুর ও অমৃতসর ইত্যাদি জেলাগুলির মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাদের সংখ্যাগুরু মুসলিম অধ্যুসিত তহশীলগুলি পাকিস্তানে পড়বে। কাজেই বিপদের সময় তারা অমুসলিম সংখ্যাগুরু হিন্দুস্থানী এলাকা ত্যাগ করে ঐসব এলাকায় আশ্রয় নিতে পারবে। কিন্তু র‍্যাডক্লিফের বাঁটোয়ারা তাদেরকে হতভম্ব করে দিয়েছিল।

গুরুদাসপুর জেলার ট্রাজেডি কেবলমাত্র সেখানকার মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আরো তিনটি জেলার জন্যও এটি মৃত্যুর পরোয়ানা বহন করে এনেছিল। কাংগড়া, হোশিয়ারপুর ও অমৃতসর জেলার সীমানার গুরুদাসপুরের সাথে মিশতো। যদি কাশ্মীরের সাথে সম্পর্কিত নেহরু ও মাউন্ট ব্যাটেনের অভিলাশের কারণে এ মুসলিম সংখ্যাগুরু জেলাটি হিন্দুস্তানকে না দেয়া হতো তাহলে হোশিয়ারপুরের মুসলমানরা বিয়াস (বিপাশা) অতিক্রম করে এখানে আশ্রয় নিতে পারতো। অমৃতসরের অর্ধেক মুসলিম অধিবাসী লাহোরের তুলনায় এখানে অতি সহজে পৌঁছে যেতে পারতো। কাংগড়া জেলা ও চম্বা রাজ্যের সুদূরবর্তী এলাকার ছড়িয়ে থাকা মুসলমানরা বিপদকালে গুরুদাসপুরের সীমান্তে প্রবেশ করার কথা ভেবে রেখেছিল। কিন্তু গুরুদাসপুর জেলা যখন নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার লীলাভূমিতে পরিণত হয়ে গেলো তখন এইসব লোক এমন একটি অন্ধকার গুহায় আটকে গেলো যেখান থেকে বের হবার কোনো পথই ছিল না।

পাকিস্তানের খবরের কাগজগুলিতে প্রতিদিন এই ধরনের খবর ছাপা হচ্ছিল ঃ 'আজ অমুসলিম সেনাবাহিনী ও পুলিশ সম্মিলিতভাবে পূর্ব পাঞ্জাবের ওমুক শহরে হামলা করেছে।' 'আজ শিখদের সশস্ত্র দাংগাড়ে দল এবং আম জনতার ছদ্মাবরণে পূর্ব পাঞ্জাবের করদ রাজ্যগুলির সিপাহীরা ওমুক এলাকার মুসলমানদের পাইকারী হারে হত্যা শুরু করেছে।' 'ওমুক সড়ক ও ওমুক পুলের ওপর শরণার্থীদের কাফেলা আক্রান্ত হয়েছে। শিখেরা এতজনকে হত্যা করেছে এবং এত সংখ্যক মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।' 'ওমুক ওমুক স্টেশানে শরণার্থীদের ট্রেনের ওপর হামলা করা হয়েছে।' পশ্চিম পাঞ্জাব সরকার প্রতিবাদ করেছে এবং পূর্ব পাঞ্জাবের নেতারা সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।' 'ফিরোজপুরে ব্যাপক গণহত্যা চলছে।' 'মিয়ানি পাঠানার মুসলমানরা এতদিন থেকে হামলাকারীদের মোকাবিলা করছে।' মিয়ানি পাঠানার ওপর হিন্দুস্তানী ফউজ ট্যাংক ও মেশিনগানের সাহায্যে আক্রমণ চালিয়েছে।' 'জালিন্ধরে ফউজ মুসলমানদের মহল্লায় কারফিউ জারী করেছে।' 'ফউজ ও পুলিশের সিপাহীরা মুসলমানদের ঘরদোরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তারপর যখন তারা ঘরের বাইরে বের হয়েছে, তাদের ওপর গুলী বর্ষণ করা হয়েছে। ওমুক তারিখে তাদের হুকুম দেয়া হয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘর খালি করে দিতে হবে অন্যথায় তাদেরকে গুলী করে হত্যা করা হবে। তাদের সাথে ওয়াদা করা হয় তাদেরকে নিরাপদে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তারপর রেলস্টেশান এবং শরণার্থী শিবির পর্যন্ত তাদের ওপর হামলা করা হয়েছে। এত সংখ্যক পুরুষ, এত সংখ্যক নারী ও এত সংখ্যক শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। এত সংখ্যক মেয়েদেরকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।' 'আজ অমুক শহরে শিখেরা মুসলমান মেয়েদেরকে নাংগা করে তাদের মিছিল বের করেছে। সরকারী কর্মকর্তা ও পুলিশরা দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল।' 'আজ ওমুক স্টেশান ও অমুক ক্যাম্পে পূর্ব পাঞ্জাবের শরণার্থীদের তল্লাশী নেয়া হয়েছে। লোকদের পরনের কাপড় চোপড় খুলে নেয়া হয়েছে।' 'পশ্চিম পাঞ্জাব সরকার আবার প্রতিবাদ জানিয়েছে।'

'শরণার্থীরা যে রেশন পায় তাতে বিষ মিশিয়ে দেয়া হয়। ওমুক ওমুক ক্যাম্পের আশেপাশে সমস্ত কূয়ার পানিতে বিশ মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'আজ হিন্দুস্তানের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পূর্ব পাঞ্জাবের ওমুক ওমুক শহর সফর করার পর প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেছেন, পরিস্থিতির ওপর সরকারের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অরাজকতা সৃষ্টি, লুটপাট ও হত্যার অনুমতি কাউক দেয়া হবে না।' 'ওমুক মন্ত্রী ও ওমুক নেতা বলেছেন, অবস্থা শান্ত।' 'আজ প্যাটেল সাহেব ওমুক শহরে পৌছে শিখ ও হিন্দুদের সমাবেশে পাকিস্তানকে হুমকি দিয়েছে।' 'আজ পশ্চিম পাঞ্জাবের ওমুক ওমুক নেতা জোর প্রতিবাদ জানিয়েছে।'

মানবতার দুশমনরা জানতো পাকিস্তান এখন কেবল প্রতিবাদ ও আবেদন করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। উভয় পক্ষের প্রচেষ্টায় শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। সাম্প্রদায়িক দাংগার নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হলো। একটি যুক্ত বিবৃতিও জারী হলো। পশ্চিম পাঞ্জাবের নেতারা নিশ্চিন্ত হয়ে দেশে ফিরে এলো। কিন্তু পরদিন আবার খবর আসতে লাগলো, 'এবার ওমুক শহরের ওপর হামলা হয়েছে।' 'ওমুক জায়গায় পাকিস্তানের সরকারী কর্মকর্তাদের গাড়ি থামিয়ে ব্যাপক গণহত্যা করা হয়েছে।' 'ওমুক সড়কের ওপর এত হাজার লোকের একটি কাফেলাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে।'

শান্তি সম্মেলন হতে থাকলো। যৌথ বিবৃতি জারীর কাজ চলতে থাকলো। এই সাথে পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করার কাজও চলতে থাকলো। ভারতের সুপুত্ররা একদিকে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার ইতিহাসে একটা নতুন ও ব্যতিক্রমী অধ্যায়ের সূচনা করছিল আবার অন্যদিকে ধোকা প্রতারণা, ও মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা শিল্পেও দুনিয়ার সকল জাতির মধ্যে শীর্ষস্থানে অবস্থান করতে চলছিল। পূর্ব পাঞ্জাবে নেহরু হুকুমাতের নৌকা মুসলমানদের খুনের ওপর ভাসছিল। কিন্তু তারা পশ্চিম পাঞ্জাবের সরিষার দানাকে পাহাড় প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। অন্যদিকে পশ্চিম পাঞ্জাবের নেতাদের সরলতা এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, তারা দুনিয়ার সামনে নিজেদের শান্তিপ্রিয়তার প্রমাণ দেবার জন্য যে পাপ তারা করেনি তার বোঝাও নিজেদের মাথায় রাখতে তৈরি ছিল। এমন কি যখন লাহোরে শিখ ও গুর্খা ফউজ মোতায়েন ছিল এবং তারা নির্দ্বিধায় মুসলমানদের ওপর গুলী চালাচ্ছিল তখন এই মুসলমান নেতারা পেরেশান হয়ে লোকদের সামনে গিয়ে তাদেরকে বলতো, 'তোমরা শান্তি বজায় রাখো।' পশ্চিম পাঞ্জাবের নেতারা গাড়িতে বসে কোনো খবরের অপেক্ষা করতো। যদি কোথাও থেকে দুএকটা দাংগা ফাসাদের খবর আসতো অমনি সংগে সংগেই তারা অর্ধরাতের সময় হলেও সেখানে রওনা হয়ে যেতো। পরদিন সকালের কাগজে তাদের বক্তৃতা বিবৃতি বড় বড় হরফে ছাপা হয়ে যেতো। তারা নিজেদের কার্যক্রমের মাধ্যমে নেকড়েদেরকে মানবতার শিক্ষা দিতে চাইতো। কিন্তু এই সদিচ্ছা ও শান্তিপ্রিয়তার প্রকাশনী কেবল হিন্দুস্তানের এই প্রপাগাণ্ডাকেই শক্তিশালী করতো যে, পূর্ব পাঞ্জাবে যা কিছু হচ্ছে সবই পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

পূর্ব পাঞ্জাবের সমস্ত জেলায় আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। লুধিয়ানা, রোহতক, কর্ণাল, হিসার ও গুরগাঁওয়ের মুসলমানদের ধ্বংস কাহিনী অন্য জেলার মুসলমানদের থেকে আলাদা ছিল না। প্রত্যেক নগর ও পল্লীর লুণ্ঠিত ও ভুখা-নাংগা মুসলমানরা প্রতি পদক্ষেপে লাশের স্তূপ পেছনে ফেলে পাকিস্তানের দিকে এগিয়ে চলছিল। স্ত্রী স্বামীর এবং ভাই বোনের খবর জানতো না। দুগ্ধপোষ্য

শিশুকে ফেলে রেখে মা ভাগছিল এবং হিংস্রতা, বর্বরতা ও অশালীনতার তুফান তার পেছনে ধাওয়া করছিল। পূর্ব পাঞ্জাব ছিল একটি অরণ্য এবং সে অরণ্যে হিংস্র নেকড়ের পূর্ণ দাপট ও অবাধ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পূর্ব পাঞ্জাবের করদ রাজ্যগুলি মুসলিম গণহত্যায় পরস্পর প্রতিযোগিতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করছিল। কাপুরথলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তাই সেখানে কয়েকমাস আগে থেকেই শিখ ও আর এস. এস কর্মীদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। ভরতপুর ও ইন্দোরে আর এস. এস-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল মেওয়াতী মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলার পর রাহতক, হিসার ও গুরগাঁও জেলায় প্রবেশ করেছিল। নাভ-এর শাসকও নিজের সামর্থ অনুযায়ী শিখ ও আকালীদেরকে ফউজ, অস্ত্রশস্ত্র ও বারুদ সরবরাহ করছিল।

পাতিয়ালার মহারাজা দীর্ঘকাল থেকে পূর্ব পাঞ্জাবে গণহত্যার চক্রান্তে শরীক ছিল। ১৫ আগস্টের কয়েকমাস আগেই তিনি নিজের সমস্ত উপায়-উপকরণ পাঞ্জাবের আকাল সেনাকে অস্ত্র সজ্জিত করার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। পাতিয়ালার শিখদেরকে অস্ত্র সজ্জিত করে সামরিক প্রশিক্ষণ দেবার পর গোপনে পূর্ব পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হচ্ছিল। রাজার নিজের সেনাবাহিনীর লোকেরা সাধারণ পোশাকে শিখ দলগুলির নেতৃত্ব দিচ্ছিল। তবুও পাতিয়ালার মুসলমান প্রজারা শেষ সময় পর্যন্ত আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত থাকে। গণহত্যার কেবলমাত্র কয়েক দিন আগে পাতিয়ালা শহরে হিন্দু, শিখ ও মুসলমানদের একটি যুগ্ম সম্মেলন আহবান করে নেতাদের থেকে হলফ নেয়া হয় যে, তারা সর্বাবস্থায় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখবে। মুসলমানদেরকে আরো বেশি নিশ্চিন্ত করার জন্য রাজা সাহেব নিজেই ঘোষণা করেন, শান্তি ও নিরাপত্তা বিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তি যে কোনো ধর্ম ও জাতির সাথে সম্পর্কিত হোক না কেন সরকার তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের ফউজ ও পুলিশ শান্তি ও আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত। তাদেরকে যে কোনো মূল্যে শান্তি রক্ষা করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

পাতিয়ালার মহারাজার অভয়বানী ও শান্তি রক্ষার দৃঢ় অংগীকারে প্রতারিত হয়ে কেবল পাতিয়ালা রাজ্যেরই নয় বরং সীমান্তের আশেপাশের মুসলমানরাও নিরাপদ মনে করে নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পাতিয়ালায় এসে আশ্রয় নিতে শুরু করলো। এরপর একটি পরিকল্পিত প্রোগ্রামের ভিত্তিতে মুসলিম গণহত্যা শুরু হলো। এরপর রাজার সেনাদল সীমান্ত এলাকা মুসলমান শূন্য করলো, যাতে বাইরের জগতের

সাথে মুসলমানদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখন শিকার চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে গিয়েছিল। প্রায় দশ দিন ধরে রাজার পুলিশ ও ফউজ এবং শিখদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দল মুসলিম গণহত্যা চালিয়ে যেতে থাকলো। রাজা ও তার প্রশাসকবৃন্দ প্রায় প্রতিদিন এই মর্মে বিবৃতি দিতে থাকেন 'রাজ্যে কোনো প্রকার অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টির অনুমতি দেয়া হবে না। মুসলমানদের জান-মাল-ইজ্জতের জন্য কোনো প্রকার আশংকার কারণ নেই।'

এরপর এলো দিল্লীর পালা। এ ঐতিহাসিক শহরটি ছিল অহিংসার পতাকাবাহীদের রাজধানী। এখানে বরমালা মন্দির ও ভাংগী কলোনীতে মহাত্মা গান্ধী তার পূজারীদেরকে অহিংসার পাঠ দিতেন। এখানে ছিল ভারতের ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের আবাসস্থল। কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় বাউণ্ডারী ফোর্সের উপস্থিতিতে কোনো প্রকার গোলযোগের আশংকা নেই। এখানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দুস্তানের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সরদার বলদেব সিং ও স্বদেশ মন্ত্রী সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল। প্রেস, রেডিও এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সরকার বারবার ঘোষণা দিয়ে এসেছে, দিল্লীতে কোনো প্রকার গোলযোগ ও দাংগা হাংগামার অনুমতি দেয়া হবে না। বাইরে থেকে যেসব শিখ ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের স্বেচ্ছা সেবক রাজধানীতে জমায়েত হচ্ছিল তারা ছিল অস্ত্র সজ্জিত। ফলে শান্তিপ্রিয় সরকার দাংগার আশংকা করে জনসাধারণের মধ্যে তল্লাশী অভিযান শুরু করলো। শিখ ও হিন্দুদের তল্লাশীর দরকার নেই। কেবল মুসলমানদের তল্লাশী দরকার। শান্তিপ্রিয়দের সরকার। কাজেই শিখ ও হিন্দুদের স্টেনগান, টমিগান ও রাইফেলের মোকাবিলায় মুসলমানদের ঘরে পেন্সিল কাটা চাকু, সবজি কাটার ছুরি এবং জ্বালানী কাঠ রাখাও নিরাপদ নয়। সরকারের হুকুমে এসব ভয়ংকর জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হলো। তারপর 'জয় হিন্দ' ও 'সতশ্রী আকাল' এর শ্লোগান উচ্চকিত হলো। অল ইণ্ডিয়া রেডিও ঘোষণা করলো, আজ শহরে বিচ্ছিন্ন দুএকটা ঘটনা ঘটেছে। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। আজ শহরে কারফিউ লাগানো হয়েছে। আজ একজায়গায় দাংগা শুরু হতে যাচ্ছিল কিন্তু পণ্ডিত নেহরু যথাসময় পৌঁছে জনতাকে ছত্রভংগ করে দিয়েছে। আজ পণ্ডিত নেহরু বিদেশী সাংবাদিক ও সংবাদ সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, তারা ঘটনাকে বাড়িয়ে চাড়িয়ে বর্ণনা করেছে। এ ধরনের কার্যক্রমের অনুমতি কখনোই দেয়া যাবে না।

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন এখনো ভাইসরয় ছিলেন। পণ্ডিত নেহরু এখনো ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু দিল্লীতে ছিল গুণ্ডাদের রাজত্ব। সম্ভবত এ সময় তিনি প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে এই খুনের তুফান প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং ইবলিস তার কানে কানে বলছিল 'আমি এ দুনিয়ায় বহু মানুষের ছদ্মবেশে এসেছি। আদমের বাগানে

কয়েকবার আগুন লাগিয়েছি। সমরকন্দ ও বুখারায় চেংগিজ খানের রূপ ধরে নাযিল হয়েছি। বাগদাদে এসেছি আমি হালাকু খানের বেশে। কিন্তু তুই আমার যুগশ্রেষ্ঠ কীর্তি।'

সংহিস দেবীর পূজারীরা যখন দিল্লীতে তার কাজ শেষ করে ফেললো তখন অহিংসার দেবতা সেখানে পৌঁছে গেলো।

পাকিস্তান এখন লখো লাখো ভুখা নাংগা এবং সহায় সম্বলহীন লোকদের আশ্রয় স্থল এবং হাজার হাজার জখমীদের হাসপাতালে পরিণত হয়েছিল। পূর্ব পাঞ্জাবের নগর পল্লীগুলি এখন মুসলমান শূন্য হয়ে গিয়েছিল। হামলাকারীদের সামনে এখন ছিল আশ্রয় শিবির অথবা কাফেলা। বাউণ্ডারী ফোর্স ভেঙে দেয়া হয়েছিল। মুসলিম গণহত্যার পথে যে সামান্যতম বাধা ছিল তাও অপসারিত হয়েছিল। দিল্লী থেকে ওয়াগাহ পর্যন্ত সারাটা পথে শরণার্থী কাফেলা পিঁপড়ের সারির মতো চলছিল। কোনো কোনো দিন কাফেলা চলতো মাইলের পর মাইল। লাহোরের রাজপথ, গলিপথ, স্টেশান ও ক্যাম্পগুলিতে তিল ধারণের জায়গাও ছিল না।

পথে মাইলের পর মাইল চলার পর ক্ষুধায় ক্লান্তিতে অবসন্ন লোকেরা ওয়াগাহে পৌঁছে পাকিস্তানের সীমানায় পা রেখেই 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি উচ্চারণ করে সটান জমিনের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। এটা ছিল এমন একটি মনজিল যেখানে পৌঁছার জন্য তারা নিজেদের সমস্ত পুঁজি উৎসর্গ করে দিয়েছিল। সরকার ছিল পেরেশান। সরকারী কর্মকর্তারা আতংকগ্রস্ত। প্রতিদিন যেসব শরণার্থী কাফেলা লাহোরে আসছিল লাহোরে তাদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। কিন্তু লাহোরের অধিবাসীদের ত্যাগ, কুরবানী ও খুলুসিয়াত একথা প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, লাহোর এ বোঝা উঠাতে সক্ষম। লাহোর রেডিও থেকে ঘোষণা হচ্ছিল– আজ এতটার সময় এতজন মুহাজিরের কাফেলা লাহোরে আসছে। তাদের খাবারের প্রয়োজন। আর সাথে সাথেই লোকেরা তাদের মহল্লা ও গলি কুচায় রান্নাবান্না করে তাদের জন্য ডেকচিতে করে খাবার নিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছে যেতো।

অন্যান্য শহরেও ত্যাগী লোকদের কমতি ছিল না। সামষ্টিক বিপদ মুকাবিলার জন্য একটি সামষ্টিক চেতনার জন্ম হয়েছিল। কিন্তু হিন্দুস্তান সরকার যে সয়লাবকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বুনিয়াদ প্রকম্পিত করার জন্য যথেষ্ট মনে করেছিল তাকে রুখে দেয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। এই বিপদের মোকাবিলা করার জন্য একটি শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত সরকারের বিপুল উপায় উপকরণের প্রয়োজন ছিল। অথচ পাকিস্তানের অবস্থা ছিল এমন একটি শিশুর মতো দাঁড়ানো ও হাঁটা শেখার আগেই

যার মাথায় বিরাট একটি বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাকে দৌড়াতে বাধ্য করা হয়েছিল। পশ্চিম পাঞ্জাব সরকারের সামনে কাজ ছিল যত বড় সেই কাজ সম্পাদন করার হাতগুলি ছিল তত অনভিজ্ঞ। আবার অনেক হাত এমনও ছিল যারা ডাংগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মন্ত্রণালয়ের কলম হাতে তুলে নিয়েছিল। অফিস ব্যবস্থাপনা এখনো সেই গদাই লস্করী চালে একদিনের সফর একমাসে সম্পন্ন করতো। বরং বলা যায় একটি পরিকল্পিত স্কীম অনুযায়ী অমুসলিম কর্মচারীদেরকে ঝেঁটিয়ে হিন্দুস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর ফলে অফিস ব্যবস্থাপনা চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। পূর্ব পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তানের অন্যান্য এলাকার সরকারী মুসলিম কর্মচারী যারা এই শূন্যস্থান পূরণ করতে পারতো তাদের বৃহত্তম অংশকে হত্যা করা হয়েছিল এবং বাকি যারা পাকিস্তানে পৌঁছতে সক্ষম হচ্ছিল তাদেরও করুণ দশা ছিল। কারোর স্ত্রী সন্তান নিহত হয়েছিল। কারোর অতি নিকট আত্মীয় নিখোঁজ ছিল এবং তাদের তালাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

পাকিস্তান হাজার বিপদ, হতাশা ও পেরেশানির মুখোমুখি হয়েছিল। দিগন্তে ঘন অন্ধকার তুফান ও ধুলিঝড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু এই ভয়াবহ তুফানের মধ্যেও আলোর একটি মিনার তার ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে চলছিল। সেই আলোর রেখা মৃতপ্রায় হৃদয়গুলিতে ঈমান ও ইয়াকিনের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিল। সে আলোর মিনার ছিল জাতির টলটলায়মান কিশ্তির মাল্লাহ কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি বললেন, 'পাকিস্তানকে এখন কেউ খতম করতে পারবে না। আমরা এই অন্ধকার ও তুফানের বুক চিরে সফলকাম হয়ে বের হবো ইনশাআল্লাহ।'

এখন হিন্দুস্তান থেকে পাকিস্তানের অংশের সেনাবাহিনী চলে আসতে শুরু করেছিল। সেনাবাহিনীর পদার্পণে জাতির মধ্যে নতুন জীবন চেতনা জেগে উঠছিল। এতদিন পর্যন্ত বেলুচ রেজিমেন্টের মুষ্টিমেয় সিপাহীরা যা কিছু করেছিল তার প্রেক্ষিতে জাতি পাকিস্তানী ফউজের কাছ থেকে অনেক বড় কিছুর আশা করছিল। জনগণ তাদের জন্য গর্ব অনুভব করছিল। মেয়েরা শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার অশ্রু দিয়ে তাদের খোশ আমদেদ জানাচ্ছিল।

গান্ধীর অহিংসা ও শান্তিপ্রিয় শাগরিদদের তলোয়ারের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করা যেতে পারতো কেবলমাত্র নিরস্ত্রদের ওপর। প্রতিপক্ষের হাতে অস্ত্র তারা দেখতে চাইতো না। কাজেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকেও তারা তাদের আগের কৌশলের ফাঁদে আটকাবার চেষ্টা করলো। পথে বিভিন্ন স্থানে তাদের স্পেশাল গাড়ি থামানো হলো। তাদের কাছে দাবী করা হলো তোমরা নিজেদের হাতিয়ারগুলি আমাদের হাতে জমা দাও। তোমাদের হেফাজতের জন্য হিন্দুস্তানী ফউজের একটি দল গাড়ির সাথে যাবে। কিন্তু মহাশয়রা জানতে পারলো সাধারণ মানুষ ও সামরিক বাহিনীর লোকের মানসিকতার মধ্যে অনেক তফাৎ। মুসলমান সিপাহী জান দেবার পূর্বে হাতিয়ার দিতে প্রস্তুত হলো না। তাদের সাফ জবাব ঃ আমরা নিজেরা নিজেদের হেফাজত করতে পারবো।

কোথাও কোথাও শিখদল এ গাড়িগুলিকে সাধারণ আশ্রয় প্রার্থীদের গাড়ি মনে করে হামলা করে দিয়েছিল। ফলে তাদের অবস্থা হয়েছিল সেই পাখি শিকারীদের মতো যারা শিকারের লোভে বাঘের গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

রাভীর কিনারে প্রতিদিন আশ্রয় প্রার্থীদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। গুরুদাসপুর জেলা ও অমৃতসর জেলার আজনালা তহসীলের বেশির ভাগ মুসলিম জনবসতি এখন এদিকে আসছিল। ডেরা বাবা নানকের পুল থেকে উপরে ও নিচের দিকে কিছু কিছু দূরত্বে কয়েকটি তাঁবু খাটানো হয়েছিল। কোথাও কোথাও নৌকাগুলি লোকদেরকে নদী পার করার কাজে লিপ্ত ছিল। আবার কোথাও লোকেরা পশুর পাল, গরুর গাড়ির চাকা ও পাটাতন এবং শুকনো খড়-কাঠের গাঁঠরীর সাহায্যে নদী পার হবার চেষ্টা করছিল। এভাবে নদী পার হবার লোকের সংখ্যা সাধারণত ছিল বেশী।

নগর ও পল্লীর এলাকা মুসলমান শূন্য করার পর শিখদের দৃষ্টি এবার পড়লো সড়কে ও রাভীর কিনারে মুসলিম শরণার্থীদের শিবিরের ওপর। লোকদের সামনে ছিল নদী এবং পিছনে আগুন।

বর্ষা মওসুম শেষ হয়ে গিয়েছিল, যখন নদীর দুকুল ছাপিয়ে স্রোত ধারা প্রবল বেগে ছুটে চলতো। কিন্তু আগস্টের শেষ দিনগুলোয় বৃষ্টি হচ্ছিল। কিছুক্ষণের জন্য আকাশ মেঘমুক্ত হলে লোকেরা পরস্পর এই বলে সান্ত্বনা দিতো ঃ 'আর মাত্র দুচার দিনের ব্যাপার। নদীর পানি কমে যাবে এবং আমরা ওপারে পৌঁছে যাবো।' কিন্তু পরদিন আকাশে আবার মেঘের ঘনঘটা দেখে তারা বলতো, 'না, নদীর পানি আর নামবে না। এ কিয়ামতের নিশানী।' অন্ধকার রাতে মুশলধার বৃষ্টির মধ্যে মায়ের বুকের মধ্যে জড়সড় হয়ে শুয়ে শিশুরা কান্নাকাটি করতো। জখমী, ডাইরিয়া, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া ও টাইফয়েডের রোগীরা আর্তচিৎকার করতো। আচানক একজন ডুকরে কেঁদে উঠতো ঃ হায় আল্লাহ! আমি শেষ হয়ে গেলাম। আমার ছেলেটি মারা গেলো। এ কান্না প্রবল হতে হতে আবার ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে আসতো। তখন অন্য একদিক থেকে একজন মাতম করে উঠতো। তারপর আচানক শোরগোল শোনা যেতো ঃ পানি এসে গেছে। নদীর পানি ফুঁসে উঠছে। সয়লাব শুরু হয়ে গেছে। এখান থেকে পালাও। চারদিকে হৈ চৈ শুরু হয়ে যেতো। অনেক লোক নদী থেকে দূরে চলে যাওয়ার পরিবর্তে ভয়ে দিশেহারা হয়ে আরো নদীর দিকে এগিয়ে যেতে থাকতো। ফলে পানির স্রোত তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো। অন্ধকারে লোকেরা নিজেদের সাথি সংগী ও আত্মীয় স্বজনদের আওয়াজ দিতে থাকতো। বৃষ্টি থেমে গেলে আবার লোকদের শোরগোল ধীরে ধীরে কমে

যেতে থাকতো। লোকেরা এখন বিছানার পরিবর্তে কাদা ও পানির মধ্যে বসে আরাম করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

নদীর তীরে সেলিমের প্রত্যেকটি দিন ছিল হাশরের দিন এবং প্রত্যেকটি রাত কিয়ামতের রাত। আমৃত্যু সহযোগিতার অংগীকারাবদ্ধ একটি দল নিয়ে সে শিখদের আক্রমণ ঠেকিয়ে আসছিল। এইদলের আটজন শহীদ হয়ে গিয়েছিল। তিনজনকে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে ওপারে পাঠানো হয়েছিল। আর দুজন ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছিল।

কোনো বিশেষ মোর্চা হেফাজত করা সেলিমের লক্ষ্য ছিল না। ক্যাম্প আক্রান্ত হলে তার সাথিরা সেখানে লড়তো। আশেপাশে কোনো কাফেলার ওপর হামলা হলে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে তাদের হেফাজতের জন্য সেখানে পৌঁছে যেতো। চারবার তারা শিখদের হটিয়ে দিয়েছিল। পঞ্চমবার এসেছিল চূড়ান্ত লড়াই করার জন্য। বিকাল চারটায় শিখদের প্রায় দু'শ ঘোড় সওয়ার ও এক হাজার পদাতিক দল অর্ধ বৃত্তাকারে নদীর দিকে এগিয়ে এলো। হামলাকারীরা ক্যাম্পের চার'শ গজ দূরে থেমে গেলো এবং সেখান থেকে রাইফেলের গুলী বর্ষণ করতে থাকলো। সেলিমের সাথিরা একদিকে কয়েকটি ছ্যাকড়া গাড়ির আড়ে বসে পড়লো। বারুদের কমতির কারণে সেলিম সাথিদেরকে কেবল প্রয়োজনে ফায়ার করার নির্দেশ দিল। এক ঘন্টা গুলী বর্ষণ করার পর 'সত্‌শ্রী আকাল' শ্লোগান দিতে দিতে শিখ দল একজোটে ক্যাম্প আক্রমণ করলো। সামনের দিকে ছিল ঘোড়সওয়ার দল আর তার পিছনে কৃপাণ ও বর্শাধারী শিখেরা। ক্যাম্প ও তাদের মাঝখানে যখন আর মাত্র দেড়'শ গজ দূরত্ব রয়ে গিয়েছিল তখন সেলিম তার সাথিদেরকে ফায়ার করার হুকুম দিল। এক মিনিটের মধ্যেই তারা তিরিশ চল্লিশ জন সওয়ারকে নিহত করলো। কিন্তু আক্রমণকারীরা পলায়ন করার পরিবর্তে আরো সামনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। ক্যাম্পের একদল লোক সরে এসে ছ্যাকড়ার আশে পাশে জমা হয়ে গেলো। মুজাহিদদের পক্ষে ফায়ার করার সামস্যা দেখা দিল। বাধ্য হয়ে তারা ছ্যাকড়ার আড়াল থেকে বের হয়ে তার ওপর উঠে ফায়ার করতে লাগলো। সেলিমের হাঁক ডাক ও চিৎকারে আতংকিত লোকেরা জমিনের ওপর শুয়ে পড়লো। এখন তার সাথিরা ছ্যাকড়ার ওপর রাখা মালপত্রের আড়াল নিয়ে ফায়ার করছিল। কিন্তু ততক্ষণে হামলাকারীরা ক্যাম্পের ওপর চড়াও হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানরা লাঠি ও ডাণ্ডার সাহায্যে তাদের মোকাবিলা করছিল। একদল যুবক ইতিপূর্বে শিখদের সাথে লড়াইয়ের সময় তাদের থেকে কৃপাণ ও বর্শা ছিনিয়ে নিয়েছিল এখন সেগুলি নিয়ে তারা শিখ বাহিনীর সাথে যুঝতে লাগলো। শিখ সওয়ারদের একটি দল ছ্যাকড়াগুলির দিকে এগুলো। কিন্তু অবিশ্রাম গুলী বর্ষণে তারা বিপর্যস্ত ও বিশৃংখল হয়ে পড়লো। হামলাকারী পদাতিক গ্রুপগুলি মুসলমানদের সাথে এমনভাবে হাতাহাতি লড়াই শুরু করেছিল যে, তাদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে বন্দুকের গুলীর নিশানা করাও সম্ভব ছিল না।

নারী ও শিশুরা উপায়ন্তর না দেখে পানিতে নেমে পড়েছিল। পুরুষরা যতই নদীর দিকে সরে আসছিল ততই মেয়েরাও গভীর পানিতে নেমে যাচ্ছিল। শিখদের একটি প্রচণ্ড হামলা কিছু পুরুষকে নদীর পানিতে ঠেলে দিল। মেয়েরা ও শিশুরা চিল্লাতে ও চিৎকার করতে করতে পানির স্রোতের মুখে ভেসে গেলো। কোনো কোনো পুরুষ এখন মোকাবিলা করার চাইতে বরং তাদের রক্ষা করার এবং ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচাবার কাজে লেগে পড়লো। তাদের অনেকে সাঁতার জানতো না। ফলে নারী ও শিশুদের সাথে সাথে তাদেরও সলিল সমাধি হলো। যারা ছ্যাকড়ার চারপাশে জমিনের ওপর শুয়েছিল তারা ক্যাম্পের বাকি লোকদের থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিল। বন্দুক সজ্জিত লোকদের গুলী বর্ষণের ফলে হামলাকারীরা নিকটে আসতে পারছিল না। শিখদের একটি সশস্ত্র দল একদিকে কয়েক'শ গজ দূরে জমিনে শায়িত হয়ে তাদের ওপর ফায়ার করে চলছিল।

হামলাকারী দলের নেতা একটি বড় আকৃতির ঘোড়ার পিঠে চড়ে ময়দান থেকে প্রায় দু'ফার্লং দূরে খাড়া ছিল। তার ডাইনে বাঁয়ে দাঁড়িয়েছিল আরো দুজন। বর্শা ও তলোয়ার সজ্জিত মুসলমানদের একটি গ্রুপ শিখ হানাদারদের ঠেলতে ঠেলতে শিখ নেতা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে পঞ্চাশ গজের মধ্যে নিয়ে গেলো। শিখ নেতা ঘোড়া ভাগিয়ে নিয়ে চিল্লে উঠলো, 'নির্লজ্জ বেহায়ার দল! পিছু হটতে লজ্জা হয় না!' শিখেরা মুখ ফিরিয়ে জবাবী হামলা করলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সওয়ারদের একটি দল ময়দান থেকে বের হয়ে মুসলমানদের পেছনে পৌঁছে গেলো। বিপুল সংখ্যক মুসলমান শাহাদত বরণ করার পর তারা শিখদের ঘেরাও ভেদ করে আবার নিজেদের অবশিষ্ট সাথিদের সাথে যোগ দিল।

সেলিমের অধিকাংশ সাথি এখন নিজেদের বন্দুকের শেষ রাউণ্ড গুলী চালিয়েছিল। সেলিম তার শেষ রাউণ্ড চালাবার পর পাশে শায়িত ব্যক্তির হাতে টমিগান সোপর্দ করে দিল এবং থলি থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়ে ছ্যাকড়া থেকে নেমে বুকে হেঁটে অন্য ছ্যাকড়ায় দাউদের পাশে গেলো। দাউদের পাশে শায়িত ব্যক্তি মাথায় গুলী লাগার ফলে শহীদ হয়ে গিয়েছিল। তার আশে পাশে রক্ষিত মালপত্রের বাক্স পেটরা এবং বড় বড় বাণ্ডিল গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। দাউদের কপালে খুনের ধারা দেখে সেলিম বললো, দাউদ তুমি আহত?

গুলী আমার মাথার চামড়ার ওপর দিয়ে পিছলে চলে গেছে। সামান্য আঁচড় লেগেছে।

দাউদ! আমার বারুদ খতম হয়ে গেছে। স্রেফ পিস্তলে কয়েকটা গুলী আছে।

আমার কাছে হয়তো আরো দু'রাউণ্ড হবে।

সেলিম থলিতে হাত দিয়ে হাতবোমা বের করে বললো, এই নাও।

একটি গুলী এলো এবং সেলিমের কান স্পর্শ করে চলে গেলো।

দাউদ চিৎকার করলো, মাথা নিচু করো।

সেলিম মাথা নিচু করতে করতে বললো, এই নাও দাউদ, ধরো জলদি করো।

দাউদ তার হাত থেকে হাত বোমা নিল এবং সেলিম ছ্যাকড়া থেকে নেমে নিহত শায়িত ব্যক্তিদের মধ্যে চলে গেলো।

তুমি কোথায় যাচ্ছো? দাউদ পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলো।

কথা বলার সময় নেই।

একথা বলেই সেলিম বুকে হেঁটে একজনের কাছে পৌঁছে গেলো। তার মাথা থেকে পাগড়িটি নিয়ে দ্রুত শিখদের মত করে পরে নিয়ে চেহারার অর্ধেক ঢেকে রাখলো। তারপর শালওয়ার হাঁটু পর্যন্ত টেনে কোমর ভালো করে টাইট করে বেঁধে সে উঠে দাঁড়িয়ে জোরে দৌড় দিল এবং হাতাহাতি লড়াইকারীদের মধ্যে ঢুকে গেলো। একদিকে ঘোড়সওয়ার দল বর্শা ও বল্লমের সাহায্যে মুসলমানদেরকে নদীর দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। সেলিম একজন জখমী শিখের বল্লম উঠিয়ে সওয়ারের পিছনে পৌঁছে গেলো। সওয়ার যখন একজন পতিত মুসলমানের ওপর নিচু হয়ে তার বর্শা দিয়ে আঘাত করতে যাচ্ছিল তখন সেলিম দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তার কোমরে প্রচণ্ড জোরে বল্লমের আঘাত করলো। তাকে ধাক্কা দিয়ে বল্লমসহ একদিকে নামিয়ে দিল। সওয়ারের বল্লম নিচে পতিত মুসলমানের গায়ে না লেগে বালির বুকে ঢুকে গেলো। সেলিম বিদ্যুতবেগে হতবিহ্বল ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে লাফিয়ে তার পিঠে উঠে বসলো। কয়েক কদম দূরে আর একজন শিখ সওয়ার এক মুসলমানের ওপর বর্শা দিয়ে আক্রমণ করছিল এবং সে লাঠি দিয়ে তা ঠেকাতে চাচ্ছিল। সেলিম দ্রুত বালির মধ্যে বিদ্ধ বর্শাটি তুলে নিল এবং ঘোড়া ছুটিয়ে সেটি শিখের পাঁজরে আমূল বিদ্ধ করলো। এরপর এক মুহূর্ত দেরি না করে সে ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে তার পিঠে জোরে গোড়ালী ঠুকলো এবং ময়দানের বাইরে বেরে হয়ে এলো। তার ঘোড়া ছুটছিল সেদিকে যেদিকে শিখ দলনায়ক পন্থের পতাকা নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসেছিল। সেলিমের ঘোড়া দ্রুত ছুটে যাচ্ছিল। সে তার গর্দানের সাথে মাথা ঠেকিয়ে কখনো জিনের এদিকে এবং কখনো ওদিকে এভাবে ঝুলে পড়ছিল যার ফলে শিখেরা যে-ই তাকে দেখছিল সে-ই তাকে তাদের কোনো জখমী সাথি ভাবছিল।

ঘোড়াকে দূর থেকে দেখে দলনায়ক সাথিদেরকে বললো আরে, এতো মহারাজা সিংয়ের ঘোড়া মনে হচ্ছে। সে জখমী। ঘোড়াকে থামাও।

দলনায়কের দুই সাথি এগিয়ে গিয়ে ঘোড়াকে আটকাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ঘোড়া তাদেরকে ডজ দিয়ে সোজা দলনায়কের দিকে এগুতে থাকলো। দলনায়ক পেরেশান হয়ে নিজের ঘোড়া একদিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সেলিম আচানক নিজের মাথা উঠালো, একহাত দিয়ে লাগাম ঘুরিয়ে পুনরায় দলনায়কের দিকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল এবং অন্য হাতে তার দিকে বল্লম তাক করলো। দলনায়ক বাণ্ডা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পকেট থেকে পিস্তল বের করলো। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। সেলিমের বল্লম দলনায়কের বুকে বিদ্ধ হয়ে এফোড় ওফোড় করে দিয়েছিল। আতংকগ্রস্ত ঘোড়া দলনায়কের তিন মন ভারী লাশটি নিয়ে একদিকে ছুটলো। তার একটি পা রেকাবে ফোঁসে গিয়েছিল এবং মাথা জমিনে ঘষে

ঘসে চলছিল। সেলিম উপরের দিক থেকে চক্কর কেটে দলনায়কের ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিল লড়াইয়ের ময়দানের দিকে। দলনায়কের জনৈক সাথি তার ঝাণ্ডা উঠিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। সেলিম ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পিস্তলের গুলীতে তাকে সাবাড় করে দিল। দ্বিতীয় জন দ্রুত দৌড়ে তার সাথিদের দিকে চলে গেলো এ কথা বলতে বলতে 'দলনায়ক নিহত' 'দলনায়ক নিহত'। মেয়েরা চিৎকার করছিল এবং যেসব শিখ ঘোড় সওয়ার তাদেরকে ধরে ধরে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার করছিল দলনায়কের ঝুলন্ত লাশ নিয়ে ঘোড়া তাদের সামনে পৌছে গিয়েছিল। তারা হতভম্ব হয়ে গেলো। লাশসহ একটি খাদ লাফিয়ে পার হতে গিয়ে রেকাব ভেঙে গেলো এবং লাশ জমিনে পড়ে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেলো।

'দলনায়ক নিহত', 'দলনায়ক নিহত' মুহূর্তের মধ্যে এ খবর ময়দানের প্রত্যেক শিখের কানে পৌছে গেলো। সেলিম শিখদলের নিকট থেকে দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেলে দলনায়কের সাথি বললো, ঐ দেখো, ঐ ব্যক্তি দলনায়ককে হত্যা করেছে। কিন্তু প্রত্যেক শিখ তখন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে চলছিল। কাজেই দলনায়কের সাথি অনুভব করলো তার কথা কেবল সে একাই শুনছে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। মুসলমান শেষবার সর্বশক্তিতে হামলা করলো এবং শিখদের পিছু হটতে বাধ্য করলো। দলনায়কের মৃত্যুতে যেসব শিখ পেরেশান হয়ে পড়েছিল তারা পিছু হটে ময়দানের একদিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। রাইফেল সজ্জিত শিখেরা প্রতিপক্ষ থেকে নিজেদের গুলীর জবাব না পেয়ে ধীরে ধীরে সামনের দিকে বাড়তে থাকলো।

সেলিম ওপর থেকে চক্কর কেটে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের কাছে চলে গেলো এবং বুলন্দ আওয়াজে বলতে থাকলো, 'দলনায়ক নিহত হয়েছে। পাকিস্তানী ফউজ এসে পড়েছে। বেলুচ রেজিমেন্ট চারদিক ঘিরে ফেলেছে।'

অন্য সাথিদেরকে প্রায় বিজয়ের মুখে পিছু হটতে দেখে এই অগ্রবর্তী বাহিনীটি পূর্বেই পেরেশান হয়ে পড়েছিল। তার ওপর এখন আবার নেতার মৃত্যু এবং পাকিস্তানী ফউজ এসে যাবার খবর শুনে তাদের মধ্য থেকে অনেকে সামনে এগুবার চাইতে বরং পেছনে কেটে পড়া শুরু করেছিল। এখন শিখদের পিছু হটাবার জন্য কেবল শেষ ধাক্কাটির প্রয়োজন ছিল। এমন সময় আচানক শোনা গেলো অশ্ব পদধ্বনি এবং এই সংগে ধ্বনিত হলো আল্লাহু আকবর শ্লোগান। মুহূর্তে সমস্ত ময়দানে 'আল্লাহু আকবর' শ্লোগান ধ্বনিত প্রতিধ্বনি হতে থাকলো। ময়দানের এক কোণ থেকে উদিত হলো এক দল ঘোড় সওয়ার। পনর বিশ জনের একটি বাহিনী। তারা মিনিটের মধ্যে গুলী বর্ষণ করতে করতে ময়দানের এ কোণ থেকে ও কোণ পর্যন্ত চষে বেড়ালো। তাদের পেছনে ছিল একটি পদাতিক বাহিনী।

সেলিম তার পাগড়ী খুলে ছুড়ে ফেলে দিল। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে ছ্যাকড়ার আশেপাশে শায়িত লোকদের কাছে গিয়ে বললো, দুশমন পালাচ্ছে, আজ আবার আল্লাহ তোমাদের ফরিয়াদ শুনেছেন। চলো হামলা করো।

কিছুক্ষণ আগে যাদের মনে শতকরা একশভাগ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, তাদের মৃত্যু এখন শিয়রে উপস্থিত, তারা একটি নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়ে ময়দানে পড়ে থাকা জখমীদের হাতিয়ার কুড়িয়ে নিয়ে শত্রুদের ওপর প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করছিল। ময়দান একেবারে খালি হয়ে গেলো। ঘোড় সওয়ার দল এক মাইল পর্যন্ত শিখদের পশ্চাদ্ধাবন করে ফিরে এলো। সেলিম জানতে পারলো এই নতুন আক্রমণকারী ঘোড় সওয়ার দলের নেতা হচ্ছে আমির আলী।

আমির আলী সেলিমকে দেখেই বললো, ভাই আমাকে কাপুরুষতার ধিক্কার দেবেন না। আমরা তিনটে হামলা প্রতিহত করেছি। কিন্তু শেষের দিকে বারুদ ফুরিয়ে গেলো। একটি গুরুদ্বার থেকে আমি আট'শ কার্তুজ ও দুটো রাইফেল ছিনিয়ে এনেছিলাম। কিন্তু এখন আমার কাছে রয়ে গেছে আর মাত্র দুটি কার্তুজ।

মেয়েদের কি হলো?

ওরাও এসে গেছে। গুলীর আওয়াজ শুনেই আমরা কিছুদূর পেছনে নদীর কিনারে তাদেরকে বসিয়ে রেখে এসেছি। আমি জিজ্ঞেস করছি আপনাদের কাছে কি পরিমাণ বারুদ আছে?

সেলিম তার থলের মধ্যে হাত দিয়ে পিস্তলের কয়েকটা গুলী বের করে এনে বললো, আমার কাছে এই কটা আছে মাত্র। আর আমার সাথিদের বারুদও প্রায় শেষ।

দাউদ বললো আমার কাছে সম্ভবত স্টেনগানের কয়েকটা গুলী রয়ে গেছে।

আর একজন বললো, আমার কাছে চারটি গুলী আছে।

বাকি সবাই ছিল খালি হাত।

আমির আলী হতাশ হয়ে বললো, ওরা এবার আরো বেশি প্রস্তুতি নিয়ে আসবে। যে কোনো ভাবেই হোক আমাদের বারুদ হাসিল করতে হবে।

সেলিম বললো, আমির আলী! যদি এখানে আমাদের মিশন খতম না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ নতুন উপকরণ তৈরি করে দেবেন।

অর্ধরাত পর্যন্ত ক্যাম্পের লোকেরা গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে শহীদের লাশগুলি দাফন করতে থাকলো। শহীদদের সংখ্যা ছিল সাত'শতেরও বেশী। জখমীদের সংখ্যা ছিল এর চাইতে দেড়গুণেরও বেশী। নদীতে ডুবে যাওয়া নারী ও শিশুদের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশ। আরো প্রায় আড়াই'শ লোক তাদেরকে বাঁচাতে গিয়ে ডুবে গেছে। প্রায় পনরটি মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে শিখদের একটি ঘোড়সওয়ার দল।

হামলা চলাকালে মাঝিরা নিজেদের জান ও নৌকা বাঁচাবার ফিকিরে ব্যস্ত ছিল বেশি। ইতিপূর্বে একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। কয়েকদিন আগে শিখদের একটি হামলার সময় ভীত সন্ত্রস্ত লোকদের অতিরিক্ত লোডিং, হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি

এবং মাঝিদের ওপর চড়াও হবার ফলে বিপুল সংখ্যক যাত্রীসহ একটি নৌকা প্রবল স্রোতের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। এই দুর্ঘটনার পর মাঝিরা কোমর বরাবর পানির মধ্যে নৌকা দাঁড় করাতো। আজো তারা শিখদের আক্রমণের সূচনাতেই নৌকা ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং হামলার প্রচণ্ডতা দেখে আশা করতে পারেনি পুনর্বার ফিরে এসে কোনো জীবিতকে দেখতে পাবে।

দুজন মাঝি তাদের নৌকা কয়েক মাইল দূরে অন্য একটি ক্যাম্পে নিয়ে যাবার ফায়সালা করেছিল। কিন্তু যখন দেখলো শিখেরা পরাজিত হয়ে ময়দান খালি করে চলে গেছে তখন তারা নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হলো। ফীকর দীন আল্লাহু আকবর শ্লোগান দিল এবং বাকি মাঝিরা তার সাথে শরীক হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা নিজেদের নৌকা এপারে এনে ভিড়ালো।

সেলিম যখন জখমী, নারী ও শিশুদের নৌকায় উঠাবার কাজে ব্যস্ত ছিল তখন আমির আলী দাউদের হাত ধরে একদিকে টেনে নিয়ে গেলো। 'দাউদ, এখন কি হবে?'

এখানে হামলা ছাড়া আর কি হতে পারে? দাউদ বেপরোয়া হয়ে জবাব দিল।

কিন্তু বারুদ নেই। এ ব্যাপারে কি চিন্তা করেছো?

কিছুই নয়। কিছুদিন থেকে আমরা চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছি। কেবল সেলিমই চিন্তা করে। আর এখন সম্ভবত সেও আর চিন্তা করে না।

তুমি বলেছিলে তোমার কাছে স্টেনগানের কয়েকটা গুলী আছে।

হ্যাঁ।

ওগুলি আমাকে দাও। এক জায়গা থেকে আমার অস্ত্র পাবার আশা আছে।

আমিও তোমার সাথে যাবো। রাইফেলের কয়েকটা গুলীও আমরা পেতে পারি। এছাড়া আমার কাছে একটা হাতবোমাও আছে। তুমি কখন যেতে চাও?

এখনি।

ঘোড়ায় চড়ে?

হ্যাঁ।

চলো!

আমির আলী কিছু চিন্তা করে বললো, সেলিমের কাছ থেকে অনুমতি নেয়া দরকার।

ওকে বলো না। সে হামেশা বিপদে তার সাথিদের চাইতে আগে থাকতে চায়।

সকালে নামাযের পর দাউদকে গরহাজির দেখে সেলিম সাথিদেরকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। একজন বললো, সে দাউদ ও আমির আলীকে রাতের বেলা ঘোড়ায় চড়ে ক্যাম্পের বাইরে যেতে দেখেছে। আর একজন কিছুটা ইতস্তত

করে বললো, আমার কাছে রাইফেলের যে কটি গুলী অবশিষ্ট ছিল দাউদ সেগুলি চেয়ে নিয়ে তার সাথিকে দিয়েছিল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমরা কোথায় যাচ্ছো? জবাবে বলেছিল ফিরে এসে বলবো।

সেলিম ব্যথাভরা কণ্ঠে বললো, আমি জানি ওরা কোথাও থেকে বারুদ সংগ্রহ করতে গেছে।

একজন বললো, কোথাও থেকে সামান্য কিছু আনলেও তা দিয়ে বড় জোর আমরা দু'একটা হামলার মোকাবিলা করতে পারবো। কিন্তু এই পরাজয়ের পর তারা নিঃসন্দেহে বড় আকারের প্রস্তুতি নিয়ে প্রচণ্ড হামলা চালাবে। আমাদের সে চিন্তা করা দরকার। দেখা যাচ্ছে, প্রতিদিন নৌকায় যতজন পার হচ্ছে তার চেয়ে বেশি নতুন লোক ক্যাম্পে এসে যাচ্ছে। রোগও বেড়েই চলছে। রেশন খতম হয়ে যাচ্ছে। যদি আগামী কয়েকদিন হামলা নাও হয়। তাহলে যারা রোগের আক্রমণ থেকে বেঁচে যাবে ক্ষুধা তাদেরকে খেয়ে ফেলবে।

সেলিম বললো, পরশু পাকিস্তানী ফউজের হেফাজতে কয়েক হাজার মুহাজিরের কাফেলা পুল অতিক্রম করে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। উপরের দিকে ক্যাম্পের লোকেরাও তাদের সাথে শামিল হয়ে চলে গেছে। কিন্তু আমরা সময়মতো খবর পাইনি। এখন আমাদের মুসলমান সিপাহীদের হেফাজতে আগত কোনো কাফেলার ইন্তিজার করতে হবে। যখন পুল সংরক্ষিত হয়ে যাবে সংগে সংগেই আমাদের সেখানে পৌঁছে যেতে হবে। গোলাম আলী! তুমি এখনই সাদেকের সাথে রওনা হয়ে যাও। দেখো, আমাদের কোনো ঘোড়া যদি আশে পাশে কোথাও চরে বেড়ায় তাহলে তাতেই চড়ে বসো। নয়তো আমির আলীর লোকদের থেকে দুটো ঘোড়া নিয়ে নাও। অন্য কিনারা সংরক্ষিত আছে। তাই তোমরা এখান থেকে নদী পার হয়ে পুলের অন্য দিকে চলে যাও। সেখান থেকে আমাদের সংবাদ পাঠাতে থাকবে। মুসলমান ফউজের কোনো অফিসারের সাথে সাক্ষাত হলে তাকে বলবে ঐ পুলের ওপর স্বতন্ত্র ও স্থায়ী পাহারার প্রয়োজন।

এ কথা হচ্ছিল এমন সময় কেউ একদিকে ইশারা করে বললো, ওদিকে দেখো, মনে হয় ওরা আসছে।

সেলিম দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। তিন ফার্লং দূরে ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে একজন ঘোড়সওয়ারকে আসতে দেখলো সে। ঘোড়া আসছিল স্বাভাবিক গতিতে। সেলিম বিষণ্ণ বদনে নিজের মাথা নিচু করে নিল। সওয়ারও বিষণ্ণ বদনে নিজের মাথা নিচু করে নিল। সওয়ার নিকটে পৌঁছে ঘোড়া থামালো। লোকেরা তার চারদিকে জমা হয়ে গেলো। এ ছিল আমির আলী এবং তার কোলে ছিল দাউদের লাশ।

লোকেরা লাশ নামিয়ে জমিনে রাখলো। আমির আলী অচৈতন্য অবস্থায় ঘোড়া থেকে নেমে মুহূর্তকালের জন্য জিনের সাথে সেঁটে দাঁড়িয়ে রইলো। সেলিম দৌড়ে গিয়ে তার বাহু ধরে বললো, 'আমির আলী!' 'আমির আলী।' আমির আলী কিছু না

বলে দু'কদম পেছনে হটে গিয়ে টলতে টলতে জমিনের ওপর ধপাস করে পড়ে গেলো। তার জামা ছিল রক্তে ভেজা। চেহারায় হলুদ আভা ফুটে উঠেছিল। একটি যুবতী মেয়ে ডুকরে কাঁদছিল। সে এগিয়ে এসে আমির আলীর মাথা কোলে তুলে নিয়ে বসে পড়লো।

সেলিম দাউদের দিকে দেখলো। তার বুক গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। 'ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' বলে সে দেখতে লাগলো আমির আলীকে। ভীড় দুঁফাক করে তার কাছে গিয়ে বসে পড়লো। তার নাড়িতে হাত রাখার পর দ্রুত তার জামা উঠিয়ে দেখলো। তার পিঠ ও বুকে গুলীর তিনটি জখম ছিল। সেলিম দ্বিতীয়বার নাড়িতে হাত রাখলো। তার চোখের পাতা খুলে দেখলো এবং আশপাশের সমবেত লোকদের বললো, এর এখান পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়াও তো একটা অলৌকিক ব্যাপার মনে হচ্ছে।

লোকেরা যখন নদীর কিনারা থেকে একটু সরে গিয়ে কবর খুঁড়ছিল, আমির আলীর যুবতী বউ সবাইকে বোঝাচ্ছিল, 'সে মরেনি, জিন্দা আছে। তোমরা সবাই পাগল হয়ে গেছো। তোমাদের আল্লাহর দোহাই, ওকে ভালো করে দেখো। তোমাদের কি হয়ে গেলো তোমরা জিন্দাকে দাফন করতে যাচ্ছো!' সেলিমের বাহু আকর্ষণ করে সে বললো 'ভাইজান! ভালো করে দেখো। সে জীবিত আছে। আমার স্বামী জীবিত আছে। তাকে কেউ মারতে পারে না।'

তুমি ঠিক বলছো আমার বোন। সে জীবিত আছে। শহীদের মৃত্যু নেই।

দাউদ ও আমির আলীকে দাফন করার পর সেলিম কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো পাথরের মূর্তির মতো নিরব নিস্পন্দ। কেউ তার কাঁধে হাত রেখে বললো, 'দাউদ আপনার ভাই ছিল?'

দাউদ ও আমির আলী দুজন আমার ভাই ছিল। এ কথা বলেই সেলিম কবরের পাশে একটি ঝোপের নিচে বসে পড়লো নির্জীবের মতো।

কিছুদিন থেকে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল। তারপরও মুসিবত ও হতাশার মোকাবিলায় প্রতিরক্ষার যে শক্তিকে সে এতদিন জিইয়ে রেখেছিল তা এখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছিল। গত চারদিন থেকে তার হালকা হালকা জ্বর আসছিল। তবুও প্রবল সামষ্টিক অনুভূতির কাছে তার নিজের শারীরিক কষ্ট অনুভবযোগ্য হয়নি। নৌকা এপারে এলে লোকেরা পার হবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় নামতো এবং হৈ-চৈ-হাংগামা শুরু হয়ে যেতো। লোকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেলিমকে ঘন্টার পর ঘন্টা কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। সেখান থেকে নিশ্চিন্ত হবার পর সে চলে আসতো জখমী ও রুগিদের কাছে। তাদের সেবা শুশ্রুসায় লেগে যেতো। এশার নামাযের পর অর্ধরাত পর্যন্ত ক্যাম্পের চারদিকে চক্কর লাগাতো। পাহারাদারদের হুশিয়ার থাকার জন্য তাগিদ দিতো। খাবার সময়ও নিজের পেট ভরার পরিবর্তে কেউ যেন ভুখা না থাকে সেদিকে তার নজর থাকতো। তারপর যখনই সে খবর পেতো আশপাশের কোনো ক্যাম্পে হামলা হয়েছে তখনই সাথিদের নিয়ে সেখানে

পৌছে যেতো। দাউদ প্রায়ই তাকে বলতো, 'সেলিম তুমি একটু আরাম করো। তোমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। গায়ের রং হলুদ হয়ে যাচ্ছে।' কিন্তু সে জবাব দিতো, আরে ভাই আমি ভালো আছি। আমার চিন্তা করো না।

আর আজ সে দাউদের কবরের পাশে বসে ভাবছিল, 'হায়! আজ যদি দাউদ আমাকে বলতো, সেলিম তুমি শুয়ে পড়ো।' নিজের নিসংগতা ও অসহায়ত্বের অনুভূতি তাকে প্রচণ্ডভাবে পেয়ে বসলো।

এক ব্যক্তি খাবার নিয়ে এলো। কিন্তু সে বললো, আমার ক্ষুধা নেই। একথা বলেই মাটির ওপর শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের মধ্যে সময় ও দূরত্বের ব্যবধান অতিক্রম করে পৌছে গিয়েছিল জীবনের রাজপথের আর এক কিনারে। সেখানে সংগোপনে আবৃত ছিল অতীতের হাস্য-কলরব। জালাল, বশির, দাউদ ও মজিদের সাথে সবুজাভ গম ক্ষেতের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল সে। তাদের সাথে মিলে গাছে গাছে পাখির বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। রং বেরংয়ের ফুলের তোড়া তৈরি করছিল। তারপর নিজের বাড়ির ছেলে মেয়েদের সাথে দোলা ঝুলছিল। বাড়ির মেয়েদের মধ্যে বসে তাদেরকে শোনাচ্ছিল গল্প। রামধনুর রঙের মতো এক সময় এসব দৃশ্য অন্তর্হিত হয়ে গেলো। তারপর শুনলো ইসমাঈল চাচার অট্টহাসির রোল। এ হৃদয় প্রলুব্ধকারী অট্টহাসি এক সময় ভয়াবহ ও আতংকজনক হয়ে উঠলো। ইসমাঈলের চারপাশে আচানক আগুনের শিখা লকলক করে ফণা বিস্তার করলো। এখন তার চারদিকে অসংখ্য নারী-পুরুষ-শিশু অট্টহাসি দিচ্ছিল। আগুনের শিখা তাদেরকে ঢেকে নিল। কিন্তু অট্টহাসি আগের মতোই কানে বাজাচ্ছিল।

'সেলিম'! 'সেলিম'! কেউ তাকে ঝাঁকানি দিতে দিতে ডাকছিল। সেলিম চোখ মেললো। উঠে বসলো। বেশ কয়েকজন পুরুষ ও নারী তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। এক ব্যক্তি পানির পেয়ালা এগিয়ে দিতে দিতে বললো, নিন আপনি পানি চাইছিলেন।

সেলিমের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পেয়ালাটা নিয়ে সবটুকু পানি পান করে আবার জমিনের ওপর শুয়ে পড়ে বললো, মনে হয় আমি স্বপ্নের মধ্যে পানি চেয়েছিলাম।

এক শ্বেত শ্মশ্রুধারী সেলিমের মাথায় হাত রেখে বললো, বেটা! তোমার গায়ে বেশ জ্বর। চলো আমি তোমাকে আমার পিঠে করে নিয়ে চলছি। এ ব্যক্তি ছিল আমির আলীর চাচা।

সেলিম জিজ্ঞেস করলো, কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে?

আমরা পুলের দিকে যাচ্ছি। তোমার লোকেরা বেলুচ রেজিমেন্টের চারজন সিপাহীকে নিয়ে এসে গেছে।

নিজের চারপাশে সমবেত লোকদের মধ্যে গোলাম আলী এবং তার সাথে বেলুচ রেজিমেন্টের একজন হাবিলদারকে দেখে সেলিম আবার উঠে বসলো।

গোলাম আলী বললো, আমরা পুলের উপর পৌছতেই এঁকে পেলাম।

হাবিলদার বললো, আমাদের ক্যাপ্টেন সাহেব হুকুম দিয়েছেন, ক্যাম্পের লোকদের সন্ধ্যের আগেই পুলের ওপর পৌছে যেতে হবে। তিনি একটি কাফেলাকে আনতে চলে গেছেন এবং আপনাদের হেফাজতের জন্য আমাদের পাঠিয়েছেন। আপনারা জলদি চলুন।

এক ঘন্টা পর প্রায় দশ হাজার মানুষের একটি কাফেলা পুলের দিকে রওনা হলো। কিন্তু দেড় হাজারের মতো ছিল রুগী, জখমী ও পংগু। তাদের পায়ে হেঁটে চলার ক্ষমতা ছিল না। তারা হতাশ দৃষ্টিতে চলমান কাফেলার দিকে তাকিয়েছিল। অনেকের আত্মীয় তাদেরকে রেখে চলে যেতে রাজি ছিল না। কিন্তু সেলিম তাদেরকে নিশ্চয়তা দিল আগামীকাল সকাল পর্যন্ত তাদেরকে ওপারে পৌছে দেয়া হবে।। কাজেই আপনারা নিশ্চিন্তে পুল পার হয়ে ওপারে নৌকা ঘাট থেকে তাদেরকে নিয়ে যাবেন। সেলিমের পরামর্শে তার সাথিরা অনেক নারী ও শিশুদের জন্য নিজেদের ঘোড়া দিয়ে দিল।

অনেক নওজোয়ান সেলিমকে এই মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় রেখে চলে যেতে রাজি ছিল না। মেয়েরাও তাদের অনুগ্রাহককে সংগে করে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। কিন্তু সেলিম তার জিদের ওপর অবিচল ছিল। সকল প্রকার আবেদন ও অনুনয়ের জবাবে তার শেষ কথা ছিল ঃ যতদিন এ ক্যাম্প খালি হবে না আমি এখানেই থাকবো।

আমৃত্যু সেলিমের সাথে থাকার জন্য অংগীকারাবদ্ধ গোলাম আলী, সাদেক এবং আরো চারজন সেখানেই সেলিমের সাথে রয়ে গেলো। রুখসাতের পূর্বে হাবিলদার সেলিমকে বললো, আপনার সম্পর্কে আমি অনেক কিছু শুনেছি। আপনি অনেক বড় কাজ করেছেন। কিন্তু এখন আপনি আমাদের সাথে চলুন। ক্যাপ্টেন সাহেবের অনুমতি ছাড়াই আমি আপনার জায়গায় আমার দুজন লোককে এখানে রেখে যেতে রাজি আছি।

সেলিম বললো, আপনাদের প্রয়োজন সর্বত্র। আপনি আমাদের জন্য কিছু করতে চাইলে বন্দুকের কয়েক রাউণ্ড গুলী আমাদের দিয়ে যান।

হাবিলদার কোনো কথা না বলেই তার পেটি থেকে কয়েক রাউণ্ড গুলী বের করে সেলিমের হাতে দিল। তার সাথিরাও তার অনুসরণ করলো। ফলে ষাট সত্তর রাউণ্ড গুলী সেলিমের কাছে জমা হয়ে গেলো।

হাবিলদার বললো, এ বারুদ সামান্য মাত্র। তাই আপনি যত দ্রুত পারেন বাকি লোকদেরকে ওপারে পৌছাবার ব্যবস্থা করুন। আমি অনুমতি পেলে এখানে চলে আসার চেষ্টা করবো।

সেলিম বললো, আমি আপনাকে আর একটু কষ্ট দেবো।

হাবিলদার বললো, আমি একজন মুসলমান। আর এই লোকদের জন্য আপনি যা কিছু করেছেন তারপর আপনি আমাকে হুকুম দিতে পারেন।

সেলিম বললো, আপনি আমাদের অতিরিক্ত বন্দুকগুলি নিয়ে যান। এখন সম্ভবত আমরা এগুলির হেফাজত করতে পারবো না। এগুলির এক একটির জন্য আমাদের কয়েকটি প্রাণ দিতে হয়েছে। এগুলি জাতির আমানত মনে করবেন। জাতির এখন এগুলির চাইতে বেশি আর কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই।

কাফেলা রওনা হবার পর সেলিম নদীর কিনারে চলে এলো। মাঝিদের ডেকে বললো, ভাইয়েরা! এখন তোমাদের শেষ দৌড় শুরু হচ্ছে। আল্লাহর ওয়াস্তে হামলা শুরু হবার আগেই এই লোকগুলিকে নদীর ওপারে পৌছে দাও। ওরা খুব জলদি এসে যাবে। আমি জানি তোমরা পরিশ্রান্ত। আমরা সবাই পরিশ্রান্ত একথা বলেই সেলিম জমিনের ওপর শুয়ে পড়লো।

সাদেক এগিয়ে এসে সেলিমের নাড়িতে হাত রাখলো। 'গোলাম আলী! তুমি তো গা পুড়ে যাচ্ছে। এসো একে ওপারে পৌছিয়ে দেই।'

সেলিম বললো, না, না, তোমরা এইসব লোকদের কথা ভাবো। আমি ভালো আছি। তোমরা কাজ করো। লোকদেরকে এক জায়গায় জমা করো। শস্যের খালি বস্তাগুলি বালিতে ভরে নাও। কিনারা থেকে একটু দূরে তিন চারটি মোর্চা বানাও।

গোলাম আলী সাদেক আলী দুজন মিলে সেলিমকে তুলে একটি ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় শায়িত করলো এবং মোর্চা বানাবার কাজে লেগে গেলো।

ফকীর দীন মাঝি তার সাথিদের বলছিল, ভাইয়েরা! আজ আমাদের পরীক্ষা। আমি কসম খাচ্ছি যতক্ষণ এই লোকদেরকে ওপারে না পৌছিয়ে দেবো ততক্ষণ আমার জন্য ঘুম হারাম।

অর্ধরাত পর্যন্ত মাঝিরা এক হাজার লোককে পার করে দিল। অনেক লোক ফউজের সাথে পুল পার হবার পর নিজের অক্ষম আত্মীয়দেরকে নেবার জন্য ওপারে নৌকাঘাটে পৌছে গিয়েছিল। আর আনুমানিক পাঁচ'শ লোককে পার করানো বাকি ছিল। মাঝিরা রাতের তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত তাদের পার করাতে পারবে বলে মনে করছিল। কিন্তু রাত বারোটার সময় দেড়'শ মুসলমানের একটি নতুন কাফেলা ওখানে পৌছে গেলো। তারা জানালো শিখদের একটি বাহিনী তাদেরকে ধাওয়া করে আসছে। পাঁচ'শ লোকের সাথে তারা কিরণ খাল পার হয়েছিল। পথে জখমী ও শহীদদেরকে রেখে তারা এখানে পৌছে গেছে। এ খবর পেয়েই যেসব মাঝি এপারে ছিল তারা নৌকা ভরে নিয়ে দ্রুত চলে গেছে। ফকির দীন সেলিমকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে বললো, না, এখনো আমার হাত বন্দুক চালাতে সক্ষম।

রাত একটার কাছাকাছি সময়ে নদীর অপর কিনারে বন্দুকের ঠাস ঠাস আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো। এ সময় তিন জন লোক দৌড়ে মাঝিদের কাছে

পৌছে গেলো। গায়ে সামরিক বাহিনীর পোশাক দেখে মাঝিরা তাদের চারদিকে জটলা পাকালো।

এক নওজোয়ান তার সাথিদের বলছিল, এটাই পতন। তারপর সে মাঝিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, আমাদের দ্রুত ওপারে পৌছিয়ে দাও।

এক মাঝি বললো, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আপনারা মাত্র তিনজন ওখানে গিয়ে কি করতে পারবেন? আপনারা এসেছেন তাও মাত্র তিনজন। তার ওপর আবার মাত্র দুটি রাইফেল। ওখানে সম্ভবত পুরোপুরি একটা সেনাদল গুলী বর্ষণ করছে।

নওজোয়ান বললো, আল্লাহর দোহাই সময় নষ্ট করো না।

নওজোয়ানের এক সহযোগী বললো ক্যাপ্টেন সাহেব! এরা এমনিতে যাবে না। এদের সাথে আমাদের কথা বলার অনুমতি দিন।

ফকির দীন মাঝি এগিয়ে এসে বললো, ভাইসাহেব। নারাজ হবেন না। ক্যাপ্টেন সাহেবের সিপাহী এই জায়গার অবস্থা দেখে গেছেন। ওখানে আছে কেবলমাত্র রুগী ও জখমীরা। তারা বারুদের কয়েকটি গুলী দিয়ে গিয়েছিলেন। তার সাহায্যে পাঁচ ছয়জন মুজাহিদ বিরাট শিখ বাহিনীকে রুখে রেখেছে। যতক্ষণ এই পাঁচ ছয়জন ময়দানে টিকে আছে ততক্ষণ শিখেরা গুলী বর্ষণ করতে থাকবে। আর যখন তাদের গুলী ফুরিয়ে যাবে, শিখেরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্যাম্পের লোকদেরকে খতম করে ফেলবে। ক্যাপ্টেন সাহেব যখন এলেন কিছু সংগে করে নিয়ে আসতেন।

নওজোয়ান বললো, ভাই! আমি সোজা লাহোর থেকে আসছি। আমি কিছুই জানি না। এখান থেকে দুমাইল দূরে জীপ চালাবার পথ ছিল না। ওখান থেকেই আমরা শুনলাম ফউজ ক্যাম্পের লোকদেরকে নিয়ে পুলের দিকে গিয়েছে। আর যারা থেকে গেছে তাদেরকে তোমরা নৌকার সাহায্যে পার করিয়ে আনবে। আমি এসেছি আমার এক আত্মীয়ের তালাশে। তার সম্পর্কে আমি জানি শেষ সময় পর্যন্ত সে ওখানে মোকাবিলা করতে থাকবে। আমি সেলিমের আত্মীয়। সম্ভবত তোমাদের কেউ তার খবর জানো।

সেলিমের নাম শুনে অনেক লোক তার চারদিকে জমা হয়ে গেলো। ফকির দীন বললো, ক্যাপ্টেন সাহেব, সে অসুস্থ। আপনি একটা পাহাড়কে উঠিয়ে তার দিকে আনতে পারেন কিন্তু তাকে আনতে পারবেন না। তাকে এখানে আনতে হলে শিখ বাহিনীকে পরাজিত করতে হবে। নওজোয়ান বললো, আমি একজন ডাক্তার। আমাকে ওপারে পৌছিয়ে দাও। হয়তো আমি তার জান বাঁচাতে পারি।

আসুন!

ফকির দীন এগিয়ে গিয়ে নৌকার রশি খুললো। ক্যাপ্টেন ও তার দুজন সাথি নৌকায় উঠে বসলো।

তারা মাত্র দশগজের মতো দূরত্ব অতিক্রম করেছিল এমন সময় ফকির দীন অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় নদীর কিনারায় সাত আটজন লোকের একটি দল দেখতে পেলো। সে বললো, ক্যাপ্টেন সাহেব! সম্ভবত বেলুচ রেজিমেন্টের সিপাহীরা আসছে।

ক্যাপ্টেন বললো, এখন আর পেছনে দেখো না। সামনের দিকে চলো।

সামনের দিকে আরো কিছু দূর যাওয়ার পর কিনারা থেকে ফকির দীন তার এক সাথির আওয়াজ শুনতে পেলো। 'ফকির দীন!' 'ফকির দীন!' থামো। সিপাহী এসে গেছে।

ফকির দীন কিছুটা ইতস্তত করে জবাব দিল, ওনাদেরকে দ্বিতীয় নৌকায় করে নিয়ে এসো। আমি এখন মাঝ দরিয়ায় পৌঁছে গেছি।

ফকির দীন তীর থেকে বেশ কিছু দূরে কিশ্‌তি থামিয়ে বললো, এখানে উরু বরাবর পানি। আপনারা এখানে নেমে যান। আমি কিশ্‌তি কিছু দূরে নিচে নামিয়ে রেখে আপনাদের ইন্তিজার করছি।

ক্যাপ্টেন এক হাতে পিস্তল এবং অন্য হাতে অষুধের বাক্স নিয়ে নেমে পড়লো।

ক্যাম্পের পুরুষ ও মেয়েরা নদীর কিনারায় শায়িত ছিল। তাদের থেকে কিছু দূরে বালির বস্তা দিয়ে তিনটি মোর্চা তৈরি করা ছিল। সামনে প্রায় দেড়'শ গজ দূর থেকে হামলাকারীদের বন্দুক অগ্নি উদগীরণ করছিল। মোর্চায় বসে থাকা মুজাহিদরা তাদের জবাবে মাঝে মাঝে ফায়ার করছিল।

ক্যাপ্টেন ও তার সাথিরা বালির ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে এগিয়ে গেলো। কিনারায় শায়িত হতাশ লোকেরা একটুখানি আশান্বিত হয়ে শুয়ে শুয়ে পরস্পরের সাথে ইশারা ইংগিতে কিছু কথাবার্তা বলছিল। এক ব্যক্তি বিভ্রান্তির শিকার হয়ে ঝট করে ক্যাপ্টেনের সাথির রাইফেল ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে বললো, কে তুমি?

সিপাহী তার এই পদক্ষেপে অবাক হয়ে নিজের সাথিদের দিকে তাকালো। ক্যাপ্টেন আগে চলে গিয়েছিল। দ্রুত পেছন ফিরে বললো, আরে ভাই! আমরা ওপার থেকে আসছি। ওদিকে দেখো, অন্য কিশতিতে ফউজ আসছে। লোকেরা নদীর অন্য কিনারার দিকে তাকালো। আট দশ গজ দূরে দুশমনের মর্টার বোমা ফাটলো। কিন্তু নারী ও শিশুর চিৎকার শোনা গেলো। আতংকিত ব্যক্তি রাইফেল ছেড়ে দিয়ে বললো, মাফ করবেন ভাই, আমি ভেবেছিলাম আপনারা দুশমনের লোক এবং মোর্চার ওপর হামলা করতে যাচ্ছেন।

ক্যাপ্টেন এক মোর্চার কাছে পৌঁছে ডাকলো, সেলিম! সেলিম!

কে? এক ব্যক্তি পেছন ফিরে বললো।

আমি সেলিমকে তালাশ করছি। সে কোথায়?

সেলিম ওই মোর্চার মধ্যে আছে। সে নিজের ডানদিকে ইশারা করলো। তুমি ফউজি? দাঁড়াও! আমাকে কিছু বারুদ দিয়ে যাও।

ক্যাপ্টেনের ইশারায় তার এক সাথি মোর্চায় বসে গেলো এবং ক্যাপ্টেন ডানদিকের মোর্চার দিকে এগিয়ে গেলো। একটি গুলী তার মাথার চুল এবং অন্য একটি পিঠ স্পর্শ করে চলে গেলো।

একের পর এক মর্টারের দুটি গোলা কয়েক কদম দূরে ফাটলো। লোহার একটা ছোট টুকরা তার সাথির বাহুতে গেঁথে গেলো।

'সেলিম'! 'সেলিম'! ক্যাপ্টেন মোর্চার কাছে গিয়ে আওয়াজ দিল। কিন্তু সেলিমের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির কণ্ঠ শুনে সে হতাশ হয়ে পড়লো।

'সেলিম অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তুমি কে?' মোর্চার ভেতর থেকে একজন বললো।

ক্যাপ্টেন জবাব না দিয়ে এগিয়ে গেলো। সেলিম বস্তার আড়ালে শায়িত ছিল। ক্যাপ্টেন দ্রুত তার নাড়িতে হাত রেখে বললো, 'সে অজ্ঞান হয়ে আছে কবে থেকে?'

এই কিছুক্ষণ আগে বোমার টুকরা তার ঠ্যাংয়ে বিদ্ধ হয়ে জখম সৃষ্টি হয়। কিন্তু জখমের চাইতে জ্বরই তার জ্ঞান হারাবার জন্য বেশি দায়ী। সকাল থেকে তার কষ্ট বেড়ে গেছে। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

আমি অনেক দূর থেকে আসছি।

আপনি নৌকা চড়ে নদী পার হয়েছেন?

হ্যাঁ।

যদি নৌকা ফিরে না গিয়ে থাকে তাহলে আপনার আল্লাহর দোহাই ওকে নিয়ে যান। আমাদের বারুদ শেষ হবার পথে।

'আমার কাছে যথেষ্ট বারুদ আছে।' ক্যাপ্টেনের সাথি মোর্চায় বসে নিজের বন্দুক তাক করে বললো। 'ডাক্তার সাহেব! পরবর্তী নৌকায় যদি ফউজের লোকেরা এসে গিয়ে থাকে তাহলে অতি দ্রুত ময়দান খালি হয়ে যাবে। এখন গুলী বৃষ্টির মধ্যে এখান থেকে বের হওয়া বিপদজনক হবে।'

মোর্চায় বসা দুজন মুজাহিদ এক সাথে প্রশ্ন করলো, ফউজ আসছে?

'হ্যাঁ' ক্যাপ্টেন জবাব দিল এবং সেলিমের রাইফেল উঠিয়ে মোর্চায় বসে গেলো।

মোর্চা থেকে একজন হামাগুড়ি দিয়ে মাথা তুলে নদীর দিকে দেখলো। সে বললো, নৌকা নিচের দিকে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওরা ডান দিক থেকে হামলা করবে'।

পনর মিনিট পর ফউজের সিপাহীরা শূন্যে আলোর গোলা নিক্ষেপ করলো। একই সাথে মর্টারেরও কয়েকটা গোলা ছুঁড়ে দিল। দু'মিনিট পরেই শিখেরা এ কথা বলে ভাগতে শুরু করলো, 'ফউজ এসে গেছে'! 'ফউজ এসে গেছে'। 'বেলুচ রেজিমেন্ট এসে গেছে।'

৪

সেলিমের জ্ঞান ফিরে এলো। একটি পরিপাটি করে সাজানো কামরার পরিচ্ছন্ন বিছানায় নিজেকে দেখতে পেলো সে। কামরার ছাদের সাথে ঝুলছিল একটি বিদ্যুতের বালব। তা থেকে আলো ছিটকে পড়ছিল। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে সে তাকিয়ে রইলো বাতির দিকে। 'আমি কোথায়?' তার মনে ভাবনার উদয় হলো। এই শান্ত সমাহিত পরিবেশে সৃষ্টি হলো বিপুল আলোড়ন। চরম পেরেশানী ও অস্থিরতার মধ্যে তার দু'চোখ বন্ধ করে ফেললো। তার মাস্তিষ্কের চারপাশ ঘিরে ফেললো এক প্রকার তন্দ্রালুতা। নারী ও শিশুদের চিৎকার শুনতে পেলো সে আর শুনলো বন্দুকের ট্যার.... ট্যার.... ট্যার....। তার চোখের সামনে লাফিয়ে সাপের মতো পেঁচিয়ে ওপরের দিকে উঠছিল আগুনের শিখা। আগুনের শিখার মধ্যে দেখতে পেলো তার গ্রামের ও তার খান্দানের শিশু, নারী ও পুরুষদের চেহারা। তারপর আগুন ধীরে ধীরে নিভে গেলো এবং এই চেহারাগুলিও গায়েব হয়ে গেলো। সেলিমের আবার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। লোকদের চিৎকার ধ্বনি, বন্দুকের ঠাশ... ঠাশ, বোমার বোম ফটাশ-এর পরিবর্তে শুনছিল টেবিলের ওপর রাখা একটি টাইম পিসের টিক টিক আওয়াজ। কিছুক্ষণ পড়ে থাকলো সে চোখ বন্ধ করে। 'আমি কোথায়?' 'আমি কোথায়?' এ প্রশ্ন বারবার তার মনে ধাক্কা খেলো। বিছানার চারদিকে হাতড়ে দেখলো সে। না, এটা স্বপ্ন হতে পারে না। আবার তার চোখের পাতা খুলে গেলো। বাম হাতে ঘড়ির টিক টিক শোনা যাচ্ছিল। সামনের দেয়ালে দুটো জানালা খোলা ছিল। তার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল নিচের ফুল গাছের ফুলভরা শাখাগুলি। জানালার কাছে একটি টুলের ওপর একটি মাটির সুরাহী এবং একটি কাঁচের গ্লাস দেখা যাচ্ছিল। বাইরে ফুরফুরে বাতাসের জন্য গাছের পাতার একটা শিরশির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সেলিম বাঁপাশ বদলাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ডান হাত নাড়তে বেশ কষ্ট অনুভব করলো। বাঁ হাতটা একবার ডান বাহুর ওপর বুলাবার চেষ্টা করে দেখলো সেখানে পট্টি বাঁধা আছে। এখন তার বিশ্বাস হলো নদীর কিনারে সে যে শেষ দৃশ্য দেখেছিল সেটা স্বপ্ন ছিল না। হামলা হবার পর সে গোলাম আলী ও সাদেকের সাথে মোর্চার মধ্যে বসে গিয়েছিল। তারপর বোধ হয় সে গুলী বিদ্ধ হয়েছিল। .... না, মনে হয় তার কাছাকাছি কোথাও বোমা ফেটেছিল। তারপর কি হলো? নদী কোথায়? আমার সাথিরা কোথায়? আমি কোথায়? উহ! বোধ হয় আমি শিখদের হাতে বন্দী। কিন্তু এ বিছানা? এ কামরা? এ বিজলীর আলো? শিখেরা লাশও বিকৃত করে। আমি যদি তাদের হাতে বন্দী হতাম তাহলে আমাকে জীবিত ছাড়লো কেন? বাঁ হাতের সাহায্যে ডান বাহুটা উঁচু করে ধরে আস্তে করে

পাশ ফিরলো সে। টেবিলের পাশে চেয়ারে বসা কাউকে দেখা যাচ্ছে। পরিচিত মনে হচ্ছে। আবার তার মাথায় চক্কর দিল। এবারের বেহুশ হওয়াটা ছিল মাত্র স্বল্পক্ষণের জন্য। পাঁচ মিনিট পর আবার হুশ ফিরে এলো। এবার নিজেকে বোঝাচ্ছিল, এটা স্বপ্ন, এটা স্বপ্ন। না, এটা স্বপ্ন নয়। টেবিলে রাখা টাইম পিসের টিক .... টিক লাগাতার শোনা যাচ্ছিল। তার কাঁটা তখন ছিল চারের ঘরে।

অন্য টেবিলে ওষুধের শিশি ও ইনজেকশনের সাজ সরঞ্জাম একটা সাদা প্লেটে রাখা ছিল। বিদ্যুতের বাল্ব জ্বল জ্বল করছিল। সারা ঘর ছিল আলোয় ভরা। জানালায় দেখা যাচ্ছিল ফুলের ডালি। পাতার শির শির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সে জাগন্ত ছিল। তার জ্ঞান ছিল এবং ডান বাহুতে বেশ ব্যথা অনুভব করছিল। জিন্দেগীর একটি জীবন্ত সত্য তার সামনে ছিল। ইসমত তার কাছ থেকে মাত্র দুবিঘত দূরে একটি ইজি চেয়ারে ঘুমুচ্ছিল। চেয়ারের একটি হাতলে রাখা তার হাতটি সেলিমের এত কাছে ছিল যে চাইলে সে তাকে ছুঁয়ে দিতে পারতো 'ইসমত,' 'আমার ইসমত, 'আমার জীবন, 'আমার প্রাণ'। সে বলতে চাচ্ছিল কিন্তু তার মুখ থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল না। সে বিমুগ্ধতার এক নৈসর্গিক জগতে বিরাজ করছিল যেখানে সময়ের কাঁটা থেমে গিয়েছিল।

সাড়ে চার বেজে গেলো। আচানক টাইম পিসের এলার্ম বাজতে লাগলো। ইসমত চমকে উঠে চোখ খুললো। দ্রুত এলার্ম বন্ধ করলো। তারপর সেলিমের দিকে তাকাতে লাগলো। আচানক হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমস্ত অনুভূতি একত্র হয়ে তার চোখে জমাটবদ্ধ হলো। তার কম্পিত ঠোঁট চিরে বের হলো, 'আল্লাহ! তোমার শোকর।' এই সাথে দু'চোখ বেয়ে নামলো অশ্রুধারা। নিজের চেহারা দু'হাত দিয়ে ঢেকে নিল। 'আল্লাহ তোমার শোকর!' 'আল্লাহ তোমার শোকর।' ইসমত কাঁদতে লাগলো।

আমি ভালো আছি ইসমত। আমি ভালো আছি। সেলিম ক্ষীণ স্বরে বলে যাচ্ছিল। ইসমত চোখের পানি মুছে চেয়ার থেকে উঠলো এবং টেবিলের ওপর থেকে থার্মোমিটার তুলে নিয়ে সেলিমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, নিন, আপনার টেমপারেচারটা একবার দেখে নিন।

সেলিমের মনে কয়েকটি প্রশ্ন ছিল। ইসমত তার মুখে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে খামুশ করে দিল। প্রায় দুমিনিট পর থার্মোমিটার বের করে নিয়ে ইসমত বললো, এখন আপনার টেমপারেচার এক'শ এক।

সেলিম বললো, যদি এটা স্বপ্ন না হয়ে থাকে তাহলে আমাকে বলো আমি কোথায়?

আমরা লাহোরে আছি।

লাহোর! কিন্তু আমি এখানে এলাম কেমন করে?

আগে আপনাকে ইনজেকশনটা দিয়ে দেই তারপর সবকিছু বলছি। একথা বলে ইসমত ইনজেকশানের সরঞ্জাম তৈরি করতে লাগলো।

নাড়ী দেখার পর সেলিমের কপালে হাত রেখে আরশাদ বললো, এখন কেমন লাগছে সেলিম?

আগে আমাকে বলো নদীর কিনারে আমার সাথে যেসব লোক ছিল তাদের কি অবস্থা?

তারা সবাই পাকিস্তানে পৌঁছে গেছে।

তুমি কি ফউজের সিপাহী নিয়ে সেখানে গিয়েছিলে?

আমার সাথে মাত্র দুজন সিপাহী ছিল।

কিন্তু আমাদের নদী পার হবার সাথে সাথেই বেলুচ রেজিমেন্টের একজন হাবিলদার আটজন সিপাহীসহ সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। সে দিনের বেলায় কাফেলা থেকে কাফেলা নিয়ে গিয়েছিল। তুমি তার হাতে অতিরিক্ত হাতিয়ারও সোপর্দ করে দিয়েছিলে।

ইনজেকশান লাগাবার পর আরশাদ সেলিমের জখমে পট্টি বাঁধলো। ততক্ষণে ডাক্তার শওকতও বিছানা থেকে উঠে ভেতরে চলে এসেছিলেন।

সাম্প্রতিক বিপদ ও মর্মান্তিক যাতনা তাঁর শারীরিক কাঠামোয়ও প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। তিনি এমনই শুকিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁকে চেনাই মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তবুও সেলিমকে সুস্থ হতে দেখে তাঁর চেহারা যেন তরতাজা হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, মা ইসমত, এবার তাহলে তাদের পত্র লিখে দাও। জানিয়ে দাও সেলিম আমাদের কাছে আছে। ভালো আছে। পরশুও তাদের পত্র এসেছিল।

কাদের পত্র? সেলিম পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

আমিনার পত্র। তোমার ব্যাপারে সে খুবই পেরেশান আছে।

আমিনা কি জানে আমি এখানে আছি?

ডাঃ শওকত বললেন, না এখনো সে জানে না। আমি এখানে এসেই টাইফয়েডে আক্রান্ত হই। তাই তাকে বিস্তারিত জানাতে পারিনি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে কয়েকটি পত্র লিখেছিলাম। কিন্তু কেউ আমাকে সন্তোষজনক জবাব দেননি। ইসমতের ধারণা ছিল তুমি নদী পার হয়েই সোজা আমিনার ওখানে যাবে। তাই সে সেখানে পত্র লিখে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। কয়েকদিন পর্যন্ত আমিনার কোনো জবাব আসেনি। তোমার এখানে আসার দু'দিন আগে আমিনার স্বামীর পত্র পেলাম। তাতে জানতে পারলাম, বিলম্বের কারণ ছিল বাড়ি থেকে তাদের অনুপস্থিতি। তোমাদের গ্রামের একজন লোক ওদের জানিয়েছিল, মজিদ শিয়ালকোটে কোথাও চিকিৎসাধীন আছে। ফলে আমিনা স্বামীকে নিয়ে সেখানে চলে গিয়েছিল।

মজিদের সম্পর্কে তারা আরো কিছু জানিয়েছে কি?

তারা জানিয়েছে মজিদ সুস্থ হয়ে উঠেছে। মজিদকে সাথে করেও তারা নিয়ে এসেছে।

সেলিম নিশ্চিন্ত হয়ে বললো, মজিদ তাহলে আমিনাদের ওখানে আছে?
হ্যাঁ।
আপনি আমার ব্যাপারে কিছু লিখেছেন?
তোমার অবস্থা ভালো ছিল না। তাই আমি তাদেরকে পেরেশান করা ভালো মনে করিনি। আমার ইচ্ছা ছিল তোমার জ্ঞান ফিরে এলে তাদেরকে এখানে আসতে বলবো। ইসমত, তুমি আজই আমিনাকে পত্র লিখে দাও।
না, আমি নিজেই সেখানে যাবো। মজিদের কাছে আমিনার থাকা দরকার।
আরশাদ বললো, হ্যাঁ আব্বাজান! মেয়েদের পক্ষে গাড়িতে সফর করা এখন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাছাড়া কলেরারও ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। আমি নিজেই ওদেরকে একটা সান্ত্বনা পত্র লিখে দিচ্ছি।
আরো দশদিন পার হয়ে গেলো। সেলিমের জখম এখন ভালো হয়ে গিয়েছিল। একদিন সকালে সে বিছানায় শায়িত ছিল। ইসমত ও রাহাত বারান্দায় নামায পড়ছিল। জানালার সামনের গাছে পাখিরা কিচির মিচির করছিল। দুটি পাখি গাছ থেকে উড়ে এসে জানালায় বসলো। সেলিম তাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো। খানিকক্ষণের মধ্যে তাদের কাছে আরো কয়েকটি পাখি এসে বসলো।
সেলিম আস্তে করে উঠে বসে দেয়ালের গায়ে মাথাটা ঠেকিয়ে দিল। পাখিরা উড়ে গেলো। বারান্দায় কারোর পায়ের শব্দ শোনা গেলো। সেলিম দ্রুত হাত বাড়িয়ে বিছানার কাছে রাখা থার্মোমিটারটা খুলে মুখের ভেতর রেখে দিল।
ইসমত ভেতরে প্রবেশ করলো। সেলিমের মুখে থার্মোমিটার দেখে তার ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। সেলিম হাতের ইশারা করতেই সে চুপি চুপি বসে পড়লো।
রাহাত দরোজায় মুখ বাড়িয়ে বললো, আপা নাশ্‌তা তৈরি করবো?
হ্যাঁ জলদি করো।
ভাইজান! আপনার অবস্থা কেমন?
সেলিম মুখ থেকে থার্মোমিটার বের করে ইসমতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আমি ভালো আছি রাহাত!
রাহাত চলে গেলো। ইসমত থার্মোমিটার দেখে বললো, আজ আপনি একদম সুস্থ।
ডাক্তার সাহেব ও আরশাদ কি চলে গেছে?
তারা আজ রাতে আসেননি। ক্যাম্পে জখমীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। ওদিকে কলেরার প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি হয়ে গেছে। এভাবে বসতে নিশ্চয়ই আপনার কষ্ট হচ্ছে। আমি আপনার জন্য বালিশ আনছি। ইসমত উঠে অন্য কামরায় চলে গেলো।
পাখিরা আবার জানালায় জড়ো হচ্ছিল। ইসমত বালিশ নিয়ে এলে সেলিম হাতের ইশারায় তাকে থামাতে চাইলো। ইসমত পেরেশান হয়ে নিশব্দে চুপিচুপি

এগিয়ে আসতে আসতে বললো, কি ব্যাপার? চড়ুইগুলি আচানক উড়ে গেলো। সেলিম বললো, তুমি ওদেরকে ভয় পাইয়ে দিয়েছো।

এই চড়ুইগুলি? ইসমত তার মাথার নিচে বালিশ ঠেকিয়ে দিতে দিতে বললো, 'আপনি যখন বেহুশ ছিলেন তখন এরা এসে কোনো কোনোদিন আপনার বিছানার ওপর বসে থাকতো।

গ্রামের চড়ুইগুলি আমাকে একদম ভয় পেতো না। আর ছোটবেলায় কাকের তো আমার সাথে এমনই দোস্তী ছিল যে তারা এসে আমার হাত থেকে রুটির টুকরা তুলে নিয়ে যেতো। চড়ুইয়ের বাচ্চারা কখনো বাসা থেকে পড়ে গেলে তাদের উঠিয়ে নিয়ে আবার বাসার মধ্যে রেখে দিতাম। আমাদের বাড়িতে অনেক পাখি আসতো। ভরা বর্ষার দিনগুলোতে আমি তাদের জন্য ছাদের ওপর শস্যদানা ছড়িয়ে দিতাম। মজিদ কখনো ওদের ধরার জন্য ছাদে ফাঁদ পেতে রাখতো। কিন্তু আমি এজন্য তার সাথে ঝগড়া করতাম। আমি তাকে বলতাম, এ পাখিগুলি আমার। তুমি বাইরে গিয়ে পাখি ধরো। ইসমত, আমি কখনো চিন্তা করি সেই পাখিগুলি এখন কি ভাবছে? তাদের কিচির মিচির এখন কে শুনছে? তারা দেখছে ছাইয়ের স্তূপ। তারা হয়তো বিশ্বাস করতে পারছে না এটা সেই গ্রাম। এটা সেই বাড়ি! সেলিম আচানক খামুশ হয়ে গেলো।

ইসমত অশ্রুভেজা চোখে কিছুক্ষণ তাকে দেখতে থাকলো। সেলিম এতদিন তার বাড়ি বা গ্রামের প্রসংগ আলোচনাকে এড়িয়ে চলছিল। কেউ এ প্রসংগ উঠালেই সে সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে প্রসংগের ইতি টানার চেষ্টা করতো। কিন্তু আজ নিজের গড়ে তোলা নিয়ম বিরোধী অনেক কথাই বলতে চাচ্ছিল সে। ইসমত ইতস্তত করে বললো, যদি আপনি মনে করেন আমার জিজ্ঞেস করার হক আছে তাহলে সব ঘটনা আমাকে শোনান।

ইসমত, আমি ভাবতাম মানুষকে কেবল মনোমুগ্ধকর কাহিনী শোনাবার জন্য আমার জন্ম হয়েছে এবং তোমার জন্ম হয়েছে কেবল ফুলের সাথে খেলা করার জন্য। কিন্তু এখন আমার ঝুলিতে ভস্মীভূত ছাই ছাড়া আর কিছুই নেই। তোমার মনে আছে ইসমত! যখন ছোটবেলায় আমি তোমাকে ভয়াবহ সব কাহিনী শুনাতাম তখন তোমার চেহারায় ভীতি ও আতংকের ভাব লক্ষ্য করে আচানক আমি কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দিতাম। আসলে আমি তোমার মুখে কেবল হাসিই দেখতে চাইতাম। আমার মনে আছে একবার তোমাকে পেরেশান করার জন্য আমি জেনে বুঝে আমার কাহিনীকে বিষাদময় পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার কাহিনীর নায়ককে আমি অজগরের মুখোমুখি করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার চোখে অশ্রু দেখে আমি এটা বরদাশত করতে পারলাম না। আমি বলেছিলাম অজগরের ওপর আকাশ থেকে বজ্রপাত হলো এবং আমার নায়ক বেঁচে গেলো। এখন আমার কাহিনীও মানুষ ও অজগরের কাহিনী। মানুষেরা ঘুমিয়েছিল এবং অজগররা তাদের

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হায়, আমি যদি তাদের ওপর বজ্রপাত করতে পারতাম এবং এই কাহিনীর পরিণাম বদলে দিতে সক্ষম হতাম! কিন্তু ইসমত, আমি বলবো সেই দিনের ইন্তিজার করো, যেদিন আমি তোমাদের কাছে এসে একথা বলতে পারবো আমরা সেই ভয়ংকর অজগরদের চোয়াল গুঁড়িয়ে দিয়েছি এবং আমরা লোকালয় থেকে মানুষখেকো নেকড়েদেরকে বিতাড়িত করেছি।

ইসমত বললো, আমি অজগর ও নেকড়েদেরকে দেখেছি। এখন আমি সব কাহিনী শোনার ক্ষমতা রাখি। আপনি সেদিন বলেছিলেন, 'এ ছাইগুলি আপনার পুঁজি।' কিন্তু ওগুলি কেবল আপনার নয়, আমাদের দুজনের পুঁজি। আমি কেবল আপনার হাসির অংশীদার নই, আপনার অশ্রুর আপনার বেদনারও অংশীদার। আপনার বাগিচার ফুল যদি আমার জন্য থেকে থাকে তাহলে আপনার ভস্মীভূত বাগিচার জ্বলন্ত অংগারও আমার জন্য। আপনি নিসংগ নন। আব্বাজান বলেছিলেন, কথা বললে আপনার মনের বোঝা হালকা হয়ে যাবে। আপনার পরিবার সম্পর্কে অন্যদের থেকে আমি অনেক কিছু শুনেছি। কিন্তু আমার অভিযোগ, এখনো আমি আপনার মুখ থেকে আপনার নিজের কথা শোনার যোগ্যতা অর্জন করতে পারলাম না।

ইসমত আমি চাই না আমার মনের বোঝা হালকা হোক। কিন্তু আমি তোমাকে বলবো। আমি তোমাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলবো। এ কথা বলে কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর সেলিম তার নিজের ঘটনা বলতে শুরু করলো। যখন সে তার বাড়ির শেষ দৃশ্য বর্ণনা করছিল, ইসমতের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল টপ টপ করে। সেলিম বললো, ইসমত তুমি কাঁদছো?

ইসমত দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে বললো, এটা আমার শেষ অশ্রু।

বাইরে কারোর পদশব্দ শুনে সে দরোজার দিকে তাকালো। আরশাদ দরোজায় পা রেখেই বললো, কি অবস্থা এখন সেলিম?

আমি বেশ ভালো। সে জবাব দিলো।

আরশাদ ইসমতের দিকে তাকালো সে বললো, আজ টেমপারেচার নিরানব্বুইয়ের একটু বেশী।

ইনশা আল্লাহ আগামীকাল পর্যন্ত একদম ঠিক হয়ে যাবে। নাশ্‌তা তৈরি হয়নি?

বাবুর্চিখানা থেকে রাহাতের আওয়াজ এলো, নাশ্‌তা তৈরি ভাইজান! আমি এখনি নিয়ে যাচ্ছি।

ইসমত জিজ্ঞেস করলো, আব্বাজান আসেননি?

তিনি সম্ভবত আরো কয়েকদিন আসবেন না। গতকাল দুপুরে তিনি ওয়াগায় চলে গিয়েছিলেন। তারপর সেখান থেকে খবর এসেছিল বিকেল পাঁচটার মধ্যে দু'লাখ শরনার্থীর কাফেলা ওয়াগায় পৌঁছে যাবে। এই কাফেলায় কয়েক হাজার রুগী ও জখমী আছে।

রাহাত নাশতা ও চা আনলো। আরশাদ দ্রুত এক পেয়ালা চা পান করে উঠে পড়লো। সে যেতে যেতে বললো, সেলিম তুমি নিশ্চিন্তে তোমার অংশের চাটুকু খেয়ে ফেলো। আমি বারোটার পর আর একবার আসবো।

সেলিম বললো, আরশাদ আমি যেতে চাই।

কোথায়? আরশাদ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলো।

আমিনাদের ওখানে। এখন আমি সফর করতে পারবো।

আরশাদ পুনর্বার চেয়ারে বসতে বসতে বললো, সেলিম, এখনো তুমি সুস্থ হয়ে ওঠোনি। আরো এক সপ্তাহ আমি তোমাকে বাইরে বের হবার অনুমতি দেবো না। এখানে বসে বসে তুমি সফরের কঠিন সমস্যাবলী আন্দাজ করতে পারবে না। ইসমত, তুমি আমিনাকে পত্র লিখে জানিয়ে দাও সেলিম এখন একেবারেই সেরে উঠেছে। দশদিনের মধ্যে সে তোমাদের বাড়িতে আসছে।

না, না, তাকে কেবল এতটুকু লিখে দাও, আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি এবং শিগগির তাদের বাড়িতে আসছি।

পাঁচ দিন পর। সেলিম, আরশাদ ও ডা. শওকত দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। ইসমত ও রাহাত দুজন প্রতিবেশী মেয়ের সাথে অন্য কামরায় বসে গল্প করছিল। এমন সময় বাড়ির বাইরে সড়কের ওপর একটি ফউজি ট্রাক এসে থামলো। এক নওজোয়ান ট্রাক থেকে নেমে সদর দরোজায় এসে আওয়াজ দিল, 'ডাক্তার সাহেব!'

কে? নওকর বাবুর্চিখানা থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

নওজোয়ান এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, ডাক্তার শওকত সাহেব কি এখানে থাকেন?

হ্যাঁ, তিনি ভেতরে খাবার খাচ্ছেন। আপনি বারান্দায় চেয়ারে বসেন। তিনি এখনি বাইরে আসবেন। নওজোয়ান বারান্দার কাছে পৌঁছে বললো, আমার তাড়া আছে আমি সেলিমের সাথে দেখা করতে চাই। সে ডাক্তার সাহেবের এখানে আছে।

এ আওয়াজ সেলিমের কানে অপরিচিত ছিল না। রুটির টুকরা তার গলা থেকে আর নামলো না। সে দ্রুত উঠে 'মজিদ' 'মজিদ' বলতে বলতে বাইরে বের হয়ে এলো।

মজিদ ফউজি পোশাক পরেছিল। আগের চাইতে অনেকটা হ্যাংলা পাতলা দেখাচ্ছিল তাকে। সেলিম তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

আরশাদ ও ডা. শওকত বাইরে এলেন। মজিদ বললো, ডা. সাহেব, মাফ করবেন। অসময়ে আমি আপনাদের কষ্ট দিলাম। কিন্তু কি করবো আমার হাতে সময় খুব কম।

ডা. শওকত এগিয়ে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। 'সময় যতই কম থাক, চলো কিছু খেয়ে নেবে।'

আমি খেয়ে বের হয়েছি।

আরশাদ তার বাহু ধরে বললো, চলেন ভেতরে গিয়ে বসি।

আমি এখান থেকে অনুমতি নিয়ে নিলে ভালো হয়। আমার সাথিরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

আচ্ছা আপনি ভেতরে চলেন। আমি ওদেরকে নিয়ে আসছি।

না, আমি ফেরার পথে এখানে বসবো।

তুমি কোথায় যাচ্ছো? সেলিম জিজ্ঞেস করলো।

আমি আজ সকালে এখানে পৌঁছেই হেড কোয়ার্টারে রিপোর্ট করেছিলাম। সেখান থেকে আমাকে কনভয় নিয়ে লুধিয়ানায় পৌঁছার হুকুম দেয়া হয়েছে। লুধিয়ানার কাছে পঞ্চাশ হাজার মুহাজিরদের একটি কাফেলা আমাদের ইন্তিজার করছে। আমি এক মিনিট সময় নষ্ট না করে সেখানে পৌঁছতে চাচ্ছি। বেলা দুটায় আমরা এখান থেকে রওনা দেবো। এখন একটা বেজে চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে।

তোমার শরীর এখন ভালো?

আমি একদম সুস্থ সেলিম। তোমার শরীর?

আমিও সুস্থ।

মজিদ বললো, দাউদ ....?

সে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছে। সেলিম ধীর কণ্ঠে বললো।

আর অন্যরা?

সাদেক ও গোলাম আলীও শেষ সময় পর্যন্ত আমার সাথেই ছিল। তারা পাকিস্তানে এসে গেছে।

আচ্ছা সেলিম। এখন আমি যাচ্ছি। তুমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলে যখন সফর করতে পারবে, আমিনাদের বাড়িতে অবশ্যই যাবে। সে তোমার কথা বারবার বলছে। বশিরকে সেখানে রেখে এসেছি।

আমি আগামীকালই যাবার ইরাদা করেছি।

মজিদ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, ঠিক আছে। এখন আমি তাহলে চলি। দুটার আগেই আমাকে ছাউনিতে ফিরে যেতে হবে। মজিদ মুসাফাহার জন্য ডাক্তারের দিকে হাত বাড়ালো। কিন্তু তিনি বললেন, আমি সড়ক পর্যন্ত তোমার সাথে যাচ্ছি।

ইসমত ও রাহাত দরোজায় দাঁড়িয়ে বাইরে উঁকি মারছিল। যখন ডা. শওকত, আরশাদ ও সেলিম মজিদকে বিদায় দেবার জন্য বাইরে চলে গেলো, তারা বারান্দায় বের হয়ে এলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রাকের ইঞ্জিন সচল হলো। একটি মেয়ে ইসমতের কাঁধে হাত রেখে বললো, লোকটি কে ছিল?

ইসমত মুখ ফিরিয়ে বললো, এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে এই একটু আগেই আমি তোমাদের বলছিলাম।

মাইডিয়ার লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন,

আপনাকে জানানো যাচ্ছে, আমার রাজ্যে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি অবিলম্বে আপনার সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করছি। বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দুস্তান থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। বলা বাহুল্য যতক্ষণ না আমার রাজ্য (কাশ্মীর) হিন্দুস্তানের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ হিন্দুস্তান আমার আবেদনে সাড়া দিতে পারে না। কাজেই আমি সংযুক্তির ফায়সালা করে ফেলেছি এবং সংশ্লিষ্ট আবেদন আপনার মনজুরীর জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার রাজ্য রক্ষা করতে হলে এখনি শ্রীনগরে সাহায্য পাঠানো দরকার।

আপনার একান্ত
হরি সিং

আমার প্রিয় মহারাজা সাহেব,

আপনার বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার সরকার হিন্দুস্তানের সাথে কাশ্মীর রাজ্যের সংযুক্তি মনজুর করার ফায়সালা করেছে। আপনার আবেদনক্রমে হিন্দুস্তানী ফউজ কাশ্মীরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তারা আপনার সেনাদলকে রাজ্যের প্রতিরক্ষা এবং আপনার প্রজাদের জান-মাল-ইজ্জত-আবরুর হেফাজতে সাহায্য করতে পারে………

আপনার বড়ই একান্ত
মাউন্ট ব্যাটেন অফ বর্মা, গবর্ণর জেনারেল
হিন্দুস্তান।

যে নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রও প্রতারণামূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে দিল্লী থেকে নিয়ে ওয়াগাহ পর্যন্ত মুসলমানদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হচ্ছিল, যে জন্য আশি লাখ মুসলমানকে পাকিস্তানের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল, যে জন্য র‍্যাডক্লিফের বিবেক কিনে নেয়া হয়েছিল, যে জন্য পাকিস্তানের সেনাদলকে কার্যত দেশের বাইরে রাখা হয়েছিল এবং যে জন্য পাকিস্তানের অংশের অস্ত্রশস্ত্রও সামরিক সরঞ্জাম হিন্দুস্তানে আটকে দেয়া হয়েছিল এ দুটি পত্র ছিল তারই একটি আনুষ্ঠানিক গ্রন্থী।

যে ডোগরা শাসনকর্তা মাত্র কয়েকলাখ টাকার বিনিময়ে কাশ্মীরের মুসলমানদের স্বাধীনতা কিনে নিয়েছিল রাজা হরি সিংয়ের শিরায় তারই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল।[৫] আর মাউন্ট ব্যাটেন ছিল সেই ফিরিংগী ব্যবসায়ীদের স্থলাভিষিক্ত যারা কাশ্মীরের মুসলমানদের আজাদী ও ইজ্জতের মূল্য আদায় করে নিয়েছিল।

৫. অমৃতসর চুক্তির ভিত্তিতে ইংরেজরা কাশ্মীরকে ৭৫ লাখ টাকার বিনিময়ে জম্মুর শাসকদের হাতে বিক্রি করে দিয়েছিল।

কাশ্মীরের পয়ত্রিশ লাখ মুসলমানকে আর একবার বিক্রি করা হচ্ছিল। কিন্তু এবারকার এ লেনদেন ছিল স্বৈরাচারী ডোগরা শাসক ও হিন্দু ফ্যাসিবাদের মধ্যে। মাউন্ট ব্যাটেন অফ বর্মা এই নিকৃষ্ট লেনদেনের ক্ষেত্রে নিছক একজন দালাল হিসাবে কাজ করছিল। হিন্দুস্তানের মঞ্চে রক্তাক্ত নাটকের একটি নতুন অভিনয় শুরু হয়েছিল। একদিকে নেহরু ও প্যাটেল তাদের হিংস্র মানুষখেকো নেকড়ের ফউজ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল অন্যদিকে হরি সিং নিজের হিংস্র হায়েনা স্বভাবের সেনাদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিল এবং কাশ্মীরি মুসলমানরা আর্ত, আতংকিত ও মজলুম মানবতার রূপে হস্ত পদ শৃংখলিত অবস্থায় তাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল। স্টেজের পর্দার পেছনে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন অব বর্মা এই নাটকের ডাইরেকটর হিসাবে দাঁড়িয়েছিল। এটা ছিল ভেড়া ও নেকড়ের খেলা। নেকড়ারা ভেড়ার পালের ওপর হামলা করার আগে ভেড়াদের নিশ্চিন্ত করার জন্য একটা ভেড়াকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিল। দেশ বিভাগের কিছুদিন পূর্বে যে শেখ আবদুল্লাকে হরি সিং বিদ্রোহের অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল, যাকে সাহায্য করার জন্য দেশ বরেণ্য

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কোহালার পুল পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং তারপর ডোগরাদের উদ্যত সংগীন দেখে ফিরে এসেছিলেন, এখন তাকে হিন্দু ফ্যাসিবাদ ও ডোগরা স্বৈরাচারী জুলুমতন্ত্রের একটি সাময়িক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য কারামুক্ত করে ক্যাবিনেট গঠনের দাওয়াত দেওয়া এবং হরি সিংয়ের মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে পত্র লেখা–এগুলি ছিল নিছক আনুষ্ঠানিকতা পালন করার ব্যাপার। নয়তো প্রকৃত সত্য এই ছিল যে, পূর্ব পাঞ্জাব ও অন্যান্য রাজ্যগুলির ন্যায় কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে ধ্বংস ও নির্মূল করার পরিকল্পনা অনেক আগেই তৈরি করা হয়েছিল। মাউন্ট ব্যাটেনের সহকর্মী র‍্যাডক্লিফ পূর্ব পাঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুসিত এলাকাগুলি হিন্দুস্তানে শামিল করে দিয়ে কাশ্মীরের একটি প্রান্তকে হিন্দুস্তানের সাথে মিলিয়ে দিয়েছিল এবং গান্ধীর বংশবদ শিষ্য লাখো মুসলমানদের লাশের ওপর দিয়ে হিন্দু ফ্যাসিবাদের রথ টেনে নিয়ে যাবার জন্য কাশ্মীরী মুসলমানদেরকে আগুন ও খুনের দরিয়ার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিল।

১৫ আগস্টের পূর্বেই পাতিয়ালার মহারাজা ও কাশ্মীরের মধ্যে চক্রান্তের সিলসিলা শুরু হয়েছিল। কাশ্মীরের সীমান্তের সাথে লাগোয়া পশ্চিম পাঞ্জাবের শিয়ালকোট, গুজরাট, ঝিলাম ইত্যাদি জেলার শিখদেরকে কাশ্মীরে স্থানান্তরিত হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সেপ্টেম্বরে পূর্ব পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তান থেকে রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ, আজাদ হিন্দ ফউজের সিপাহী, আকালী সেনা ও পূর্ব পাঞ্জাবের রাজ্যগুলির দাংগাড়ে দলগুলি জম্মুর বিভিন্ন জেলায় প্রবেশ করে লুটতরাজ ও গণহত্যা শুরু করে

দিয়েছিল। জম্মুর মুসলিম পল্লীগুলি থেকে উত্থিত আগুনের শিখা শিয়ালকোট থেকে দেখা যাচ্ছিল। সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত হাজার হাজার শরণার্থী পূর্ব পাঞ্জাবে প্রবেশ করেছিল। এই সংগে এই ধরনের খবরও ছড়িয়ে পড়ছিল : কাশ্মীরের রাজা হিন্দুস্তানের সাথে সংযুক্তির ফায়সালা করে ফেলেছেন। কাশ্মীরের একটি প্রান্তকে হিন্দুস্তানের সাথে মিলাবার জন্য সরু সরু রাস্তাগুলিকে বড় বড় সড়কে পরিণত করা হচ্ছে। রাবীর ওপর পুল বানানো হচ্ছে। এসব ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়ে গেলে কাশ্মীরের ডোগরা শাসক হিন্দুস্তানের সাথে সংযুক্তির কথা ঘোষণা করে দেবে। কাশ্মীরের শতকরা নব্বুই ভাগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনবসতি এখন জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে আটকে গিয়েছিল। যেসব রক্তাক্ত তলোয়ার ইতিপূর্বে পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, কাপুরথলা, নাভ, পাতিয়ালা, ভরতপুর ও ইলোরে লাখো নিরস্ত্র মুসলমানদের জবেহ করেছিল, কাশ্মীরের ৩৫ লাখ মুসলমান এখন সেইসব রক্তাক্ত তলোয়ারকে নিজেদের 'শাহরগের নিকটবর্তী দেখছিল। তাদের মা-বোনদের দিকে সেই হিংস্র দানবদের হাত এগিয়ে আসছিল যারা কাশ্মীরের শিকার ক্ষেত্রে প্রবেশ করার আগে যমুনার এপার থেকে শুরু করে রাভীর কিনারা পর্যন্ত মজলুম ও অসহায় মানবতার পাশ্চাদ্ধাবন করেছিল।

কাশ্মীরের পুষ্প শোভিত উপত্যকা এবং জাফরানের ক্ষেতগুলির হিন্দুস্তানী সওদাগররা প্রবল বাতাসের দোলায় সওয়ার হয়ে এসেছিল। এটা ছিল জওহরলাল নেহরুর পিতৃভূমি। তিনি হয়েছিলেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী। তাই কাশ্মীরের ৩৫ লাখ মুসলমানকে তাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা গান্ধীজী নিজের মানবিক কর্তব্য মনে করলেন।

কাশ্মীরের সীমান্ত তিব্বত, রাশিয়া ও চীনের সাথে মিশেছিল। আর এখন মাউন্ট ব্যাটেন ও র‍্যাডক্লিফ তার এক প্রান্ত হিন্দুস্তানের সাথে মিলিয়ে দিয়েছিল। এ জন্য পণ্ডিত নেহরু বলতেন, হিন্দুস্তান কাশ্মীরের ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। কাশ্মীরে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কাশ্মীরের মুসলমানদের সামনে ছিল অন্ধকার গর্ত এবং পেছনে আগুনের লেলিহান শিখা। তাদের শেষ আশা ছিল পাকিস্তান। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান যেসব ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হচ্ছিল তা নেহরু, প্যাটেল, হরি সিং ও মাউন্ট ব্যাটেনকে এ নিশ্চয়তা দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, হিন্দুস্তান কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয়েই কাশ্মীরকে গ্রাস করে নিতে পারে।

হিন্দুস্তানের সাথে কাশ্মীরকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে রাজার সবচেয়ে বেশি আশংকা ছিল পুনছের মুসলমানদের বিরোধিতার। পুনছের অধিবাসীদের মধ্যে ছিল ষাট হাজার সাবেক ফউজী। তারা ইতিপূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মালয়, বর্মা, লিবিয়া ও ইটালীর রণক্ষেত্রে লড়াই করেছিল। এরা সবাই জানতো, হিন্দুস্তানের সাথে কাশ্মীরকে সংযুক্ত করা হলে তাদের পরিণাম কি হবে। পুনছের যেসব সিপাহী পাকিস্তানী সেনাদলে ছিল এবং সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর

পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে চাকুরীরত ছিল তারা এলাকার যে রাজ্যগুলি হিন্দুস্তানের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল সেখানকার মুসলমানদের পরিণাম সম্পর্কে বেখবর ছিল না।

কাশ্মীর সরকার তাদেরকে আতংকগ্রস্ত করার জন্য ডোগরা সিপাহীদেরকে খুন, হত্যা ও লুটতরাজ করার হুকুম দিয়েছিল। এই জুলুমের জবাবে পুনছের মুসলমানরা পাকিস্তানের পক্ষে আওয়াজ বুলন্দ করলো। জুলুম বেড়েই চললো। এই সংগে এই আওয়াজও জোরদার হতে থাকলো। পুনছের মুসলমানরা নিজেদের শিশু সন্তান, বৃদ্ধ ও যুবকদেরকে রক্তাক্ত হতে এবং নিজেদের ঘরবাড়ি জ্বলে ভস্মীভূত হতে দেখছিল। ভবিষ্যত সম্পর্কে তাদের কোনো ভুল ধারণা ছিল না। রাজা ফউজকে এই মর্মে পূর্ণ ক্ষমতা দান করেছিল যে, তাদের হুকুম যে ব্যক্তি অমান্য করবে বলে সন্দেহ করা হবে তাকে সংগে সংগেই গুলী করে উড়িয়ে দিতে পারবে।

পানি মাথা ছাপিয়ে উঠেছিল। এ অবস্থায় পুনছের মুসলমানরা শেষ ফায়সালা করতে বাধ্য হয়েছিল। যখন পাকিস্তানে নেতারা বক্তৃতা, বিবৃতি, প্রতিবাদ ও প্রস্তাব পেশ করার রাজনীতির পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিল তখন পুনছের নিরস্ত্র, নিসম্বল কিন্তু দৃঢ়চিত্ত একদল মানুষ উঠে দাঁড়ালো। তারা স্বৈরাচার ও জুলুমের তুফানের সামনে বুক পেতে দিল। সেই সব নাম গোত্রহীন সিপাহীরা নিসন্দেহে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় অনুগ্রাহক ছিল। তারা বুকে গুলী খেয়ে ডোগরা সিপাহীদের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছিল। জাতি সেই সব শহীদদের কথা কোনোদিন ভুলতে পারে না যারা সর্ব প্রথম ডোগরা নির্যাতনের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিল।

মুমিন যখন মৃত্যুর সামনে সিনা টান করে দাঁড়িয়ে যায় তখন জীবন তার পদচুম্বন করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আর একবার এই সত্যটিকে সুস্পষ্ট করতে চাচ্ছিলেন। পুনছের যুদ্ধ কাশ্মীরের জনগণের যুদ্ধ এবং কাশ্মীরের জনগণের যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের জনগণের যুদ্ধে পরিণত হলো। পুনছের মুজাহিদরা একটি জাতির স্থায়িত্বের যুদ্ধের সূচনা করেছিল এবং জাতি বলছিল, আমি জীবিত আছি। যে শ্লোগান পুনছে উচ্চকিত হয়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই তা পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের ময়দান থেকে নিয়ে ওয়াজিরিস্তান ও চিত্রালের পাহাড় পর্বতেও গুঞ্জরিত হতে থাকলো। উপজাতীয় মুজাহিদরা তাদের ভাইদের আহ্বান শুনলো এবং তাদের সাহায্যার্থে পৌছে গেলো। ডোগরারা পালাচ্ছিল। সেবক সংঘী ও আকালীরা পালাচ্ছিল। মুজাহিদদের মনজিলে মকসুদ ছিল শ্রীনগর।

অবস্থার এ পরিবর্তন হিন্দুস্তান ও কাশ্মীরের সরকারের প্রত্যাশা বিরোধী ছিল। রাজা হরি সিং তার প্রিয় মাউন্ট ব্যাটেনকে লিখলো, আমি আপনার আশু সাহায্য কামনা করি। মাউন্ট ব্যাটেন সংগে সংগেই জবাব দিল, হিন্দুস্তানী ফউজকে কাশ্মীরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা আপনার ফউজকে রাজ্যের প্রতিরক্ষা এবং জনগণের জান-মাল ইজ্জতের হেফাজতে সাহায্য করবে।

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন অফ বর্মা পূর্ব পাঞ্জাব ও রাজ্যগুলিতেই কেবল নয় বরং দিল্লীতে নিজের ভবনের আশে পাশে মুসলমানদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড একজন

দর্শকের মতো দেখে গেছেন। যখন মুহাজিরদের ক্যাম্প, কাফেলা ও গাড়িগুলিকে হামলা হচ্ছিল, হাজার হাজার মুসলমান মেয়ের ইজ্জত আব্রু লুট করা হচ্ছিল, মাউন্ট ব্যাটেনের কানে তার কোনো আওয়াজই পৌঁছেনি। তারপর যখন পূর্ব পাঞ্জাব ও রাজ্যগুলি থেকে মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করার পর হিন্দুস্তানের সন্ত্রাসী ও দাংগাবাজ শক্তি জম্মুতে ব্যাপক ধ্বংস যজ্ঞ চালাচ্ছিল এবং হরি সিংয়ের ডোগরা নেকড়েরা কাশ্মীরের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলছিল তখন মাউন্ট ব্যাটেন অফ বর্মার ধ্যান ভংগ হয়নি।

যখন জম্মু থেকে হরণকৃত মুসলমান মেয়েদেরকে পূর্ব পাঞ্জাবের বাজারগুলিতে বিক্রি করা হচ্ছিল। কাশ্মীরের রাজা ও তার প্রিয় মাউন্ট ব্যাটেনের তখন কাশ্মীরের প্রজাবর্গের জান-মাল-ইজ্জত-আবরুর হেফাজতের খেয়াল হয়নি। কিন্তু কাশ্মীরকে হিন্দুস্তানের ঝুলিতে নিক্ষেপ এবং একজন জালেম ও বর্বর শাসকের টলটলায়মান কর্তৃত্বের প্রাসাদকে সহয়তা দান করার জন্য মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে ফউজ ছিল, ট্যাংক এবং হাওয়াই জাহাজও ছিল। বিলাতের শাদা দেবতা তার কালো পূজারীদের কাছ থেকে নিজের নিকৃষ্টতম উদ্দেশ্যকে উৎকৃষ্টতম শব্দের আবরণে লুকাবার কৌশল রপ্ত করে নিয়েছিল।

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন সম্ভবত বিশ্ব জনমতকে নিশ্চিন্ত করার জন্য একথা ঘোষণা করেছিল যে, যখন কাশ্মীরের অবস্থা শান্ত হয়ে যাবে, কাশ্মীরের জনগণের মতামতের ভিত্তিতে হিন্দুস্তানের সাথে তার সংযুক্তির ব্যাপারটি ফায়সালা করা হবে। কিন্তু প্রকৃত সত্য মাউন্ট ব্যাটেনের চাইতে বেশি আর কেউ জানতো না যে, ডোগরা, শিখ, রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ ও হিন্দুস্তানী ফউজের ট্যাংক, কামান ও যুদ্ধ বিমানগুলি গণভোটের ব্যাপারে হিন্দুস্তানের পেরেশানী দূর করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করবে না। মৃতরা ভোট দেয় না।

সেলিম কয়েক সপ্তাহ থেকে লা-পাত্তা ছিল। তার লাহোর থেকে রওনা দেবার পর ইসমত আমিনার কাছে পত্র লিখে তার কুশল জানতে চেয়েছিল। জবাবে আমিনা জানিয়েছিল, সেখানে পৌঁছার তিন দিন পর সে খবরের কাগজে তার কোনো বন্ধুর বিজ্ঞপ্তি দেখেছিল। তাতে লেখা ছিল তিনি পূর্ব পাঞ্জাব থেকে হিজরত করে কাসূরে নিজের কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছেন। এ বিজ্ঞপ্তি পড়েই পরদিন কোনো প্রকার নিষেধ না শুনে সে কাসূরে রওনা হয়ে গিয়েছিল। পনর দিন পর আরশাদ সেলিমের পত্র পেলো। তাতে সে লিখেছিল, আমি কাসূরের ক্যাম্পে রেজাকারদের সাথে কাজ করছি। এখানে আমার মামাদের গ্রামের কিছু লোকের সাথে দেখা হয়েছে। তাদের থেকে জানলাম, মামাজান তাঁর খান্দানের লোকদের

নিয়ে বাহাওয়ালপুর পৌঁছে গেছেন। তাই এখন আমিও সেখানে যাচ্ছি। ইনশা আল্লাহ সেখান থেকে সোজা লাহোরে চলে আসবো।

এরপর আর কয়েকদিন সেলিমের কোনো পত্র আসেনি। ফলে ইসমতের পেরেশানী আশংকায় পরিণত হতে থাকলো। ডা. শওকত মেয়ের শোকার্ত চেহারা দেখে প্রতিবারই তাকে সান্ত্বনা দিতেন এই বলে যে, মুহাজিরদের ক্যাম্পের অবস্থা খুবই খারাপ। এ অবস্থায় সেলিমের মতো ছেলে কিভাবে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে। সে সম্ভবত বাহাওয়ালপুরের ক্যাম্পগুলিতে কাজ করছে। এ ধরনের লোকদের প্রয়োজন সর্বত্র।

ইসমত কখনো কখনো জখমী ও রুগ্ন মেয়েদের সেবা করার জন্য বাপের সাথে ক্যাম্পে চলে যেতো। ধীরে ধীরে এ কাজে তার আগ্রহ বেড়ে যেতে থাকলো। এরপর সে যথারীতি ক্যাম্পের সেবা কর্মের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেলো।

ক্যাম্পে কলেরা মহামারী প্রতিরোধ এবং জখমীদের সেবা শুশ্রূষা করার ক্ষেত্রে বিরাট সংকট দেখা দিল। কাজ এত বেশি বেড়ে গেলো যে, ডিগ্রীধারী ডাক্তারের অভাবে সামান্য কিছু চিকিৎসা জ্ঞানের অধিকারীদেরকেও গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হচ্ছিল।

কাশ্মীরের জিহাদ শুরু হবার পর আরশাদ লাহোর থেকে বদলী হয়ে রাওয়ালপিণ্ডি চলে গেলো। বিদায় নেবার সময় ইসমত ইতস্তত করে ভাইকে বললো, ভাইজান! আমার স্থির বিশ্বাস সে কাশ্মীরে চলে গেছে। হয়তো রাওয়ালপিণ্ডি থেকে আপনি তার পাত্তা পেয়ে যাবেন।

ইসমত, আমি কয়েকদিন থেকে ভাবছিলাম, যদি সেলিম সেখানে থাকে তাহলে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে তার সন্ধান নেয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে না। আমি ইনশা আল্লাহ শিগগিরিই তোমাকে জানাতে পারবো।

ইসমত ইতস্তত করে বললো, ভাইজান.........।

বলো ইসমত কি বলতে চাও।

ভাইজান, কাশ্মীরে নিশ্চয়ই জখমী মুজাহিদদের নার্সিংয়ের প্রয়োজন হবে?

হ্যাঁ ইসমত, সেখানে নার্সের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। তুমি কি সেখানে ....?

হ্যাঁ ভাইজান, আমি ওখানে যেতে চাই।

ঠিক আছে ইসমত রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছেই আমি এ ব্যাপারে তোমাকে পত্র লিখবো।

একদিন সারাটা দিন ক্যাম্পে কাজ করার পর ইসমত বাসায় ফিরলো। রাহাত তাকে দেখেই চিৎকার করে উঠলো, আপাজান সেলিম ভাইজানের পত্র এসেছে। তিনি কাশ্মীরে আছেন। রাহাত দৌড়ে গিয়ে তার কামরা থেকে পত্র নিয়ে এলো।

ইসমত মুহূর্তকাল নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। তার একপা ছিল নিচে এবং আর একপা বারান্দার সিঁড়ির ওপর। 'তার চিঠি?' অস্পষ্ট

কণ্ঠে বললো সে। তারপরই তার হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুততর হলো। 'সেলিমের চিঠি' তার নিরব পৃথিবীর প্রত্যেকটি অণু পরমাণু থেকে সৃষ্টি হতে লাগলো একটি সংগীত লহরী। ইথার তরংগ থেকে কানে ভেসে আসছিল তার সুরধ্বনী। গাছপালা দুলছিল। ফুল ফুটছিল। ফুল কলিরা মুচকি হাসছিল। রংধনুর সাত রঙে রঙীন হয়ে উঠেছিল তার ভুবন। 'সেলিমের চিঠি!' কালের ছিন্ন গ্রন্থীগুলির মধ্যে আবার সংযোগ স্থাপিত হচ্ছিল। চিঠি নিয়ে বারান্দায় একটি চেয়ারে বসলো সে। রাহাত বললো, আপাজান। উপরে নাম ঠিকানা লেখা থেকে আমি তাঁর হাতের লেখা চিনতে পেরে আপনার অনুমতি ছাড়াই খাম খুলে ফেলেছিলাম।

রাহাত, তোমার জন্য আমার অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। এ কথা বলেই ইসমত পত্রের মধ্যে ডুবে গেলো। সেলিম লিখেছিল,

আমার ইসমত,

কাশ্মীরের যুদ্ধের ময়দান থেকে আমি তোমাকে পত্র লিখছি। আমি কাবুল থেকে মুলতান যাবার ইরাদা করছিলাম। এমন সময় কাশ্মীরের উপর হিন্দুস্তানের আক্রমণের খবর পেলাম। জিহাদে অংশগ্রহণ করার নিয়তে আমি মুলতান গেলাম না। আমার ইচ্ছা ছিল কাশ্মীর যাবার আগে লাহোরে একদিন অবস্থান করে যাবো। কিন্তু লাহোর স্টেশানের প্লাটফরমে আফতাবের সাথে দেখা হলো। আফতাব আমার কলেজের সাথি ছিল। তিরিশজন মুজাহিদের সালার হিসাবে সে কাশ্মীরে যাচ্ছিল। তার সংগী মুজাহিদের মধ্যে পাঁচজন ছিল আমার সহপাঠী। লোকেরা এই মুজাহিদদের গলায় ফুলের মালা পরাচ্ছিল।

আফতাব ও অন্য বন্ধুরা আমাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোথায় যাচ্ছো? আমি বললাম, আমিও সেখানেই যাচ্ছি যেখানে তোমরা যাচ্ছো। আফতাব তার গলার মালা খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিল। তার দেখাদেখি আরো কয়েকজনও তাদের গলা থেকে মালা নামিয়ে আমার গলায় দিল। গাড়ি ছাড়ার তখন দশ মিনিট বাকি ছিল। তারা কামরায় বসে পড়লো। আমি কিছুক্ষণ দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমি আফতাবকে বলতে চাচ্ছিলাম আগামী দিন রাওয়ালপিণ্ডিতে আমি তার সাথে মিলবো। কিন্তু আমি বলতে পারলাম না। আফতাব বললো, ভিতরে এস বসো সেলিম! গাড়ি এখনি ছেড়ে দেবে। দোটানার মধ্যে একটি পা পাদানিতে রেখে দিলাম। লোকেরা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে 'গাজী-এ-কাশ্মীর জিন্দাবাদ' শ্লোগান লাগাচ্ছিল। একজন বোরকা পরিহিতা মহিলা এগিয়ে এসে আমার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল। তারপর একজন বয়োবৃদ্ধ বুজর্গ এগিয়ে এসে কাশ্মীরের গাজীদের জন্য দোয়া করার আহ্বান জানালেন। লোকেরা হাত উঠালো। আমিও হাত উঠালাম। গাড়ি সিটি বাজালো। আমি আফতাবের পাশে বসে পড়লাম।

এখন আমি কাশ্মীরে আছি। আসলে আমার জায়গা এখানেই নির্ধারিত ছিল। পূর্ব পাঞ্জাবে যা কিছু শিখেছিলাম এখন কাজে লাগছে। বিগত তিন মাস

থেকে আমি আজাদ কাশ্মীরের ফউজের গেরিলা বাহিনীর সাথে ছিলাম। আমরা হিন্দুস্তানী ফউজের পশ্চাদ্দেশে পৌছে গিয়েছিলাম। এই গেরিলা গ্রুপগুলিতে অধিকাংশ ছিল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতির মুজাহিদ বৃন্দ। আমাদের সিপাহ সালার ছিল মাহসূদ গোত্রের এক নওজোয়ান। তাদেরকে দেখে আমার জাতির মধ্যে জীবন চাঞ্চল্য অনুভব করছিলাম। এরা হাসিমুখে গুলীর সামনে বুক পেতে দেয়। মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য মনে করে। দুশমনের কামান ও বোমারু বিমানকে একটুও ডরায় না। বরাফাবৃত পাহাড়ে রক্ত জমাট করা হিমেল বাতাস এদেরকে একটুও পেরেশান করে না। এদের অধিকাংশের হাতে ছিল নিছক দেশী রাইফেল এবং অনেকে দুশমনের রাইফেল ছিনিয়ে নেবার আশায় কেবল চাকু ও ছোরা নিয়ে ময়দানে চলে এসেছিল।

একদিন পাঞ্চাশজন মুজাহিদের একটি নতুন দল আমাদের কাছে এলো। এরা ছিল সুলায়মান খায়ের পাঠান। পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে মেহনত মজদুরী করে এরা দিন যাপন করতো। এখন এরা কাশ্মীরের জিহাদে অংশগ্রহণ করতে এসেছে। এদের কয়েকজনের হাতে কেবল চাকু ছিল এবং অনেকের হাতে তাও ছিল না। তাদের নেতা ছিল এক নওজোয়ান। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই, রাইফেল ছাড়া তোমরা কি করবে? জবাব দিল, তুমি চিন্তা করো না। আমদের কাছে রাইফেল নেই কিন্তু দুশমনের কাছে অনেক হাতিয়ার আছে। রাতে তারা আমাদের সালারের কাছ থেকে বিশটা রাইফেল ধার করে নিল। পনর মাইল দূরে একটি হিন্দুস্তানী পাহারাদার ক্যাম্পে তারা আক্রমণ চালালো। সকালে ফিরে এলো আশিটা রাইফেল ও বিশটা মেশিনগান নিয়ে। এ ছাড়া তাদের সাথে ছিল বারুদ ও রসদে পরিপূর্ণ দশটি খচ্চর। এই অভিযানে মুজাহিদদের বারোজন শহীদ হয়ে গিয়েছিল। পরদিন আমরা অকুস্থলে গিয়ে দেখলাম শিখ ও ডোগরাদের ষাটটি লাশ পড়ে রয়েছে। কিন্তু প্যাটেল ও নেহরুর সিপাহীরা যেমনই বুজদিল ঠিক তেমনি হিংস্রও। ক্যাম্পের যে সব শিখ ও ডোগরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল তারা যাবার পথে তিন মাইল দূরে একটি মুসলমান লোকালয় জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিয়ে গেছে।

উপজাতীয় মুজাহিদরা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নিশানাবাজ। আমার চোখের সামনে বন্দুকের গুলী ছুঁড়ে তিনটি হিন্দুস্তানী বিমান তারা ভূপাতিত করলো। অন্যান্য ময়দানেও তারা হিন্দুস্তানের কয়েকটি বিমান ভূপাতিত করেছে। ফলে হিন্দুস্তানী বোমারুগুলি এখন ফউজী অবস্থানের পরিবর্তে কেবল গ্রাম ও শহরগুলির ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

মুজাহিদদের সাথে আনন্দে আমার দিন কেটে যাচ্ছিল। তাদের সাথে নিজেকে কখনো অপরিচিত মনে করিনি। ভীতিপ্রদ ও বিপজ্জনক অভিযানগুলিতে তাদের সাথে যেতে আমি প্রস্তুত থাকতাম। আমাদের কাজ ছিল হিন্দুস্তানী সেনাদলের রসদ ও অস্ত্র সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন এবং দুশমনের বৃহত্তর

অংশকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করা। আমাদের কোনো স্থায়ী অবস্থান ছিল না। দুশমনের কনভয় আসার খবর শুনলেই আমরা গোপন ঘাঁটি থেকে লুকিয়ে তাদের ওপর আচানক আক্রমণ করে বসতাম। সেনাদলের এগিয়ে আসার খবর শুনলে পথের পুলগুলি উড়িয়ে দেবার জন্য আমাদের যেতে হতো। এহেন অবস্থায় তোমাদের কাছে পত্র লিখতে পারিনি। এজন্য তোমাদের কোনো অভিযোগ থাকা উচিত নয়।

বর্তমানে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাম্প হেফাজতের দায়িত্বে নিযুক্ত আছি। এ ক্যাম্পটি আছে ন'হাজার ফুট উঁচুতে। এখানে হিন্দুস্তানী সেনাদলের কামান ও মেশিনগান ফিট করা ছিল। জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে আমরা জেনারেল তারেকের নির্দেশ পেলাম, আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে এ ক্যাম্পটি আমাদের দখলে আনতে হবে। এ অভিযানে নেতৃত্ব দেবার জন্য তিনি একজন ক্যাপ্টেনকে পাঠিয়ে দিলেন। এ ক্যাপ্টেন ছিলেন মিঁয়া ওয়ালী জেলার একজন সাবেক ফউজী। বিগত বিশ্বযুদ্ধে তিনি বর্মা ও মালয়ের ময়দানে লড়াই করেছিলেন। ক্যাপ্টেন আমাদের বললেন, এ অভিযানে আমি চল্লিশজন মুজাহিদ চাই, যারা বিজয়ের চাইতে বেশি শাহাদতের প্রত্যাশী।

অনেকে নিজের নাম পেশ করলো। কিন্তু ক্যাপ্টেন কেবল চল্লিশজনকে বাছাই করে নিলেন। আমিও ছিলাম তাদের একজন। রাত দুটোয় প্রচণ্ড বরফ ঝড়ের মধ্যে আমরা ক্যাম্পে হামলা করলাম। কিন্তু দুশমন গাফেল ছিল না। পাহাড়ের শিখর দেশ থেকে আমরা যখন এক হাজার ফুট নিচে তখন দুশমন কামানের গোলা নিক্ষেপ করতে লাগলো। পাঁচটার সময় আমরা বুকে হেঁটে পর্বতশিখরের কাছাকাছি পৌছে গেলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের পনরজন সাথি শাহাদতের পেয়ালা পান করেছিল। ছটার কাছাকাছি সময় আমরা তাদের ৩টি কামান ও ২টি মেশিন গান দখল করে নিলাম। অন্য মেশিন গানটির ওপর হাতবোমা নিক্ষেপ করার পর আমাদের ক্যাপ্টেন জমিনে লুটিয়ে পড়লেন। তখনই আমরা জানলাম তিনি ইতিমধ্যে ৩টি গুলীবিদ্ধ হয়েছেন। আমরা সবেমাত্র একটু শ্বাস নিতে পেরেছিলাম এমন সময় পাহাড়ের পরবর্তী শৃংগ থেকে মেশিনগান ও মর্টার থেকে ফায়ার শুরু হলো। এ শৃংগটি এ ক্যাম্প থেকে আরো এক'শ ফুট উঁচু ছিল। এতে আমাদের সাতজন মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেলো। অতি কষ্টে নিশ্বাস টানতে টানতে ক্যাপ্টেন চিৎকার করে উঠলেন, 'যদি সূর্য ওঠার আগেই এ শৃংগটি কবজা করতে না পারো তাহলে আমাদের সমস্ত কুরবানী নিস্ফল হয়ে যাবে। আমরা তিনদিক থেকে শৃংগের ওপর উঠতে শুরু করলাম। আমার সামনে ছিল একজন আফ্রিদী মুজাহিদ। সে শৃংগের ওপর উঠেই দৌড়ে গিয়ে মেশিন গানের মোর্চায় হাতবোমা নিক্ষেপ করতে চাইলো। কিন্তু সাথে সাথেই গুলী বৃষ্টি শুরু হলো এবং সে সেখানেই ঝাঁঝরা হয়ে গেলো। অন্যদিক থেকে আমাদের আরো দুজন সাথি উপরে পৌছে গেলো এবং পাথরের

আড়ালে শুয়ে ফায়ার করতে লাগলো। দুশমন যখন মেশিনগানের মুখ সেদিকে ঘোরাচ্ছিল ঠিক তখনই আমি এগিয়ে গিয়ে হাতবোমা ছুঁড়লাম। শৃংগ দখল করার পর আমি দৌড়ে নিচে পৌঁছে গেলাম এবং ক্যাপ্টেনকে বললাম আমরা শৃংগ দখল করে নিয়েছি। ক্যাপ্টেন অস্পষ্ট জড়িত স্বরে বললেন, 'এখন তোমাদের যে কোনো মূল্যে শৃংগের হেফাজত করতে হবে।' একথা বলেই তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি তার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিলাম। দশ মিনিট পর ক্যাপ্টেন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। এই শৃংগে আমরা চারটি দুর্ভাগা মেয়ে পেলাম। নেহরুর সিপাহীরা কাশ্মীর উপত্যকা থেকে এদেরকে উঠিয়ে এনেছিল। তাদের কথায় জানলাম তাদের আগে আরো পাঁচটি মেয়েকে এখানে আনা হয়েছিল। তিনজন শিখ ও ডোগরাদের বর্বরতার শিকার হয়েছে এবং দুজন পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে জীবন দিয়েছে। তাদের লাশগুলি বরফের নিচে দাবিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ ছিল এমন একটি সেনাবাহিনীর কীর্তি যাদেরকে মাউন্ট ব্যাটেন, গান্ধী, নেহরু ও প্যাটেল কাশ্মীরের জনগণের জান-মাল-ইজ্জত-আবরুর হেফাজতের জন্য পাঠিয়েছিল।

তৃতীয় দিন আজাদ কাশ্মীরের ফউজ এই ময়দানে একটি বড় ধরনের বিজয় লাভ করে। জেনারেল তারেক নিজেই এই হামলা পরিচালনা করেন। বিজয়ের পর তিনি আমাদের ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন। আমাকে তিনি একটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই ক্যাম্পের হেফাজতের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন।

এখন আমি এখানেই আছি। প্রচণ্ড বরফ পড়ছে। বসন্ত ঋতু শুরু হবার আগে আর এখানে দুশমনের হামলার কোনো সম্ভাবনা নেই। পথ ঘাট বন্ধ। হিন্দুস্তানী ফউজ সাধারণত ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ি ছাড়া কোনো মোর্চায় হামলা চালায় না। কখনো দুশমনের বোমারু বিমানগুলি এখানে এসে আন্দাজে যেখানে সেখানে কিছু বোমা ফেলে দিয়ে চলে যায়। আজ পর্যন্ত আমাদের এই ক্যাম্পের নিকটতম এলাকায় যে বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয়েছে সেও এখান থেকে প্রায় দুই ফার্লং দূরে। আমরা একটি বিমান ভূপাতিত করেছি।

এই গেরিলা বাহিনীর সাথে থেকে প্রথমে আমার চিঠি লেখার ফুরসত ছিল না। আর এখন সময় পেলেও চিঠি লিখে পাঠাবার কোনো উপায় নেই। আজ কয়েকজন সিপাহী রসদ নিয়ে আমাদের কাছে এসেছে। তাদের হাতে এ চিঠি পাঠাচ্ছি। তোমার চিঠি আমার কাছে পৌঁছার কোনো উপায় আপাতত দেখছি না। আজাদ কাশ্মীর রেডিও মারফত তোমার খবর পাঠাতে পারবে। হিন্দুস্তানী সিপাহীরা আমাদের ক্যাম্পে একটা ব্যাটারী সেট রেডিও ফেলে রেখে গেছে। তার সাহায্যে প্রতিদিন বিকালে আমরা ফউজী প্রোগ্রাম শুনে থাকি। সময় কাটাবার জন্য আমি একটি প্রবন্ধ লেখায় হাত দিয়েছি। এটি হয়তো ছোটখাট একটি বই হয়ে যেতে পারে। 'হে আমার জাতি' প্রবন্ধটির নাম দিয়েছি। লাহোর থেকে আসার পথে গাড়িতে আমার মুখে পূর্ব পাঞ্জাবের ঘটনাবলী শোনার পর

আফতাব আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল জাতির নামে একটি পয়গাম দেবার জন্য। আফতাবই এ প্রবন্ধটি ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করার ওয়াদা করেছে। ইনশা আল্লাহ এ পুস্তিকাটি শিগগির তোমার হাতে পৌঁছে যাবে।

চিঠি অনেক দীর্ঘ হয়ে গেলো। কিন্তু মনে হচ্ছে এখনো আমি কিছুই লিখিনি। কিন্তু সিপাহী ফেরত যাবার জন্য তৈরি হয়ে গেছে।

ইসমত, হিন্দুস্তানের হাতি কাশ্মীরের চোরাবালিতে ফেঁসে গেছে। দোয়া করো যেন তোমার কাছে বিজয়ের সুখবর নিয়ে আসতে পারি।

ইতি

তোমার সেলিম।

পূর্ব পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তানের সাথে যোগদানকারী রাজ্যগুলিতে মুসলমানদের উৎখাত করার কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। ভারত থেকে আশি লাখ মুসলমান হিজরত করে পাকিস্তানে পৌঁছে গিয়েছিল। এখন গান্ধী মহারাজ দিল্লীতে বসে বসে অহিংসার পাঠ দিচ্ছিলেন এবং তাঁর শিষ্যরা সারা হিন্দুস্তানে মুসলমানদের হত্যা এবং তাদের ঘর-বাড়ি-সম্পদ ভস্মীভূত করে চলছিল।

জুনাগড় পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিল। সেখানকার শাসক ছিল মুসলমান। অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগুরু। তাই হিন্দুস্তান সেখানে ফউজ পাঠিয়ে দিল। কাশ্মীরের নব্বুই ভাগ অধিবাসী ছিল মুসলমান কিন্তু রাজা ছিল হিন্দু। এ জন্য সেখানেও হিন্দুস্তান সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিল। হিন্দুস্তানের শাসক ছিল হিন্দু এবং অধিবাসীদের সংখ্যাগুরু ছিল হিন্দু। তাই সেখানে মুসলিম সংখ্যালঘু সমস্যাটি আকাল সেনা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের হাতে সোপর্দ করা হলো।

প্যাটেলের মুখ থেকে অগ্নিস্ফুলিংগ নির্গত হচ্ছিল। তিনি একদিন কোনো শহরে বক্তৃতা করতেন। পরদিন খবর আসতো সেখানে মুসলিম গণহত্যা শুরু হয়ে গেছে। জওহর লাল নেহরু কাশ্মীরে তার সৈন্যদের বিরাট কৃতিত্বের জন্য গর্ব করছিলেন। অন্যদিকে গান্ধীজী দুনিয়াকে অহিংসার বাণী শুনাচ্ছিলেন। একই বেহালা থেকে কয়েক ধরনের সুর বের হচ্ছিল। দেশ ভক্তরা মহাত্মা গান্ধীর পূজা করতো, নেহরুকে ইজ্জত করতো এবং প্যাটেলের ইশারায় নাচতো। অল ইণ্ডিয়া রেডিও শান্তির জন্য গান্ধীর আবেদন, দাংগার জন্য প্যাটেলের ভাষণ এবং যুদ্ধের জন্য প্রধান মন্ত্রী নেহরু ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার বলদেব সিংয়ের বিবৃতি প্রচার করতো।

গান্ধীজী এখনো হিন্দু ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী উদ্দেশ্যাবলী গোপন রাখার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। বিশ্ব জনমতের সামনে উলংগ হবার খায়েশ তাঁর ছিল না। তিনি দেখছিলেন কাশ্মীরের যুদ্ধে নেহরুর প্রোগ্রাম এখন দিনের পর সপ্তাহ এবং সপ্তাহের

পর মাসে গড়িয়ে যাচ্ছে। সীমান্তের শার্দুলদেরকে গান্ধী প্রথমে চরকার মন্ত্র পড়িয়ে হাত করেছিলেন। তারপর চরকার ভূত নেমে গেলে ওয়ার্ধার যাদুকর পাকিস্তানে গোত্রদ্বন্দ্ব খাড়া করার প্রচেষ্টা চালালেন। সীমান্তে তার চেলা পাঠানিস্তানের শ্লোগান দিল। কিছুদিনের মধ্যেই এ শ্লোগান এক ভয়াবহ রূপ নিল। গান্ধীর মুসলমান চেলা অখণ্ড হিন্দুস্তানে সংখ্যাগুরু হিন্দুর গোলামীর শিকল গলায় পরার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। এখন তিনি পাঠানদেরকে পাকিস্তান থেকে আলাদা হাবার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। মহাদুর্যোগের পূর্বে 'মুক্ত চিন্তার' দাবীদার মুসলমানদের এ দলটি দশ কোটি মুসলমানকে এক জাতীয়তার রশি দিয়ে বেঁধে হিন্দু ফ্যাসিবাদের যূপকাঠে বলি দিতে চাচ্ছিল। আর দুর্যোগ কেটে যাবার পর পকিস্তানকে এরা গোত্রবাদের করাত দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করার চিন্তায় মেতে উঠেছিল।

কিন্তু এ চক্রান্ত কামিয়াব হয়নি। কাশ্মীরের যুদ্ধ কুফর ও ইসলামের যুদ্ধে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আর ইসলামের তরবারি কোশমুক্ত হলে সর্বপ্রথম আঘাতটি পড়ে গোত্রবাদের মূর্তির মাথায়। ওয়ার্ধার যাদুকরের নতুন মূর্তিটি কাশ্মীরের চৌরাস্তায় ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে, যেখানে সীমান্তের উপজাতিরা, পাঞ্জাবী, বেলুচিস্তানী ও সিন্ধী মুজাহিদীন পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল।

মহাত্মা গান্ধী, যিনি সারা জীবন হিন্দুদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, এ অবস্থা দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি কাশ্মীরে সামরিক পদক্ষেপের পূর্বেই পাঠান ও অপাঠানের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা জরুরী মনে করতেন। কিন্তু শিষ্যদের তাড়াহুড়ার ফলে তাঁর সাজানো নাটক ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। এখন কাশ্মীরের যুদ্ধে পাঠান ছিল সবার আগে। ইসলামী বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এখন কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের অসৎ উদ্দেশ্য উলংগ হয়ে যাচ্ছিল, যাকে পূর্ণ করার জন্য দিল্লী থেকে গুরুদাসপুর পর্যন্ত মুসলমানদের রক্তের নদী প্রবাহিত করা হয়েছিল।

বিষে চোবানো ছুরী ফুলের ঝাঁপিতে লুকাবার প্রবক্তা ছিলেন গান্ধীজী। তিনি দেখছিলেন তাঁর চেলাদের সীমাতিরিক্ত জোশ ও জংগী বক্তৃতা মুসলমানদের প্রতিরক্ষা শক্তিকে উস্কে দিচ্ছিল। তাই তিনি হত্যাকারীদের মুখ থেকেও ঠাণ্ডা ও মিষ্টি শব্দ শুনতে চাচ্ছিলেন। সর্পদংশনের দুঃখ তাঁর ছিল না। কিন্তু সাপের ফোঁস ফোঁসানি ছিল তাঁর অপছন্দ। তিনি জানতেন ফোঁস ফোঁসকারী শেষ পর্যন্ত মারা পড়ে। কাজেই পূর্ব পাঞ্জাব ও তৎ সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে মুসলমানদের পরিপূর্ণ ধ্বংস এবং দিল্লী থেকে লাখো মুসলমানের হিজরতের পর তিনি বিরলা মন্দিরে শান্তি ও অহিংসার পাঠ দিচ্ছিলেন।

বিশ্ব জনমতকে নিশ্চিন্ত করার জন্য তিনি আমরণ অনশনও পালন করেছেন। কিন্তু হিন্দু জাতির যেসব সন্ত্রাসী গ্রুপগুলিকে বিগত বছরগুলিতে ইসলাম দুশমনির ময়দানে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করা হয়েছিল, যারা ১৫ আগস্টের পর মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলার অবাধ স্বাধীনতা লাভ করেছিল, তারা এখন আর কোনো আপাত

বা আনুষ্ঠানিক বাধা বরদাশত করতে প্রস্তুত ছিল না। কাজেই একদিন খবর এলো কোনো সেবক সংঘী সন্ত্রাসী মহাত্মাজীকেও মৃত্যুর দুয়ারে পৌছিয়ে দিয়েছে।

এক সাপুড়ে এক ভয়াবহ আজদাহা পুষেছিল। শহরের লোকেরা তার ধারে কাছে যেতে ভয় করতো। লোকদের নিশ্চিন্ত করার জন্য সাপুড়ে আজদাহাকে নগরের চৌরাস্তায় নিয়ে যেতো এবং নিজের ঠ্যাং তার মুখের মধ্যে পুরে দিতো। সে লোকদের বলতো, দেখো তোমরা খামাখা একে ভয় করছো। দেখো সে আমাকে কিছুই বলে না। আমি তাকে বশ করে ফেলেছি। আমি তার প্রকৃতি বদলে দিয়েছি। ধীরে ধীরে লোকদের ভয় তিরোহিত হলো। এরপর সাপুড়ে রাতের বেলা আজদাহার ঝাঁপির মুখ খুলে দিতো এবং সে বস্তির আশ-পাশের কোনো বিচ্ছিন্ন পথিককে গিলে ফেলে চলে আসতো। আজদাহার সাহস বেড়ে যেতে লাগলো। কখনো কখনো সে লোকদের ঘরের ভেতরে ঢুকে শিকার ধরে নিয়ে চলে আসতো। শেষ পর্যন্ত শহরের লোকেরা সব জানতে পারলো। তারা সাপুড়ের কাছে অভিযোগ করলো। সাধারণ মানুষকে নিশ্চিন্ত করার জন্য সাপুড়ে আবার একবার চৌরাস্তায় সর্বসমক্ষে আজদাহার মুখের মধ্যে নিজের ঠ্যাং ঢুকিয়ে দিল। কিন্তু আজদাহা এখন মানুষের রক্ত ও গোশ্‌তের স্বাদ পেয়ে গিয়েছিল। সাপুড়ের গোশত অন্য মানুষদের থেকে আলাদা ছিল না। এবার লোকদের চোখের সামনেই সে সাপুড়েকে গিলে ফেললো।

মহাত্মা গান্ধীও এই সাপুড়ের পরিণতি বরণ করেছিলেন। নিষ্ঠুরতা, হিংস্রতা ও বর্বরতার সয়লাবের বাঁধ ভেঙে পড়ার পর গান্ধীজী তার উদ্ধত তরংগমালার সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে সংযম ও শৃংখলার পাঠ দিচ্ছিলেন। একটি তরংগ এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো।

বসন্তকালের এক সকালে ইসমত ও রাহাত রাওয়াল পিণ্ডিতে সড়কের এক কিনারে বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে কাশ্মীরগামী মুজাহিদদের দেখছিল। লোকেরা সড়কের কিনারে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর' ও 'মুজাহিদীন-এ-কাশ্মীর জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিচ্ছিল। এই মুজাহিদরা বিভিন্ন জায়গা থেকে কাশ্মীর, পাকিস্তান ও ইসলামী দুনিয়ার পক্ষ থেকে নেহরু ও প্যাটেলকে জবাব দিতে এসেছিল। এরা নিজেদের দেশী রাইফেলের সাহায্যে দুশমনের ট্যাংক, বোমারু বিমান ও কামানের মোকাবিলা করতে এসেছিল। পূর্ব পাঞ্জাবের অগ্নিভস্ম যেসব বিদ্যুত প্রবাহের জন্ম দিয়েছিল ইসমত ও রাহাত তাদেরকে প্রত্যক্ষ করছিল।

মুজাহিদ সেনারা চলে গেলো। ইসমত অশ্রুসজল চোখে বলছিল, আমার ভাইয়েরা! এগিয়ে চলো। আল্লাহ তোমাদের মাহমুদ গজনবীর সংকল্প এবং মুহাম্মদ

বিন কাসেমের আত্মমর্যাদা দান করুন। কাশ্মীরে নিষ্পাপ নিরপরাধদের খুন তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছে। পূর্ব পাঞ্জাবের মসজিদগুলি তোমাদের ডাকছে। লাল কেল্লার দর দালান তোমাদের স্মরণ করছে। আমার জাতির সুপুত্ররা! তোমাদের জাতির কন্যাদের লুণ্ঠিত পবিত্রতা ও সতীত্বের দোহাই তোমরা এগিয়ে চলো।

একটি টাংগা বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। ডাক্তার শওকত চামড়ার ব্যাগ হাতে টাংগা থেকে নামলেন।

আব্বাজান! আব্বাজান! দুবোন এক সাথেই বলে উঠলো।

ডাক্তার সাহেব আঙিনায় প্রবেশ করলেন। রাহাত তার হাত থেকে ব্যাগটি নিল। কিছুটা পেরেশান হয়ে সে বললো, আব্বাজান বেশ ভারী লাগছে। কি আছে এতে?

বেটি, তোমার বোনের জন্য একটি চমৎকার তোহফা এনেছি।

কি আব্বাজান?

থামো আপাজান। আমি খুলে দেখছি। একথা বলে রাহাত ব্যাগ জমিনে রেখে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল। একটি বই বের করতে করতে সে বললো, এগুলি তো সবই বই দেখছি। বইয়ের কভার পৃষ্ঠায় লেখা 'হে আমার জাতি।' বই দেখেই ইসমত রাহাতের হাত থেকে সেটি ছিনিয়ে নিল। ডাক্তার শওকত বললেন, সেলিমের এক বন্ধু লাহোরে বইটি ছাপার জন্য এনেছিল। গত সপ্তাহে সে আমাকে পঞ্চাশ কপি দিয়ে গেছে। কিছু আমি বিতরণ করেছি। বাকি তোমাদের জন্য এনেছি। এগুলি বিতরণ করে দাও। গত সপ্তাহে সেলিমের পত্র এসেছিল। আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

জী হ্যাঁ, আমরা পেয়েছি।

আরশাদ কোথায়?

আজ অনেক সকালে হাসপাতালে চলে গেছে।

রাহাত বললো, আব্বাজান! চলেন ভিতরে বসেন।

না, বেটি! আমাকে এখনি যেতে হবে।

কোথায় আব্বাজান? ইসমত অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো।

বেটি, পাঁচজন ডাক্তার নিয়ে আমি কাশ্মীরের যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছি। লাহোরের দুজন ব্যবসায়ী এ্যাম্বুলেন্স গাড়ি এবং দশ হাজার টাকার ওষুধপত্র কিনে দিয়েছে। সন্ধ্যার আগে আমাদের রওনা হতে হবে। আমার সাথিরা স্টেশনের কাছেই আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি মনে করছিলাম আর কোনো বড় রকমের খিদমতের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু সেলিমের এই বই আমাকে আবার জোয়ান বানিয়ে দিয়েছে। আমি তার সাথে দেখা করার চেষ্টা করবো।

ডাক্তার শওকত তাদেরকে আল্লাহ হাফেজ বলে আবার টাংগায় উঠে বসলেন।

ইসমত বইর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কামরায় প্রবেশ করে একটি চেয়ারে বসে পড়লো। বইয়ের শুরু থেকে পড়তে শুরু করলো সে। অন্য কামরায় রাহাত একটু উচ্চস্বরে পড়ছিল। 'রাহাত আস্তে পড়ো।' ইসমত চেঁচিয়ে বললো।

রাহাত কয়েক মিনিট খামুশ থাকলো। কিন্তু তারপর আবার বুলন্দ আওয়াজে পড়তে লাগলো। ইসমত আবার তাকে সতর্ক করলো। রাহাত কামরা থেকে একটি চেয়ার নিয়ে উঠানে একটি গাছের নিচে বসলো।

এ বইয়ের প্রথম অংশে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পূর্বের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ছিল। দ্বিতীয় অংশে লেখক পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানদের ব্যাপক গণহত্যার চোখে দেখা ঘটনাবলী বর্ণনা করেছিল। শেষ অংশে ছিল মিল্লাতের নামে সেলিমের পয়গাম। সে পয়গাম ছিল ঃ

'হে আমার জাতি! তুমি মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারময় যুগটিও দেখেছো। জালেম ও মজলুমের কাহিনী দুনিয়ায় অতি প্রাচীন। মানবতার শস্যোদ্যানে বহুবার বজ্রপাত হয়েছে। আদমের বাগিচা অনেকবার দুর্যোগ কবলিত হয়েছে। হিংস্রতা ও বর্বরতা বারবার মানবতাকে দলিত মথিত করেছে। কিন্তু আগুন ও রক্তের যে খেলা তুমি দেখেছো তা আর কেউ দেখেনি।

তোমার কবি ও তোমার সাহিত্য সেবী তোমাকে মনোমুগ্ধকর কাহিনী ও মিষ্টি সুরের গান শোনাতে এসেছিল .... কিন্তু তুমি রক্তের নদীতে ভাসছিলে। তোমার মহফিলে ফুল কলিদের মৃদু হাসি ও কোকিলের কুহুতানের সমাদরও ছিল। কিন্তু তার সামনে ছিল খুনের দরিয়া, ছাইয়ের পাহাড় ও লাশের স্তূপ। সে তোমার পদতলে তারকার হাসি, রংধনুর রং এবং দুনিয়া জাহানের সমস্ত শোভা-সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা নিবেদন করতে চাইছিল। কিন্তু তার সামনে ছিল নারীর লুণ্ঠিত পবিত্রতা ও সতীত্ব।

হে আমার জাতি! পূর্ব পাঞ্জাব থেকে তোমার জন্য আমি এনেছি আগুনের স্ফুলিংগ। এ আগুন তোমার শিশুদের জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিয়েছে। আমি তোমার জন্য এনেছি এমন সব ছেঁড়া কামিজ ও কাপড়ের টুকরা যেগুলি তোমার মেয়েদের সতীত্বের খুনে রঙীন হয়ে আছে। আমি তোমাকে হৃদয় প্রলুব্ধকারী রাগিনী নয় বরং বুকফাটা চিৎকার শোনাতে এসেছি, যেগুলি এখনো দিল্লী ও পূর্ব পাঞ্জাবের আকাশে বাতাসে গুঞ্জরিত হচ্ছে। আমি তোমার সাথে আগুন নিয়ে খেলা করেছি। রক্তে গোসল করেছি। আমার অতীত ও বর্তমান তোমার অতীত ও বর্তমানের সাথে বিজড়িত। আমার ভবিষ্যত তোমার থেকে আলাদা নয়। তোমার জন্য আমার পয়গাম এমন কবি ও সাহিত্যিকের পয়গাম নয় যে নিজের মহফিলের অন্ধকারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অন্যের মজলিসে গিয়ে মানসিক প্রশান্তির সন্ধান করে। আমি তোমার সাথেই আছি এবং তোমার সাথেই থাকবো।

তিক্ত সত্যের গায়ে আমি কল্পনার সুন্দর আবরণ জড়াতে চাইনা। দিল্লী থেকে নিয়ে পূর্ব পাঞ্জাবের শেষ সীমানা পর্যন্ত আমাদের সমস্ত শহর বরবাদ, গ্রামগুলি ধ্বংস এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের মাসুম বাচ্চাদেরকে শূন্যে নিক্ষেপ করে বর্শা বিদ্ধ করা হয়েছে। লাখো মুসলিম নরনারীকে হত্যা করা হয়েছে। হাজার হাজার যুবতী মেয়েকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। যে জমিনের ওপর আমরা আট'শ

বছর ধরে প্রবল প্রতাপে আমাদের বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে এসেছি সে আজ প্রত্যক্ষ করছে আমাদের দাফন কাফনহীন লাশগুলি। যে আকাশ গাজী মুহাম্মদ বিন কাসেমের আত্মমর্যাদার সামনে রাজা দাহিরকে নত মস্তকে দেখেছিল, মাহমুদ গজনবী ও মুহাম্মদ ঘোরীর প্রতাপ ও প্রতিপত্তি দেখেছিল, সে আজ দেখছিল আমাদের অসহায়তা ও লাঞ্ছনার তামাশা। কিন্তু এতসব কিছু কি ছিল বিনা কারণে? এগুলি কি ছিল কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা?

না, এগুলি অকারণ ছিল না এবং কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনাও ছিল না। সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিধানে জাতিদের উত্থান ও পতনের পথ নির্ধারিত আছে। মর্যাদা ও উন্নতি-অগ্রগতি তারাই লাভ করে যারা কল্যাণ ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যায়। আর যারা অবনতির পথ অবলম্বন করে তারা শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী কোনো জাতির সামগ্রিক কর্ম ব্যর্থ হয় না। পূর্ব পাঞ্জাবের ধ্বংস ও বরবাদী ছিল আমাদের নিজেদের ভুল, বিভ্রান্তিকর আন্দাজ অনুমান ও ভ্রান্ত কার্যধারার প্রতিফল ও শাস্তি। আমরা মেষপালের জীবন যাপন করেছি এবং নেকড়ের হাতে জীবন দিয়েছি। আমাদের ভুল ও আত্ম প্রতারণার কারণে এমন একটি দুশমনের তলোয়ার আমাদের শাহরগ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যার ধর্ম ও নৈতিক বিধানে দুর্বলের জন্য দয়া ও ইনসাফের কোনো অবকাশ ছিল না। দেশ ও সমাজ শাসনের বিধান তারা লাভ করেছে মনুর সংহিতা থেকে। সারা দুনিয়ায় মানব জাতির মধ্যে বর্ণবাদের তারাই প্রথম উদ্ভাবক। দুর্বল জাতিদেরকে পরাজিত করে তারা তাদেরকে অচ্ছুতে পরিণত করে। তার রক্ত ও হাড়ের ওপর নিজেদের সমাজের বুনিয়াদ গঠন করে। শতশত বছর পর মানবতার এই দুশমনরা তাদের অতীতের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি নতুন সমাজের বুনিয়াদ নির্মাণ করছিল। তাদের এই বুনিয়াদ পূর্ণ করার জন্য তারা মুসলমানের রক্ত ও হাড় নির্বাচন করেছিল। ইসলাম দুশমনীর প্রেরণার ওপর নতুন ঐক্য ও সংগঠনের বুনিয়াদ রাখা হয়েছিল। আমরা সবকিছু দেখছিলাম। কিন্তু আমাদের অতীতের প্রতি মুখাপেক্ষিতা ছিল না। বর্তমান থেকে আমরা ছিলাম গাফেল। আর ভবিষ্যতের কোনো পরোয়াই আমাদের ছিল না।

দুশমন যখন গোলাগুলী বর্ষণ শুরু করলো তখনই আমরা মোর্চা বানাবার কথা চিন্তা করলাম। সয়লাব যখন শুরু হয়ে গিয়েছিল তখনই আমরা বাঁধ বাঁধার কথা ভাবলাম। দিনের বেলায় আমরা ঘুমাচ্ছিলাম। দুশমন এসে আমাদের রশি দিয়ে বেঁধে ফেললো। আমাদের মাথার ওপর তলোয়ার নিয়ে দাঁড়ালো। আমরা ছিলাম অসহায়, অক্ষম। আমরা প্রতিবাদ করছিলাম, আমরা অনুনয় বিনয় করছিলাম। আমরা বিশ্ব জনমতের কাছে আবেদন জানালাম। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদেরকে আমাদের মজলুমীর অবস্থা দেখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিলাম। কিন্তু আমরা জানলাম যেখানে জংগলের আইন চলে সেখানে কেবলমাত্র বাঘের গর্জনই শোনা যায়। ভেড়ার ম্যাঁ ম্যাঁ ডাকে কেউ কান দেয় না।

জাতীয় নেতৃবৃন্দ কেবল প্রতিবাদ, প্রস্তাব পাশ ও বিবৃতি দানের পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা চালাচ্ছিল। বিহারে মুসলিম গণহত্যা হলো। তারা প্রতিবাদ জানালো। গড় মুক্তেশ্বরে মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলা হলো। তারা জোর প্রতিবাদ জানালো। পাঞ্জাবের করদ রাজ্যগুলিতে এবং দিল্লীতে ব্যাপক ধ্বংস যজ্ঞ চালানো হলো। জবাবে তারা কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ জানালো। চিৎকার করতে করতে প্রতিবাদকারীদের গলার আওয়াজ বসে গেলো এবং তাদের শব্দের ভাণ্ডার শেষ হয়ে গেলো কিন্তু ধ্বংস ও বরবাদীর তুফানের গতিবেগ কমলো না।

আমাদের কাছে শব্দের অভাব ছিল না। আমাদের কাছে ছিল আন্তরজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা। কিন্তু আমাদের ট্রাজেডি ছিল এই যে, পাকিস্তানের অস্ত্র শস্ত্র আমানত ছিল মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ছিল দেশের বাইরে। আর সবচাইতে বড় ট্রাজেডি এই ছিল যে, ইংরেজ তার রাজনৈতিক পলিসির ভিত্তিতে মানবতার শ্রেষ্ঠতম দুশমনকে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিল।

হে আমার জাতি! আমরা বেঈমানী, অবিশ্বস্ততা, বেইনসাফী ও বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছি। এর কারণ, আমাদের দুর্বলতা ও অসহায়তা আমাদের এমন সব আদালতের ফায়সালা মাথা পেতে নিতে বাধ্য করেছিল যেখান থেকে ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের আশা করা আত্ম প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আমরা কুফরকে ইসলামের বন্ধু মনে করে শতশত বছরের ঐতিহাসিক সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলাম। অতীতের ইতিহাস সাক্ষী অনৈসলামী ব্যবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের আসনে উপবেশনকারীরা হামেশা মজলুমের অশ্রু থেকে জালেমের জন্য আনন্দের সামগ্রী সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেছে। ইনসাফ ও ন্যায় বিচার কেবলমাত্র তাদের জন্য যারা বেইনসাফীর বিরুদ্ধে লড়াই করার হিম্মত রাখে।

হে আমার জাতি! আন্তরজাতিক সম্মেলন সমূহের মাধ্যমে তোমার দুঃখ-বেদনার উপশম হবার কোনো উপায় নেই। তোমার দুশমন অবস্থা অনুযায়ী তার কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করে। কিন্তু তার উদ্দেশ্যে কোনো পরিবর্তন আসে না। সে ভারত বিভাগে রাজি ছিল না। কিন্তু যখন সে অনুভব করলো, মাউন্ট ব্যাটেন তার নৌকায় উঠে বসেছে এবং তার কর্মপদ্ধতি শেষ পর্যন্ত দেশ বিভাগের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেবে তখনি সে বিভাগের নীতি মেনে নিল। আর এতেই তুমি খুশি হয়ে গেলে যে, কোনো কুরবানী ছাড়াই তুমি পাকিস্তান পেয়ে গেছো। দুশমন তার তীরদানী থেকে নতুন তীর বের করেছে এবং দিল্লী থেকে নিয়ে পূর্ব পাঞ্জাবের শেষ পর্যন্ত হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ডের প্রচণ্ড বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে। একই সংগে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের খঞ্জরও তোমার বুকে বিদ্ধ করেছে। তোমার সেনাবাহিনী ছিল দেশের

বাইরে। তোমার ভাগের অস্ত্রশস্ত্র হিন্দুস্তান আটকে দিয়েছিল। তোমার যে হাতগুলি প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত হতে পারতো সেগুলিকে আগেই বেঁধে ফেলা হয়েছিল এ অবস্থায় মানবেতিহাসের সবচেয়ে বড় জুলুম ও বেইনসাফির সামনে মাথা নত করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই তোমার ছিল না। তুমি আশা করেছিলে র‍্যাডক্লিফের ফায়সালা মেনে নেবার পর তোমার দুশমন তোমার শান্তিপ্রিয়তা ও সদিচ্ছায় সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এটা ছিল একটা আত্ম প্রতারণা। তুমি মনে করেছিলে পূর্ব পাঞ্জাবের তুফান ওখানেই থেমে যাবে। কিন্তু এ তুফান দিল্লী পৌঁছে গেছে। তার শান্তিপ্রিয়দের একটি দল একথা বলে নিজেদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল যে, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ এটা উভয়েরই জন্য হবে আত্মহত্যা। কিন্তু হিন্দুস্তান দ্বিতীয় পদক্ষেপ নিল এবং কাশ্মীরের ওপর আক্রমণ করে বসলো। হিন্দুস্তানী ফউজ জুনাগড়ে প্রবেশ করেছে বলে তুমি বিশ্ব জনমতের সামনে হিন্দুস্তানের জুলুম ও সাম্রাজ্যবাদিতা এবং নিজের শান্তি ও সম্প্রীতির নীতির ডংকা বাজাচ্ছিলে।

হে আমার জাতি! তোমার সুপুত্ররা বিশ্বজনমতের সামনে আবেদন জানাচ্ছিল। আর ওদিকে দিন দুপুরে কাশ্মীরের আজাদী গ্রাস করা হচ্ছিল। কিন্তু বিশ্ব শান্তির ইজারাদাররা মুখে কুলুপ এঁটে সব কিছু দেখছিল। শেষ পর্যন্ত তোমার কিছু দেওয়ানার হুশ ফিরে এলো। মজলুমী, অসহায়তা ও অক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায় প্রত্যক্ষ করার পর তোমার মৃত- প্রায় শিরা উপশিরায় আবার জীবনের রক্ত প্রবাহ শুরু হয়ে গেছে। তোমার আজাদী পাগল যুবকরা তোমার আহ্বান শুনতে পেয়েছে। তোমার মুহাম্মদ বিন কাসিমরা তোমার কন্যাদের চোখে অসহায়তার অশ্রু সহ্য করতে পারলো না। হিন্দুস্তানে সোমনাথের পূজারীরা তোমার সুপুত্রদের মধ্যে আর একবার মাহমুদ গজনবীর প্রাণ সঞ্জীবিত করেছে– কাশ্মীরের উপত্যাকায় এখন ব্যাঘ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। তোমার সন্তানরা এতদিন তটে দাঁড়িয়ে তরংগের খেলা দেখছিল। ইতিমধ্যে তোমার দেওয়ানারা বেদেরেগ ঝাঁপিয়ে পড়লো দরিয়ায় এবং তরংগের সাথে খেলা করতে করতে মাঝ দরিয়ায় পৌঁছে গেলো।

নেহরুর সেনাদল কদিনের মধ্যে মুজাহিদদের প্রতিরক্ষা শক্তি চুরমার করে দেবার সংকল্প নিয়ে ময়দানে নেমেছিল। যে সব তলোয়ার পূর্ব পাঞ্জাবের অসহায় নিরস্ত্র মানুষের গর্দান উড়াবার ক্ষেত্রে খুব ধারালো প্রমাণিত হয়েছিল কাশ্মীরের ময়দানে একেবারে ভোঁতা প্রমাণিত হলো।

প্যাটেল, নেহরু ও বলদেব প্রতিদিন ঘোষণা করছিল, শাবাশ বাহাদুর! ভারত মাতা তোমাদের জন্য গর্বিত। কিন্তু ভারত মাতার গর্বিত সুপুত্ররা অবাক হচ্ছিল এই ভেবে যে, তাদের সামনে নিরস্ত্রদের ঠেলে দেয়া হচ্ছে না কেন? হিন্দুস্তান সরকার পাকিস্তানের কাছে অভিযোগ করছিল, তারা উপজাতীয় ও সীমান্ত রেজাকারদেরকে কাশ্মীর সীমান্তে বাধা দেয়নি কেন? কোটলী, মীরপুর ও আখনৌরে হিন্দুস্তানী সেনাদল চরমভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল।। উড়ী ও পুঞ্চের রণক্ষেত্রে হিন্দুস্তানী সেনাদল

তাদের সংখ্যাধিক্য ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য সত্তেও মার খাচ্ছিল। নিরস্ত্র মুজাহিদ সৈনারা তাদের যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ অস্ত্র শস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছিল। আল্লামা ইকবালের আত্মা কাশ্মীরের উপত্যকাগুলি ও পাহাড় পর্বতসমূহে গাজীদেরকে স্বাগত জানাচ্ছিল। আর হিন্দুস্তানী মহাজনরা তাদের খৈতেন খাতা খুলে ক্ষতির হিসাব কশছিল।

সীমান্ত ঈগলরা জম্মু থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে ছিল। কাশ্মীরের খালেদ ও তারেকেরা আর একবার নিজেদের পূর্ব পুরুষদের ঐতিহ্যকে সঞ্জীবিত করছিল। এখন বেয়নেটের জবাবে প্রতিবাদের পরিবর্তে ছিল বেয়নেট। এখন হিন্দুস্তান জাতিসংঘের দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছিল।

যখন পাকিস্তান বলছিল কাশ্মীর সমস্যা আন্তর্জাতিক আদালতে পেশ করা হোক তখন পাকিস্তানের কথায় কান দেবার জন্য ভারত প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু এখন সে সাত সমুদ্র পার হয়ে জাতিসংঘের দরোজায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। নেকড়ের অভিযোগ ছিল, তাকে পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী ও জুনাগড়ের মতো কাশ্মীরে ভারতমাতার আজাদীর উৎসব অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়া হলো না কেন? নেকড়েদের প্রতিনিধি বিশ্ব শান্তির ইজারাদারদের কাছে আবেদন জানাচ্ছিল, তোমরা আজাদ কাশ্মীরে আমাদের শিকার ক্ষেত্র থেকে পাকিস্তানকে তার সেনাদল ফেরত নেবার হুকুম দাও। তোমরা কাশ্মীরের পঁয়ত্রিশ লাখ মুসলমানকে শৃংখলাবদ্ধ করে আমাদের সামনে ফেলে দাও এবং তারপর দেখো আমাদের হাত কত শক্তিশালী।

আজ কাশ্মীর সমস্যা জাতিসংঘের সামনে আছে। হিন্দুস্তান বিশ্বজনমতের সামনে উলংগ হয়ে গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো প্রকার বিভ্রান্তির শিকার হওয়া আমাদের উচিত নয়। জাতিসংঘ আমাদের সাথে ইনসাফ তখনই করতে পারবে যখন আমাদের মধ্যে বেইনসাফীর বিরুদ্ধে লড়াই করার হিম্মত ও শক্তি থাকবে। আজ যদি জাতিসংঘে হিন্দুস্তানের সাথে পাকিস্তানের আওয়াজ শ্রুত হয়ে থাকে তাহলে এজন্য সেইসব মুজাহিদদের শোকর গুজারী করা উচিত যারা নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে বিশ্বের সামনে কাশ্মীর সমস্যার গুরুত্ব সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে, যারা এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন রাজনৈতিক জোটবদ্ধতার কারণে হিন্দুস্তান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির নেতৃত্ব দেবার স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু তার শক্তির হাতি এখন কাশ্মীরের চোরাবালিতে ফেঁসে গেছে।– তবে হ্যাঁ, কাশ্মীরের যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। আর কাশ্মীর সমস্যার ইনসাফ পূর্ণ সমাধানের জন্য হিন্দুস্তান জাতিসংঘের দরোজায় ধর্ণা দিয়েছে– এ ধরনের কোনো আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত থাকা আমাদের উচিত নয়। একান্ত অক্ষম হয়েই হিন্দুস্তান কেবলমাত্র তার কর্ম পদ্ধতি বদলে দিয়েছে। বিগত ক্ষতি পুশিয়ে নেবার জন্য তার কাশ্মীরের ওপর চূড়ান্ত হামলা করার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। কাশ্মীরের তুষারপাত ও হিমাংকের নিচের বরফ শীতল আবহাওয়া তার সৈন্যদের সকল উদ্দীপনায় পানি ঢেলে দিয়েছে।

শীতের মধ্যে হিন্দুস্তানী ফউজ রশদপত্র ও গোলা বারুদ একত্র করছিল। নতুন পুল ও নতুন রাস্তাঘাট তৈরি করছিল। ফলে বসন্তের আগমনের সাথে সাথেই হিন্দুস্তান পূর্ণশক্তিতে নতুন হামলা শুরু করে দিল। জুনাগড় গ্রাস করার পর তার বিশ্বাস জন্মে গেছে শক্তির ভিত্তিতে যে ফায়সালা করা হয় বিশ্ব শান্তির ঠিকাদার তা রদ করতে পারবে না।

পাকিস্তানকে শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কাশ্মীরের মুজাহিদরা প্রস্তুতির জন্য যে সামান্য সময় দিচ্ছে পাকিস্তানকে তা থেকে ফায়দা উঠানো উচিত।

যারা মনে করে নিজেদের মজলুমী ও অসহায়তার ঢোল পিটিয়ে তারা জাতিসংঘকে কাশ্মীরের ব্যাপারে কার্যকরী হস্তক্ষেপে বাধ্য করবে তাদের ফিলিস্তিন থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। ফিলিস্তিনে বিশ্বশান্তির ইজারাদাররা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, দুর্বল জাতিদের তাদের কাছ থেকে ইনসাফ, ন্যায়বিচার বা করুণা আশা করা উচিত নয়। আরব দেশগুলি ফিলিস্তিনের ওপর ইহুদী আক্রমণের বিরুদ্ধে মজবুত মোর্চা বানাতে পারেনি। ফলে সিকিউরিটি কাউন্সিলও ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করার প্রতি সমর্থন দিয়েছে। এ্যাংলো আমেরিকান ব্লকের ইহুদী তোশনের পরে বিশ্ববাসী ভেবেছিল রাশিয়া এই বেইনসাফীর বিরোধিতা করবে। কিন্তু এই প্রথমবার পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্টরা একটি ব্যাপারে ঐকমত্য পোশন করলো। তারা উভয়ে মিলে বাইরের একটি জাতিকে মুসলমানদের ঘরের মধ্যে এনে বসিয়ে দিয়ে গেলো।

ফিলিস্তিনের মুসলমানদের যুক্তি দুর্বল ছিল না, তাদের এ ধরনের কোনো অপরাধ ছিল না। বরং তারা নিজেদের ঘরের হেফাজত করতে পারেনি, তাদের কাছে সেই তলোয়ার ছিল না যা অন্যায় ফায়সালা রদ করতে পারে, এই ছিল তাদের অপরাধ।

হে আমার জাতি! পূর্ব পাঞ্জাবে যা কিছু ঘটেছে তা কোনো সাম্প্রদায়িক দাংগার ফল ছিল না। মানবেতিহাসের সবচেয়ে বড় গণহত্যাকে সাম্প্রদায়িক দাংগার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা আসলে প্রপাগাণ্ডা শিল্পের এমন সব গুরুদের উর্বর মস্তিষ্কের উদ্ভাবন যারা দুনিয়াবাসীর চোখে অহিংসা পরম ধর্মের ধূলি নিক্ষেপ করে নিকৃষ্টতম হিংস্র ও বর্বর নেকড়ের ফউজ তৈরি করেছিল। পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, ভরতপুর, ইলোর, পাতিয়ালা, ফরিদকোট, নাভ ও কাপুরথলার মঞ্চে রক্তাক্ত নাটক অভিনীত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাংগার সাথে তার কোনো তুলনাই হয় না। এটা ছিল এমন একটা গণহত্যা যার পৃষ্ঠ- পোশকতা করছিল ভারত সরকার, ভারতের সেনাবাহিনী ও পুলিশ এবং ভারতে যোগদানকারী রাজ্যগুলির শাসকবৃন্দ। নেহরু ও প্যাটেল থেকে নিয়ে একজন সেবক সংঘী এবং বলদেব সিং থেকে নিয়ে একজন

আকালী পর্যন্ত সবাই এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। হিন্দুস্তান থেকে মুসলমানদেরকে সমূলে উৎখাত করার পরিকল্পনার একটি গ্রন্থী ছিল এ গণহত্যা।

কিন্তু পাকিস্তানে এখনো এমন লোক আছে যারা যে কোনো অবস্থায় প্যাটেল ও নেহরুর রক্ত রঞ্জিত হাত ধুয়ে দেয়া নিজেদের কর্তব্য মনে করে। আর একবার এরা জাতির পিঠে হাত বুলিয়ে তাদেরকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে।

দেশ বিভাগের পূর্বে কংগ্রেস যখন মুসলমানদের ওপর শেষ আঘাত হানার জন্য হিন্দু ও শিখ জাতির সন্ত্রাসী গ্রুপগুলিকে সংগঠিত করছিল তখন মিথ্যাচারী লোকদের একটি দল এই বলে মুসলমানদের পিঠ থাপড়াচ্ছিল যে, হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই এবং হিন্দুদের মনোভাব সম্পর্কে মুসলমানদের সন্দেহ পোশন করা উচিত নয়। মুসলমানদের পৃথক সংগঠন রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণমনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। গান্ধী বড়ই ভালো মানুষ। কাজেই মুসলমানদের কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই।

দেশ বিভাগের পর তাদের জায়গা দখল করেছে একদল কবি ও সাহিত্যিক। এখন এরা হিন্দু ফ্যাসিবাদের পক্ষে সাফাই গাইছে। এদের দাবী হচ্ছে, প্রথমত পূর্ব পাঞ্জাবের ভয়াবহ ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করা যাবে না। আর যদি করা হয় তাহলে এর দায়ভার পঞ্চাশ ভাগ হিন্দু ও শিখদের ওপর এবং বাকি পঞ্চাশ ভাগ মুসলমানদের ঘাড়ে চাপাতে হবে। কারণ মুসলমান পূর্ব পাঞ্জাবের ভয়াবহ ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যেন আবার হিন্দু ফ্যাসিবাদের সয়লাবের বিরুদ্ধে নিজের সামগ্রিক শক্তিকে কাজে না লাগায়। হিন্দুস্তান জুনাগড় গ্রাস করেছে। কাশ্মীর গ্রাস করতে চায়। হিন্দুস্তান থেকে মুসলমানদের উৎখাত করার পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণ রূপ দেবার পর পাকিস্তানের ওপর শেষ আঘাত হানতে চায়।

এইসব কবি সাহিত্যিকদের জন্য মুসলমানদের ইজ্জত আবরু-জান-মাল কোনো সমস্যা নয়। দশ পনের লাখ মানুষ হত্যাও কোনো সমস্যা নয় তাদের কাছে। জাতির হাজার হাজার অপহৃত বউ-বেটিও কোনো সমস্যা নয়। এই রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক এতিমরা সাহিত্যের নামে কোকেনের ব্যবসা করে এবং পাকিস্তানের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র হিন্দুস্তানে কয়েকটি বই বিক্রি করার জন্য এই কোকেন বিক্রেতাদের পৃষ্ঠপোশকতা করছে।

সামষ্টিক বিপদ মুসিবতের মোকাবিলা করার জন্য সামষ্টিক সংগ্রাম সাধনার প্রয়োজন হয় এবং সামষ্টিক সংগ্রাম-সাধনা সামষ্টিক চিন্তা-চেতনা ও কার্যক্রম ছাড়া সম্ভব নয়। পূর্ব পাঞ্জাবের ধ্বংস ও বরবাদীর পর মুসলমানরা অনুভব করছে যদি আমরা হিন্দু ফ্যাসিবাদের আক্রমণের সামনে নিজেদের সামষ্টিক শক্তিকে কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ করতে সক্ষম না হই তাহলে পাকিস্তানের ভূখণ্ডে পূর্ব পাঞ্জাব, জুনাগড় ও দিল্লীর ইতিহাসের পুনরাবর্তন করা হবে। সামষ্টিক বিপদের অনুভূতিই জাতির যুব শক্তিকে কাশ্মীরের ময়দানে টেনে এনেছে। এখানে যে যুদ্ধ করা হচ্ছে তার ওপর কাশ্মীরের পঁয়ত্রিশ লাখ মুসলমান ছাড়াও পাকিস্তানের আট কোটি অধিবাসীর জীবন নির্ভর করছে। এখানে মানবতা ও ইসলামী বিশ্বের জন্য সবচেয়ে

বড় বিপদের মোকাবিলা করা হচ্ছে। কাশ্মীর সমস্যা কেবলমাত্র ভৌগোলিক দিক দিয়ে পাকিস্তানের অংশ হিসাবে গণ্য এলাকাটির সমস্যা নয়, যার উপত্যকাসমূহ থেকে পাকিস্তানের জীবন স্রোতস্বিনী উৎসারিত বরং এটি পুরোপুরি একটি জাতির অস্তিত্ব, আজাদী ও মর্যাদার সমস্যা।

এ অবস্থায় জাতির সিপাহীর তলোয়ার ও সাহিত্যিকের কলম একই পথের পথিক। কোকেন বিক্রেতার পর্যায়ভুক্ত এই সাহিত্যিক ও কবিরা তুফানের ধ্বংসকারিতার সামনেও জাতির চোখে পট্টি বাঁধতে চাচ্ছে। এদের রাজনৈতিক নেতারা তন্দ্রাভিভূত মুসলমানদেরকে ঘুমের বড়ি খাওয়াচ্ছে এবং এরা জাগন্ত মুসলমানদের গলায় কোকেন ঠুঁসে দিচ্ছে। এদের কাছে মুসলমানদের স্বাধীনতার সমস্যা কোনো সমস্যা নয়। আর এখন এরা নতুন দৃষ্টিভংগী ও নতুন মূল্যবোধের অধিকারী হবার কারণে মুসলমানের জীবন ও মৃত্যুর কোনো তাৎপর্যই এদের দৃষ্টিতে নেই।

হে জাতির সাহিত্যিক! তোমার সামনে আছে ভস্মীভূত ছাইয়ের স্তূপ। তোমার অগ্নি উদ্গীরণকারী লেখনী তার বুকে বিদ্যুত প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে। পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লীর শাহীদদের খুনকে মাটির বুকে শুকিয়ে যেতে দিয়ো না। এই খুনের রোশনাই দিয়ে তুমি এমন কিতাব রচনা করতে পারো যা জাতির জোয়ানদের সীনায় নতুন জীবন প্রবাহ সৃষ্টি করবে। তাদের হৃদয়ে জন্ম দেবে নতুন আশা আকাংখার।

আমরা অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু একটি বিরাট বিশাল সম্পদ আমাদের এখনো আছে। আমাদের জনতার মনোবল ও উন্নত সংকল্প অপরিবর্তিত আছে। মানব ইতিহাসের বৃহত্তম দুর্ঘটনার শিকার হবার পরও তাদের দিলে ঈমান ও ইয়াকিনের মশাল রওশন আছে। তারা ইসলামের নামে বেঁচে থাকতে ও মৃত্যু বরণ করতে চায়। কুফরের সয়লাব তাদের দিল থেকে রসূল প্রেমের স্ফুলিংগকে নিভাতে পারেনি। তাদের নিস্বার্থপরতা আত্মত্যাগ ও আন্তরিকতা আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। কিন্তু দেশ আজো এই অমূল্য সম্পদ থেকে পুরোপুরি ফায়দা হাসিল করার প্রচেষ্টা চালায়নি।

হে আমার জাতি! যেসব মানুষ মেষপালের জীবন যাপন করে তারা নেকড়ের হাতে জীবন দান করে। আমাদের মধ্যে আজো এমন লোকের কমতি নেই যারা কেবল নেতা খেতাব পাওয়ার লোভে জনগণকে মেষপালের জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করছে। অনেক নেতৃত্ব প্রত্যাশী আশংকা করে জাতি যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে কর্ম ও সংগ্রামের ময়দানে নেমে আসবে তখন তাদের নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক যোগ্যতার দাম কমে যাবে। তাই যে কোনো মূল্যে তারা জাতিকে বিশৃংখল রাখতে চায়।

এই লোকেরা বিগত কয়েক'শ বছর মিল্লাতের সুদৃঢ় প্রাচীরকে স্বার্থান্ধতার করাত দিয়ে চিরে খণ্ড বিখণ্ড করেছে। ইসলাম একটি অবিভাজ্য সত্তা ছিল। কিন্তু

এরা তাকে ফেরকা, দল, বংশ ও অঞ্চলে বিভক্ত করে ফেলেছে। কষ্ট ও বিপদের দিনে যখন মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও শৃংখলা প্রবণতা জাগ্রত হতো এরা তখন ময়দানে বের হয়ে আসতো। গ্রানাডাবাসীদের ওপর যখন মুসিবতের পাহাড় নেমে আসছিল, এরা তাদেরকে আরবীয়, আন্দালুসী ও বার্বারী নামে পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত করেছিল। বাগদাদের ওপর যখন তাতারীদের আক্রমণ চলছিল তখন এরা বিভিন্ন ফেরকার মধ্যে ঘৃণা ও অনৈক্য বিস্তার করে চলেছিল।

ইসলাম আমাদের জন্য এমন একটি ঢাল যা কুফরের সকল আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। ইসলাম আমাদের হাতে এমন একটি তলোয়ার যা অন্য সমস্ত তলোয়ারকে ভোঁতা করে দেয়। ইসলাম অন্ধকার ঘনঘটার মধ্যে আমাদের সামনে আলোর এমন একটি মিনার যা বারবার আমাদের নৌকাকে লক্ষ্যের তীরভূমিতে পৌছিয়ে দিয়েছে। আজ আমরা মৃত্যুর পাঞ্জা থেকে মুক্ত হয়ে জীবন সাগরের কিনারায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। ইসলাম এমন একটি প্রস্রবণ যেখান থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবনের ধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। কুফরের ঘূর্ণিবত্যার সামনে আমাদের বিশৃংখল জীবনগ্রন্থীকে আমরা কেবলমাত্র ইসলামের রশি দিয়েই বাঁধতে পারি। ইসলামই আমাদের ছাইভস্মের বুকে বিজলী সঞ্চার করতে পারে।

হে আমার জাতি! আমি তোমাকে নিরাপদ জীবনের প্রত্যাশী এমন একটি দলের ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি যারা মনে করে পাকিস্তানের শান্তিপ্রিয়তা ও আপোশমুখিতা হিন্দুস্তানের আক্রমণাত্মক সংকল্পের চেহারা বদলে দেবে। বিগত ঘটনাবলী বারবার একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, হিন্দু ফ্যাসিবাদ একমাত্র তলোয়ারের ভাষা বোঝে।

ভারতে এমন একটি শিল্প সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন হচ্ছে যার ভিত্তি রাখা হয়েছে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রবণতার ওপর। হিন্দু শক্তিশালীকে সম্মান করে। না, বরং তাকে পূজা করে। সে দুর্বলকে অচ্ছুতে পরিণত করে দলিত মথিত করে। মোগল রাজবংশের পতনের পর মুসলমানদের বিশৃঙখলা ও দুর্বলতা হিন্দুর অচ্ছুত দুশমনীকে ইসলামী দুশমনীতে পরিবর্তিত করে। ইসলামের সাথে হিন্দু ধর্মের যে পরিমাণ বৈপরীত্য আছে সেই পরিমাণই মুসলমানের অস্তিত্ব হিন্দুর জন্য অসহনীয়। আমাদের ভদ্রতা, সভ্যতা, শান্তি প্রিয়তা ও সততা ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্য অর্থহীন যতক্ষণ আমরা নিজ বাহুবলে তার কাছ থেকে নিজেদের জীবিত থাকার অধিকার আদায় করে নিই।

হিন্দুস্তানের মন্দিরগুলি থেকে যে আগুন উত্থিত হয়েছে তা তওহীদের দশ কোটি সন্তানকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিতে চায়। এ আগুন হামেশা কোনো মুহাম্মদ বিন কাসেম ও মাহমুদ গজনবীর ইন্তিজার করতে থাকবে।

হিন্দুস্তানের শাসক শ্রেণী যে পরিমাণ ইসলাম দুশমনীর প্রকাশ ঘটাবে হিন্দু জনতার মধ্যে তার জনপ্রিয়তাও ঠিক সেই পরিমাণ বেড়ে যাবে।

কংগ্রেসের প্রথম শ্রেণীর নেতা মি. প্যাটেল নিজেকে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দুশমন প্রমাণ করেছে। তাই দেখা যায় হিন্দু জনতার মধ্যে তার জনপ্রিয়তা মি. গান্ধী ও নেহরুর চাইতে অনেক বেশী। হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের নেতারা প্যাটেলের তুলনায় অনেক বেশি চরম পন্থী। কাজেই ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, আগামীর দিনগুলিতে হিন্দুস্তানের ভাগ্য ঐসব উন্মাদদের হাতে ন্যস্ত হবে। তারা হিন্দু জনমতের সামনে একথা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে যে, হিন্দুস্তানে মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনা প্যাটেল ও নেহরুর তুলনায় অনেক বেশি ভয়াবহ। সেদিন বেশি দূরে নয় যখন নেহরু ও প্যাটেলের চেয়ারে আমরা সেবক সংঘী ও মহাসভায়ীকে দেখবো। তখন হিন্দুস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে পূর্ব পাঞ্জাবের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। পাকিস্তানের মুসলমানরা যদি নিজেদের কোটি কোটি ভাইয়ের হত্যাকাণ্ড নিছক একজন দর্শক হিসাবে প্রত্যক্ষ করে তাহলে এটা এমন একটা অপরাধ হবে যা সম্ভবত আল্লাহ কখনো মাফ করবেন না।

কোনোদিন আমরা হঠাৎ শুনবো, আজ হিন্দুস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে একজন মহাসভায়ী বা সেবক সংঘী। পূর্ব পাঞ্জাবে যেমন দ্রুততার সাথে মুসলিম গণহত্যা করা হয়েছিল তার থেকেও দ্রুততার সাথে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও মুসলমানদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হবে। হিন্দুস্তানে যখনই কোনো গণআন্দোলন শুরু হবে তার মোড় ফিরিয়ে দেয়া হবে মুসলমানদের দিকে।

শান্তি ও সমঝোতা দুনিয়ায় অনেক বড় নেয়ামত। কিন্তু শান্তি ও সমঝোতা একমাত্র তার জন্য যে অন্যায় ও অকল্যাণের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকে। যতোদিন দেশ বাইরের বিপদমুক্ত হতে পারছে না ততদিন তোমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, তোমার অংশের প্রতিরক্ষামূলক কাজ এখনো বাকি আছে। তোমার হাত জখমী ঠিকই কিন্তু জাতির উন্নতির ও গৌরবের তাজমহল হামেশা তারাই নির্মাণ করেছে যাদের হাত জখমী ছিল।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতি সেই মহান ব্যক্তির নেতৃত্ব হারা হয়ে গেলো যে তাকে তুফান ও অন্ধকারের বুক চিরে পাকিস্তানের মনজিলে মাকসূদে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ জাতির নৌকার এমন একজন নাখোদা ছিলেন যিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছর পর পর্যন্ত

মানব ইতিহাসের ভয়াবহতম তুফানের মোকাবিলা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ জাতির চিন্তা-চেতনাকে বজ্রাহত করলো। এর পরপরই খবর এলো হিন্দুস্তানের হিংস্রতা ও বর্বরতার সয়লাব হায়দরাবাদের সীমানায় প্রবেশ করেছে। জওয়াহেরলাল নেহরুর ট্যাংক নিরস্ত্র মুসলমানদের লাশের উপর দিয়ে এগিয়ে গেছে। এ ধরনের নাজুক পরিস্থিতিতে জাতি যে আওয়াজটির ইন্তিজার করতো তা চিরতরে খামুশ হয়ে গিয়েছিল।

ভারত সরকার দীর্ঘদিন থেকে দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু আক্রমণ করার আগে হায়দরাবাদ যেন তার জন্য আর একটা কাশ্মীরে পরিণত না হয় একথা নিশ্চিতভাবে জানা তার জন্য অত্যন্ত জরুরী ছিল। এ নিশ্চয়তা তাকে হায়দরাবাদের নিজাম ছাড়া আর কেউ দিতে পারতো না।

মুসলমানরা মাথায় কাফন বেঁধে ময়দানে এলো। তাদের নেতা সাইয়েদ কাসেম রিজভী আর একবার সুলতান টিপুর শ্লোগান উচ্চারণ করলো, 'সিংহের একদিনের জীবন শিয়ালের হাজার বছরের জীবনের চেয়ে ভালো।' কিন্তু যেসব আত্মমর্যাদাশীলতা নিছক দেশী রাইফেল ও বর্শা সজ্জিত হওয়া স্বত্বেও হিন্দুস্তানের ট্যাংক, বিমান ও কামানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল তারা নিজামের গাদ্দারী ও কাপুরুষতার ধকল সহ্য করতে পারেনি। হায়দরাবাদের যুদ্ধ বহু মুসললমানের জন্য জীবন মৃত্যুর যুদ্ধ ছিল। তারা জানতো হিন্দু ফ্যাসিবাদের সামনে অস্ত্র সংবরণ করার পর তাদের পরিণাম কি হবে।

নিরস্ত্র মুসলমানরা এই আশা নিয়ে হিন্দুস্তানের কামান ও ট্যাংকের মুখোমুখি হয়েছিল যে, নিজামের সেনাবাহিনী যুদ্ধে তাদের সহায়তা করবে। কিন্তু নিজাম প্রমাণ করলো তার পূর্ব পুরুষদের রক্তের রং বদলে যায়নি। দাক্ষিণাত্যের মুসলমানরা যখন দুশমনের ট্যাংকের সামনে শুয়ে পড়ছিল নেজামের সেনাবাহিনী তখন সেকেন্দ্রাবাদে হানাদারদের স্বাগত জানাবার প্রস্তুতি চালাচ্ছিল।

দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদ ছিল মুসলমানদের শেষ প্রতিরক্ষা প্রচীর। হিন্দুস্তানে যখন মুসলমানদের হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়েছিল তখন মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশ থেকে লাখো মুসলমান হিজরত করে হায়দরাবাদে আশ্রয় নিয়েছিল। হায়দরাবাদের ধ্বংসের কাহিনী বাগদাদ ও গ্রানাডা থেকে আলাদা ছিল না। শতশত বছর থেকে যে জমিন মুসলমানদের প্রতিপত্তি ও শান শওকত দেখে আসছিল এখন সেখানে প্রবাহিত হচ্ছিল নিরপরাধদের রক্ত এবং অসহায়দের অশ্রু। হায়দরাবাদে মুসলমানদের শত শত বছরের স্বাধীনতা ও শাসনের অবসান ঘটছিল এ ধরনের শব্দাবলীর মাধ্যমে যে, জাতিদের দুশমনীর জন্য নেহরু ও প্যাটেলের তুলনায় ঘরের শত্রু বিভীষণরাই বেশি বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়। যে ঘরের পাহারাদার চোর ও

ডাকাতদের সাথে যোগসাজশ করে তা হামেশাই ধ্বংস ও বরবাদীর মুখোমুখি হয়।

সেলিম তিন সপ্তাহ থেকে মিরপুরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল। কাশ্মীরের জিহাদে সে দ্বিতীয়বার জখমী হয়েছে। প্রথমবার তার জখম মামুলি ছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার দুশমনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোর্চায় হামলা করতে গিয়ে সে গুরুতর জখম হয়। তাকে চিকিৎসার জন্য মীরপুর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অপারেশনের পরে যখন সে জ্ঞান ফিরে পেলো দেখলো একজন বুড়ো ডাক্তার তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এবং অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখছেন। তিনি ছিলেন ডাক্তার শওকত।

সেলিমের প্রথম প্রশ্ন ছিল, আমি কবে রণক্ষেত্রে যেতে পারবো?

ডাক্তার শওকত কিছুটা চিন্তাক্লিষ্ট নয়নে তার দিকে তাকালেন।

বেটা তুমি জলদি ঠিক হয়ে যাবে। বাহুর জখম ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার পা............!

সেলিম চমকে উঠে বললো, হ্যাঁ, আমার পায়ের ব্যাপারে........?

ডা. শওকত সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বেটা! আশংকার কোনো কারণ নেই তবে তোমাকে বেশ কিছুদিন আরাম করতে হবে।

আরাম! সেলিম অতি দুঃখে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, আরাম আমার জন্য খুবই কষ্টকর হবে। এই ধরনের নিরবতাকে আমি ভয় করি।

ডাক্তার শওকত একটি টুল টেনে এনে তার কাছে বসে বললেন, বেটা! ঘাবড়াবে না। ইনশা আল্লাহ তুমি অতি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে।

আপনি অপারেশনের আগে আমার পায়ের ব্যাপারে পেরেশান ছিলেন। আমি জানতে চাচ্ছি কতদিনে আমি ময়দানে যাবার যোগ্যতা অর্জন করবো? হাঁটুর নিচে থেকে নিয়ে পায়ের আঙুল পর্যন্ত সমস্তটাই অসাড় হয়ে গেছে।

ডাক্তার কিছু বলতে চাচ্ছিলেন এমন সময় দূরে বিমানের আওয়াজ শোনা গেলো। আওয়াজ কাছে এসে গেলো। হাসপাতালে শায়িত রোগীরা পরস্পরের প্রতি তাকাতে লাগলো। বাইরে কেউ বুলন্দ আওয়াজে বললো, শুয়ে পড়ো, ওরা এদিকে আসছে। সাথে সাথেই হাসপাতালের কিছু দূরে বোমা ফাটলো এবং মেশিনগানের ট্যার ট্যার ট্যার ট্যারও শোনা গেলো। একটি বোমা ফাটলো হাসপাতালের এক কোণের কাছাকাছি একটি জায়গায়। একটি আলোর স্ট্যাণ্ড এবং জানালার কয়েকটা কাঁচ উড়ে গেলো। সেলিমের থেকে কিছু দূরে একজন রোগী আচানক বিছানা থেকে

উঠে বসলো এবং উচ্চ কণ্ঠে বললো, তোমরা কি দেখছো? তোমাদের কামান ও মেশিনগান চালাচ্ছো না কেন? ওদেরকে মেরে উড়িয়ে দাও। আল্লাহর কসম এরা খেলনার চেয়ে বেশি নয়। পাকিস্তানের বৈমানিকদের বলো, এরা যেমন জালেম তেমনি বুজদিল।

ডাক্তার দ্রুত উঠে এগিয়ে গেলেন এবং তাকে ধরে জবরদস্তি শুইয়ে দিতে দিতে বললেন, আপনি শুয়ে আরাম করুন। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না।

রোগী ডাক্তারের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে বললো, আমাকে রাইফেল দাও, আমি এদের সব কটাকেই গুলী করে মাটিতে ফেলে দেবো। আল্লাহর কসম, আমি ওদেরকে ডরাই না।......... ওদেরকে ডরাই না...........। হাসপাতালের আরো কয়েকজন কর্মচারী তার চারপাশে জমা হয়ে গেলো। বিমান হাসপাতালের আশেপাশে কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করে এবং এলোপাতাড়ি কয়েক রাউণ্ড গুলী ছুঁড়ে দে ছুট। রোগীর জোশ ও জযবা অনেকটা কমে এসেছিল। সে বলছিল, আমাকে ছেড়ে দিন ডাক্তার সাহেব, আমি সুস্থ হয়ে গেছি।

ডাক্তার শওকত আবার সেলিমের কাছে এসে বসে বললেন, গতকাল বিকালে ওকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এখানে আনা হয়েছে। ইতিপূর্বে মুজফফরবাদে ছিলাম। সেখানেও সে জখমী হিসাবে এসেছিল। ওর সাথিরা ওর সাহসিকতার ভীষণ তারীফ করছিল।

ডাক্তার সাহেব! এখন উনি কেমন?

ওর জখম মামুলি ধরনের। কিন্তু নিউমোনিয়ায় প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত। এখনো সে জ্বরের ঘোরে চিল্লাচ্ছিল। তবে আগের বারের তুলনায় এবার তার অবস্থা অনেক ভালো। ইনশা আল্লাহ জলদি সুস্থ হয়ে যাবে।

সেলিম একটু চিন্তা করে বললো, ডাক্তার সাহেব! যদি কষ্ট না হয় তাহলে ওর বিছানাটা আমার বিছানার কাছে এনে দিন, তবে এখন নয়। এ সময় সে আমাকে দেখে পেরেশান হয়ে যাবে।

তুমি তাকে চেনো?

সে আমার কলেজ সহপাঠী। সে সময় আমরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম। আমি ভাবতেই পারছি না, কোনোদিন আমরা একই ময়দানে একত্র হয়ে যাবো—!

এ নওজোয়ান ছিল আলতাফ। জাতীয়তাবাদী স্বদেশভক্ত আলতাফ। ছাত্রাবস্থায় পাকিস্তান শব্দটির সাথে তার জন্মগত বিরোধ ছিল। আর আজ সে দীর্ঘদিন থেকে পাকিস্তানের একজন নাম গোত্রহীন মুজাহিদ হিসাবে কাশ্মীরের জিহাদে অংশ নিচ্ছিল।

তৃতীয় দিন আলতাফের জ্বর নেমে গিয়েছিল। সেলিমের নিকটে বিছানায় শায়িত অবস্থায় সে তার কাহিনী শুনিয়ে যাচ্ছিল। আলতাফের কাহিনী সেলিমের জন্য নতুন ছিল না। এ ধরনের শত শত কাহিনী শুনেছিল সে। যারা শেষ মুহূর্ত

পর্যন্ত হিন্দু ও শিখদের ওপর ভরসা করেছিল আলতাফ ছিল তাদের একজন। তার শহরে জেলা কংগ্রেস সভাপতি ছিল তার বন্ধু। ডেপুটি কমিশনার ও সামরিক অফিসাররা তার বাপকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, তার পরিবারের হেফাজতের জন্য দিল্লী থেকে প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী বিশেষভাবে কঠোর নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। কাজেই যখন হাংগামা শুরু হলো, মহল্লার কয়েকটি পরিবার আলতাফদের বাড়ি সংরক্ষিত মনে করে সেখানেই নিজেদের বউবেটিদের পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এরপর তাদের বাড়ির ওপর হামলা হলো। কংগ্রেস নেতা ও পুলিশ অফিসাররা হামলাকারীদের পথ দেখিয়ে আনলো। হামলার সময় আলতাফের বাপ বাড়ির সদর দরোজার বাইরে এসে চিল্লালো, 'জালেমরা! আমরা সব সময় কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা করেছি। আমরা সব সময় পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছি। নেহরু ও প্যাটেল আমাকে জানে। আমার কাছে মহাত্মা গান্ধীর চিঠি আছে।' হানাদাররা অট্টহাসি দিয়ে উঠলো। একজন শিখ তাকে দাড়ি ধরে টেনে হিঁচড়ে গলির মধ্যে নিয়ে গেলো। ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো চারদিক থেকে দাংগাড়েরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আলতাফ দ্বিতীয় গলিপথ দিয়ে বের হয়ে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোর দিকে দৌড়ালো। কিন্তু পুলিশের সিপাহীরা তাকে বাংলোর গেটের বাইরে থামিয়ে দিল। আলতাফ চিৎকার করে বলছিল, আমি ডেপুটি কমিশনারের বন্ধু। আমাকে তার কাছে যেতে দাও। আমার বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে। নেহরু ও প্যাটেল আমাকে জানে। সিপাহী একথার জবাবে বলছিল, একে পায়ে দড়ি বেঁধে এখানে উল্টা করে ঝুলিয়ে দাও।

ডেপুটি কমিশনার তার গাড়িতে বসে বাসা থেকে বের হলো। সিপাহীরা পথ ছেড়ে একদিকে দাঁড়ালো। ডেপুটি কমিশনার গাড়ির বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে ড্রাইভারকে বললো, থেমো না, সামনের দিকে চলো।

আলতাফ এক ঝটকায় নিজেকে সিপাহীদের থেকে মুক্ত করে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে ট্যাক্সির পাদানিতে পা রেখে চিৎকার করলো, ডেপুটি সাহেব! কার থামান, আমি আলতাফ। আমার বাড়ির ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। আপনি তাদেরকে থামাতে পারেন। আলতাফ গাড়ির জানালা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। সিপাহীরা কয়েক কদম দূরে তার পিছু নিয়ে দৌড়ে চলে আসছিল। ডেপুটি কমিশনার প্রথমে হাতের ধাক্কায় তাকে ফেলে দিতে চাইলো। তারপর পিস্তল বের করে ফায়ার করলো। গুলী তার কাঁধের পাশে লাগলো। তারপরও সে গাড়ি না ছাড়ায় ডেপুটি কমিশনার তাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিল। ড্রাইভার আবার গাড়ি থামাতে চাইল। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার আবার বললো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের এয়ার পোর্টে পৌঁছুতে হবে। জোরে চালাও।

কারের পাশ দিয়ে একটি ফউজী ট্রাক যাচ্ছিল। আলতাফ নিচে পড়ে যেতেই ট্রাকটি থেমে গেলো। বেলুচ রেজিমেন্টের একজন অফিসার ও পাঁচজন সিপাহী নিচে নামলো। আলতাফের পেছনে ধাওয়াকারী পুলিশের সিপাহিরা তাদেরকে দেখে

থেমে গেলো। এই ট্রাকের পেছনে বেলুচ রেজিমেন্টের আরো দশটি ট্রাক আসছিল। অফিসারের নির্দেশে তারাও থেমে গেলো। পুলিশের সিপাহিরা এক মিনিট থেমে গিয়ে এবার পিছন দিকে ভাগতে লাগলো। অফিসারের হুকুমে সিপাহীরা বেহুশ অবস্থায় আলতাফকে একটি ট্রাকে শুইয়ে দিল। তারপর হুশ ফিরে পেয়ে দেখলো সে লাহোর হাসপাতালে শুয়ে আছে।

সুস্থ হয়ে ওঠার পর নিজের খান্দানের পরিণতি সম্পর্কে আলতাফ কিছুই জানতে পারেনি। একদিন লাহোরের ওয়ালটন ক্যাম্পে তার মহল্লার কয়েকজন লোকের সাথে দেখা হলো। তারা জানালো, হামলার সময় তার স্ত্রী বাড়ির তিন তালার ওপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়েছিল। তার খান্দানের এবং তাদের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণকারী মেয়েদের উলংগ করে রাস্তায় মিছিল বের করা হয়েছিল। এরপর দুমাসের মধ্যে ফউজী কনভয়ের সাহায্যে আলতাফ তিনবার পূর্ব পাঞ্জাব ঘুরে এসেছে। কিন্তু তার খান্দানের কোনো মহিলার সন্ধান পায়নি। তার ভগ্নিপতি লাহোরে ছিল। একদিন তারা শুনলো জালিন্ধরের আশপাশ থেকে কিছু মুসলিম মেয়েকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা লাহোর পৌছে যাবে। আলতাফ তার ভগ্নিপতিকে নিয়ে ষ্টেশানে পৌছুলো। ঐ মেয়েদের মধ্যে তার খান্দানের একটি মাত্র মেয়ে ছিল। সে ছিল তার বোন। আলতাফ যখন সেলিমের কাছে এসব ঘটনা বর্ণনা করছিল তার মনে হচ্ছিল যেন কেউ তার গলা চেপে ধরছে। আলতাফ আচানক খামুশ হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে সে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, সেলিম! সে দৃশ্যটি ছিল বড়ই হৃদয় বিদারক যখন আমি আমার বোনের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। সে আমাকে চিনতে পারেনি। উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল সে। মাঝে মাঝে তার জ্ঞান ফিরতো। তখনকার অবস্থা হতো আরো করুণ। আমাকে দেখলেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো সে। তার ধারণা ছিল হামলার সময় আমি সবাইকে ফেলে রেখে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে এসেছিলাম। দেশ বিভাগের পূর্বে কলেজে মেয়েদের মজলিসে সে পাকিস্তানের পক্ষে বক্তৃতা করতো। তার চিন্তা-ভাবনা আমার ও আব্বাজানের বিপরীত ছিল।

কাশ্মীরের যুদ্ধ শুরু হলে মুজাহিদ দলের সাথে আমি সেখানে পৌছলাম। দুমাস পরে উড়ীর রণক্ষেত্রে একদিন আমার সেই ভগ্নীপতি হামেদের সাথে দেখা। সেও আজাদ কাশ্মীর ফউজে শামিল হয়ে গিয়েছিল। সে আমাকে জানালো আমার বোন ফাহমিদা আমার রওনা হবার বিশ দিন পর ইন্তিকাল করেছিল। ইন্তিকালের পূর্বে সে হামেদকে ওয়াদা করিয়েছিল সে কাশ্মীরের জিহাদে শরীক হবে। হামেদ শহীদ হয়ে গেছে। উড়ীতেই তাকে দাফন করা হয়েছে।

আলতাফ ও সেলিম কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো। আচানক আলতাফ বললো, সেলিম! তুমি আখতার সম্পর্কে কিছু জানো কি?

আখতারের নাম শুনেই সেলিম চমকে উঠলো। বললো, না, পনের আগস্টের পর থেকে তার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

আলতাফ বললো, সে শহীদ হয়ে গেছে। আমি প্রথমবার আমার খান্দানের মেয়েদের সন্ধানে জালিন্ধর গিয়েছিলাম। সেখানে ক্যাম্পে আখতারের এক বন্ধুর দেখা পেয়েছিলাম। তার মুখে শুনেছিলাম আখতার অংগীকার করেছিল, যতক্ষণ শহরের সমস্ত মুসলমান পাকিস্তানে পৌঁছে না যাবে ততক্ষণ আমি এখান থেকে যাবো না। তার এক চাচা সেনাবাহিনীতে মেজর পদে চাকরী করতো। খান্দানের সমস্ত লোককে বের করে সে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আখতার সেখানে রয়ে গিয়েছিল। একদিন জালিন্ধরের পাশের একটি গ্রাম থেকে মুসলমানদের বের করে নিয়ে আসছিল সে আশ্রয় শিবিরের গাড়িতে সওয়ার করার জন্য। পথে শিখরা হামলা করেছিল। মাত্র কয়েকজন পালিয়ে এসে গাড়িতে উঠতে পেরেছিল। তারা বলেছিল, আখতার শহীদ হয়ে গেছে।

এক সপ্তাহ পরে সুস্থ হয়ে আলতাফ আবার রণক্ষেত্রে চলে গেলো। সেলিম হাসপাতালের খামুশী ও নিসংগতাকে গভীরভাবে অনুভব করছিল। তিন সপ্তাহ পরে তার জখম শুকালো। কিন্তু এই সংগে সে জানলো গোছার কয়েকটি রগ কেটে যাওয়ার ফলে তার বামপাটি অকেজো হয়ে গেছে। অনির্দিষ্টকাল তাকে ক্রাচে ভর দিয়ে চলতে হবে। ডাক্তার শওকত তাকে বরবার একথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, তোমার এ কষ্ট সাময়িক। কিছুদিন পরে ক্রাচের সাহায্য ছাড়াই তুমি চলতে পারবে। কিন্তু হাসপাতালের অন্য এক ডাক্তার সেলিমকে একথা বলে অনেক হতাশ করে দিয়েছে যে, তোমার ব্যাপারে নিশ্চয়তা সহকারে কিছুই বলা যায় না। হতে পারে কয়েক মাসে তুমি ক্রাচে ভর দিয়ে চলার সামর্থ অর্জন করতে পারবে কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে তোমার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারার আশা খুব কম।

একদিন ডাক্তার শওকত সেলিমকে বললেন আরশাদের চিঠি এসেছে। সে পরশু এখানে এসে পৌছুবে এবং তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাবে। আমিও এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছি। হঠাৎ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য যদি আমাকে ছুটি বাতিল করতে না হয় তাহলে আমিও তোমাদের সাথে যাবো। হ্যাঁ আরশাদ আরো লিখেছে, মজিদ বদলী হয়ে রাওয়ালপিণ্ডি এসে গেছে। যদি সে ছুটি মনজুর করাতে পারে তাহলে সেও সম্ভবত আরশাদের সাথে এসে যাবে।

সেলিম ভারাক্রান্ত স্বরে বললো, ডাক্তার সাহেব! আপনি কি আমার রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়া জরুরী মনে করেন।

ডাক্তার পেরেশান হয়ে বললেন, আমি মনে করেছিলাম হাসপাতালের জীবন তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

হাসপাতালের জীবন সত্যিই আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আর যখন থেকেই আমি জানতে পেরেছি আমি আর সৈনিক জীবন যাপনে সমর্থ নই তখন থেকেই এই চার দেয়ালের মধ্যে আমার দম বের হয়ে আসছে। কিন্তু রাওয়ালপিন্ডি গিয়ে আমি কি করবো?

সেখানে তুমি বেকার বসে থাকবে না সেলিম! আর তোমাকে কে বলেছে তোমার পা আর ভালো হবে না? তুমি সৈনিক জীবন যাপনের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে? বেটা, আমি তোমাকে জানি। যতদিন তোমার হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হয়ে না যাচ্ছে ততদিন কেউ তোমাকে সৈনিক জীবন যাপন থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। আর আমি আশা করি তোমার পা একদম ঠিক হয়ে যাবে। আমি লাহোর ও করাচীর অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে তোমার ব্যাপারে পরামর্শ করবো। কিন্তু যতদিন তুমি বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে পুনরায় ময়দানে যাবার সামর্থ অর্জন করতে পারছো না ততদিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থেকেও তুমি জাতির খিদমত করতে পারো।

কিভাবে?

তোমার কলম বন্দুকের চাইতে কম শক্তিশালী হাতিয়ার নয়। জাতির এর প্রয়োজনও আছে। তুমি নিজেই বলতে, কাশ্মীরের লড়াই পাকিস্তানের লড়াই। আর পাকিস্তানের লড়াই সমগ্র জাতির লড়াই। সেলিম! একে জাতির লড়াইয়ে পরিণত করার জন্য তোমার মতো সাহিত্যিকের কলমের প্রয়োজন। তুমি ছাইভস্ম থেকে বিদ্যুত প্রবাহ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখো।

বিকাল চারটা। আরশাদদের বাড়ির সামনে একটি জীপ থামলো। রাহাত একটি কামরা থেকে বের হয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে বললো, আপাজান! আপাজান! তিনি এসে গেছেন। মুহূর্তের মধ্যে ইসমত যেন তার সমস্ত জাগতিক অনুভূতি হারিয়ে ফেললো। আরেক রঙীন কল্পনার জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেললো সে।

হাতের বইটি টেবিলের ওপর রেখে নিথর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল সে। রাহাত বারান্দা থেকে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, আপাজান! সেলিম ভাই এসে গেছেন। ইসমত যেন স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলো। তার শরীর ও আত্মার মাঝখানের শূন্যটা পূরণ হয়ে গেলো। সেলিম! সেলিম! সেলিম! তার সমস্ত অনুভূতি একত্র হয়ে গেলো। ইসমতের দিল স্পন্দিত হতে লাগলো। কম্পিত হাতে নিজের দোপাট্টা ঠিকঠাক করতে করতে বারান্দার দিকের দরোজার কাছে পৌঁছে গেলো সে। ইতস্তত করলো, থামলো এবং তারপর আচানক বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ডা. শওকত,

আরশাদ, মজিদ ও সেলিম জীপ থেকে বের হয়ে আঙিনায় প্রবেশ করলো। মজিদের সাহায্য নিয়ে সেলিম ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছিল।

'ভাইজান!' রাহাত আচানক এগিয়ে এসে সেলিমের অন্য হাতটি ধরে ফেললো। সেলিমের ঠোঁটে ফুটে উঠলো একটি বেদনার্ত হাসির রেখা। বারান্দায় পা রেখে সেলিম ইসমতের দিকে তাকালো। তার চোখে জ্বলজ্বল করছিল দুফোঁটা অশ্রু মুক্তোদানার মতো। তা থেকে ফুটে বের হচ্ছিল প্রেম, প্রীতি, পবিত্রতা ও হৃদয় বিমুগ্ধকারী ধারা।

কিছুক্ষণ পরে তারা কামরায় টেবিলের চারপাশে বসে চা পান করছিল এবং পাশের কামরায় বসে ইসমত তাদের কথা শুনছিল। আচানক সে উঠে কামরার এক কোণে রাখা চামড়ার ব্যাগটি খুলে ফেললো এবং কাগজে মোড়া একটি সোনার আংটি বের করে হাতের আঙুলে পরলো। তারপর আবার কি খেয়াল হলো আংটি খুলে নিয়ে বাক্সের মধ্যে রেখে দিল।

রাহাত কামরায় প্রবেশ করে ভারাক্রান্ত স্বরে বললো, আপাজান!

ইসমত মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকালো এবং উঠে দাঁড়িয়ে বললো, কি ব্যাপার রাহাত?

রাহাতের হাতে ছিল ক্রাচ এবং চোখে অশ্রু ধারা। এটা সেলিম ভাইজানের। কাঁদতে কাঁদতে বললো সে।

পাগলী, তুমি কাঁদছো কেন? ইসমত তার হাত থেকে ক্রাচ নিয়ে দেয়ালের গায়ে রাখলো।

আপাজান! রাহাত নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, আমার আশংকা ছিল তুমি কষ্ট পাবে।

ইসমত তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, বোকা মেয়ে এতো একজন মুজাহিদের অলংকার।

আপা! ওনাকে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে হচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে তোমার অশ্রু তাকে বিভ্রান্ত করবে। আমি এজন্য পেরেশান ছিলাম। তুমি তো তার সাথে কোনো কথাই বলোনি।

আমি তার সাথে কি কথা বলতে পারতাম!

আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাকে বলবো।

কি বলবে?

চোখে দুষ্টুমি ভরা হাসি নিয়ে রাহাত বললো, যা মনে আসে বলবো।

চা পান শেষে মজিদ পুনর্বার আসার ওয়াদা করে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিল। আরশাদ ও সেলিমের সাথে মুসাফাহা করার পর সে ডা. শওকতের হাত ধরে বললো, আসুন আপনার সাথে একটু কথা আছে।

ডা. শওকত তার সাথে বাইরে বের হয়ে এলো। আঙিনায় পা রেখে মজিদ একটু ইতস্ততভাবে বললো, ডাক্তার সাহেব! আপনার কোনো

আপত্তি না থাকলে আমি সেলিমের শাদী করিয়ে দিতে চাই। আমার চাইতে বেশি কেউ তাকে জানে না। সে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ। একজন মেহমান হিসাবে আপনাদের বাড়িতে কয়েকদিনের বেশি থাকতে চাইবে না সে। শাদীর পর আপনি তার জন্য এমন কোনো কাজের কথা চিন্তা করুন যার সাথে সংযুক্ত হয়ে সে নিজেকে বেকার মনে করবে না। কাশ্মীরের পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যার ফলে যে কোন দিন আমরা অগ্রসর হবার হুকুম পেতে পারি। আর আমি দূরে যাবার আগে সেলিমের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে চাই।

ডা. শওকত সস্নেহে মজিদের কাঁধে হাত রেখে বললেন, বেটা! তুমি যদি আলাপের সূচনা না করতে সম্ভবত আগামী কালই আমি নিজে তোমার সামনে এ প্রস্তাব নিয়ে হাজির হতাম। এ উদ্দেশ্যে আমি এক সপ্তাহের ছুটিও নিয়ে এসেছি। আগামীকাল তুমি এলে সেলিমকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবো।

বহুত আচ্ছা। কাল একটার সময় আমি চলে আসবো।

চারদিন পর ইসমত ও সেলিমের শাদী হয়ে গেলো।

দুহপ্তা পরে একদিন সেলিম টেবিলে লিখছিল। ইসমত কামরায় প্রবেশ করে বললো, টেবিলে নাশতা দেয়া হয়েছে। ভাইজান আপনার ইন্তিজার করছেন।

বহুত আচ্ছা। চলো, আমি আসছি।

সেলিম কলম রেখে উঠে দাঁড়ালো এবং এদিক ওদিক দেখতে লাগলো।

চলুন। ইসমত হাসতে হাসতে বললো।

আমার ক্রাচ দুটি আজ সকাল থেকেই গায়েব। সেলিম পেরেশান হয়ে বললো।

ইসমত এগিয়ে এসে সেলিমের হাত ধরে বললো, ওগুলি আমিই সরিয়ে ফেলেছি। এখানে আমার উপস্থিতিতে আপনার অন্য কোনো সহায়কের প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র বাইরে যাবার সময় আমি ওগুলি ব্যবহার করার জন্য আপনাকে অনুমতি দেবো।

আর যদি তোমার সহায়তায় চলতে গিয়ে আমি পড়ে যাই তাহলে?

আমরা দুজন এক সাথে পড়বো এবং হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াবো।

সেলিম গুরু গম্ভীর স্বরে বললো, আমি তোমাকে আমার সাথে পড়ে যেতে দেবো না। হ্যাঁ, দেখো আমার বালিশের নিচে ঘড়িটা আছে। ওটা নিয়ে এসো।

এই আনছি, বলে ইসমত পাশের কামরায় চলে গেলো।

সেলিম ইতস্তত করতে করতে অন্য দরোজাটির দিকে কয়েক কদম এগিয়ে গেলো। গোছার কয়েকটি শিরায় টান পড়লো। ফলে তার পক্ষে জমিনে গোড়ালি রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। তবুও সে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল এই ভেবে যে, সামান্য একটু কষ্ট করে সে সহায়তা ছাড়াই চলতে পারে। ইসমত ঘড়ি নিয়ে ফিরে এসে দেখলো সেলিম দ্বিতীয় দরোজা থেকে বের হচ্ছে।

ইসমত দ্রুত এগিয়ে এসে তার হাত ধরলো এবং তার সাথে চলতে চলতে বললো, না এখনো নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি খুব শিগগির সহায়ক ছাড়া চলতে পারবেন। কিন্তু তাড়াহুড়া করবেন না।

আমি চলতে পারি ইসমত। এখন তো আমি গোড়ালির ওপর একটু একটু জোর দিতে পারি।

আমি জানতাম। আজই আমি স্বপ্নে দেখলাম, আপনি একটি সেনাদলকে মার্চপাস্ট করাচ্ছেন।

সত্যি বলছো ইসমত?

রাহাতকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। ঘুম থেকে উঠেই তাকে একথা বলেছি।

আচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আরশাদকে একটু পেরেশান করি।

ইসমত হেসে বললো, আরশাদ ভাইয়া পেরেশান হবেন না। কারণ আপনার ক্রাচ গায়েব করার পরিকল্পনা তিনিই তৈরি করেছেন।

পাশের কামরা থেকে আরশাদ আওয়াজ দিল, সেলিম! চলে এসো!

সেলিম ও ইসমত পাশের কামরায় গিয়ে খাবার টেবিলে বসে পড়লো। রাহাত চা ও নাশতা পরিবেশন করছিল। চা পান করতে করতে আরশাদ বললো, সেলিম! রাতে তোমাকে একটি সুখবর শোনাতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু তখন তুমি লিখছিলে। আমাদের ফউজের কয়েকটি গ্রুপ কাশ্মীরের ভেতরে প্রবেশ করেছে এবং কয়েকটি ময়দানে দুশমনের অগ্রগতি রুখে দিয়েছে।

সেলিমের চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে বললো, পরশু মজিদও আমাকে বলছিল কাশ্মীরের ব্যাপারে তুমি শিগগির কিছু নতুন খবর শুনবে।

আরশাদ বললো, বিগত কয়েক মাস থেকে হিন্দুস্তান তারস্বরে বলে চলছিল, কাশ্মীরে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী লড়াই করছে। পাকিস্তানকে শেষ পর্যন্ত তার এ খায়েশ পূর্ণ করতে হলো। সেলিম তুমি কি মনে করো আমাদের এ পদক্ষেপের পর হিন্দুস্তান পাকিস্তানের সাথে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করার সাহস করবে?

হিন্দু জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, সমঝোতা, আপোশ ও সন্ধির জন্য যারা হাত বাড়িয়ে দেয় তাদের ওপর তারা আক্রমণ চালায়। যদি একবার তাদের বিশ্বাস জন্মে যায় যে, প্রতিপক্ষ পরাজয় স্বীকার করবে না তাহলে তারা নিজেরাই বুকে হাত বেঁধে খাড়া হয়ে যায়। আমাদের পক্ষ থেকে শান্তিপ্রিয়তা ও সমঝোতার জন্য যত বেশি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ততই তাদের আক্রমণাত্মক অভিলাশ শক্তিশালী হতে থেকেছে। এমন কি তাদের বোমারু বিমানগুলি কাশ্মীরের সীমানা পার হয়ে আমাদের সীমান্ত এলাকায় বোমা বর্ষণ করতে থেকেছে। এখন পাকিস্তানী সিপাহী কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে।.তোমরা দেখবে শিগগির যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধির জন্য হিন্দুস্তান অতিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠবে। কিন্তু এটা হবে তার একটা প্রতারণা। তার রাজনীতিকরা আপোশ আলোচনার একটা দীর্ঘ মেয়াদী সিলসিলা শুরু করে দেবে এবং তার সিপাহীরা নতুন নতুন মোর্চা তৈরি

করতে থাকবে। পাকিস্তানের সিপাহীদের সংগীনের আঁচড়ে যে ফায়সালা লেখা হবে আমাদের কাশ্মীর সমস্যারই সেই একমাত্র সমাধানই সঠিক হবে। কাশ্মীরের যুদ্ধ যেদিন শুরু হয়েছিল সেদিন থেকেই আমি এ পদ্ধতিতে চিন্তা করে আসছি। তোমরা দেখবে শীঘ্রই পাকিস্তানের সকল স্তরের মানুষই এভাবেই চিন্তা করবে। হিন্দু কেবল একটিমাত্র ভাষা বোঝে–আর সেটা হচ্ছে তলোয়ারের ভাষা।

বাইরে রাজপথে লোকেরা পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগান লাগাচ্ছিল। তাদের শ্লোগানের সাথে ট্রাক ও জীপের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। রাহাত বাইরে বের হয়ে এলো এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললো, ভাইজান! ফউজ যাচ্ছে।

সেলিম চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, ইসমত আমার ক্রাচ নিয়ে এসো। বাইরে গিয়ে ওদের দেখতে চাই।

ইসমত অন্য কামরা থেকে ক্রাচ নিয়ে এলো। যখন তারা বাইরে বের হচ্ছিল আরশাদ উঠে তাদের সাথে চলতে চলতে বললো, সেলিম! আমি চাচ্ছি এ ক্রাচ দুটি কোনোদিন চিরতরে গায়েব করে দেবো।

যদি ইসমত আমাকে সহায়তা দেবার জন্য জোর দিতে থাকে তাহলে কোনোদিন আমি নিজেই এ দুটিকে গায়েব করে দেবো। আজ প্রথমবার আমি এদের সাহায্য ছাড়া কয়েক কদম চলেছি।

খুব তাড়াতাড়ি তুমি এগুলি ছাড়াই চলতে পারবে। পায়ের ওপর ধীরে ধীরে ভর দেবার চেষ্টা করো।

সড়কের কিনারে পৌছে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তারা ফউজী ট্রাক, লরী ও জীপের কাফেলা দেখতে লাগলো।

ভাইজান! আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। আমি চেয়ার আনছি।

রাহাত ভেতর থেকে একটি বেতের চেয়ার আনলো। সেলিম ফটকের এক কদম বাইরে পথের কিনারে চেয়ারে বসে পড়লো। আরশাদ তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। রাহাত ও ইসমত আঙিনায় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সড়কে ফউজী গাড়ির বহর দেখছিল।

সড়কের কিনারে লোকেরা সিপাহীদের দেখে আনন্দে শ্লোগান দিচ্ছিল। ট্রাক ও লরীর বাহিনী শেষ হয়ে গেলো। আরশাদ হাসপাতালে যাবার জন্য তৈরি হয়ে গেলো। সেলিম ওঠার এরাদা করছিল এমন সময় দূরে পদাতিক সিপাহীদের ভারী বুটের আওয়াজ শোনা গেলো।

সিপাহীরা নিকটে এসে গেলো। ইসমত ও রাহাত দ্রুত আঙিনায় চলে এলো এবং ফুলের কেয়ারী থেকে চটপট কয়েকটি ফুল ছিঁড়ে সড়কের দিকে ফিঁকে দিল।

সিপাহীদের কয়েকটি দল তাদের অতিক্রম করে গেলো। শেষ দলটি দরোজার কাছাকাছি পৌঁছলো। সাথে আগমনকারী অফিসার আচানক হাঁক দিল, 'হল্ট' আর অমনি সমস্ত দলটি দাঁড়িয়ে গেলো। 'রাইট টার্ন' সিপাহীরা ডান দিকে ফিরে গেলো। অফিসার 'স্টাণ্ড এট ইজ' বলে সোজা সেলিমের দিকে এগিয়ে এলো। সেলিম তাকে দেখতেই উঠে দাঁড়ালো। এ ছিল মজিদ।

সে এসেই বললো, 'সেলিম!' এই হচ্ছে সেই বিজলী, তুমি যার তালাশে ফিরছিলে। তোমরা যেখান থেকে এসেছো আমরা সেখানেই যাচ্ছি। তোমরা কাশ্মীরে যে কাজ শুরু করেছিলে তা এইসব হাতে পূর্ণতা লাভ করবে।

তোমরা এখনি যাচ্ছো?

হ্যাঁ, এই এক ঘন্টার মধ্যেই আমাদের ব্যাটালিয়ান রওয়ানা হয়ে যাবে। ভাবীজান কোথায়?

সেলিম আঙিনার দিকে ইশারা করে বললো, ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে সে তোমাদের দেখছে।

মজিদ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বললো, ভাবীজান! গতকাল আমিনার চিঠি এসেছিল। সম্ভবত আগামীকাল সে আপনাদের দেখতে আসবে।

ইসমত বললো, তিনি আমাকেও চিঠি লিখেছেন।

আমি তার চিঠির জবাব লিখতে পারিনি। সম্ভবত আর লেখা সম্ভব হবে না। আপনি তাকে জানিয়ে দেবেন আমি এখান থেকে চলে গেছি। আপনার যে কিতাবগুলি সেদিন নিয়ে গিয়েছিলাম কেউ আমাকে না জানিয়ে টেবিল থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। সেগুলির বিনিময়ে আমি আপনাকে কাশ্মীরের মহারাজার বাগান থেকে আপেল পাঠিয়ে দেবো।

আর কাশ্মীর বিজয়ের সুসংবাদও।

হ্যাঁ, তাও।

ইসমত বললো, এর বদলে আপনি আমার সমস্ত কিতাব নিয়ে যান।

রাহাত এতক্ষণ খামুশ দাঁড়িয়েছিল। সে বললো, আপনি আমার জন্য কাশ্মীর থেকে কি আনবেন?

তোমার জন্য? মজিদ কিছুক্ষণ চিন্তা করলো তারপর বললো, তোমার জন্য জাফরনের ফুল আনবো।

মজিদ ইসমত ও রাহাতকে 'আল্লাহ হাফেজ' বলে আবার সেলিমের কাছে ফিরে এলো। 'মজিদ আমার কোম্পানী তোমাকে সালামী দিতে চায়।'

না, না। সেলিম চমকে উঠে বললো।

তুমি আমার ভাই বলে এ সালামী দিচ্ছে না। বরং এ জন্য যে তুমি জাতির হাজার হাজার মানুষকে বাঁচিয়েছো। এ সিপাহীরা এমন এক ব্যক্তিকে সালামী দিতে চায় যে রাভীর কিনারে জ্বরে বেহুশ ও আঘাতে জর্জরিত শরীর থাকার পরও যুদ্ধ করছিল। তুমি কাশ্মীরের জিহাদে যেসব জখম খেয়েছো সেগুলির জন্য এ সালামী

দেয়া হচ্ছে। সেলিম! এরা সবাই তোমাকে জানে। আমি এদের সবাইকে তোমার পয়গাম শুনিয়ে থাকি।

আর সেলিম দাঁড়িয়ে সেই জানবাজদের সালামী গ্রহণ করছিল, যাদের চওড়া সিনার ওপর জাতির তাকদির লেখা ছিল। তখন তার চোখে জমা হচ্ছিল কৃতজ্ঞতার অশ্রুরাশি।

মজিদ মার্চ করার হুকুম দিল। সড়কের ওপর সিপাহীর বুটের ধ্বনি উঠছিল খটখট। সিপাহী দল সেলামী দিতে দিতে সেলিমকে অতিক্রম করে গেলো। তাদের পদধ্বনি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকলো। সেলিমের সিনায় একটি হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছিল আর বলছিল, এগিয়ে চলো– এগিয়ে চলো–' এগিয়ে চলো– তার চোখে অশ্রু জমা হচ্ছিল। অশ্রু– শোকরানার অশ্রু। একজন কবি, সাহিত্যিক, সিপাহী ও একজন মানুষের এ ছিল শেষ পুঁজি, যা সে উৎসর্গ করছিল জাতির যুবকদের প্রতি।

আমরা ভারতের মুসলমানরা কুফরকে ইসলামের বন্ধু মনে করে শত শত বছরের ঐতিহাসিক সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলাম। অতীতের ইতিহাস সাক্ষী কুফরী শাসন ব্যবস্থা সবসময় মজলুমের রক্ত থেকে জালেমের জন্য আন[illegible]রা বেঈমানী, অবিশ্বস্ততা, বেইনসাফী ও বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছি। ওদিকে আমাদের দুশমনরা সবসময় অবস্থা বুঝে তাদের কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন এনেছে[illegible] কখনো একচুল বিচ্যুত [illegible] ভারত বিভাগে রাজী ছিল না। কিন্তু যখন দেখল সাত সমুদ্র তের নদীর পারের দেবতা তাদের নৌকায় চড়ে বসেছে এবং তাদের নীতি আদর্শ গ্রহণ করেছে তখনি [illegible] ভারত মাতার সমস্ত দেহে এলোমেলোভাবে ছুরি চালাতে প্রস্তুত হয়ে গেল। আর এতেই আমরা মুসলমানরা খুশি হয়ে গেলাম যে, কোন প্রকার কুরবানী ছাড়াই আমরা পাকিস্তান পেয়ে যাবো। আসলে দুশমনরা আমাদেরকে ধোকায় ফেলেছিল। এই সুযোগে তারা গোলা-বারুদ, সাজ সরঞ্জাম ঠিক করে নিয়েছিল এবং দিল্লী থেকে পূর্ব পাঞ্জাবের শেষ পর্যন্ত হত্যা, ধর্ষণ, লুন্ঠন ও অগ্নিসংযোগের প্রচণ্ড বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। একই সাথে [illegible]কে বিদ্ধ হয়েছিল।

লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তখনো ভাইসরয় আর পান্ডিত নেহেরু ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু দিল্লীসহ সারাভারত জুড়ে তখন চলছিল সহিংস দেবীর পূজারী গুণ্ডাদের রাজত্ব। এ সময় অহিংসার দেবতার প্রধান সহযোগী লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন রাজ প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে [illegible] তুফান প্রত্যক্ষ করছিলেন [illegible] আমি এ দুনিয়ায় বহু মানুষের রূপ ধরে এসেছি। আদমের বাগানে বহুবার আগুন লাগিয়েছি। সমরকন্দ ও বুখারায় চেংগিজ খানের রূপ ধরে নাযিল হয়েছি। বাগদাদে এসেছি হালাকু খানের বেশে। কিন্তু তুই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।'

সহিংস দে[illegible] ফেললো তখনই অহিং[illegible]

ভারত বিভাগের সময় উপমহাদেশ জুড়ে মুসলিম নিধনের যে তাণ্ডবলীলা চলেছিল তারই লোমহর্ষক কাহিনী নিয়ে রচিত নসীম হিজাযীর অনবদ্য উপন্যাস **ভারত যখন ভাঙলো**।

ISBN [illegible]-7